রবীন্দ্র উপন্যাসে সময়

রাহুল চক্রবর্তী

উৎসর্গ

বাবা ও মাকে

লেখকের কথা

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস নিয়ে আজ পর্যন্ত অনেক আলোচনা হয়েছে। অনেক গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে এই গ্রন্থ নূতন করে আরেকভাবে দেখার প্রচেষ্টা মাত্র। নিঃসন্দেহে যা অত্যন্ত কঠিন কাজ। বস্তুত এক্ষেত্রে সহায়ক উপকরণ প্রচুর পরিমাণে লভ্য হলেও নূতন করে কিছু বলতে চাওয়াটা শক্ত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রচনায় তথা তাঁর উপন্যাস-বিশ্বে এমন কতগুলো সম্ভাবনা থাকে, যেখানে যুগে যুগে নূতন আলোকে দেখার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

আজকের এই ব্যস্ত পৃথিবীতে বহুমুখী বিকাশে বার বার সময়ের নানা অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে কি সাহিত্য, কি শিল্পকলা, কি বিজ্ঞান সর্বত্রই প্রবলভাবে অদৃশ্য সময়ের অস্তিত্বকে পাদ প্রদীপের আলোকে দাঁড় করানোব তাগিদ অনুভূত হয়। যা সাহিত্যের ধারায়, বিশেষত উপন্যাসে প্রচুর সম্ভাবনাকে নিয়ে আসে। ফলে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলোর নূতন করে পর্যালোচনা এবং সময়ের পটে এর সংযোগ সূত্র আবিষ্কারে থাকে আলাদা একটি আকর্ষণ। কেননা, জাতির নানা অবস্থান বিন্দু যেখানে বারবার ধরা পড়ে, সেখানে সময়ের দৃষ্টিকোণে আরো ব্যাপকভাবে ভাবতে ও ভাবাতে সাহায্য করে রবীন্দ্র উপন্যাস। কাজেই তাঁর 'করুণা' থেকে 'চার অধ্যায়' পর্যন্ত মোট তের খানা উপন্যাসের একটি পর্যায়ক্রমিক নূতন আলোচনার ফসল আমার এই গ্রন্থ, যা তাঁর জন্মের সার্ধশতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলিও বটে। অবশ্য বিস্তীর্ণ এই আলোচনার মধ্যে অসংখ্য শাখা-প্রশাখা ঘিরে এর বহুমুখি পর্যালোচনার যে অবকাশ রয়েছে, তা একটিমাত্র নিবন্ধে আলোচনা করা অসম্ভব। আমি কেবল সময়ের সুগভীর তাৎপর্যকে নিয়ে রবীন্দ্র উপন্যাস জগতের মিলিত রূপ ধরে নূতন একটি পথ সন্ধান করেছি। একজন অমৃতের পুত্র কিভাবে মানুষকে লক্ষ্য করে তার গঠন ও পরিচর্যাকে সম্পূর্ণ করেছেন— চির পুরাতন অথচ চির নবীন সেই মানব ধর্মের পূজারীকে উপন্যাসের বহু সম্ভাবনাময় পটে খুঁজতে চেয়েছি সময়ের মূল্যাঙ্কনে। সেইসঙ্গে প্রাসঙ্গিকতার সূত্রে চিহ্নিত করতে চেয়েছি আজকের যুগ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই গ্রন্থটি রচনার সামগ্রিক অনুপ্রেরণা দান করেছেন আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা তথা আমার গবেষণাপত্রের তত্ত্বাবধায়ক রমা ভট্টাচার্য। তাঁর অপরিসীম ধৈর্য, স্নেহ এবং মূল্যবান পরামর্শ না পেলে এই নিবন্ধ

রচনা সম্ভবপর হত না। তাছাড়াও আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্য এবং সহ-উপাচার্য অধ্যাপক গৌতম বিশ্বাসের মূল্যবান নির্দেশ আমাকে সঠিক বক্তব্য গঠনের অনুপ্রেরণা দিয়েছে।

এই গ্রন্থ প্রকাশে আরো যাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা আমি পেয়েছি, তার মধ্যে সহকর্মী ড. দেবাশিস রায়ের নাম উল্লেখ করবো। উল্লেখ করবো আমার সহধর্মিনী পূরবী চক্রবর্তীকে।

সর্বোপরি, যাঁরা আমার শুভানুধ্যায়ী বন্ধু এবং এই গ্রন্থ প্রকাশে যাঁরা প্রভূত পরিমানে উৎসাহ যুগিয়েছেন, তাদেরকে জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। সেই সঙ্গে টুওয়ার্ডস ফ্রিডমের স্বত্তাধিকারী মানস বাগচী মহাশয়কে এই গ্রন্থ প্রকাশে এগিয়ে আসার জন্য তাঁকে আলাদা করে ধন্যবাদ জানাই।

গ্রন্থটিতে অনেক বানানগত ভুল-ভ্রান্তি হয়ত থেকে গেছে, অনেক পর্যালোচনাও বাকি। সেক্ষেত্রে সহৃদয়বান পাঠকরাই এর শ্রেষ্ঠ বিচারক। তাই তাঁদের মূল্যবান মতামত কামনা করি।

রাহুল চক্রবর্তী

সূচাপত্র

বিষয় | পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়

প্রস্তাবনা ১

দ্বিতীয় অধ্যায়

করুণা থেকে রাজর্ষি ঃ সময়ের অন্তর্বৃত্ত এবং বহির্বৃত্তে সংযোগ ১৬

তৃতীয় অধ্যায়

চোখের বালি থেকে গোরা ঃ অন্তর্বৃত্ত এবং বহির্বৃত্ত সময়ের শিল্পরূপের বিন্যাস ৮৮

চতুর্থ অধ্যায়

চতুরঙ্গ ও ঘরে বাইরে ঃ সময়ের মুখচ্ছবি ১৬৮

পঞ্চম অধ্যায়

যোগাযোগ থেকে চার অধ্যায় ঃ অতীত ও অনাগতের মেলবন্ধন ২২৭

উপসংহার ২৮১

গ্রন্থপঞ্জি ২৮৮

প্রথম অধ্যায়

প্রস্তাবনা

'প্রৌঢ়তার দিকে তবু পৃথিবীর জ্ঞানের বয়স
অগ্রসর হয়ে কোন্ আলোকের পাখিকে দেখেছে?'[১]

একজন আধুনিক কবির কাছে এই উচ্চারণ 'জ্ঞান' এবং 'আলোকের পাখি' পরিপূরক অঙ্গী হয়েও আলাদা, কারণ মানুষের বুদ্ধি আর মানবের বেঁচে থাকা এক নয়। মানুষ জ্ঞানের ভেতর দিয়েই অগ্রসরমান, অথচ বড় বেশি লিপ্ত-আসক্ত নিকটের সাময়িক কাল-অভিজ্ঞতায়। আর এভাবেই ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠা জীবন ক্রমশ একদিন আবিষ্কার করে, পরিচিত এই পৃথিবী ছাড়িয়েও আরো বিস্ময়ের পর্যটন বাকি। হয়তো সেজন্য আরো অন্তর্নিবিষ্ট হয়ে অনুভব সম্ভব, বিশ্ব জাগতিক অনাদ্যন্ত কালপ্রবাহের মধ্যে মানুষের বিম্ব অবস্থান— ভঙ্গুর ভারাতুর ভীতিময়, আবার একইসঙ্গে রঞ্জিত রহস্যাতুর রতিময়।[২]

অথচ এই বড় বেশি সমকাল-আসক্তি, আর তারই সঙ্গে সমকাল-উত্তরণ হল জীবন-আকাঙ্ক্ষা প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়। সেইসঙ্গে যুগপৎ এই সংগঠনে দীর্ঘ সংঘর্ষ শেষে সময়প্রবাহ ধরে ক্রমে ক্রমে রুচিবান হয়ে ওঠা। কোনো একটি সত্তার মৃত্যু দিয়ে কোনো আর একটি সত্তায় জেগে ওঠা। আবার এই রুচির অন্তর্বয়নে সমষ্টি থেকে ব্যাপ্তিতে পথ গড়ে তুলতে তীব্র আততিসহ বহু বিচিত্র অজ্ঞতাকে দূর করে স্বাবলম্বিতার মাঝে দাঁড় করিয়ে দেওয়া।

এই সঞ্চরমান মানব-ধৃতি অন্য জগতের আলো নিয়ে আসে। গড়ে তোলার ভূমিটি পূর্ণাঙ্গ হতে চায় পরিপূর্ণ সামগ্রিক বৃত্তিতে। আর তাতে যে বর্ণময়তা দেখা দেয়, সেখানে 'আমি' এবং 'না-আমি'- 'সত্তা' এবং 'অপরতা'র আলাদা নিরাপত্তার প্রাচীর উবে যায়। সত্তা অবিরত নিজ কেন্দ্রভূমিতে আবর্তিত হতে হতে ক্লান্ত হয়ে সময়কে ছুঁয়েই ক্লান্তি মোক্ষণের পথে অনর্গল সংলাপে অপরতার মাঝে পরিসর খুঁজে নেয়, আর এই নূতন আত্মপরিচয়ের মুখোমুখি হয়ে নির্মিত অতীতকে অবলোকন করে। একইসঙ্গে খণ্ডিত এবং পূর্ণাঙ্গ আলাদা দুই মাত্রার অবস্থান-বিন্দু ধরেই উপলব্ধিতে গড়ে ওঠে দ্বৈত শিল্পরূপ।

একদিকে খণ্ডিত যুগ, অন্যদিকে সংবেদনশীলতা; একদিকে জ্ঞানভাবগ্রস্ত মন, অন্যদিকে পাখির মতন উড়ে যাওয়ার প্রবণতা— উভয়ের সংঘর্ষ নিরন্তর। তাতে সংশয়ের তিমির ভেদ করে কোথাও বিশ্বাসের প্রতীতী ধরা পড়ে, কোথাও পড়ে না। অথচ একথাগুলো মানুষের চেতনালোক থেকে শিল্পীর অনুসন্ধানী দৃষ্টিতেই ধরা পড়ে। তবুও এই সংবেদনশীল অভিজ্ঞ উচ্চারণের আগেও মানুষ সময়ের প্রবহমান ধারায় আলোড়িত। ফলে, বহুযুগ আগেই বেদে সচেতনভাবে বলে নেওয়া হয়-'কালো অশ্বো বহতি' [৩] -সময় বয়ে চলে। আর এই বয়ে যাওয়াকে ঘিরে তার অসহায় অবস্থান সভ্যতার বিচিত্র অতিক্রান্তিতে ধীরে ধীরে বুঝতে শেখায় বিকাশের রহস্য— তার অন্বেষণ এবং স্বীকরণ। ফলে মানসিক এবং সামাজিক - উভয় ধারার পাকে পাকে জড়িয়ে অবয়বের অস্পষ্টতা কাটিয়ে গড়ে ওঠে আত্মভ্রান্তি-আত্মজিজ্ঞাসা-আত্মবোধ। পর্যায়ক্রমিক এই ধারা ক্রমান্বিত সময়কে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে। আর ধীরে ধীরে সমতালে পাল্টে যেতে থাকে পরিসরের আদল। চলমান স্রোতে জ্ঞানসমৃদ্ধি ঘটে, পাশাপাশি নিঃশব্দে সঞ্চারিত হয় উপলব্ধি। তাই সঙ্গতভাবে এই কথা মেনে নিতে হয়—

"Men feel and think in the time flow. They also act in it, either seizing opportunities or missing them." [৪]

কিন্তু সেই সঙ্গে সময়ের আধিপত্যকে একমুখী প্রবণতায় সে আর এভাবে মেনে নিতে পারে না- 'Some die, others are born; nothing halts the flow of the river.' [৫]। বরং আত্মশক্তিতে পূর্ণ উদ্যমে কখনো কখনো সদম্ভে উচ্চারণ করে,- 'সময় তো রথে চড়ে আসেন না, আমরা তাঁকে ঘাড়ে করে নিয়ে আসি' [৬]

এখানেই মানুষের চেতনা এবং বোধ উন্নত এই অর্থে, যে, তা ক্রমবিবর্তনমুখী আবার প্রগতিশীল। দুটো প্রক্রিয়াতেই সময় ও পরিসর যুক্ত, কিন্তু দুটো প্রক্রিয়াই সমার্থক নয়। এককোষী প্রাণী থেকে যেখানে বহুকোষী জটিল মানব দেহ বহু লক্ষ বছরের অতিক্রান্তিতে গড়ে ওঠে, তার নেপথ্যে থাকে বিবর্তন ধর্ম। সময় এখানে নিছক ক্রমান্বিত ধারা। কিন্তু যেখানে প্রগতিশীল কথাটি যুক্ত, সেখানে সর্বাংশেই ভাবলোক তার অনুভবের বিস্তার এবং মানবমুখীতা নিয়ে সেই জগতের অভিসারী। সময় এখানে নিছক ক্রমান্বিত ধারা নয়, নির্মাণের সহায়ক—সংযুক্তি আর বিযুক্তিতে, সদর্থক আর নঞর্থকতায়। ফলে প্রোটোপ্লাজম থেকে মানুষ—এই তদ্‌গত উপরিতলের দৃষ্টিতে সময়ের বিবর্তন যেখানে বোঝায়, মানুষকে সেখানে মানব হয়ে উঠতে চৈতন্যের গভীরে তৈরি করতে থাকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হবার নানা-স্তরীয় শক্তি। এই লক্ষ্য পূরণে কত বিস্তৃত পট, কত বিস্তৃত সংস্কার, কত

বিস্তৃত বিরোধিতা ভরে ওঠে। তৈরি হয় আভাসের অস্পষ্টতা, মুখোশের আড়াল— আর অতর্কিতে অন্তরাল ভেদ করে দেখা দেয় মুখশ্রী আবিষ্কারের তাড়না। ক্রমশ জৈবিক সময়ের একটি অর্থসূচক একরৈখিক স্থূলত্ব ঝেড়ে ফেলে মানুষ 'সত্তা-সন্ধানে' বহুদিনের দুর্বল 'সত্তা-নির্ভরতা' পরিত্যাগ করে অপরকে ডেকে আনে। আর এই অপরকেই সত্তায় প্রতিষ্ঠিত করে সে হয়ে ওঠে অতীতের পর্যবেক্ষক এবং বর্তমান ও ভবিষ্যত-নির্মাতা। তখন তার পক্ষে, 'সময় বয়ে চলে'- এই একটি মাত্র নিঃসঙ্গ-নিস্পৃহ উচ্চারণকে প্রগতির পথে আন্তরিকভাবে মেনে নেওয়া মুশকিল।

মানুষ যখন 'আমি' এবং 'না-আমি'র মাঝখানটির ছোট্ট বিরতিকে চেনে না, তখন তার সম্পর্ক-সন্ধান কেবল জৈবিক ধর্মে টিকে থাকার প্রবৃত্তি। তাই প্রাগৈতিহাসিক যুগের অনিশ্চিত জীবনের আত্মবলয়ের কঠিন আবরণ ভেদ করতে পারা শুধু বিবর্তন সূত্রে নয়, প্রগিতিশীলতার অনেক চড়াই-উৎরাই পথ পেরিয়ে আসা। ধীরে ধীরে অরণ্য জীবনকে পরিত্যাগ করে উপনিবেশ গঠনে, খাদ্য সমস্যার সমাধান প্রচেষ্টায়, চাষবাসের মাধ্যমে স্থায়ীত্ব আনবার অতিরিক্ত সতর্কতায়, অভিজ্ঞতার পরীক্ষা দিয়ে মানুষ হয়তো মেনে নেয় প্রকৃতির সময়ের মর্জি, ঋতুর পালাবদল। আর অদ্ভুত বিস্ময়ে অর্জন করে মৃত্যুদর্শন অভিজ্ঞতাকে ছুঁয়ে ভীতিমিশ্রিত ধারণা—

"The irreversibility and inexorability of the passage of time is borne in on a human being by the fact of death. Unlike other living creatures, he knows that his life may be cut short at any moment and that, even if he attains the full expectation of a human life, his growth is bound to be followed by eventual decay and, in due time, death."[৭]

সরল এই অভিজ্ঞতা থেকেই একের পর এক জন্ম হয় দর্শন-বিজ্ঞান-ইতিহাসের জ্ঞান-মাধ্যম। তবুও অনুসন্ধানের এই প্রস্তাবনা থেকে অলক্ষ্যেও গড়তে থাকে সেই সময়ের জগত, যেখানে জৈবিক নিয়মের একাধিপত্যই সব নয়।

অবশ্য পুরোনো সংস্কারকে জৈবিক ধর্মেই একেবারে পরিত্যাগ সম্ভব নয়। অথচ সেই সংস্কার ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে মিলিত হয়েই সত্তার ভেতর থেকে আরেক সত্তাকে আবিষ্কার করতে উন্মুখ হয়ে ওঠে। কিন্তু এই প্রবহমান সময়ের উচ্চনিনাদিত মাঝতরঙ্গের অভ্যন্তরে কে সেই বিচিত্র জগত তাঁর আবিষ্কারী চোখ নিয়ে দেখাতে পারেন— এরই লক্ষ্যে শিল্পমাধ্যমের সূত্রপাত। উপরিতলের সময় মর্জিকে বজায় রেখেও মানবমর্জিও যেখানে সমানভাবে যুক্ত হবার যোগ্যতা রাখে। আর তারই

হাতে থেকে যায়, সময়কে মুখপাত্র করে ভেতর থেকে চিরন্তন জগতকে আবিষ্কার করার বাসনা। জীবন ঠিক এ জায়গাতে কায়িকরূপে নয়, সম্মান এবং আভিজাত্যের ঐশ্বর্য নিয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে— বিস্তৃতি ঘটে সীমানার। প্রেমকে আত্মস্বৈরাচারের দাবি মেনে তখন শুধু নিজের দিকেই টানতে চায় না, প্রয়োজনে আত্মবলিদানেও তৎপর হয়ে ওঠে। প্রীতির বন্ধন কেবল আত্মজনির্ভর হয়ে থাকে না, ক্রমশ তার আধার অনায়াসে পরিবর্তিত হতে পারে। জীবনের দ্রুত নিঃশেষিত সময়-পুঞ্জকে মুঠোর মধ্যে ধরে তাকে আন্তরিক রূপে, গভীরতর রূপক সঞ্চারিত হয় জীবনেরই আরেক বিস্তারিত পটে। আর এখানে বিপুল অভিজ্ঞতার বিচ্ছিন্ন বস্তুজগতের তদ্গত লোক থেকে উদ্ভব ঘটে জীবনকে অবলোকন এবং পুনর্নির্মাণ করার আলাদা এক মাত্রা। মৃত্যু তখন কখনো কখনো হয় আকাঙ্ক্ষা, অন্ধকার হয় রোমাঞ্চকর, বন্ধুর পথ হয় অজানা দেশকে আবিষ্কার করার হাতছানি। এতদিনকার বহু সময়ের সমাহারে নিয়ন্ত্রণহীন গতিতে চলতে চলতে বাস্তব জীবনের নিখুঁত প্রতিভাস থেকে মানুষ জড়লোক আর মানব লোককে এক করে চেনে, আলাদা করেও বেছে নেয়। সঞ্চারিত হয় সময়কে ধারণ করার এবং বাহিত হবার ভিন্ন সামর্থ্য।

সুপ্রচলিত আরব্য উপন্যাসের বিচিত্র কাহিনীমালার ভূমিকাতে পারস্যাধিপতি শারিয়ার নারীচরিত্র সন্ধিহান এবং ঘৃণা যে যুক্তি-বুদ্ধিকে আশ্রয় করে, তাতে প্রয়োজনীয় কারণ থাকলেও তদ্গত তার প্রবৃত্তি। তাই যুক্তিহীনভাবে আধিপত্যের প্রবহমানতার পথ ধরে তার মধ্যে অনিবার্য হয়ে ওঠে নারীহত্যার পিপাসা। সময়ের এই কারাগার থেকে সেদিন আর কোনো বিবাহযোগ্যা রমণীরই পরিত্রাণ নেই। অথচ আরব্য উপন্যাস কোনো একজন নারীর ব্যভিচারিনী হয়ে ওঠা এবং শারিয়ার মনে ক্রোধ ও ঘৃণা জাগিয়ে তোলার অযৌক্তিক প্রতিলিপি নয়। বরং সময়ের তদ্গত জড়লোক থেকে আপন সমৃদ্ধি ও মানবিকতার গুণে তাকে জীবনমুখী করে তোলার সহস্রাধিক অনুপ্রেরণার গল্প। মন্ত্রীকন্যা শাহারজাদী হত্যার আনন্দে মেতে ওঠা উন্মাদ পারস্যাধিপতিকে এই গল্প বলার প্রেরণায় যে সময়, যে পরিসরের কথা বলে তা সমকালের ঊর্দ্ধে ব্যক্তির সংগঠনের সহায়ক। গল্পগুলি সমকাল থেকে চিরকালের সুবিস্তীর্ণ পটে সম্প্রসারিত হতে থাকে। আর তারই ফলে একাধারে নিয়ন্ত্রণ করে 'বর্তমান জড়লোক', উজ্জীবিত হয় জড়লোকের অন্তঃপ্রবাহ। শারিয়ার তার সন্দেহলোক থেকে মুক্ত হন দীর্ঘ প্রবহমান জীবন-সান্নিধ্যের প্রেরণার সঞ্চরণে।

এই প্রেরণার লক্ষ্যে জীবন অনুসন্ধানই মুখশ্রীদর্শন। তারই লক্ষ্যাভিমুখী হতে প্রবহমান ক্রমান্বিত সময়ধারা বজায় রেখেও তাল পাল্টাতে হয়, সৃষ্টিশীল গতিকেই অব্যাহত রাখতে প্রতিহত করতে হয় প্রচলিত রীতিকে। অথচ বিজ্ঞান-ইতিহাস-

দর্শন এই উপস্থাপনা এবং গতিধর্মকে যেখানে ধরতে পারে না, সেখানে নিপুণ শিল্পী অনুভব করেন তার অমোঘ আকর্ষণ এবং শক্তি। শুধু অনুভবই করেন না, অনর্গলভাবে ক্রমান্বিত সময়ের সংমিশ্রণে এবং সম্প্রসারণে কোথায় তার বঞ্চনা, কোথায় তার উপেক্ষা—কারণ অনুসন্ধান করেন। অনুসন্ধানকেই যুক্তি দিয়ে বোঝাতে সাহায্য নেন বিজ্ঞান-ইতিহাস-দর্শনের। সৃষ্টিলোকে পৌঁছাতে তাঁর কোনো মাধ্যমই অস্পৃশ্যরূপে বর্জনীয় হয়ে ওঠে না। ফলে, সময়ের সবগুলো তন্ত্রী তিনি ছুঁয়ে যান, আবার সেই স্তূপীকৃত বস্তুপিন্ড থেকেও তিনি শেষপর্যন্ত শুষে নেন বেছে নেবার গভীর উদ্দীপ্তি। এজন্যই শিল্পলোক বহু সম্ভাবনার দাবীদার, বহু অবস্থানের ভূমি। হয়তো তাই শিল্পলোকের অন্যতম মাধ্যম উপন্যাসের সঙ্গে দর্শনের তুলনা করতে গিয়ে আলোচক বলেন— "The novel's wisdom is different from that of philosophy."[৮]

যেখানে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার জটিল প্রয়োজন, শিল্পের ক্ষেত্রে তা উপরিতল মাত্র। চৈতন্যের গভীরতাকে মাপতে তত্ত্ব ব্যাখ্যা দিয়ে জীবন অনুভূত নয়, অতএব তা পূর্ণ পরিচয়ের দিশারী নয়। আরব্য উপন্যাসে শাহারজাদী পারস্যাধিপতিকে তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে বোঝাতে যাবার সোজা পথ ধরে না, বরং সেভাবে এগুলে প্রথম রাত্রেই তার জীবনে গতানুগতিক মৃত্যু নেমে আসতো। শুধু গল্প শোনার দুর্নিবার আবেদন এখানে প্রচলিত নিয়মের বদ্ধ অবস্থানকে লঙ্ঘন করার সাহস রাখতে পারে বলেই ভেতরে ভেতরে নির্মাণ করে তোলে অপরিচিত পৃথিবীলোকে পরিচিত বিশ্বকাল।

শিল্পভাবনা তাই বারে বারে প্রচলিত সাময়িকতার গন্ডী অতিক্রম করতে রীতি পাল্টায়। অবশ্যই শিল্প মাধ্যমের সকল শাখাই সমপর্যায়ের শক্তিধর নয়। আর এখানেই চিত্র-সঙ্গীত-কাব্য সমমান্যতা পেয়েও তাদের গড়ে ওঠার সামগ্রিক বিন্যাস যেন জীবনের টুকরো আলোর দীপ্তি। তারা একটি ভাবের স্বচ্ছ প্রকাশ, অথচ জীবনের নানাস্তরিক সমাহার নয়। সমালোচককেও তাই বলতে হয় —

'চিত্রকরের রং ও তুলি, বাদকের যন্ত্র এবং গায়কের কণ্ঠের মতো কবির শব্দও স্রষ্টার সকল অনুভূতিগুলি সর্বাঙ্গ সুন্দরভাবে প্রকাশ করতে পারে না।'[৯]

সাহিত্যের অঙ্গনে অন্যতম শাখা হিসেবে নাটক যথেষ্ট সমকাল-বাহক এবং সময় সচেতন হলেও তার আয়তন ও আঙ্গিক-বিন্যাস নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতায় থেকে প্রধান প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠে। সাহস করে একালের একজন সমালোচক তাই বলেই ফেলেন —

'সেই সীমা ছাড়িয়ে নাটককে যুগের সার্বিক চেতনা ও জীবনধারার মাধ্যম হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা শেকস্পিয়রের প্রতিভার পক্ষেও সম্ভব হয়নি।'[১০]

মহাকাব্য হয়ত সেদিক দিয়ে বহু প্রতিবিম্বের শিল্পসাক্ষর। তবু যে অর্থে সময়ের মাত্রা ব্যক্তিকে স্পর্শ করে ব্যক্তির অন্তর্লোকে প্রবেশের পক্ষপাতি, সেক্ষেত্রে মহাকাব্য কেবল এক বিস্তৃত ক্রমান্বিত সময় জগত নিয়ে ব্যস্ত। সময়ের পটে গতিশীল আজকের এই প্রগতিবাদী মানুষ তাতে সঠিক তৃপ্তি পান না। সমালোচক বুদ্ধদেব বসু তাই 'রামায়ণ' থেকে রাবণের সীতাহরণের কারণ রূপে প্রচলিত ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট না হয়ে ব্যক্তি-রাবণের অন্তর্লোকে ভাসমান চৈতন্যের অঙ্গ ছুঁয়ে সীতাকে তার ভালবাসার গভীর গোপন অনুরাগকে উপভোগ করেন।[১১] রবীন্দ্রনাথও স্বয়ং 'কাব্যের উপেক্ষিতা' প্রবন্ধে মহাকাব্যের অবহেলিত ব্যক্তিকে নূতন করে অন্বেষণ করে ফেরেন।[১২] আর যদিও তার ফলে আধুনিক সমালোচকদের দৃষ্টিতে অবহেলা এবং উপেক্ষার কথাই অনুযোগরূপে মহাকাব্য রচয়িতার উপর বর্ষিত হয়, তবু তীক্ষ্ণ অনুধাবন শক্তিতে সহজেই বোঝা যায়— সমস্যা রচয়িতার চাইতে রচনার সীমাবদ্ধতায়।

কাজেই বিপুল বিস্তৃত, অথচ দ্বন্দ্ব জর্জরিত সময় ও পরিসর এই আধুনিক যুগে প্রকাশ পেতে অন্য একটি স্বতন্ত্র শিল্পশাখার প্রয়োজন অনুভব করে। যেখানে মাধ্যমের অন্তর্নিহিত সীমা অতিক্রম করতে গিয়ে তার প্রকৃতি বদলে নেয়— তাকে দেয় তির্যক গতি। আবার তার মধ্যে সঞ্চার করে গূঢ়তর ব্যঞ্জনা - 'a language within a language'।[১৩] ঠিক এখানেই সমবেত যুগের এবং একটি বর্তমান যুগের অবস্থান বিন্দুতে উপন্যাস তার বহুবাচনিক (dialogic) সত্তায় আবির্ভূত। জীবনের সবচেয়ে নিকটবর্তী একটি প্যাটার্নকে ধরে বিবিধ বিরোধী উপাদানের মধ্যে সক্রিয়রূপে সময়ের অসংখ্য দ্বান্দ্বিক অবস্থানে সংঘাত-সম্পর্ক-সমন্বয় নিয়ে আসে। ফলে জীবনের বিচিত্র অবতল এখানে সদর্থক এবং নঞর্থক সমবায়ে সমদৃষ্টিতে দেখা সম্ভব। ভিক্টোরিয়ান যুগের ঔপন্যাসিক ডিকেন্স তা না হলে জীবনকে ধরতে ফরাসি বিপ্লবের পটভূমিকায় এভাবে তাঁর একটি সুবিখ্যাত উপন্যাসের সূত্রপাত ঘটাতে পারতেন না—

"It was the best of time, it was the worst of time, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of Light, it was the season of Darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair....."[১৪]

সময়ের বহুস্বরিক আলো ছায়ার খেলা অনন্ত সম্ভাবনায় উপন্যাসেই ধরা দেয় বলে হয়তো নূতন করে ভাবিয়ে তোলে স্রষ্টাকে। আর ভাবনা থেকেই চিন্তাবিদরা তাঁদের বহু অজানা রহস্যের কেন্দ্রীয় স্তর হিসেবে উপন্যাসকেই করে তোলেন

মাধ্যম। অন্যতম চিন্তাবিদ এম. এম. বাখতিন তাঁর 'ডিসকোর্স ইন দ্য নভেল' প্রবন্ধে উপন্যাসকে আলাদা শিল্পরীতি হিসেবেই উল্লেখ করেন - 'The novel is an artistic genre'[১৫] -যা খুব সাধারণ এক 'বাচন' মাত্র নয়। কেননা, অনেকান্তিক ব্যঞ্জনার ধারণা বা বাখতিনের ভাষায় 'heteroglossia' উপন্যাসেই বিশেষ করে লভ্য। আর তাই জীবনের সঙ্গে সঙ্গে জীবনমুখিতা, সময় ও সামাজিক পর্ববিন্যাসের একীভূত মিশ্রণ ছেড়ে স্বতন্ত্র উচ্চারণে এখানে ত্যাজ্য ও গ্রাহ্য ধর্মে সৃষ্টিশীল। বাখতিনের বক্তব্য বিশ্লেষণ করে এম. হল্‌কুইস্ট অনুবাদ করে নেন---

"The compositional forms for appropriating and organizing heteroglossia in the novel, worked out during the long course of the genre's historical development, are extremely heterogeneous in their variety of genetic type. Each such compositional form is connected with particular stylistic possibilities and demands particular forms for the artistic treatment of the heteroglot 'languages' introduced into it. We will pause here only on the most basic forms that are typical for the majority of novel types".[১৬]

যদিও সময় প্রসারণের দিক দিয়ে জ্ঞানমাধ্যম ও ভাবমাধ্যম ধরে দুটো আলাদা পথের কথা বলা হয়, তবু শুধু ভাবমাধ্যমই উপন্যাসের একমাত্র আধার হতে পারে না। বরং তার আগে জ্ঞানমাধ্যমের সঙ্গেও তা যুক্ত। সেক্ষেত্রে বিজ্ঞান-ইতিহাস-দর্শন উপন্যাসের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে জড়িয়ে থাকে। তা যদি না হয়, তবে জয়েসের 'ইউলিসিস্' উপন্যাসে লিওপল্‌ড ব্লুম ইতিহাসকে ছেড়ে ইউরোপের আড়াই-তিন হাজার বছরের অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতেই পারে না। কিংবা বিস্তৃত প্যানোরামায় সমুদ্রের বিশালতা এবং নিস্পৃহতাকে ড্যানিয়েল ডিফো যখন ক্রুশের বর্ণনায় তুলে ধরেন, তখন অনন্ত সময়কে ছুঁয়ে দর্শনের অনুরণন তোলে। কেননা অবিচ্ছিন্ন কালকে প্রথমে অনুমান করেই 'অনুভব' করতে পারাটা সম্ভব। সেইসঙ্গে নিউটন নির্দেশিত 'absolute time'-র[১৭] পর আইনস্টাইনের পদার্থবিদ্যায় আপেক্ষিক তত্ত্বের[১৮] প্রবর্তন সময় ভাবনার যে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটায়, তার প্রভাব উপন্যাসকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে। তাই বস্তুজগতের পাশাপাশি মানসজগতের সময় ও পরিসর ভিত্তিক আপেক্ষিক সম্পর্ক তৈরি হয়ে উঠতে পারে। সচেতনভাবে বস্তু ও মানস জগতকে একই মাধ্যমে টেনে এনে ভার্জিনিয়া উল্‌ফ তাঁর 'মিসেস্ ড্যালোওয়ে' উপন্যাসে মধ্যবয়সী একজন মহিলার ক্ষণিক বর্তমান বস্তজগতের পরিসর ধরে অতীতের অন্য পরিসরে সুদীর্ঘ স্মৃতিরেখায় চালিত করেন। বর্তমানের শাসনকে

চূর্ণ করে অনুভূতির অসংখ্য সময়ের অমেয়তা ড্যালোওয়েকে পরিবর্তমান জীবনের অসংখ্য অভিজ্ঞতার মুখোমুখি নিয়ে যায়। অতএব এই চেতনাবোধ নিয়ে ঔপন্যাসিক কোনোভাবেই পারেন না বিজ্ঞানকেও উপেক্ষা করতে। অথচ যে জায়গাটি ছুঁয়ে উপন্যাসের পাত্রপাত্রীরা অন্তর্মুখীন ও দ্বন্দ্বময় ব্যক্তিত্বকে নিয়ে বৃহত্তর সামাজিক মানুষের সম্পর্কে আসে, অর্থাৎ যে শক্তির তীব্র চাপের ফলে সে অনন্তকালের সঙ্গে সূত্রবদ্ধ হতে পারে - সেখানে উপন্যাস শুধু জ্ঞানের আত্মীয়রূপে আত্মব্যাখ্যা করতে পারে না। লেভ তলস্তয়ের 'রেজারেকশন' উপন্যাসের নেখ্‌লিউদভ্ তাই মাস্‌লোভা স্মৃতিতে অনুশোচনার সময়-বিবৃতি ধরে আত্মকেন্দ্রিক শোষক সত্তা থেকে মুক্ত হয়ে পুনরুজ্জীবিত হতে পারে। দস্তয়েভস্কির 'ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট' উপন্যাসে রাস্‌কলনিকফকে খুন এবং পরস্বাপহরণের স্মৃতি পাপচেতনার আগুনে পুড়িয়ে শুদ্ধ করে তোলে। এক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার দর্পণে উভয়ের পরিবর্তন জ্ঞান মাধ্যমের দৃষ্টিতে দেখানো সম্ভব নয়। কাজেই সময়ের অবস্থান যেখানে মহৎ-এর পথ অবলম্বন করে, সেখানেই উপন্যাসে প্রবেশ করে ভাব ও অনুভূতির জগত। হয়ে ওঠে প্রগতিশীল। সত্তা বারে বারেই সম্প্রসারিত হয় অপরতায়। বাইরের এই দৃশ্যপট ছেঁকে উপন্যাসের অনুভূতির চোখে ধরা পড়ে মানুষের যন্ত্রণার ভেতর একটি স্পর্শকাতর সময়। আর বাইরের জগত জুড়ে জড়িয়ে থাকা 'বর্তমান' নিস্পৃহ বস্তুময়তায় সমতালে এগিয়ে সেই যন্ত্রণার সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে বিশিষ্ট কোনো মুহূর্তের খন্ডত্বে জ্বলে ওঠে। স্বভাবত: এই খন্ডত্ব মুছে গিয়েই অসহ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি ঘটতে পারে ক্রমশ মানবিক কালের সন্নিধানে। প্রত্যেক ঔপন্যাসিক তাঁর সুবিস্তৃত পটচিত্রের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে যেখানে সত্তা-অপরতার সম্পর্ক গড়ে তোলেন, সেখানে শেষ পর্যন্ত মানবিক কালকেই অনুসন্ধানের পথে আভাসের ছোঁয়া দিয়ে যান। কিংবা হয়তো গড়ে নেন তার প্রতিমা। তারপর ক্রমশ আরও তীক্ষ্ণতায় এগিয়ে যান, সন্ধান করে ফেরেন মুখশ্রীকে। সমালোচকও এই যুক্তিতেই বোঝান—

"মিলিয়ে দেখতে চাওয়াটা ঔপন্যাসিকের দেখতে চাওয়া। এই ব্যক্তি আর পরিবেশকে মিলিয়ে দেখতে গিয়ে ঔপন্যাসিক দেখান কী এবং কতটুকু মিলছে এবং কী কোথায় মিলছে না। অসমন্বয়ের এই যন্ত্রণাকে ঔপন্যাসিক নানাভাবে পরীক্ষা করেন। সকল প্রেমে সকল মানুষ তার স্বরূপকে খুঁজছে। ব্যক্তি মানুষের এই সন্ধানী যাত্রায় ঘন ঘন করাঘাত সমাজ-পরিবেশের বুকের ওপরেই বাজতে থাকে।"[১৯]

ফলে উপন্যাসে একজন মানুষকে কেন্দ্র করে যেমন বহু মানুষের প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ সমাহার ঘটে, তাতে নানা ব্যক্তির যৌগিক অবস্থানে ডিস্‌কোর্স অনিবার্য

হয়। এই ডিস্‌কোর্স বস্তুজগতের চোখে সুবিন্যস্ত যতটুকু নয়, উপন্যাস তাকে মহতের পথে বিন্যস্ত করে তুলতে পুনর্নির্মাণের প্রয়োজন অনুভব করে। কারণ উপন্যাস জীবনকে গড়ে তুলতে, ব্যক্তির আত্মজগত থেকে মানবজগতে অবগাহন করতে তাৎপর্যবাহী হয়। অবশ্য সর্বত্রই তার পূর্ণতা আসে না। কিন্তু সেক্ষেত্রে তার আপাত অবস্থান সূত্রে পূর্ণতারই অভিমুখীন হয়। সেজন্য বঙ্কিমের 'কপালকুন্ডলা'র মত শ্রেষ্ঠ উপন্যাস অনিশ্চিত অবস্থানে শেষ হয়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'মালঞ্চ' উপন্যাসের নায়িকাকে শেষ মুহূর্তেও আত্মদহন থেকে মুক্ত করেন না এবং শরৎচন্দ্র 'গৃহদাহ'-তে হতভাগ্য অচলার জন্য মহিমের পক্ষ থেকে গল্পের শেষ সীমানায় কোনো পথের নির্দেশও দিয়ে যান না।

তবু ঠিক এই জায়গাতেই উপন্যাসের আপাত-পরিসমাপ্তি ঘটলেও, উপন্যাস-পাঠক থেমে থাকেন না। কেননা মহৎ উপন্যাসের ধর্মই হয় তার উজ্জীবনের আগুনকে নিভতে না দেওয়া। সেজন্য তার শিল্পগত সংহতি এবং কাহিনী বয়নের বিস্তৃতি— যুগপৎ ধর্মে অনুভবকে যেমন শিথিল হতে দেয় না, অন্যদিকে প্রসারিত সময়ের স্পর্শে মমত্ববোধকেও জাগিয়ে তোলে। তাই মহৎ উপন্যাসের পাঠ সার্থক হয়ে ওঠে বিন্যাসের সতর্কতায়। যেখানে কাহিনীর কাল, লেখকের কাল এবং পাঠকের কালের ত্রয়ী অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হতে হয়।

তাই উপন্যাসে বর্ণিত কোনো একটি উপাখ্যানই সময় জগতের সহায়তা নিয়ে জীবন-সঞ্চরণ নয়। বরং একদিকে বহির্মুখী সময়ের স্রোত যেখানে ঘটনার মধ্য দিয়ে উপন্যাসে উপাখ্যানের ধারাবাহিকতা বজায় রাখে, সেখানে অন্যদিকে উপাখ্যান-অন্তরালে মুক্ত আর এক সময় স্বাধীনতা নিয়ে এগিয়ে, পিছিয়ে, কিংবা থেমে গিয়ে পাঠককে সচকিত, কুণ্ঠিত, কৌতূহলী এমনকি ভীতও করে তোলে। সময়ের যোগ্যতা-অযোগ্যতায় ঔপন্যাসিক তাকে কাজে লাগাতে পারেন জীবনধর্মে। আর এভাবেই তিনি প্রমাণ করতে পারেন প্রচলিত সময়ের শাসন থেকে তিনি কতটা মুক্ত। ফলে প্রবহমান কালের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ-কে শুষে নিয়ে তাদের মুহূর্তসীমাকে চূর্ণ করে যে একটি অখন্ড সত্তার আবির্ভাব ঘটে— পুনর্বীক্ষণে তার মূল্য বিচার প্রয়োজন। আর এখানেই ঔপন্যাসিক একটি বড় পরিধি ছুঁয়ে ট্র্যাডিশনকে ভেঙে চলেন। তাতে অবিরত বর্তমানের সঙ্গে সখ্যতা গড়ে ওঠে বটে, তবে সেই বর্তমান একঘেঁয়ে হয়ে ওঠে না।

বলা যেতে পারে উপন্যাস সৃষ্টিতে এ প্রবণতার পথ ধরে বাখতিন কথিত বহুস্বরসঙ্গতি যুক্ত হয়ে একে ক্রমশ জটিল থেকে জটিল করে তোলে। কিন্তু সেইসঙ্গে উপন্যাস এমন একটি মাধ্যম যা একাধারে জ্ঞান ও অনুভবে বিশ্বকোষও হয়ে

উঠতে পারে। সময়ের 'Micro' ও 'Macro' দুটো অনুভবই অবয়ব ও ভাবনালোকে সুস্পষ্ট প্রবণতায় যেখানে আজ আধুনিকতার পথ নির্দেশক, সেখানে আজকের এই যুগচিত্রে আমরা কি দেখি,— একদিকে বিশ্বায়নের সম্মিলন প্রয়াস, অন্যদিকে একাকীত্বের একাধিপত্য। উপন্যাস তার উচিত-অনুচিতের পথ নির্দেশ না করেও সময়ের ধারাতে একদিকে যেমন অবসাদকে তুলে ধরে, অন্যদিকে সেই সময় দিয়েই প্রমাণিত হয় দুঃখমোচনের প্রলেপ।

হয়তো তার জন্য উপন্যাস শুধুমাত্র আঙ্গিক প্রসাধনে ব্যস্ত না হলেও সময়ের তীব্র তাড়নায় নির্দিষ্ট প্যাটার্নে উপস্থাপিত হয় যুগের দাবিতেই। ফলে আধুনিক ঔপন্যাসিক টমাস মানের 'ম্যাজিক মাউন্টেন', জয়েসের 'ইউলিসিস্' কিংবা প্রুস্তের 'রিমেমব্রান্স অব থিংস্ পাস্ট'-এ প্যাটার্নগত সময়ের বিশেষ প্রযুক্তি লক্ষ্যণীয়। আর তার মৌলিক কারণ—

"The novelist has frequently found it desirable to alter the chronological arrangement of events, sometimes describing an earlier event after portraying a later event, and he has sometimes attempted to achieve an effect of simultaneity of events."[২০]

এক্ষেত্রে একটি উপন্যাসে সময়ের উত্থান-পতনের নানা উচ্চারণ ধরে কেবল আঙ্গিক কৌশলই শেষ কথা নয়। যদিও উপন্যাসে উপাখ্যানের দাবিতে ঘটনার অজস্র উপকরণ জড়জগত থেকে এলোমেলো অবস্থানে সামঞ্জস্যে এসে মিলিত হয় একটি বিশিষ্ট ছক্‌কে মাধ্যম করেই। তবু জড়জগতের মতন অসংখ্য ঘটনায় জড়িয়ে থাকা সময়-অসময়ের যোগফল এখানে সমষ্টি গড়ে না। ফলে প্রাথমিকভাবে উপন্যাসে একটি ছকের প্রয়োজন হয়ে পড়লেও সেই ছক্‌কেই অন্য প্রয়োজনে আবার ভেঙে ফেলে। এই অন্য প্রয়োজনের তাগিদটাই প্রথমত এবং পূর্ণায়তরূপে বড়। তাই শ্রীমতী ড্যালোওয়ে বিশেষ একটি দিনের নির্দিষ্ট পরিধি বৃত্তে অতীত অভিজ্ঞতার বিস্তৃত পরিসর পেরিয়ে এলেন— শুধু এটুকুতেই ভার্জিনিয়া উলফ্ তাঁর 'মিসেস্ ড্যালোওয়ে' উপন্যাসের খতিয়ান করে তোলেন না। ড্যালোওয়ের জীবনে আত্মব্যক্তিত্বকে নিয়ে বর্তমানে চিনে নেবার কি যোগ্যতা সেই সময়ের অতীত স্পর্শে অনুভব হয়, তাই হয়ে ওঠে বড়। ঠিক একইভাবে বলা যায়, জয়েসের 'ইউলিসিস্' উপন্যাসের ব্লুমের মানসিক জগতে স্থান-কালের পরম্পরা ভেঙে যে অভিজ্ঞতার ছবি ওঠে আসে, সেটাই মূল ভাব নয়; বরং বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী মানুষের সঙ্কটাপন্ন জীবনের ছবি গভীরভাবে ব্যক্তির আত্মোপলব্ধিতে কিভাবে ধরা দেয় তা লক্ষ্যণীয়।

এই দৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে সময়-ধর্ম মেনে রাত্রির

পটভূমি যেখানে নায়িকা কপালকুন্ডলাকে নিয়ে নবকুমারের চোখে একটি ভিন্ন জগত সৃষ্টিতে সাহায্য করে, সেখানে জীবনধর্মে তা অপূর্ব ব্যঞ্জনায় একজন সৌন্দর্যমুগ্ধ যুবককে কীভাবে বিপর্যয়েব পথে এগিয়ে নিয়ে যায়, তার চিত্র ধরা পড়ে। উদাব নবকুমারের দীপ্ত যৌবন-ধর্ম পরিস্থিতির সময়-ধর্মে যেভাবে ধীরে ধীরে সংকীর্ণ হয়ে ওঠে, তারই পূর্ণাঙ্গরূপ রাত্রির উপমাতেই চমৎকাররূপে সম্ভব। অথচ এর কাহিনী, চরিত্র এবং পটবিন্যাসের পরস্পব সঙ্গতির জন্য রাত্রির ভূমিকা যতটা তাৎপর্যময়, মুঘল যুগের মধ্যে তাকে নিয়ে লেখক বিশেষ কোনো উচ্চারণ ধ্বনিত করে তোলেন না। মতিবিবিকে অযথা ইতিহাসলোকে সেলিমের সঙ্গ অভিলাষী রূপে স্থাপন না করেও তার সমস্যা অন্যভাবে বর্তমান যুগ ধরে উপস্থাপন ঘটানো চলত। মোট কথা, এর পরিণামের সঙ্গে বিশেষ একটি অতীত ইতিহাসের ভূমিকার হয়তো কোনো সম্পর্ক না ঘটালেও সমস্যা হত না। এক্ষেত্রে উপন্যাসের চাইতে বঙ্কিমের সংশয়ী দোলাচল বৃত্তিই বিশেষ কার্যকর। পরিণামে সময়ের এই স্বরান্তর উপন্যাস-প্রয়োজনকে ততটা এখানে মান্যতা দেয় না।

উদাহরণটি এই কারণেই উল্লেখ্য, যেহেতু সময়ের যেকোনো ব্যবহারই কোনো একটি উপন্যাসের পক্ষে ততক্ষণ পর্যন্ত সঙ্গত নয়, যতক্ষণ না প্রয়োগের তাৎপর্য ধরে জীবনের সঙ্গে এর সম্মিলন ঘটে। সমালোচকের মন্তব্য উল্লেখ করা যায়—

"ঔপন্যাসিকের পক্ষে প্রয়োজনীয় একটি গুণ হলো, বস্তুজগতের আহরিত তথ্যকে সামঞ্জস্য সূত্রে গেঁথে তোলবার ক্ষমতা। সেই সামঞ্জস্য সূত্রটিকে আবিষ্কারের পিছনে ঔপন্যাসিকের ব্যক্তিগত 'ভিশন' কাজ করে।"[১১]

এ সম্পর্কে আরো মন্তব্য করা হয়—

"শিল্পের মূল রহস্য লুকিয়ে রয়েছে নির্বাচনে আর সামঞ্জস্য জ্ঞানে— নির্দিষ্ট নীতি নিয়মে জীবনের সামগ্রিকতার আভাস আনার মধ্যে। এই নির্বাচন আর সামঞ্জস্য জ্ঞান শিল্পীর ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভরশীল"।[২২]

তাই উপন্যাস জীবন এবং জীবনের বিন্যাসগত সেই শিল্পরূপ, যা সমস্ত তাৎপর্যবাহী ভাঙাগড়ার বিবর্তন পেরিয়ে তাকে স্বীকার করতে পারাকেই বড় মনে করে। সময় ও পরিসর সচেতনতায় এই সামঞ্জস্য জ্ঞান সৃষ্টি হতে পারে। ফলে মানুষের অভিজ্ঞতার পরিবর্তন—রাতের পর দিন, গ্রীষ্মের পর বর্ষা, বৎসরের পর বৎসরের মত সময় পরিক্রমা উপন্যাস-বিশ্বে সরল নয়, বরং এই পরিবর্তনের প্রবণতা কার্য-কারণের পৌর্বাপর্য সম্বন্ধের গভীর ইঙ্গিতবাহী। সমালোচকের ভাষায়—

"The novel's spirit is the spirit of continuity : each work is an

answer to preceding ones each work contains all the previous experience of the novel.”[২৩]

এই অভিজ্ঞতার চলমানতা বাইরের বিরাট ডানাওয়ালা পাখির মত সময়কে ভেসে যেতে দেয় এবং তার সঙ্গে মানসিক সময়ের সঙ্গতি সাধন করে এর শিল্পরূপ গড়ে তোলে। ফলে ঘড়ির ব্যবহার সর্বত্র তার সমান নয়।[২৪]

‘বর্তমান’ সেক্ষেত্রে অনেক বেশি গভীরতর হয়ে ওঠে ‘অতীতে’র সম্পর্ক-সন্ধানে। মালা গেঁথে গেঁথে মুখোমুখি হয় অবিচ্ছিন্ন সত্যের। হয়তো এজন্য জীবনকে শিল্পের চোখে উপন্যাসই প্রমাণ করে নিতে পারে—

“One experiences the moment ‘now’, or expressed more accurately, the present sense-experience (Sinnen-Erlebnis) combined with the recollection of (earlier) sense-experiences. That is why the sense experiences seem to form a series, namely the time-series indicated by ‘earlier’ and ‘later’.”[২৫]

ফলে উপন্যাস তার শিল্পকৃতি সম্পর্কে মূলত ভরকেন্দ্ররূপে খন্ড সময়কে অবিচ্ছিন্ন থেকে বের করে নিয়েই দেখাতে উৎসাহী। এই অসংখ্য খন্ড সময় ও পরিবৃত পরিধি ধরেই নানামুখী প্রতিমা, নানা মুখশ্রীর সন্ধান। তলস্তয়ের ‘ওয়ার অ্যান্ড পীস’ উপন্যাসে যুদ্ধের বিশাল পটচিত্রে যেখানে পিটার এবং এক ফরাসি সৈনিক একজন আর একজনের কণ্ঠ আঁকড়ে ধরে, সেখানে এই খন্ড সময়ের দৃশ্যে বিস্তৃত পরিসরের সাফল্যকে ছাড়িয়ে যায়। টমাস হার্ডির ‘মেয়র অব ক্যাস্টার ব্রিজ’ উপন্যাসে মাইকেল হেনচার্ডের প্রাথমিক পরিচয় সামান্য, কিন্তু তার প্রকৃত স্বভাব কাহিনীর অগ্রগতিতে অসংখ্য খন্ড সময়ের বাঁধনে প্রকাশ পায়। জেন অস্টেনের ‘এম্মা’ উপন্যাসে এম্মার চরিত্র তখনই স্পষ্ট হতে পারে, যখন তিনি হ্যারিয়েট স্মিথ, জেন ফেয়ারফ্যাক্স, মিষ্টার এলটন কিংবা মিষ্টার নাইটলির সংস্পর্শে বিশেষ খন্ড সময়ের মুখোমুখি হন।

উপন্যাসের এই অনিবার্য গুণ— ভাঁজ খুলে খুলে খন্ডত্বকে প্রধান গুরুত্ব দিয়েও অবিচ্ছিন্নতার সূত্রে মিশতে চাওয়া। নাটক-ছোটগল্প-কবিতায় যা সংকুচিত। তাই আজকের যে সময়-জগত, তার যোগ্য ব্যাখ্যা শুধু বৌদ্ধিক দৃষ্টিতে নয়, শিল্পের সৌকুমার্যে ঔপন্যাসিক তাঁর সৃষ্টির ভেতর দিয়ে বলে যেতে পারেন। কারণ উপন্যাসের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা পূর্বসূত্র এবং পরবর্তীসূত্রের আভাস সার্থকভাবে দিতে পারাটা সম্ভব, সেইসঙ্গে বর্তমানকে গুছিয়ে তোলাও সাধ্যগত। তাই রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি-বিশ্বে মানব সত্য সম্পর্কে যে অসংখ্য কথা ওঠে, তার যোগ্য পূর্ণাঙ্গ সম্প্রসারণ এককভাবে উপন্যাসেই থাকা সম্ভব। তিনি সারাজীবনে যে অসংখ্য

কথা সৃষ্টি করেন এবং করেন না— তার যৌথ সম্মিলিত আবেদন তাঁর উপন্যাস। রবীন্দ্রনাথকে এখানে সময় সচেতন হতে হয় না— উপন্যাসের স্বভাবধর্মেই এর চেতনাবোধ প্রসঙ্গত ব্যাপৃত এবং অনিবার্য হয়ে ওঠে। হয়তো সময় পরিসরের বিস্তৃত পরিধি স্পর্শ করে যে বিপুল আত্মসমৃদ্ধি, তার একটি পূর্ণাঙ্গ-বিশ্ব এই উপন্যাসজগত। ফলে 'চোখের বালি'র মহেন্দ্রের বর্তমান স্তর, 'চতুরঙ্গে'র শচীশের সর্বোত্তীর্ণ অবস্থান কিংবা 'ঘরে বাইরে'র বিমলার ভ্রান্তি— সমস্ত কার্যসম্বন্ধের সঙ্গে পূর্ববর্তী মুহূর্ত এবং পরবর্তী প্রতিক্রিয়ায় যুক্ত। কোনো অভিমান নিয়ে বিরূপ সমালোচনা নয়, বিপুল এই সম্ভাবনাময় জগতে আপাত অসংখ্য বিরোধ-বিপন্নতা নিয়ে সত্তার মানবায়ন— সময়ের পটে নানা স্ববিরোধে ঘেরা নির্দিষ্ট প্যাটার্ন থেকে অনির্দিষ্ট প্যাটার্নের অভিমুখীন হওয়া। তাই উপন্যাস জগত দিয়ে বিশাল পটভূমিকায় গোরা চরিত্রকে দেখানো সম্ভব, সংহত ধর্মে শ্রীবিলাসও পূর্ণাঙ্গ, আবার ঈর্ষা-হতাশার মধ্য দিয়ে কেতকী-নীরজাও হয়ে ওঠে দীপ্ত।

কাজেই উপন্যাসে পুরোনো এবং অনাগতকে প্রত্যক্ষ ধরে রাখতে পারা যে কতটা সম্ভব রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট অনুভব করেন। বহু সতর্কতায় তাই তিনি গড়ে তোলেন তাঁর উপন্যাসের কথাবস্তু। অনুভব করেন এই অনিশ্চিত মুখোশ পরিহিত আধুনিক পৃথিবীকে। যেখানে জৈবিক ধর্মে কেবল নিজের অহংকে ধারণ করে চলে, অর্থের প্রভুত্বকে দাসত্বের শৃঙ্খলে সাদরে আহ্বান জানায়; সেখানে জীবনের পরিচয় হতে পারে নূতন করে এই ভাঙা জগতের অন্বেষণ।

পুনর্বিন্যস্ত হতে উপন্যাসই সেক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক। আর তার কারণ, পৃথিবী যে আজ এক বিরাট অভিজ্ঞতার মাধ্যম। মনন জগতে বেড়ে গেছে এর পরিসর। কোনো সমস্যাই বিশেষ সমস্যারূপে ভাববার দিন আজ শেষ। ফলে এই বিপুল বর্তমানকে খুঁজে নিতে অসংখ্য ছবির ভিড়— এর অন্তর্যোগ ও অন্তর্সংঘাতের প্রতিনিধিরূপে উপন্যাসের বিকল্প আর কী হতে পারে! তাই রবীন্দ্র-উপন্যাস নিয়েই রবীন্দ্রস্মৃতি-কথার মান্যতা এভাবে পরিপূর্ণ হতে পারে—

'আজকের দিনের তুচ্ছ ঘটনা, ক্ষুদ্র চেষ্টা, স্বল্প সাফল্য যখন সুদূরের দৃষ্টিতে অলক্ষ্য হবে, তখন রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার দীপ্তিতেই ভাবীকাল আমাদের কালকে জানবে।'[২৬]

উল্লেখপঞ্জি

১। সময়ের কাছে।। জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ (দ্বিতীয় খণ্ড)।। বেঙ্গল পাবলিশার্স।। পৃষ্ঠা - ৪২

২। সময়ের সমগ্রতা।। শঙ্খ ঘোষ।।

এই সময় ও জীবনানন্দ।। সংস্করণ ১৯৯৮।। সাহিত্য অকাদেমি।। পৃষ্ঠা - ৬
৩। অথর্ব বেদসংহিতা-ঊনবিংশ কান্ড-ষষ্ঠ অনুবাক - অষ্টম সূক্ত।।
হরফ প্রকাশনী।। প্রথম প্রকাশ।। পৃষ্ঠা - ৫৫৭
৪। The New Encyclopaedia Britannica in 30 Volumes. (Macropaedia Vol - 18. Knowledge in Depth) ।। 15th Edition ।। Encyclopaedia Britannica. Inc. ।। পৃষ্ঠা - ৪১০
৫। Time Perception ।। The New Encyclopaedia Britannica in 30 Volumes. (Macropaedia Vol - 18. Knowledge in Depth) ।। পৃষ্ঠা - ৪২১
৬। চিরকুমার সভা/দ্বিতীয় দৃশ্য/শ্রীশ-র উক্তি, রবীন্দ্র রচনাবলী (ষোড়শ খন্ড)।। বিশ্বভারতী।। পৃষ্ঠা - ১৯২
৭। The New Encyclopaedia Britannica in 30 volumes. ।। পৃষ্ঠা - ৪১১
৮। Jerusalem Address : The Novel and Europe ।। The Art of the Novel ।। Milan Kundera ।। Tra. by Linda Asher ।। First Rupa Pub. ।। পৃষ্ঠা - ১৬০
৯। আধুনিক বাংলাকাব্য পরিচয় ।। দীপ্তি ত্রিপাঠী।
পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দে'জ পঞ্চম সংস্করণ।। পৃষ্ঠা-৭
১০। ইউলিসিসের অভিযান ।। সুকান্ত চৌধুরী।। দেশ ২৩ জানুয়ারি ১৯৯৯ ।। পৃষ্ঠা - ৩৩
১১। মাইকেল ।। সাহিত্য চর্চা।। বুদ্ধদেব বসু।। দে'জ দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ, প্রথম প্রকাশ।। পৃষ্ঠা - ২৯
১২। প্রাচীন সাহিত্য ।। রবীন্দ্র রচনাবলী (পঞ্চম খন্ড)।। পৃষ্ঠা - ৫৪৮
১৩। আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয় ।। দীপ্তি ত্রিপাঠী ।। পৃষ্ঠা-৮
১৪। The Tale of Two Cities - Book The First, Recalled to Life ।। Chapter - 1 : The Period ।। Macmillan India Limited, First Pub. 1986 ।। পৃষ্ঠা - ৭
১৫। Modern Literary Theory A Reader ।। Discourse and the social ।। 2nd Edition ।। Ed. Philip Rice and Patricia Waugh. ।। পৃষ্ঠা - ১৯৭
১৬। তদেব ।। পৃষ্ঠা - ২০২
১৭। "According to this concept, all events that occur anywhere in the universe could be arranged in a single, ordered sequence. Thus of two events, A and B, either A would occur before B, B before A, or the two would be simultaneous. This intuitive concept of time was altered drastically by Albert Einstein in 1905". The New Encyclopaedia Britannica in 30 Volumes. ।। পৃষ্ঠা - ৪১৩
১৮। 'The theory of relativity implies that simultaneity is relative to a frame of axes. If one frame of axes is moving relative to another, then events that are simultaneous relative to the first are not simultaneous relative to the second, and vice versa.' ।। তদেব ।। পৃষ্ঠা - ৪১৮
১৯। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর ।। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়।। পরিবর্ধিত প্রথম দে'জ সংস্করণ ।। পৃষ্ঠা - ৩০
২০। Literary Criticism : A Short History - William K. Wimsatt, JR. and Cleanth

Brooks. Oxford and IBH Publishing Co. Pvt. Ltd. New Delhi, Bombay, Calcutta।। পৃষ্ঠা - ৬৮৫

২১। উপন্যাসে জীবন ও শিল্প।। উজ্জ্বল কুমার মজুমদার।। প্রথম প্রকাশ ।। সান্যাল এণ্ড কোম্পানি।। পৃষ্ঠা - ৬

২২। তদেব ।। পৃষ্ঠা - ১০

২৩। The Depreciated Legacy of Cervantes ।। The Art of the Novel ।। Milan Kundera ।। Rupa Paper back Edition।। পৃষ্ঠা - ১৮

২৪। 'উপন্যাসে প্রযুক্ত সময় কোথাও বহির্মুখী — যেখানে সময়ের ধারা বয়ে চলেছে, আকাশের ওপর দিয়ে বিরাট ডানাওয়ালা পাখির ভেসে যাওয়ার মতো। আবার কোথাও বা অদৃশ্য সময় উপন্যাসের চরিত্রের অন্তর্লোকের পথ দিয়ে গূঢ় স্রোতে বয়ে চলে।' বাংলা কথাসাহিত্য ঃ প্রকরণ ও প্রবণতা।। গোপিকানাথ রায়চৌধুরী।। প্রথম প্রকাশ।। পুস্তক বিপণি ।। পৃষ্ঠা - ১

২৫। A New Survey of Universal Knowledge Encyclopaedia Britannica. Vol - 21 (space time)।। পৃষ্ঠা - ১০৫

২৬। রবীন্দ্রস্মৃতি ।। অতুল চন্দ্র গুপ্ত।। প্রথম প্রকাশ।। ক্যালকাটা বুক হাউস ।। সম্পাদক ঃ বিশ্বনাথ দে।। পৃষ্ঠা - ১৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

করুণা থেকে রাজর্ষি ঃ সময়ের অন্তর্বৃত্ত এবং বহির্বৃত্তে সংযোগ

একজন সাহিত্য সমালোচকের মন্তব্য -

"ঔপন্যাসিকের চিন্তা ও আবেগের পূর্ণ পরিচয় পেতে গেলে প্রতি রচনার বিশ্লেষণের একটি জটিল যোগফল তৈরি করতে হয়।" [১]

তার মানে দাঁড়ায়, একটি নির্মাণের কাঠামোর উপর আরেকটি নির্মাণ কাঠামো তৈরি করে তার শ্রেষ্ঠত্বের লক্ষ্যে পৌঁছাতে যেমন একটি বিশেষ সময় ভিত্তির উপর গঠনের দায়িত্ব থাকে, তেমনি এর যোগ্যতা-বিচার প্রবহমান সময় চিত্রকে এড়িয়েও হতে পারে না। কাজেই লেখকের চেতনাস্তরে অদৃশ্য ও অবশ্যম্ভাবী আউটলাইনের নিয়ন্ত্রণে সৃষ্টি জন্মলাভ করে। আর তা গড়ে ওঠে তাঁর জগত, জীবন, সমাজ, ধর্ম ও কাল সম্পর্কে বিশেষ বীক্ষণ থেকে। [২] আউটলাইনের বিবর্তনসূত্রে ঔপন্যাসিক প্রবহমান সময়কে ধরে এগিয়ে যান এবং বিশেষ বিশেষ কালখন্ডে তাঁর শিল্পীপ্রাণের সচেতনতায় নির্মাণকে করে তোলেন মাধুর্যমন্ডিত। আর এই মাধুর্যের ধর্মই হয় অবিরত কাল ও পরিসরকে প্রসারিত ও সংহত করে ধরে রাখার অফুরন্ত শক্তি। লেখকের এই নির্মাণ-পর্বকে গুরুত্ব দেওয়া হয় বলে আলোচনায় ওঠে আসে -

"a literary artist has an idea, or an actual experience, or an imagined experience that he or she wishes to communicate or to embody. Consciously or otherwise the artist then chooses a means of doing so, selecting or allowing the unconscious mind to present specific devices, and arranging then so that they can embody or communicate that experience. Once the author has created such a work for us, we readers must recreate the experience, in part by carefully tracing the motifs used to communicate it." [৩]

অতএব এই নির্মাণ আর সৃষ্টির সঙ্গে সংযোজক হয়ে থাকা সময় নানা পালাবদলের ইতিহাসকে নিয়ে জীবনের সাক্ষ্য বহন করে চলে। ভাবনা, গঠন, উপস্থাপনা - সকল দিক দিয়ে তা আরো নির্মাণের পথে বৃহত্তর ক্ষেত্র-প্রসারী, আবার

নিবিড় অন্তর-রঞ্জিতও বটে।

তাই কোনো একটা যুগে উপন্যাস যেখানে নীতির বাণীবাহক, পরবর্তীতে তাতে গল্পের বিনোদনই হয়ে ওঠে আশ্রয়। আবার গল্প লিখে এবং গল্প পাঠ করে নিশ্চয়ই দায় দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। এই সচেতনতা থেকে ঔপন্যাসিক-স্বর ওঠে আসে, উপস্থাপনার দৃষ্টিভঙ্গী যায় পাল্টে। অথচ যে অতৃপ্তিবোধ থেকে পালাবদল, সে তো ক্রমশ নির্মাণের তাগিদ দিয়েই চলে, থামে না।

বলা যায় এই ধারাবাহিক চিত্র কোথাও দিনের পর দিন জঞ্জালের মত হয়তো বেড়েই যায়। কিন্তু আগাগোড়া বৃত্তটি থেকে যে সৃষ্টিশক্তিকে আমরা বেছে নিতে পারি, তার পেছনে অবদান-রূপ বিশাল ইতিহাস-পর্যটনকে কি অবহেলা করা সম্ভব! দূরের অতীত থেকে কাছের অতীত— ক্রমশ অভাববোধ থেকে এগিয়ে আসা। তার ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েই তো নূতন বিশ্বাসের সম্পদ— সেই চিরকালের সমকালকে আবিষ্কার। ফলে আজকের এবং কালকের দিনগুলি সৃষ্টির স্পর্শে মৌলিক হয়ে উঠলেও কোনো অর্থেই বিচ্ছিন্ন মৌলিক নয়। প্রবহমান সময়ের দাবিকে মেনেই আপনা-আপনি একটি বিশ্বাস নানা রূপ বদলের ভেতর দিয়ে চলে। তা সূক্ষ্ম, আরও সূক্ষ্ম শিল্পলোকে প্রবেশের পথ গড়ে নেয়। একটা অদ্ভুত প্যারাডক্সে একদিকে ক্রমশ তাঁর প্রসারণ নূতন নূতন ভাবনার জগত অধিকার করে, অন্যদিকে ভাবনার দৃষ্টি আরও তীব্র, তীক্ষ্ণ, বিশেষ ও সংকুচিত হয়ে লক্ষ্যাভিমুখী হয়ে ওঠে।

একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষের জীবনকথায়ও তাঁর শৈশব-কৈশোর-যৌবন থাকে— যা আগাগোড়া সমতলীয় প্রদর্শন নয়। বরং একটির পর একটি এলেও আসলে একটি আর একটির পরিনাম। কাজেই যেখান থেকে তার যাত্রা, সেখানেই তার থেমে যাওয়া, কিংবা একেবারে পূর্ণ বিকশিত হয়ে ধরা দেওয়া স্বচ্ছতার লক্ষণ নয়—এ সিদ্ধান্তই সময়ের যৌগিক অদৃশ্য অস্তিত্ব সপ্রমাণ করে।

রবীন্দ্র উপন্যাস জগতে এই শৈশব থেকে কৈশোর, আর কৈশোর থেকে যৌবন-উত্তীর্ণ হয়ে ওঠার মূলেও আছে সময়ের বিনির্মাণ-পুনর্নির্মাণ প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়ে ওঠার বাসনা। সমালোচকের ভাষায়—

"তিনি বনস্পতির মতো। ধীরে ধীরে উঠেছেন, অঙ্কুর থেকে চারায়, চারাগাছ থেকে পত্রবহুল তরুণবৃক্ষে, তারও পরে বনস্পতি।"[৪]

যে কালের যে রঙ তার স্বাভাবিক গুণ, তাকে ধারণ করে এগিয়ে চলা। আর এই ধারাবাহিক পথে বারবারই সীমানার বদল ঘটিয়ে, কোথাও বা ধারাবাহিকতাকে ব্যাহত করে প্রচলিত সামাজিক নিয়মনীতি থেকে ঊর্ধ্বে ওঠা। রবীন্দ্রনাথ হয়তো এভাবেই প্রমাণ করতে চান খন্ডকে, প্রগাঢ় করেন অনন্তকে। প্রতিটি খন্ডকালে

নিজেকে যুক্ত রেখে অসংখ্য আরো খন্ডকালের সম্পর্ক বন্ধনে তিনি পরবর্তী থেকে ততোধিক পববর্তীতে গিয়ে পৌঁছান। অনিবার্য গতিতে দেখিয়ে দেন কোনো একটি নিয়মের বন্ধনে জীবনকে আটকে রাখা কত মারাত্মক রকমের প্রহসন। হয়তো এ কারণে বলতে হয় সমালোচককে—

"The curious fact about Tagore is that the end he reached always became the point of a new beginning. That is perhaps the most striking feature in the development of his art spread over six decades."[৫]

অতএব সৃষ্টির অনুক্রম ধরে চলার সুরটিতে হঠাৎ করে ধূমকেতুর মত জ্বলে ওঠা, কিংবা নির্বিচারে কোনো অংশ ছেঁটে ফেলা— কাজের কথা নয়। হয়তো তাই একটা যুগে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের পক্ষেও সম্ভব হয় না প্রখর বঙ্কিমের সৃষ্টি করে তোলা যুগাধারকে ছাড়িয়ে ওঠা। বুদ্ধদেব বসু কিছুটা হলেও তাঁর সত্য ভাষণটি তুলে ধরেন—

"রবীন্দ্রনাথ ভুল করেছিলেন বলবো না— ভুল করার কথাই এখানে অবান্তর, কেননা বেছে নেবার সুযোগ তাঁর ছিল না। অনুকরণযোগ্য একটি মাত্র আদর্শ ছিল তাঁর সামনে, সে আদর্শ বঙ্কিমের। রবীন্দ্রনাথ ধাপে-ধাপে এগিয়েছিলেন— টপকে পেরোতে যাননি— তাঁর এই ঐতিহ্যবোধ বন্ধুর কাজ করেছিল।"[৬]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম উপন্যাস 'করুণা' রচনায় বঙ্কিমের গোটা 'বিষবৃক্ষ' চষে নিয়ে প্রেরণার ইতিহাসকে পুষ্ট করেন। কিন্তু এখানেই দেখিয়ে দেন কিভাবে একটি বিশ্বাসের সমাপ্তিতে নূতন আর একটি বিশ্বাস জেগে ওঠে। তাই কেবল তাঁর মধ্যে বঙ্কিম-প্রতিম হয়ে 'করুণা' উপন্যাস দিয়ে শৈশবকাল আবির্ভূত হয় না, বরং জগতটি না থেমে গঠিত হয় মাত্র। কিন্তু এগিয়ে চলে, রাজর্ষি-চোখের বালি-গোবা ইত্যাদির ধারাবাহিক পথে। সময়ের যে প্রবাহকে উপন্যাসের নানা পর্বে তিনি ধারাবাহিকভাবে নিয়ে আসেন, তাতে প্রত্যক্ষ উপস্থাপনায় ধারাবাহিকতা ছিন্ন করে চলেন। সময়ের বহু কৌনিক তরঙ্গকে অস্বীকার করে নয়, সাঙ্গীভূত করে বিন্যাসের বদল ঘটিয়ে সৃষ্টি করেন রূপবৈচিত্র্য। সময়কে লেখক গড়ে তোলেন তাঁর কল্পনার ক্রনলজিক্যাল ফর্মে, আর সম্পর্ক সন্ধান করে ফেরেন সেই সমতলীয় ফর্মকেই শিল্পলোকের দরজায় পৌঁছে দেবার তাগিদে। তাই শেষ পর্যন্ত শিল্পলোকের পথে যাত্রা করার সাবালকত্ব অর্জন করা এর কাঙ্ক্ষিত ফল। কিন্তু সেই ফলের অন্তঃস্থলে যে বীজ বহন করে চলেছে তাকেও অবহেলা করার উপায় নেই বলেই 'জীবনস্মৃতি'র পাতায় তাঁকে সচেতনভাবে উল্লেখ করতে হয়—

"যাহা লিখিয়াছিলাম তাহার অধিকাংশের জন্য লজ্জাবোধ হয় বটে, কিন্তু তখন

মনের মধ্যে যে একটা উৎসাহের বিস্ফার সঞ্চারিত হইয়াছিল নিশ্চয়ই তাহার মূল্য সামান্য নহে। সে কালটা তো ভুল করিবারই কাল বটে, কিন্তু বিশ্বাস করিবার, আশা করিবার, উল্লাস করিবারও সময় সেই বাল্যকাল। সেই ভুলগুলিকে ইন্ধন করিয়া যদি উৎসাহের আগুন জ্বলিয়া থাকে, তবে যাহা ছাই হইবার তাহা ছাই হইয়া যাইবে, কিন্তু সেই অগ্নির যা কাজ তাহা ইহজীবনে কখনোই ব্যর্থ হইবে না।"[৭]

একালের একজন সমালোচক প্রায় আক্ষেপের সুরেই 'করুণা' উপন্যাসের সূত্রে উল্লেখ করেন— "আমার মনে হয় প্রতিভাবান ব্যক্তিও অনেক সময় নিজের রচনার মূল্য যথার্থ অনুধাবন করতে পারেন না।"

'প্রতিভাবান ব্যক্তি' বলতে এখানে কমন গ্রুপ হিসেবে ধরা হলেও আসলে তাতে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গই নির্দেশিত। অথচ সচেতনভাবে 'করুণা' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয় অবহেলা প্রদর্শন করেননি। অবশ্য যদি কোথাও এ ব্যাপারে তাঁর লজ্জার বিষয় থাকেও, তবে সে তার গল্পের অতিরিক্ত আবেগ এবং বাহ্যিকভাবে কাঠামোগত শিথিলতার স্তরে। তবু সমালোচকের অভিমানকে মর্যাদা জানিয়ে বলতে হয়, ঔপন্যাসিক স্বয়ং কিন্তু 'করুণা'কে তাঁর রচনাবলীতে স্থান দেননি। যেখানে দোষের কথা উল্লেখ করেও 'বউঠাকুরাণীর হাট'এর বৈধ প্রবেশাধিকার জোটে।[৯] অথচ 'করুণা'তে যে শক্তির প্রকাশ ঘটে, তাতে সময় দিয়ে সত্য ও জীবন আবিষ্কারে একটি বিশেষ ভূমিকা পালিত হয়।

তবু রবীন্দ্রনাথ যাকে প্রত্যক্ষ স্বীকৃতি দেননি, সেখানে দীর্ঘকাল ধরেও বহু রবীন্দ্র গবেষকরাও এর যোগ্যতম স্থানটি ধরিয়ে দিতে প্রয়াসী হলেন না। যে কারণে সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সুপ্রচলিত 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে কোথাও 'করুণা'কে নিয়ে স্বতন্ত্র আলোচনা করেন না, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'রবিরশ্মি' গ্রন্থের প্রথম পর্বে কেবল 'করুণা'র নাম উল্লেখ করেন মাত্র।[১০] নীহাররঞ্জন রায় 'রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা' গ্রন্থে[১১] 'বউঠাকুরানীর হাট'কেই রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস বলেন, আর সত্যব্রত দে,[১২] ভূদেব চৌধুরী,[১৩] অর্চনা মজুমদার,[১৪] গোপিকানাথ রায় চৌধুরী,[১৫] অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়,[১৬] কৃষ্ণ কৃপালনী[১৭] — এই আধুনিক সমালোচকরাও প্রমাণ করতে চান এটি অসমাপ্ত, কিংবা একটি অপরিণত মনের ফসল।

অবশ্য 'করুণা'কে নিয়ে দোষের বহর ও অনাদর বেড়ে চললেও স্বল্প হলেও কয়েকজন অন্য কথা শোনান। যার মধ্যে সুকুমার সেনের বক্তব্যটি গভীরভাবে ভাবার মতন— "'করুণা' অপরিণত রচনা হইলেও ঐতিহাসিক মূল্য বর্জিত নয়।"[১৮] সম্ভবত এখানেই পুনর্মূল্যায়নের সুযোগ থেকে যায়। কেননা, 'ঐতিহাসিক মূল্য' কথাটি সময়ের জগতে একটি গতিকে কেবল সঞ্চারিত করে না, বর্তমানের সঙ্গে

সম্পর্কও গড়ে। অবশ্য যে সমালোচকরা 'করুণা'র অপরিণত রূপকে ত্রুটি হিসেবে দেখেন, তাদের অনেকে সম্ভাবনার কথাটি বলতে ভোলেন না। কিন্তু তাতে উপন্যাসটির প্রাপ্য যোগ্যতাটুকু তারা নির্দেশ করে দিতে পারেন না। অতএব সময়ের দৃষ্টিতে আজ ভিন্ন কোণ থেকে 'করুণা'র মূল্য আবিষ্কার অপরিহার্য, তার ত্রুটির নঞর্থক এবং সম্ভাবনার সদর্থক— দুটো দিক ধরেই।

'করুণা'কে পরিমাপ করতে তাই যে সূত্র আজ গুরুত্বপূর্ণ, তাতে এর বিচার হওয়া চাই জন্মলগ্নের পাদপ্রদীপের আলোকে। ছুঁয়ে থাকা ঘটনার আবর্ত যে সময়ের দ্বারা পরিচালিত, তাকে গুরুত্ব দিয়েও দেখতে হয় সময়-বিন্যাস উপন্যাসটির আভ্যন্তরীণ জগতে কী গভীর ইঙ্গিত বহন করছে। মূলত দুভাবে তা দেখা চলে—

১) এর সম্ভাবনাময় দিকগুলো একটি মানুষের ব্যক্তি হয়ে ওঠার ইতিহাসকে আবিষ্কার।

২) ত্রুটিগুলো ব্যক্তির উত্তরণের সুযোগ হয়ে ওঠার লক্ষ্য।

একথা আমাদের কাছে স্পষ্ট, রবীন্দ্র উপন্যাসে ঘটনাগত সময় অনুসন্ধান কখনোই তেমন বড় নয়, বরং তাতে জোর পড়ে চরিত্রের ভেতর দিয়ে সময়কে ধরতে চাওয়ার বাসনা। বঙ্কিম যার বিপরীত দিকেই মূলগতভাবে অবস্থান করেন। অতএব ঘটনার ভিড়ে সম্মোহন মন্ত্রে তিনি উপন্যাসের চরিত্রাবলীকে হাজির করেন কাহিনীর ঘোড়ায় চেপে।[১৭] তাকে অতীত দিয়ে কষ্টিপাথরে বিচার করে নেন না, কিংবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে অতীতও উপেক্ষিত হয়। ফলে সেক্ষেত্রে নিছক গল্পরস আস্বাদনে কোনো সমস্যা দেখা না দিলেও উপন্যাসের সামগ্রিক দায় পালনের স্বরূপ ফুটে ওঠে না। রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তির নিজস্ব সময়কে তুলে ধরতে উৎসাহী বলেই অতীতকে ছেড়ে তিনি চরিত্রকে ভাবতেই পারেন না। যে প্রবণতাটি কাহিনীর অযথা বিস্তারের মধ্য দিয়েও 'করুণা'র মধ্যে দেখা দেয়। অন্তঃসময়ের প্রসারিত শৈল্পিক উপস্থাপনা— সূক্ষ্মভাবে রবীন্দ্র উপন্যাসে যা বর্তমান— তাতে 'করুণা' দিয়েই অনুভব করেন, ঘটনার মধ্যে চরিত্র এবং চরিত্রের মধ্যে ঘটনা, দুটো ব্যাপার এক নয়। বরং শিল্প বিকশিত হবার মূলে দ্বিতীয় ক্ষেত্রই বড়।

'করুণা'র ভূমিকা অংশে তাই বঙ্কিমী রীতি -উপস্থাপনার প্রয়াস থাকলেও সময়ের গভীর সূত্রকে তুলে নেয় এবং দু'ভাবে এই ভূমিকাংশ গুরুত্ব প্রদর্শন করে— ১) বর্ণনা রীতি, ২) সমগ্র কাহিনীর মূল বীজ।

যদি বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখা যায়, তবে মনে হতে পারে ভূমিকার বর্ণনায় খণ্ডকাল যেনো 'বিশেষ' হয়ে ধরা পড়লো না, রীতি অনেকটা ফ্ল্যাট। সময়ের চোখে বর্তমান আমাদের কাছের বলে অতীতকালটির ছিন্ন সূত্র তুলে নিতে গিয়ে বর্তমানেরই

তাৎক্ষণিক বিভ্রম ঘটিয়ে শিল্পশ্রীতে মন্ডিত করে তোলার সাধনা এখানে যেন ততটা স্পষ্ট নয়। অতএব ভূমিকার বর্ণনায় অতীত-কাহিনী ঋজুভাবে ওঠে আসে। লেখকের স্বপক্ষে এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, এখানেই ধরা পড়ে তাঁর সরল জটিলতাহীন প্রাণের পরিচয়, সময়ের জটিল বিন্যাস ঘটিয়ে যিনি ক্রমশ ভবিষ্যতে লিখবেন— 'চোখের বালি', 'গোবা', 'চতুরঙ্গ', 'ঘরে বাইরে' কিংবা 'মালঞ্চ'। অতএব সূচনার সারল্যে এখানে ভবিষ্যৎ ক্ষেত্র প্রস্তুতি। সময়ের বিচিত্র ডায়মেনশনে পরিকল্পিতভাবে স্পর্শ করে এমন এক প্রবণতা, ভেতরে ভেতরে যা উস্‌কে দিতে থাকে।

করুণা চবিত্রটি কল্পনাপ্রিয়। যে জগতে সময়-চিত্র দিনরাত্রিকে গ্রহণ করে সুখে অতিবাহিত। অথচ পারিপার্শ্বিক জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িয়ে থাকা সময়রেখার সমান্তবাল নয়। হয়তো মানুষের জীবনে এই সময়-সম্মেলন অনেক ক্ষেত্রে ঘটে না বলে বিপর্যয় বাঁধে, সরল গতিশীল পথ জটিল হয়ে ওঠে। করুণা তার একটি পাখি নিয়ে অন্তঃপুরের পুষ্করিণীতে কল্পনার রাজ্য নির্মাণ করে। আর এখানেই লক্ষ্য করতে হয়, লেখক তাঁর সারল্যের দৃষ্টিতে আগেই বলে নিচ্ছেন, 'সঙ্গিনী অভাবে করুণার কিছুমাত্র কষ্ট হইত না।'[২০] অথচ বাস্তবে 'সঙ্গিনী অভাব' করে কোনো মানুষ আঁকা যায না বলেই পাখি এবং অন্তঃপুরের পুষ্করিণী ঘিরে একটি ভিন্ন মাত্রায় সময়-জগতের রূপরেখা করুণার পারিপার্শ্বিক জীবন হয়ে ওঠে। যে জীবনের দর্পণে তার আত্মপ্রতিকৃতি নির্মাণ ও আবিষ্কার। কিন্তু এই সীমিত তদ্‌গত জগত করুণাকে কতটুকুই বা সাবালক করে তুলতে সচেষ্ট!

উনিশ শতকের বাংলার সমাজজীবনে সংস্কার ও পুনর্গঠনেব প্রেরণা দেখা দেয় ইংরেজি শিক্ষার আলোতে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি ব্যাপার হলো নারীকে সামাজিক জীবনের বিস্তৃত পরিসরে নিয়ে আসা। যেখানে সর্বাগ্রে প্রয়োজন ছিল স্ত্রীশিক্ষা প্রদান — উপলক্ষ্যরূপে ১৮৪৯ সালে বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠায় যার সূত্রপাত। কিন্তু তবুও দীর্ঘকাল নারী তাব ব্যক্তি স্বাধীনতা হতে বিচ্যুত হয়ে পুরুষ শাসিত সমাজে সাধ্বীত্বের একটি আদর্শরূপেই বিরাজ করে। তার অবগুণ্ঠনকে ফেলে দেবার বাসানার স্বীকৃতি প্রদান একটি বিশেষ গোষ্ঠীর উদ্দেশ্যকেও তখন বহন করে চলছিল বলে যথার্থ যে সম্মানবোধ এবং অধিকার তার কাম্য ছিল, তা তখনও বাস্তবায়িত হয়নি। সেই সময়কার বাংলাদেশের ইতিহাস অনুসন্ধানে দেখা যায়, হিন্দু কলেজের সংস্কারমুক্ত ছাত্রেরা শিক্ষা বিষয়ে প্রগতিশীল হলেও নিজেদের পত্নীদের লেখাপড়া শেখাতে বিশেষ উৎসাহী সমর্থক ছিলেন না।[২১] অথচ নারীকে যোগ্য সম্মানের সঙ্গে বরণ করে নেবার মানসিকতাও অনেকের মধ্যে যথার্থরূপেই দেখা দেয়। এ সম্পর্কে স্ত্রী শিক্ষা আন্দোলনের ইতিহাসে ব্রাহ্মদের ভূমিকা

উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ স্ত্রী-পুরুষের একই শিক্ষা সমর্থন করতেন।[২২] এছাড়াও ব্রাহ্মসমাজের আর এক নেতা কেশব চন্দ্র সেনও এই বিষয়ে তাঁর শুভকর্মপ্রয়াসকে চারদিকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। নারীর বিশেষ ব্যক্তিসত্তার স্বীকৃতির সমর্থনে অনেক উপন্যাসও তখন লিখিত হয়। যার মধ্যে শিবনাথ শাস্ত্রীর 'মেজবউ', প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আধ্যাত্মিকা', বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবীচৌধুরানী' ইত্যাদির উল্লেখ চলে। কিন্তু যথার্থ অর্থে দৃষ্টি ফেরালে বোঝা যায় যে এই নীতি উপদেশমূলক উপন্যাসগুলোতে ধরা পড়েছে নারীর শিক্ষণীয় প্রধান সদ্‌গুণ। অর্থাৎ তার পতিসেবা, গুরুজনের শুশ্রূষা, দাসদাসীদের প্রতি আনুকূল্য ইত্যাদির উপর গুরুত্ব। 'দেবীচৌধুরানী'র প্রফুল্ল তো শেষ পর্যন্ত স্ত্রীলোকের ধর্ম যে রাজত্ব করা নয়, সংসার পালনের মত একমাত্র দুরূহ কর্মপালন, তাকে স্বীকার করে নিতে ইতস্তত করে না। অথচ এত বড় ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন চরিত্রের এই স্বীকৃতির পরিণাম সৃষ্টিতে পাঠকের মনে যে বিশ্বাসের ঔচিত্যবোধের ক্ষেত্র জাগিয়ে তোলা উচিত, লেখক তার চেষ্টা করেননি।[২৩] অতএব নারীকে একদিকে তার মানবিক মুক্তি প্রদান, অন্যদিকে সেই মুক্তির সীমা-নির্ধারণ সেই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের হাতেই— যা ঊনবিংশ শতকের প্রেক্ষাপটে বাস্তবিক এবং অনিবার্য ছিল। অতএব সমস্ত প্রয়াস সত্ত্বেও বাঙালি সমাজে স্ত্রী শিক্ষার অনুকূল মনোভাব এ সময় গড়ে উঠলো না।[২৪]

রবীন্দ্রনাথ এই সামঞ্জস্যহীন যুগ সমাজের পটচিত্র করুণা চরিত্রে স্থাপন করলেন। সম্ভবত করুণার ভেতর দিয়ে সময়কে পর্যটন করে তিনি অনুভবে বুঝলেন, তাকে এখানে স্থাপন করে এবং সঙ্গিনী অভাবে 'কিছুমাত্র কষ্ট হইত না' বলে জীবনের কোনো একটি ধ্রুবসত্য অবহেলা করা হচ্ছে। তাই সচেতনভাবে প্রথম থেকে করুণার ব্যক্তিকাল গঠনের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের সংকীর্ণ প্রতিরূপ আভাসিত হয় দু'ভাবে—

১) পাখি, কাঠবিড়ালী, গাছপালা— মানুষের উপস্থিতি যেখানে শূন্য।

২) অন্তঃপুরের পুষ্করিণীর পাড়— বহির্বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক যেখানে ছিন্ন।

এভাবে সময়-ক্ষেত্রটি ব্যক্তি থেকে সামাজিক যুগজীবনে এবং আবার তাকে ব্যক্তিমুখী করে তার নিঃসঙ্গতা-বিচ্ছিন্নতাকে খুব নির্দিষ্টরূপে দেখানো হয় বলে ঔপন্যাসিকের সময় চেতনার বলিষ্ঠ পরিকল্পনার প্রচেষ্টাও লক্ষ্য করতে হয়। তাই চরিত্র দিয়ে নয়, সর্বজ্ঞ লেখকের দৃষ্টিতে শোনানো হয়— 'এইরূপে করুণা তাহার জীবনের প্রত্যুষ কাল অতিশয় সুখে আরম্ভ করিয়াছিল।'[২৫] অর্থাৎ, একটি বিশেষ সময়কে ধরে চরিত্রের সূচনা হল বটে; কিন্তু এই সুখকল্পনা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের তৈরি করে তোলা বিশ্বাস। অথচ এই 'বিশেষ সময়' যে চিরকাল এক থাকতে পারে না, রূপ বদল করে— সে কথাগুলো ধরিয়ে দেবার জন্যই শুধু 'করুণা' নয়; গোটা উপন্যাস-বিশ্ব গঠন করে তুলতে হল রবীন্দ্রনাথকে। সেইসঙ্গে 'করুণা'র

পটে ঔপন্যাসিক কিছুটা সমালোচনা করেন আমাদের, দেখিয়ে দেন যুগের সামঞ্জস্যহীনতা। কেননা, করুণার জীবনের চারধারে যে সংকীর্ণ কাল ভেতরে এবং বাইরে তাকে গঠন করে, তাতেই চিরদিনের মত ফেলে রেখে বিচার করার মানসিকতা করুণার পিতা ও প্রতিবেশীরা করেন বলেই তাদের মনে হয়— 'চিরকালই বুঝি ইহার এইরূপে কাটিয়া যাইবে।'[২৬] অথচ মানসিকতার দিক দিয়ে এরা কেউই অনুদার নন। করুণার পিতা অনুপকুমার তো অতিথিশালা নির্মাণ, দেবালয় প্রতিষ্ঠা, পুষ্করিণী খনন ইত্যাদি অনেক সৎকাজেই লিপ্ত।

উনিশ শতকের ভিত্তিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসে তুলে আনেন এমন এক দৃষ্টিভঙ্গি, যেখানে তিনি ঘোষণা করতে ভোলেন না, সময়ের ধ্রুবসত্যে জীবন কোনো প্রতিষ্ঠান, কোনো ব্যক্তি-বিচার শক্তির কাছে বাঁধা নয়। তাই অনাথ নরেন্দ্রের আসল চারিত্রিক গড়নের পরিচয় সকলেই যেখানে ভুল অনুধাবন করে। সেখানে কথক সত্তায় স্বয়ং লেখক কাহিনীর বৃত্তে প্রবেশ করে জানিয়ে দেন— 'নরেন্দ্র, তুমি বড়ো ভাল ছেলে নও।'[২৭]

হতে পারে, এই পদ্ধতি বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিম তাঁর উপন্যাসেও ইতিপূর্বে প্রয়োগ করেছেন, যা এক্ষেত্রে অনেকটাই নবীন রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ প্রবৃত্তি হয়ে উঠেছে। তবে বঙ্কিম যেখানে নিজে সোচ্চার ভাষ্যে প্রবেশ করেছেন উপন্যাসের বিবরে, সেখানে স্পষ্টতই বিপুল সময়কে নাড়া দিয়ে ঘটনার চরিত্র ও যুগকে জাগিয়ে তোলার বাসনা প্রবল নয়। বরং কাহিনীকে সরলভাবে বুঝিয়ে দেবার প্রবণতা বেশি। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁর উদ্দেশ্যকে পরিষ্কার করেন সীমানাকে ছাড়িয়ে উঠে। তাই সময়ের নানা ডাইমেনশনকে ফুটিয়ে উপন্যাসকে সৃষ্টি করে তোলার অদ্ভুত তাগিদ থেকে তিনি অনুভব করেন ব্যক্তি-আমি দিয়েই তার ব্যঞ্জনা দান করবেন। যার অপূর্ব ফসল ফলে 'চতুরঙ্গ' কিংবা 'ঘরে বাইরে'র মত আত্মমুখশ্রী-সন্ধানী উপন্যাসে। 'করুণা'র বেলায় ব্যঞ্জনার চাইতে যা সতর্ক করে তোলার মানসিকতাই জোরালো। ফলে কাহিনীর মধ্যে উৎকণ্ঠাপূর্ণ অনিশ্চয়তার অভাব ঘটে, সিদ্ধান্ত গ্রহণে কোনো আততি জাগায় না বলেই সময়ের প্রবল ভার বহন করতে হয় না। কিন্তু সমালোচক একে ত্রুটি বলে আখ্যায়িত করলেও[২৮] মনে হয়, তা না বলে বলা উচিত, সময়সূচক ধারাবাহিকতায় এ এক অপরিণত শিল্প। ত্রুটির ব্যর্থতা নয়, নবীন লেখকের প্রাক-পরিণত মনের মধ্যে ভবিষ্যতের বলিষ্ঠ আভাসের রেখাপাত। নিরন্তর আধুনিকতম হয়ে ওঠার প্রথম উত্তরণ প্রয়াস।

রবীন্দ্রনাথ করুণাকে নীতি উপদেশ কিংবা নারীর কর্তব্য চর্চার বাহক করে গড়তে চান না। বরং যুগের প্রেক্ষাপটকে তার উপর গড়িয়ে নিয়ে পাশাপাশি মানুষ হিসেবে তার অন্তঃসময়কে নির্দিষ্ট এবং বিশ্বাস্য পরিকল্পনায় গড়তে প্রয়াসী

হন। অতএব ঘটনাক্রমকে সময়ের শক্তিতে চালিত করে করুণার ব্যক্তিরাজ্যে যে সংকীর্ণ পরিসর সূচনায় উল্লেখ করা হয়, তাতে প্রবাহ ধারায় নিয়তির মতই পরবর্তীতে জুড়ে দেওয়া হয় নরেন্দ্রকে। ফলে দেখা যায়, করুণার ব্যক্তিরাজ্যে কাঠবিড়ালী, পাখি, গাছপালা ছাড়াও পরিসর আরো বৃদ্ধি পায়। একটি মানুষের আবির্ভাবে সে-জগত ভীষণভাবে নড়ে ওঠে। তার কারণ, যেহেতু মানুষ মানুষের বোধে নিষিক্ত হয়েই হতে পারে অগ্রসরমান, বুঝতে পারে নিজের অবস্থানের মূল্য। সময়ের অনালোকিত ক্ষেত্র সে তখন আবিষ্কার করে। হয়তো এ ব্যাপারে নরেন্দ্র করুণার জগতে পরিবর্তন আনে প্রতিবন্ধকতা ও ধ্বংসের পরিণামকে ধরেই। কিন্তু করুণার দিক দিয়ে দেখলে উপন্যাস বৃত্তে তার প্রথম আবির্ভাব যে শৈশবের স্নিগ্ধতায় অবোধ, তাতে ভেতর থেকে যৌবনের পথে চলার বাসনা অদৃশ্য শক্তিরূপে বিরাজিত। সেই পরিচয় নরেন্দ্রকে ধরে পরিসর বৃদ্ধির প্রবণতায় প্রমাণিত হয়।

কিন্তু সামাজিক কারণেই তৎকালীন প্রত্যক্ষ সাময়িকতার দ্বারা সৃষ্ট যুগজীবনে স্বাভাবিকভাবেই গ্রাম বাংলার সাধারণ পরিবারে পুরুষের পাশাপাশি নারীর শিক্ষাদীক্ষা কিংবা বাইরে বেরিয়ে আসার ছাড়পত্র আসে না[২৯] বলে বালিকা করুণাকে সংকুচিত হয়ে থাকতে হয়। মানবিক সময়ের উপর সামাজিক সময়ের একাধিপত্য বজায় আছে বলেই নরেন্দ্র শাসককুলের সদস্য হিসেবে যেখানে পাঠশালায় যেতে পারে, করুণাকে সেখানে অবদমিত কুল রূপে গৃহবন্দি হয়ে পড়তে হয়। আর এখান থেকেই সুস্পষ্টভাবে দুটো মানুষের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র ভাগ হয়ে পড়ে। ফলে সৃষ্টি করে তোলা সময়ের এই অসমদৃষ্টির পাপ সামাজিক কালকেই গ্রহণ করতে হয়। তাই করুণা চরিত্রের যদি আজ কোনো অসম্পূর্ণতার অভিযোগ ওঠে, তবে তার দায় করুণার স্রষ্টার, নাকি সেই কালধর্মের— ভাবতে হয়।

করুণা বাইরের সময় পরিসরে পরিচিত হতে পারে না বলেই পরিস্থিতি তাকে বাধ্য করে কল্পজগতের বৃত্তে আবদ্ধ হয়ে থাকতে। অন্যদিকে নরেন্দ্র পাঠশালা ছেড়ে কলকাতায় ইংরেজি স্কুলে ভর্তি হয় বলে অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র প্রসারিত হবার সুযোগ থাকে। করুণা থেকে তার দূরত্ব এভাবেই বাড়ে। কিন্তু সামাজিক সময় অনুকূল হলেই যে মানবিক সময় একটি ব্যক্তিজগতকে প্রসারিত করবে, একথা সত্য নয়। তাই নরেন্দ্রর পরিসর কলকাতায় এসে বৃদ্ধি পেলেও মনুষ্যত্বের স্বপক্ষে প্রগতিব্যঞ্জক হয় না।

কিন্তু জীবনে নঞর্থক সময় মাত্রারও মূল্য আছে, যে কারণে নানান সময় স্তরে নিরন্তর সংঘর্ষ ঘটিয়ে আলোড়ন তুলে পূর্ণাঙ্গ করা সম্ভব। উপন্যাস সে কারণেই ঘটনাবহুল হয়ে উঠতে পারে নানা বিরোধী দায়কে ধারণ করেই। রবীন্দ্র-উপন্যাসে তাই নঞর্থক স্রোতের বিপরীত প্রবাহ একটি বিশেষ মূল্যে ধরা দেয় বারবারই।

যেমন— 'বউঠাকুরানীর হাটে'র প্রতাপ, 'রাজর্ষি'র রঘুপতি, 'ঘরে বাইরে'র সন্দীপ কিংবা 'যোগাযোগে'র মধুসূদন ইত্যাদি। তবু 'করুণা' উপন্যাসে নরেন্দ্র এই প্রবাহ ধারায় অনেকটা ব্যতিক্রমিক। কেননা, রবীন্দ্র উপন্যাসে এই একটি মাত্র প্রধান চরিত্র, ব্যক্তি সময়ের অগ্রসরণে যার ধ্বংসাত্মক নঞর্থক যাত্রা বরাবর সমতল আকারে বর্তমান বলেই এর কোনো ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাই নেই। পরবর্তীতে লক্ষ্য করা যায়, রবীন্দ্রনাথ প্রধান চরিত্র হিসেবে নরেন্দ্রের মতন এত সম্ভাবনাহীন একমুখী চরিত্র আর দ্বিতীয়টি গড়তে চাননি তাঁর উপন্যাস বিশ্বে। 'বউঠাকুরানীর হাটে'র প্রতাপাদিত্য চরিত্রে দ্বন্দ্বের আলোড়ন কিছুটা হলেও ধরা দেয়। আর একেবারে শেষতম উপন্যাস 'চার অধ্যায়'-এ বটু চরিত্রকে প্রধান চরিত্র হিসেবে গণ্যই করা যায় না। তাই মনে হয়, প্রথম এই উপন্যাসটিতে নরেন্দ্রকে নির্মাণ করে রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেন, সময়ের চিরন্তন সত্যে তাকে ধরা হল না। ফলে সেক্ষেত্রে নরেন্দ্রের জগতে করুণা পদদলিত পরাভূত হয়েও পাশাপাশি উজ্জ্বল বর্ণকে সে-ই নির্দিষ্ট করে দেয়। এমনকি উপন্যাসের শেষে যেখানে সময়ের কাছে করুণার নীরব হয়ে পড়া কল্পনার সম্ভাবনাময় জগতের ধ্বংসস্তূপের স্তব্ধতাকে প্রকট করে নেয়, সেখানে একে একে সামাজিক কাল নরেন্দ্রের ব্যক্তিকালকে অদৃশ্যভাবে পোষকতা করে গেলেও তার পরিণামের অশুভ ইঙ্গিতের উর্ধ্বে করুণার ছবিটিকে কোনোভাবেই ভোলা যায় না। হয়ত এই ছবি থেকে একথা ভাবা অসমীচিন নয়, রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী উপন্যাসগুলিতে করুণার স্বাবলম্বী অদৃশ্যযাত্রা অব্যাহত থাকছে। অথচ নরেন্দ্রের ইমেজটিকে ভেঙে তিনি তৈরী করতে চান সূক্ষ্ম পূর্ণাঙ্গ প্রতিকূল শক্তির আধার। ফলে প্রথম উপন্যাসটিতেই কহিনীকে ভিত্তি করে আপাত ,'ব্যর্থ করুণা' এবং 'পূর্ণ ব্যর্থ নরেন্দ্র'— এই দু'টো উচ্চারণকে জীবনের পটে পাশাপাশি রেখে একদিকে সদর্থক পথে তাঁর অভিজ্ঞতার বিকাশের পথকে লেখক আভাসযুক্ত করেন, আবার উৎকট চড়া রঙের নঞর্থক ধারায় ব্যর্থতা প্রমাণিত করে ঘোষণা করেন, এই সৃষ্টির অবিমিশ্র পুনরাবির্ভাব ঘটবে না।

সমাজে নারীর স্থান কত বড়, দীর্ঘসময় দ্বারা লালিত অভ্যাসের কারাগারে বন্দি সংস্কারান্ধ পুরুষশাসিত সমাজ হঠাৎ করে একটি সংক্ষিপ্ত সময়প্রবাহ ধরে তাকে নির্ণয় করবে কি করে! অতএব অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে আবির্ভূত রাজা রামমোহন, দ্বারকানাথ, রাধাকান্ত দেব এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আবির্ভূত বিদ্যাসাগর, রামতনু লাহিড়ী, মধুসূদন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখদের প্রচেষ্টা সমাজের বৃহত্তর ক্ষেত্রে খুব অল্পই প্রভাব ফেলতে পারে। বৃহত্তর সমাজে এর উজ্জীবন না ঘটার কারণ— দীর্ঘদিনের সময় বন্ধনকে কাটিয়ে নূতন চিন্তাচেতনায় এগিয়ে চলার মানসিক বল সাধারণের নেই। তার জন্য চাই আরো

যথেষ্ট সময়ের শিক্ষা। উনিবংশ শতাব্দী সেই সময়টুকু দিতে পারছিল না বলেই সমাজের কিছুসংখ্যক বিশেষ গোষ্ঠীতেই কেবল নারীর ব্যক্তিমর্যাদার আন্দোলন গৃহীত ছিল। অতএব বৃহত্তর বাংলাদেশের পটচিত্রে পুরুষ-নরেন্দ্রের কাছে নারী-করুণার সময় জগত সঙ্গীদের নিয়ে একটি পরিহাস ও স্থূল বিনোদনের উপকরণ হয়ে উঠলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তাছাড়া যেখানে নরেন্দ্র তার মতন করে নিজের জগতকে গড়ে, সেখানে আত্মকেন্দ্রিকতার ঘোলাটে দৃষ্টি নিয়েই তো সে অভিজ্ঞতার অন্বেষণ করে। কল্পনার রাজ্যে নিয়ত নিজেকে প্রসারণশীল করুণাকে তাই তার বুঝে ওঠা সম্ভব নয়। শুধুমাত্র চারিত্রিক একটি মৌল বিকার থেকেই যে নরেন্দ্র জন্মেছে, তা নয়। বরং দীর্ঘসময়ের অভ্যাসদগ্ধ কুশিক্ষার আবরণে সে জড়িয়ে পড়ে বলেই কখনো সহজ হয় না সূক্ষ্মভাবে ধরে থাকা করুণার সঙ্গে তার মিলন। দুই বিপরীত মেরুর সম্মিলন অসম্ভব হলেও বর্তমানের আধিপত্যবাদী সামাজিক নির্দেশে করুণাকে এখানে বিবাহের ফাঁসে জড়িয়ে যেতে হয়। তাতে করুণা-নরেন্দ্র পর্ব উপন্যাসে যে অনাকাঙ্ক্ষিত ফল নিয়ে আসে, নিচে এভাবে তা দেখানো যায়—

উপন্যাসে যা এভাবে প্রযুক্ত হয়—
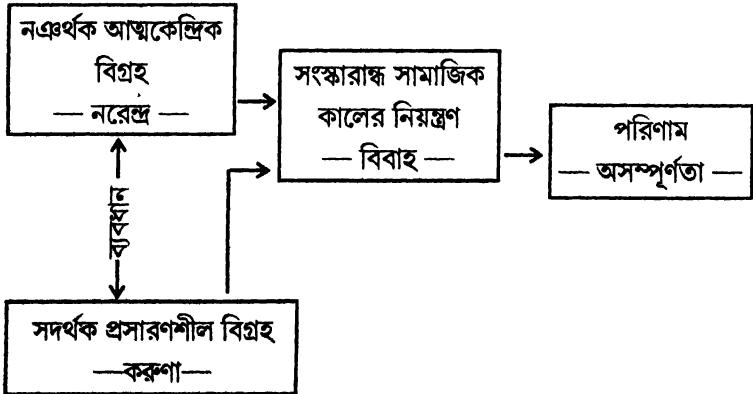
উপরের দু'টো চরিত্রের সহাবস্থান কেমন করে সময়ের বিপর্যয় ডেকে এনে ভবিষ্যৎ শূন্য হবে, তার সফল ইতিবৃত্তের আভাসটুকু দিলেন লেখক ভূমিকার শেষ চরণে, সার্বভৌম মহাশয়ের পৌরোহিত্যে দুই ভিন্ন ধর্মীয় পরিণয় ঘটিয়ে অভিশপ্ত

পরিণাম সৃষ্টিতে। ফলে সার্বভৌম মহাশয় হৃদয়বান হলেও লেখকের দ্বারা বারবার উপহাসিত হন উপন্যাসে কার্যত সেই অশুভ বিবাহ উৎসবের ধর্মীয় সূত্রধাররূপে জড়িত ছিলেন বলেই।

আমরা দেখি, করুণা-নরেন্দ্র পর্বকে ধরে অতীতের উপর ভবিষ্যতের অসম্পূর্ণতার মূলীভূত কারণকে আভাস দিয়েই মূল গল্প-বিবৃতির শুরু। অতীত দিয়ে তাই বর্তমান বোঝাতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে এই ভূমিকাপর্ব। দু'একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে এই ভূমিকার সময়-উপস্থাপনার গুরুত্ব দেখানো যায়—

ভূমিকার অতীত প্রেক্ষাপট		নানা পরিচ্ছেদে বর্তমান পরিণাম সম্পর্ক
১) 'করুণা নরেন্দ্রকে এত ভালোবাসিত যে কিছুক্ষণ তাহাকে না দেখিতে পাইলে ভালো লাগিত না...'	→	'নরেন্দ্রের স্বভাব করুণার নিকট ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইতে লাগিল।' (অষ্টম পরিচ্ছেদ)
২) 'নরেন্দ্রের মতো শান্ত শিষ্ট সুবোধ বালক আর নাই এবং পাড়ার এমন বৃদ্ধ ছিল না যে তাহার বাড়ির ছেলেদের প্রত্যেক কাজেই নরেন্দ্রের উদাহরণ উত্থাপন না করিত।'	→	'নরেন্দ্র যে কিরূপ লোক তাহা এতদিনে পাড়ার লোকেরা টের পাইল'। (প্রথম পরিচ্ছেদ)
৩) 'অনুপের মৃত্যুর পর সার্বভৌম মহাশয় নিজে পৌরোহিত্য করিয়া নরেন্দ্রের সহিত করুণার বিবাহ দিলেন।'	→	'পণ্ডিত মহাশয়...কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেন, মা, আমি তোকে অনেক কষ্ট দিয়াছি...' (সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ)

কাজেই বোঝা যায়, কাহিনীর অতীতকে সেই অপরিণত মানসিকতা নিয়েও সজ্জিত করে তোলার কাজে রবীন্দ্রনাথ অবহেলা করেন না, বরং বর্তমানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাহিনীর প্রথম পরিচ্ছেদ থেকে শেষ পরিচ্ছেদকে আভাসিত করেন ভূমিকায়। ভূমিকার প্রসারিত মাত্রাই হয় 'করুণা' উপন্যাসের বাকি অংশ। নরেন্দ্র সম্পর্কেও যে তফাৎ যাবার সাবধান বাণী সোচ্চার কণ্ঠে লেখক বলেন, তাকেই যেন সময়ের হাত ধরে ঘটনা দিয়ে নানা পরিচ্ছেদে পরিপুষ্ট করে তোলেন সকলের

অন্তরে। নরেন্দ্র তাই ভূমিকায় কৌশলে যেখানে তার আত্মপরিচয়কে সবার চোখে ধূলো দিয়ে গোপন রাখতে পারে, (অবশ্য ত্রিকালদর্শী লেখকের উপলব্ধিকে বাদ দিয়ে) সেখানে সময়ের হাত ধরে তার সুযোগকে যথাযোগ্য ব্যবহার করে সে ধীরে ধীরে তার লালসার শেকড়কে গ্রামের মাটিতেও দৃঢ়ভাবে প্রবেশ করিয়ে দেয়। পরে একটি একটি করে নরেন্দ্রের বর্বরোচিত নিদর্শন যখন সকলের কাছে পরিষ্কার হয়ে ওঠে, তখন সময়ের মাত্রা দুরারোগ্য ব্যাধিতে পূর্ণবিস্তৃত। যার হাত থেকে রক্ষা পাবার আর সরল উপায় থাকে না। এই প্রতিচিত্র আরো পরিশীলতরূপে অনেক পরে লেখা প্রতিষ্ঠিত উপন্যাস 'যোগাযোগে'ও ছায়া ফেলে। যদিও দুটো উপন্যাসের রচনার বিশাল ব্যবধান, সময়ের মাত্রা প্রয়োগে স্বাভাবিক কারণেই হয় ভিন্ন।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি তুলনার কথা আসে। 'করুণা' উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদে লেখক বর্ণনার দ্বারা স্পষ্ট করেন—

'মূল কথাটা এই, নরেন্দ্র ও করুণায় কখনোই বনিতে পারে না। দুইজনে দুই বিভিন্ন উপাদানে নির্মিত।'[৩০] ঠিক এমন করে কিংবা এমন কথা আমরা 'যোগাযোগ' উপন্যাসের কুমু-মুধুসূদনের বিবাহ বন্ধনের মধ্য দিয়েও পেয়ে যাই। কিন্তু তার উপস্থাপনা দুটো উপন্যাসে এক নয়, অথচ একে অপরের সূত্রবদ্ধ। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, 'যোগাযোগ' উপন্যাসের সাতান্ন সংখ্যক অধ্যায়ে কুমুদিনী দাদা বিপ্রদাসকে মধুসূদন সম্পর্কে বলে—

'আমাকে ওরা ইচ্ছে করে দুঃখ দিয়েছে তা মনে করো না। আমাকে সুখ ওরা দিতে পারে না আমি এমনি করেই তৈরী। আমিও তো ওদের পারব না সুখী করতে'।[৩১]

ফলে দুটো বক্তব্যের যে পার্থক্য, সে গুলো সামান্য নজর দিয়ে দেখা যায়—

১) প্রথমটির ক্ষেত্রে বাইরে থেকে প্রবেশ করে লেখক বক্তব্য রাখেন। দ্বিতীয়টিতে চরিত্রের কণ্ঠস্বরে ধরা হয়।

২) যেহেতু প্রথমটির ক্ষেত্রে লেখক ঐ বক্তব্য রাখেন, অতএব দুটো চরিত্র সম্পর্কে তাঁর শেষকথা বলে নিতে হয়। আর দ্বিতীয়টিতে একটি চরিত্রের সংলাপ ধরে কথাটি উচ্চারিত বলে পারিপার্শ্বিক কারণে এটাই শেষ কথা হলেও সময় বদলে তাতে পরিবর্তনের মাত্রা যুক্ত হবার সম্ভাবনা থাকে।

৩) সবশেষে উল্লেখিত দুই সিদ্ধান্তের ভাষ্যে নিশ্চয়ই বলা যায়, তাতে আপাত স্বভাবগত মিল থাকলেও প্রকৃতি একেবারেই আলাদা। প্রথমটির থেকে দ্বিতীয়টি অনেক বেশি নমনীয়।

কিন্তু এই স্বরগত পার্থক্য সম্ভবপর হয় কালের অতিক্রান্তিতেই। তাই যেখানে আভাসের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় একটি সমতলীয় অভিব্যক্তি, সেখানে অন্য

আরেকটি ক্ষেত্রে সমস্ত রূঢ়তাকে ছাড়িয়ে অপেক্ষা করে সর্বাঙ্গ সুন্দর শিল্প। 'করুণা' উপন্যাস তাই আমাদের চোখে যে কারণে অসম্পূর্ণ, 'যোগাযোগ' তার নমনীয় স্বভাবগুণে সেখানে আপাত ট্র্যাজেডির বাতাববণেও ভবিষ্যৎ বাঁচিয়ে চলে। করুণা যে - ক্ষেত্রে বর্তমান প্রতিকূলতায় দলিত হয়ে পুত্রকে হারায়, 'যোগাযোগে'র কুমু পুত্রের হাত ধরেই বর্তমান বন্ধ্যা সময়কে ইতিবাচক রূপে তৈরি করে নিতে পারে। এই দৃষ্টিকোণ গোড়া থেকেই ঔপন্যাসিকের ছিল, অথচ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে সময়ের সহযোগিতা ভিন্ন এর পরিপুষ্টি নিশ্চয়ই সম্ভবপর নয়।

আলোচনার এ পর্যায়ে এসে 'করুণা' উপন্যাসের সমাপ্তি সম্পর্কে বিশেষ অভিযোগ এবং বিপরীত দিক দিয়ে অভিযোগের নিষ্পত্তি, দু'জন সাহিত্য আলোচকের বক্তব্য উদ্ধৃত করে দেখানো যায়—

অভিযোগ ঃ—

'করুণায় মুদ্রিত কাহিনীর শেষ অধ্যায়ের (সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ) সর্বশেষ অনুচ্ছেদে পীড়িত করুণার শয্যাপার্শ্বে করুণারই সনির্বন্ধ অনুরোধে নরেন্দ্র এসে বসেছে। কিন্তু গল্প এখানেই শেষ হওয়ায় পাঠকের কৌতূহল তো মেটেই না, বরঞ্চ নরেন্দ্রের পরিণতি সম্পর্কে নতুন আগ্রহ জন্মে। করুণার জীবনান্ত সম্বন্ধেও যেন নিঃসন্দেহ হতে পারা যায় না। সুতরাং করুণার কাহিনীকে যে অসমাপ্ত বলা হয়, মনে হয় তা ঠিকই'।[৩২]

নিষ্পত্তি ঃ-

'করুণা অসম্পূর্ণ রচনা - এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এই কাহিনীর পরিসমাপ্তি যথাযথ ও শিল্পচাতুর্যপূর্ণ। উপন্যাসটির শেষ অনুচ্ছেদটি তার প্রমাণ... যে সাধ্বী রমণীর জীবন এক দুশ্চরিত্র স্বামীর সংস্পর্শে বিপর্যস্ত হয়েছে তার যথাযথ পরিণতির ছবি আর কি হতে পারত?[৩৩]

কিন্তু এই দুই মন্তব্যের কোনটি ঠিক, সে আলোচনায না গিয়েও মনে হয় সময়ের চোখে উপসংহার পর্বটি আরো অন্য গভীরতব ভাবে ব্যাখা করা যায়। এ ব্যাপারে ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে ; 'করুণা' উপন্যাসের মূল কাহিনী ধারা - করুণা-নরেন্দ্র বৃত্ত কখনো মিলিত হতে পারে না। বরং মিলিয়ে দিতে গিয়েই বিড়ম্বনার মুখোমুখি হতে হয়। কাজেই লেখক আভাসেই প্রথম বলে রাখেন নরেন্দ্র-করুণার যুগ্ম স্রোতধারার সম্ভাব্য পরিণাম। সকল দিক দিয়ে প্রসারিত সময়ের পূর্ণতা তাই এখানে আসতেই পারে না। ফলে এর সমাপ্তি অসমাপ্তির শিল্প হয়েই ওঠে। অথচ এই অসমাপ্তিকে লেখকের সীমায়িত কল্পনা, কিংবা উপন্যাসের গঠনমূলক ত্রুটি বলতেও সন্দেহ হয়। যেহেতু তরুণ রবীন্দ্রনাথ এই মূল স্রোতের

সময়-ব্যর্থতা দিয়েই পাশাপাশি মহেন্দ্র-রজনী পর্বের আরেকটি স্রোতকে মাধ্যম করে তার পরিণতির সদর্থক প্রকাশ ঘটিয়ে জানিয়ে রাখেন তিনি ভবিষ্যৎ উপন্যাস গড়বেন কোন্ পথ ধরে।

মুখশ্রী সন্ধানী বলিষ্ঠ উপন্যাস 'চতুরঙ্গ'ও চমৎকার আভাসিত হয় 'করুণা'য়। 'চতুরঙ্গে' শ্রীবিলাসীয় 'আমি'র আধারে বিশ্লেষণ ও ব্যাখার দায়িত্বভার 'করুণা' উপন্যাসে স্বয়ং লেখকই গ্রহণ করেন। বিশেষ করে মহেন্দ্র ও রজনী প্রসঙ্গ আলোচনায়। কুরূপা রজনীর প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন করে মহেন্দ্রের চোখে তার আসল রূপ ধরিয়ে দিতে লেখক উৎসাহী। কেননা কুরূপ নিয়ে জন্ম দোষের নয়, মানুষের আন্তরলোকের উদ্ভাসনই তার লক্ষ্য ও সত্য পরিচয়। উনবিংশ শতকের মানব মুখী সামগ্রিক বোধ-সম্পন্ন সময়ের শিল্পী তাকে ধরিয়ে দিতে চাইবেন বটে। তবু কোনো একটি শতকের ঐতিহাসিক আন্দোলনকে ঘিরে এর সামগ্রিক প্রকাশ হতে পারে না। বরং সেই আন্দোলনের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেই আন্তর-সময় ধরে উপলব্ধি সম্ভব—রূপ ক্ষণিকের, অরূপের শুদ্ধিই বড়। যা 'করুণা' উপন্যাসে লেখকের ভাবনার প্রসারণ ঘটিয়ে শেষপর্যন্ত মহেন্দ্র বুঝে নেয়। অর্থাৎ এই বুঝে নেবার জন্য কুরূপা-রজনী দিয়ে বিচ্ছেদ এবং হৃদয়শীল-রজনী দিয়ে মহেন্দ্রের মধ্যে মিলনের ক্ষেত্র সময়-অতিক্রান্তি ধরে দেখিয়ে দেবার প্রয়োজন আছে। উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে লেখক যেখানে রজনীর স্বপক্ষে আগাম সত্যবাণী ঘোষণা করেন, সেখানে নির্দিষ্ট সময়-পর্যায় তখনও মহেন্দ্র অতিক্রম করে না বলেই তার কানে সেই স্বর পৌঁছায় না। 'চতুরঙ্গে'র শ্রীবিলাস চরিত্রের আপাত সাধারণ স্তর একদিন দামিনীও প্রত্যক্ষ আলোকে উপলব্ধি করেনি। সেজন্য শ্রীবিলাস একটি জায়গায় উল্লেখ করে—

"এই নাট্যের মুখ্য পাত্র যে দুটি তাদের অভিনয়ের আগাগোড়াই আত্মগত - আমি আছি প্রকাশ্যে, তার একমাত্র কারণ, আমি নিতান্তই গৌণ।"[৩৪]

লেখক এ উচ্চারণ চরিত্র দিয়ে ধরেন এবং কৌশলে কিছুটা অভিমানও যুক্ত করেন। কিন্তু এর মর্মমূলের আসল কথাটি হয়, প্রতিটি খণ্ডকালের অভিব্যক্তি দিয়ে ঘটনা পরম্পরাগত একটি আরেকটির সম্পর্ক-সেতু রচনার মধ্যে। সময়ের ক্রমপ্রসারণ ধর্মকে ভেঙে দিয়ে সতর্ক করতে চাইলেও পরিস্থিতির নিদ্রা কাটে না। 'করুণা' উপন্যাসে সেই সুস্পষ্ট আভাস লেখক-ভাষ্যেই আসে—

"রজনীর সমুদয় বৃত্তান্ত শুনিয়া আমার অতিশয় কষ্ট হইয়াছিল। আমি মহেন্দ্রকে গিয়া বুঝাইলাম। ..... মহেন্দ্র কিছুই বুঝিল না বা আমাকেও বুঝাইল না, কেবল বলিল তাহার অবস্থায় যদি পড়িতাম তবে আমিও ঐরূপ ব্যবহার করিতাম। একথা

যে মহেন্দ্র অতি ভুল বুঝিয়াছিল তাহা বুঝাইবার কোনো প্রয়োজন নাই, কারণ আমার সহিত গল্পের অতি অল্পই সম্বন্ধ আছে।"[৩৫]

'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে শ্রীবিলাস যেভাবে তার পাশে সময়ের প্রকোপে ছুঁয়ে থাকা খণ্ডকালের চরিত্রগুলো দেখে, তাতে তার অভিজ্ঞতা দিয়ে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে। যার অনেকটা প্রাথমিক ছায়া 'করুণা'-তে মহেন্দ্র-রজনীর সম্পর্ক অবনতি ধারায় মহেন্দ্রের কলেজ ছাড়ার প্রেক্ষিতটিকে লেখকের পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত দিয়ে ধরা হয়।

লক্ষ্য করবার বিষয়, সময়ের রাজ্যে শূন্যকালের একটি ভূমিকা আছে, যা 'চতুরঙ্গ' কিংবা 'ঘরে বাইরে'র মুখশ্রী সন্ধান পর্বে শিল্পমণ্ডিত করে যেমন ধরা হয়, অনুরূপ তার আগাম আভাস 'করুণা'তেও বর্তমান। উদ্ধৃতি দিয়ে একটু তুলনা করা যাক-

আভাসপর্ব ঃ-

"পোড়ো জমিতে কাঁটাগাছ জন্মায়, অব্যবহৃত লৌহে মরিচা পড়ে, মহেন্দ্র এমন অবস্থায় কাজ কর্ম ছাড়িয়া বসিয়া থাকিলে অনেক কুফল ঘটিবার সম্ভাবনা।"[৩৬]

মুখশ্রী সন্ধানপর্ব ঃ-

"যেখানে কোনো ডাকের কোনো সাড়া, কোনো প্রশ্নের কোনো জবাব নাই, এমন একটা সীমানাহারা ফ্যাকাশে সাদার মাঝখানে দাঁড়াইয়া দামিনীর বুক দমিয়া গেল।"[৩৭]

দেখতে পাই প্রথম পর্বের লেখকের শূন্যকলের মানসিকতা বিপুল সম্ভাবনার পরিচয় নিয়ে 'চতুরঙ্গে'র মুখশ্রী সন্ধানের সৃষ্টি করে তোলা বর্ণনাকে সফল করে তুলছে। তবে এক্ষেত্রে 'করুণা' উপন্যাসে শূন্যকালের বর্ণনা লেখককৃত বলেই বঙ্কিমীয় রীতি অনুসারে অনেকটাই তা চাপানো, 'চতুরঙ্গে' যা চমৎকারভাবে ব্যক্তি-শ্রীবিলাসের অভিজ্ঞতা এবং কথক-শ্রীবিলাসের উপস্থাপনায় চিত্রময় হয়ে ওঠে। তাছাড়া প্রথমটির ক্ষেত্রে যেখানে নীরস উপদেশ চর্চাই মুখ্য, দ্বিতীয়টিতে চরিত্র দিয়ে চরিত্রের গভীরতর অতল অনুসন্ধান চলে। তবু একথা অস্বীকার করা যায় না যে, শূন্যকালের অসহ্য যন্ত্রণা কোনো চরিত্রই দীর্ঘকাল বহন করতে পারে না। ফলে 'চতুরঙ্গে'র শ্রীবিলাসের দেখা অভিজ্ঞতা দিয়ে ভয়াবহ পরিণামের কথা যেমন আভাসিত হয়, 'করুণা'য় সে ভাবনারই একটি প্রাথমিক সূত্র ধরা পড়ে মহেন্দ্রকে মাধ্যম করে-

'একটা কিছু আমোদ নহিলে কি মানুষ বাঁচিতে পারে'[৩৮]

কিন্তু শুধু সরাসরি লেখক সত্তায় করুণার প্রতিটি বিশ্লেষণ নয়, 'চতুরঙ্গ-ঘরে

বাইরে'র মতন চরিত্র দিয়েও যে তাকে ধরতে হবে এই প্রাথমিক বোধটুকুও ঔপন্যাসিক মনে রাখেন। ফলে, একবিংশ পরিচ্ছেদে মহেন্দ্রকে তার চিঠির ভাষণ উদ্ধৃত করেই সময়ের শূন্যতাবোধ ও তার রূপান্তরকে দেখাতে হয়—

"কোনো উদ্দেশ্য নাই, কোনো গম্যস্থান নাই— তখন কেন যাইতেছি, কোথায় যাইতেছি কিছুই ভাবি নাই। মনে করিয়াছিলাম এ পথের যেন অন্ত নাই, এমনি করিয়াই যেন আমাকে চিরজীবন চলিতে হইবে— চলিয়া, চলিয়া, চলিয়া তবু পথ ফুরাইবে না - রাত্রি পোহাইবে না। মনের ভিতর কেমন একপ্রকার ঔদাস্যের অন্ধকার বিরাজ করিতেছিল, তাহা বলিবার নহে। কিন্তু রাত্রের অন্ধকার যত হ্রাস হইয়া আসিতে লাগিল, দিনের কোলাহল যতই জাগ্রত হইয়া উঠিতে লাগিল, ততই আমার মনের আবেগ কমিয়া আসিল। তখন ভাল করিয়া সমস্ত ভাবিবার সময় আসিল।"[৩৯]

অতএব লেখকসত্তারূপে অনুপ্রবেশ করে সর্বজ্ঞ দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ যে সর্বত্র 'করুণা' উপন্যাসে ঘটনার পরিণাম দেন না, তার আগে ঘটনার সময় ধারায় আলোড়িত হওয়া, চরিত্রের আপন সত্তার সঙ্গে প্রতিকূল সময়ের সংস্পর্শ ঘটিয়ে প্রশ্নে প্রশ্নে নিজেকে পরিপূর্ণ করে তোলা— সময় শিল্পের এই সিদ্ধির প্রবণতা মহেন্দ্রকে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তৈরি করে নিতে চান, এ কথা অস্বীকার করা যায় না।

মুখশ্রী সন্ধানের আরেক মনোরম ভাষ্য 'ঘরে বাইরে'র সূতিকাগার হিসেবেও 'করুণা'কেই সম্ভবত নির্দেশ করা যায়। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে সময়ের নানামুখী স্তরকে মানসিক জগত দিয়ে ধরতে গিয়ে তাকে স্বতন্ত্রভাবে ভাগ করে সমমর্যাদায় তিনটি চরিত্রের আত্মকথায় ধরতে চাওয়া হয়। সৃষ্টি হয় একটি কাহিনীর অবয়বে তিনটি জগতের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের আলাদা সময় স্তর। পরিণামে মানসিক সময়কে রবীন্দ্রনাথ ত্রিধারা থেকে একটি ধারায় উপন্যাসে সূত্রবদ্ধ করেন মানবিক কালে। 'করুণা' উপন্যাসে এর একটি সামান্য প্রবণতা আংশিকভাবে মিলবে মোহিনী ও মহেন্দ্রের মনের কথা অংশে। 'ঘরেবাইরে'র আত্মকথারই পূর্বাভাস হিসেবে এখানে ধরা পড়ে সুস্পষ্টভাবে নারী ও পুরুষের মনোজগতের সময়ের পার্থক্য অনুসরণে বিশ্লেষণ পদ্ধতি। বঙ্কিমের প্রভাব এখানে আছে সত্য, কিন্তু পরিপূর্ণ রবীন্দ্রনাথ যে এখানে আভাসিত, তাকে এড়িয়ে যাবারও উপায় নেই। অতএব দেখা যায় মহেন্দ্র যেখানে পুরুষ বলেই সবকিছুকেই সুস্পষ্টভাবে সরাসরি দেখতে চায় প্রলম্বিত সময়কে সঙ্কুচিত করে, সেখানে মোহিনী নারী বলেই তার পক্ষে স্বাভাবিক হয়ে পড়ে বিলম্বিত সময়ের কৌনিকতা নিয়ে আকাঙ্ক্ষাকে বিস্তার করা। লেখক এখানে কোনো প্রত্যক্ষ পরিচালনার দায় বহন করেন না বলেই সময়-শিল্পের কতগুলো চমৎকার মুক্ত উপস্থাপনা সামান্য পরিসর হলেও ধরা পড়ে।

একথা নিশ্চয়ই জোর দিয়ে বলা যায় 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের সন্দীপ একটি

বিশেষ খণ্ডকালের সৃজনভূমি থেকেই রবীন্দ্র উপন্যাস জগতে সৃষ্টি হয়ে ওঠে। যার আদল আর অন্য কোনো চরিত্রে পূর্ণভাবে ধরা পড়া সম্ভব ছিল না ইতিপূর্বে। কারণ 'সৃষ্টি' কথাটির মধ্যেই আছে নূতনত্বের ডাক। তাই তার একটি মুহূর্তের একক প্রকাশ মৌলিক। কেবলমাত্র যোগ্যকালের সংযোগেই তাকে আলাদাভাবে আমাদের দেখার সুযোগ মেলে। কিন্তু উল্টোদিক দিয়েও তার সৃষ্টির সম্ভাবনা নির্দিষ্ট হবার মূলেও থাকে নানা উপকরণের দীর্ঘসঞ্চয়— নির্মাণপর্বের দিক দিয়ে এই ক্রিয়া যৌগিক। তাই সন্দীপ চরিত্র নিয়ে আমরা যখন তার অভিনব প্রতিমা সৃষ্টির আলোকে বিস্মিত হই, তখন সেই বিশিষ্ট সময়কে ধরে তার সফলতার পেছনে সময়ের সত্য আবিষ্কারে কিছুটা হলেও অন্তত বাহ্যিক প্রবণতায় 'করুণা'র গদাধর ও স্বরূপবাবুকে মনে করিয়ে দেয়। ব্যক্তি লালসাকে চরিতার্থ করার বাসনা নিয়ে অন্তঃপুরের প্রাচীর ভেঙে মেয়েদের বাইরে নিয়ে আসার শুভপ্রয়াস-মূলক মুখোশ সন্দীপের মতই তারা পরিধান করে নেয়। যদিও ব্যক্তির বলিষ্ঠতায় হটকারিতার ঔদ্ধত্যকে শিল্পে রূপান্তর ঘটিয়ে এবং সর্বোপরি প্রতিনায়কের ছদ্মবেশে সময়ের বিশেষ একটি চোখ নিয়ে সন্দীপ জীবনের যে আত্মবিশ্লেষণ করে, তা গদাধরবাবু কিংবা স্বরূপের মধ্যে স্থূলতাকে ভেদ করে ওঠে আসা সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু মনে রাখতে হয় সন্দীপ যেখানে বিংশ শতকের শহুরে যুগমানসের ফসল, গদাধর ও স্বরূপ সেখানে ঊনবিংশ শতকের গ্রামীণ অপভ্রংশ মাত্র।

আবার শুধুমাত্র 'ঘরেবাইরে'র সন্দীপের পূর্বসূরী হিসেবে এদের বিচার করেই 'করুণা'র মর্যাদা প্রমাণ করা যায় না, বরং উপন্যাসটিতে এরা বর্তমানে লেখকের যে উদ্দেশ্য সার্থক করে তোলে, তা অনুক্রম ধরে নিচে দেখানো যায়—

১) গল্পের পারিসরিক বৃত্ত নির্দিষ্ট করার কাজে ঊনবিংশ শতকের নবজাগরণের উন্নত মননশীলতার আড়ালে তাকেই হাতিয়ার করে কিছু সংখ্যক লোকের সুযোগ সন্ধানের চিত্র।

২) কাহিনীর অন্যতম কেন্দ্রীয় চরিত্র নরেন্দ্রের অধঃপতনের ক্ষেত্রটিকে সহযোগিতা করে বিস্তার ঘটানো, যেখানে একটি অমানবিক কাল ইন্ধন সহযোগে আরো নিবিড় হয়ে উঠতে পারে এবং সেইহেতু মানসিক আশ্রয়ও জোটে।

৩) পাশাপাশি অন্য আরেকটি কেন্দ্রীয় চরিত্র মহেন্দ্রকে তার শূন্যকালের অবস্থানভূমিতে তার দুর্বলতার পথ ধরে প্রথম পর্যায়ে এদের পরিসর বিস্তার। পরবর্তীতে মহেন্দ্রের শুভবুদ্ধির কাছে এদের পরাজয় ঘটিয়ে যোগ্যকালের মুক্তি।

গোটা 'করুণা' উপন্যাসে লক্ষ্য করা যায়, জীবনের গঠন সম্পূর্ণ করতে তার আলো-অন্ধকার রূপ আপন সহদরার মতই ফুটিয়ে তুলতে চান রবীন্দ্রনাথ। নায়িকা করুণার ক্ষেত্রটি তাই সামাজিক কালের নিয়ন্ত্রণে অন্ধকার দ্বারা খণ্ডিত হলেও তার

ভাল লাগার প্রবণতা মিশে থাকে আলোকদীপ্ত পাখি-কাঠবিড়ালীর মুক্ত জীবনে। যেখানে নরেন্দ্র তার বিপুল প্রসারিত ক্ষেত্রকে, অর্থাৎ সামাজিক স্বাধীনতা ও করুণার মধ্য দিয়ে মানবিক সান্নিধ্য পেয়েও কলকাতায় এসে বৃহত্তর কর্মকাণ্ডে উদ্দীপ্ত হবার বদলে ইয়ার বন্ধুদের সংসর্গে অন্ধকার পথকেই খুঁজে নেয় তার বিনোদনের স্থূল স্বার্থে। আবার অন্য আরেকটি দিকে মহেন্দ্রর ক্ষেত্রে পারিবারিক প্রতিপত্তিকে যেখানে পিতার আদেশ ও ইচ্ছানুসারে পিতারই মনোনীত পাত্রীকে বিবাহ করতে হয়, সেখানে তার স্বাভাবিক উজ্জীবিত পথে সাময়িক প্রতিবন্ধকতা দেখা দিলেও অন্ধকারে চিরদিনের মত সে হারিয়ে যায় না। এমনকি নরেন্দ্রের দলের স্পর্শ ও আশ্রয় লাভ করেও তার চরিত্র-বিনষ্টি ঘটে না। অতএব একটি কাহিনীতেই লেখক দেখান, নরেন্দ্রের দল যেখানে স্বভাবগতভাবে সম্পদ লুন্ঠনের আত্মকেন্দ্রিক রাজ্যে বসবাসকারী, মহেন্দ্রের প্রবেশ সেখানে পরিস্থিতিজাত, চারিত্রিক দাবিতে নয়। তাই নরেন্দ্রের দলের সঙ্গে মিশে অবনতির স্তরে ক্রমশ নেমে যেতে থাকলেও মানসিক যন্ত্রণা সে বোধ করে এবং এক সময় সেই যন্ত্রণা দিয়েই বোঝে তার জীবনের লক্ষ্য অন্য।

করুণাকে নিয়ে গল্পের যে মূল প্রবাহস্রোত ভূমিকায় তাৎপর্যরূপে আভাসিত হয়ে পরবর্তীতে বিকশিত, সেখানে সেই বিকাশের ক্ষেত্রে একা করুণাকে ছেড়ে দিলে হয়তো মেলাতে পারতেন না রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্পর্ক গঠনের বাসনাটিকে। তাছাড়া উনবিংশ শতকে নারীর মর্যাদা ও সম্মান প্রদানে পুরুষদের যে ভূমিকার একটি সদর্থক দিক ছিল, তার স্বীকৃতিও ছিল অনিবার্য। ফলে, মূল স্রোতকে প্রবহমান রাখতেই তাতে মহেন্দ্রের মত সম্ভাবনাময় চরিত্র এসে যুক্ত হয়। করুণার সঙ্গে তার সংযোগ ঘটার কোনো কারণ নেই, তবু প্রসারিত সময়ের মাত্রাকে দিয়ে নূতন নূতন ক্ষেত্র সাজিয়ে নিতে পারে বলেই নরেন্দ্র-করুণা পর্বের সঙ্গে মহেন্দ্র জড়িয়ে যায় অসহায় করুণাকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করে আশ্রয় দেবার মধ্যে। হয়তো সে কারণেই সমালোচক যথার্থই বলেন—

"নরেন্দ্র ও মহেন্দ্র - 'করুণা'র এই দুই প্রধান পুরুষ চরিত্রের মধ্যে নরেন্দ্র নামত নায়ক হলেও সে বঙ্কিমী বর্ত্মের যাত্রী, কিন্তু মহেন্দ্রের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর আগামী নায়কের ভ্রূণ-রূপটিকে আবিষ্কার করেছেন, কেননা, আমরা দেখবো যে, যে বিশেষ অর্থে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক যুগোপযোগী নায়কের স্রষ্টা ও যে পথে তাঁর উত্তরকালের বাঙালি নায়কেরা পরিক্রমা করেছেন, অস্পষ্ট হলেও 'করুণা'র মহেন্দ্রই তার অগ্রপথিক।"[৪০]

পাশাপাশি তাই করুণা-নরেন্দ্র পর্ব অসম্পূর্ণ হয়ে উঠলেও রজনী-মহেন্দ্র পর্ব

পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠতে পারে। আর লেখক এই পূর্ণাঙ্গকে দেখিয়েই প্রমাণ করেন, করুণা চরিত্রের আপাত অসমাপ্ত কাহিনী সার্থক হয়ে না উঠলেও বারবারই তা সফলতার পথে এগিয়ে যাবার প্রচেষ্টা চালাবে। নরেন্দ্রের মত চোরাবালির গর্ভে তলিয়ে গিয়ে অবরুদ্ধ হবে না জীবন। রবীন্দ্রনাথ এ সত্যকে বোঝাতে চান বলেই করুণার সহ্য শক্তি দিয়ে তার শেষ সীমাটুকু দেখান; তারপর সীমাটুকু পেরিয়ে প্রতিমা সৃষ্টিতে বিরোধী শক্তিকে গড়েন একদিকে তার মধ্যে লুকিয়ে থাকা অনির্বাপিত শুভশক্তির অঙ্কুরকে প্রথিত ও পরিচর্যা করে, অন্যদিকে সেই বিরোধী শক্তির কঠিন আবরণের সীমবদ্ধতায়। রবীন্দ্রনাথ হয়তো পরবর্তীতে সময়ের আলো-অন্ধকার দুটোকেই কাহিনীর চরিত্রের উপর ফেলে ফেলে ব্যক্তির আত্ম-অন্বেষণ ঘটান, ব্যক্তিকেই তার রূপক রূপে জড়িয়ে নেন না। হয়তো এই দৃষ্টিতে দেখলে 'করুণা'র নরেন্দ্রের মধ্যে তার পরিবেশগত অন্ধকার বৃত্তটিকে অধঃপতনের কারণ হিসেবে দাঁড় করানো যায় এই বলে - সে ছিল পিতৃমাতৃহীন। করুণার পিতা অনুপকুমার তাকে পালন করেছেন এবং সেক্ষেত্রে অনাথ অবস্থা হতে হঠাৎ বৈভবের সংস্পর্শে তার চরিত্রহীনতার প্রবণতা মূলগতভাবে ওঠে আসে। কিন্তু উপন্যাসে তার খুব বিশ্বস্ত রূপায়ণ নেই, বা সেক্ষেত্রে নরেন্দ্র চরিত্রটির পশ্চাদ্‌পট অঙ্কনে যে কিছুটা সময়-বিবরণ প্রয়োজন, লেখক তাও গ্রহণ করেননি। এর থেকে মনে হয় প্রথম থেকেই সময়ের অন্ধকার ছবিটি নরেন্দ্রের উপর চাপান হয় বিত্তহীন অবস্থান থেকে বিত্তপ্রাপ্তির অনায়াস সংযোগের কারণেই।

আমাদের দেশের ইতিহাসে দেখা যায়, সম্পদ রক্ষার্থে নিঃসন্তান জমিদার অনেক সময় পোষ্য গ্রহণ করেন। যাদের অনেকেই পিতৃস্নেহের ভাগীদারের চাইতে সম্পদ রক্ষক এবং উত্তরাধিকারীর তিলক পড়েই সময়ের গুরুত্ব অর্জন করে বেশি; স্বভাবতই এমন নিদর্শন নিশ্চয়ই অপ্রতুল নয়, অনায়াসলভ্য বিত্তই তাকে মসৃণভাবে অন্ধকারে নিম্নমুখী করে। নরেন্দ্রকেও হয়তো কিছুটা এভাবে দাঁড় করানো যায়, যদিও সেক্ষেত্রে তার প্রতি অনুপকুমারের স্নেহের কোনও অভাব আছে বলে বোধ হয় না। অবশ্য তাঁর আন্তরিকতার টানের মূলে একমাত্র সন্তান করুণাকে তার সঙ্গে বিবাহ দিয়ে তাকে ঘরজামাই হিসেবে রেখে নিজের নিঃসঙ্গতা ঘোচানোর উদ্দেশ্যও কার্যকর হতে পারে। তবে এক্ষেত্রেও নরেন্দ্রের পরিবেশটুকু গঠন করতে অতীত পটের যতটা উন্মোচন ও ব্যাখ্যা প্রয়োজন, রবীন্দ্রনাথ তা করেন না। আর এই অপূর্ণতার পথ ধরেই হয়তো নবীন লেখকের নৈতিক শিক্ষা ঘটে।

'করুণা' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ একটি গল্পই বলতে চান। আর ভূমিকার দ্রুত বর্ণনার প্রাক্‌কথন সেরে তিনি বর্তমানটি ধরেন। কিন্তু গল্পটি নির্মাণ করতে গিয়ে

তিনি অনুভব করেন, অনিবার্য গতিতে তাতে মিশে যাচ্ছে দু'টো উপকাহিনী। অবশ্য কাহিনীটি শেষ হলে সেগুলো আর বাইরে থেকে মিশ্রিত উপকাহিনী বলে মনে হয় না, মূল কাহিনী থেকে বেরিয়ে আসা শাখা কাহিনী হয়ে ওঠে— একটি উদ্ভিন্ন বৃক্ষ থেকে যেন গজিয়ে ওঠা প্রয়োজনীয় দুই বাহু। মূল কাহিনী ঃ করুণা-নরেন্দ্র পর্ব, আর তাকে স্পর্শ করে একদিকে রজনী-মোহিনী-মহেন্দ্র বৃত্ত, অন্যদিকে কাত্যায়নী-রঘুনাথ-সার্বভৌম বৃত্ত। করুণার জীবনের ট্র্যাজেডিকে ধরেই এই দুই বৃত্তের আবির্ভাব অপরিহার্য। কেননা, ইতিপূর্বে দেখি মহেন্দ্র-বৃত্ত থেকে মহেন্দ্রের আবির্ভাবই করুণার একটি আশ্রয় ও বেঁচে থাকার স্থান তৈরী হয়। অন্যদিকে মহেন্দ্র-রজনীর জীবন-ট্র্যাজেডি নিয়েও পাশাপাশি একই সময়সীমায় করুণার ট্র্যাজেডির পরিমাণ তুলনামূলক ভাবে বিচার হয়। এছাড়া যেখানে সার্বভৌম মহাশয় নরেন্দ্রের সঙ্গে করুণার বিবাহ দিয়ে সুদূর প্রসারী সময়কে করেন আলোড়িত, তাতে প্রয়োজন হয়ে পড়ে সার্বভৌমের ব্যক্তি উন্মোচন। যার সূত্রে কাত্যায়নী-রঘুনাথ-সার্বভৌম বৃত্তের অবতারণা। তবে এই বৃত্তে খুঁটিনাটি বর্ণনায় বিবাহযাত্রা ও বিবাহবাসরের যে অতিরিক্ত মাত্রা যুক্ত, অনেকাংশে মূল গল্পের পক্ষে অতিকথন হলেও এদের প্রশমিত করে লেখকের লক্ষ্যবস্তুটি যদি খুঁজে নিতে হয়, তবে বলা দরকার— কোনো পুঁথির পাতায় বন্দি সময়কে ধরে জীবনের মূল্যায়ণ হতে পারে না। কারণ, জীবনের আন্দোলিত খণ্ডকালকে যেখানে সামাজিক ইতিহাস ধরে রাখে, পুঁথির পাতা তার একটি মাধ্যমরূপে লক্ষ্য হতে পারে মাত্র। কিন্তু সেই পুঁথির পাতা ধরেই উল্টোদিকে জগতকে যদি পর্যটন করা চলে, তবে তা যেমন হাস্যস্পদ হয়, সর্বনাশেরও কারণ ঘটে। টোলের পণ্ডিত রঘুনাথ সার্বভৌম তাই তাঁর বাস্তব সময়ের অজ্ঞতা থেকে বার বার সমালোচিত এবং বিপর্যস্ত হন বিবাহবাসরে। সময়কে স্বচ্ছভাবে নিজের চোখ দিয়ে দেখেন না বলেই তিনি নির্ভর করেন এবং স্বাভাবিকভাবেই সেই নির্ভরের আধারটি সকল সময় যে বিশ্বস্ত হয় না, নিধি তার উপযুক্ত দৃষ্টান্ত। জীবনের নানা ঘটনায় সাবভৌমের বিচারশক্তির বিভ্রম বারবারই প্রমাণিত হয়। তাই নরেন্দ্রর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েও তার দোষ চোখে পড়ে না, স্ত্রী কাত্যায়নীকেও তিনি পারেন না ধরে রাখতে। বড় কথা, করুণার সঙ্গে নরেন্দ্রের তিনিই বিবাহবন্ধনে জুড়ে দেন— উপন্যাসে যা ব্যক্তিগত বিড়ম্বনার স্তর থেকে অপরতার স্তরেও বিড়ম্বনার সংকেতকে বহন করে নিয়ে আসে। অবশ্য কোনো ক্ষেত্রেই সার্বভৌম মহাশয় জ্ঞানতঃ কোনো অমঙ্গল ডেকে আনেন না। বরং তাঁর মনের মধ্যে যে একটি কোমল হৃদয় মানুষ বাস করে - সমস্ত তুচ্ছতার উর্ধ্বে যা বিরাজমান— লেখক তার আভাস রাখেন। কাজেই উপন্যাসের সূচনায় যেখানে তিনি করুণাকে নরেন্দ্রের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে

বাঁধেন, উপন্যাসের শেষে ষড়বিংশ পরিচ্ছেদে নরেন্দ্রের অত্যাচারের হাত থেকে করুণাকে তিনিই ছাড়িয়ে নিয়ে আসেন।

মূল কাহিনীতে নায়িকার বিবাহজীবন সুখের নয়। অতএব সময়ের ধারাস্রোতে যেখানে প্রথম থেকেই সম্ভাবনাহীন জগত, সেখানে সেই সময় প্রবাহ ধরেই তার চিত্রটি একটু একটু করে তৈরি করা যায় - কিভাবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, সে মলিন কৃশ হয়ে ওঠে।

পাশাপাশি রজনী-মহেন্দ্র বৃত্তের বিচ্ছেদের গ্লানি আরেকটি ভিন্ন অবতলে জীবনের শূন্যতা দেখায়। যার ফলে উপন্যাসটি বহুমাত্রায় যুক্ত হবার শক্তি রাখে।

করুণা সম্ভাবনাময় চরিত্র, মহেন্দ্রও তাই; কিন্তু দু'জন দু'রকমভাবে বর্তমান থেকে আঘাত পায় বলেই সেই লক্ষণ অনুসারেই তাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়াকে সময়ের ও অন্তর্জগত দিয়ে তুলে ধরা হয়। কাজেই যে আঘাত করুণার জীবনে অপগণ্ড নরেন্দ্রের দ্বারা দেখা দেয়, সেখানে মহেন্দ্রর ব্যাপারটি নির্দিষ্ট হয় রজনীকে ধরে ব্যক্তি অরুচির প্রশ্নে। যদিও উভয় ক্ষেত্রেই গোটা বিষয়টি রুচির প্রসঙ্গের সঙ্গে জড়িত, তবু করুণা যেখানে প্রথম থেকে আপোস করতে উৎসুক তার ছোট স্বপ্নটিকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে; সেখানে মহেন্দ্র তার ব্যক্তি অভিমান দ্বারা সূচনা থেকেই বিচ্ছেদ রচনা করে। অন্যদিকে তাদের বিপরীত রুচি-অরুচির প্রশ্নে যে চরিত্রগুলো দাঁড়িয়ে, তাতে মহেন্দ্রের বিপরীতে আছে রজনী। যে রূপবতী নয়, কিন্তু প্রাণবন্ত। আর করুণার বিপরীতে আছে নরেন্দ্র, কলঙ্ক আর পাহাড় পরিমাণ অযোগ্যতা নিয়ে যার বিকাশ। অতএব প্রবহমান সময়ের একই আধারে পুরুষের দিকদিয়ে যেখানে শূন্যকাল দেখা দেয়, সেখানে ব্যক্তিগত গ্রহণ সমস্যাই আপাততঃ বাধাস্বরূপ হয়, অথচ সকল ভালোবাসা উজাড় করেও বোধশক্তি রোহিত সত্তার সঙ্গে নারী কখনোই সংযোগ ঘটাতে পারে না। তাই উপন্যাসে দু'টোর উপসংহার ভিন্ন। যাদের রেখা চিত্রের আকারে এভাবে সাজিয়ে নেওয়া যায়—

ক) করুণা-নরেন্দ্র পর্ব ঃ
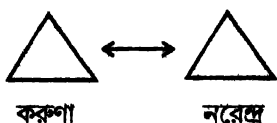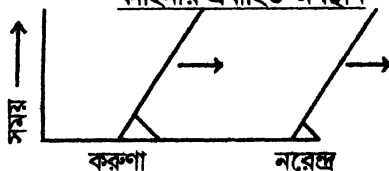
খ) রজনী-মহেন্দ্র পর্ব ঃ
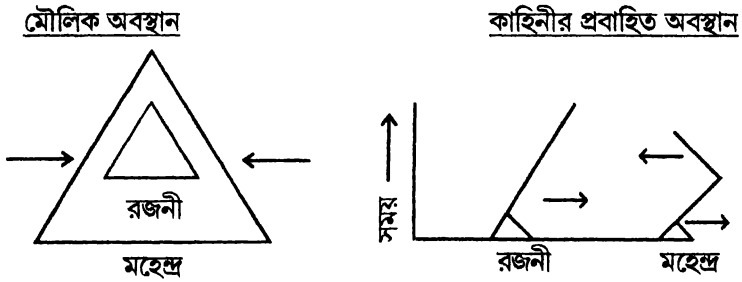
কিন্তু মনে প্রশ্ন জাগে রবীন্দ্রনাথ এখানে নারী ও পুরুষ, অপ্রাপ্তি ও প্রাপ্তির সীমারেখা দিয়ে শুধু একটিমাত্র ছবিই কি আঁকছেন! এ প্রসঙ্গে পুরুষশাসিত সমাজে নারীর নিষ্করুণ অবস্থান দেখিয়ে কেবলমাত্র একটি উদ্দেশ্যের সংকীর্ণ সীমানা অঙ্কিত হতে পারে না। বরং ঐতিহাসিক কালের নিরিখে নারী-পুরুষের একটি সাধারণ অবস্থান দেখিয়ে বক্তব্যের বেদিমূল রচিত হয়। বক্তব্যের অনুসন্ধান তাঁর স্বতন্ত্র বলেই মনে হয়। একজন সাহিত্য গবেষক অন্যপ্রসঙ্গে এ বিষয়ে আলোকপাত করেন—

"বিশাল ও সমৃদ্ধ রবীন্দ্রসাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর নারীমুক্তির ভাবনা একটি দিক মাত্র। এই প্রশ্নটি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ ব্যাপৃত ছিলেন না, প্রসঙ্গত ব্যাপৃত ছিলেন শুধু। তাঁর চিন্তায় ও সৃষ্টিতে তাই নারীমুক্তির ভাবনা অনেক সময়েই কোনো পরিষ্কার সামগ্রিক রূপ নেয় না, বারবার উপস্থিত হলেও তা আসে খণ্ডিতভাবে, আসে অন্য ভাবনার স্রোতে ভেসে।"[৪১]

অতএব এ নিয়ে মহেন্দ্রকে পুরুষ ও করুণাকে নারীরূপে বিভাজনটা প্রধান কথা নয়। বরং দুটো মানুষের দুটো শাখা যে বিড়ম্বনার মুখোমুখি, তাতে একদিকে সময়ের সংক্ষিপ্ত প্রবাহ ধরে মিলন সম্পূর্ণ করে তোলা - মহেন্দ্র বনাম রজনী ; অন্যদিকে বিচ্ছেদ— করুণা বনাম নরেন্দ্র। অথচ সময়ের বৃহত্তর প্রবাহে খণ্ডিত মিলন-বিচ্ছেদকে লুপ্ত করে সকল দিকে পরিপূর্ণতা দিয়ে প্রস্তুত করে তোলাই হয় এর স্বভাবগত জীবনের কামনা। 'করুণা' উপন্যাসে এককভাবে তার উত্তর নেই, উত্তর আছে 'রাজর্ষি'তে উপনীত হয়ে। কেননা, ছোট সময় অতিক্রান্তিতে কোথাও মিলন, কোথাও বিচ্ছেদ প্রদর্শিত হয়ে, তারপর তার নানা কোলাহল একটিমাত্র সত্যে গিয়েই যে মিলিত হয়। অথচ ঐ একটি সত্যও বৈচিত্রহীন থাকে, যদি না তার অন্তরজগতে নানা যোগ-বিয়োগের প্রসার-প্রতিপত্তি-সংকোচন স্তব্ধ হয়ে পড়ে।

অতএব সাহিত্য তথা উপন্যাসকে একটি মাত্র ঘটনা, একটি মাত্র সংগঠন দ্বারা চিহ্নিত করে তার উপযুক্ত বিচার হয না। একজন সমালোচক খুব গুরুত্বের সঙ্গেই তাই সাহিত্যের মৌলধর্মকে নির্দেশ করতে গিয়ে যে কথাটি বলেন, তা প্রাসঙ্গিক বিচারে হয়তো যুক্ত করা যায়—

"Literature does not only show its content in terms of the conflicts inherent in organising a group and its particular activity It also conveys the sense of power to achieve organisation and to use its energy'. [৪২]

আমরা দেখি কোনো কোনো উপন্যাসের নারী চবিত্ররা বরাবরই বিশেষ কিছু সংকেত গর্ভ ভাবনাকে প্রস্তুত করে রাখে, যেখানে নারীর আইডেনটিটির ব্যবহার ঘটিয়ে তার বিশ্লেষণ ও উপস্থাপনা ছাড়া লেখক পূর্ণ অভিব্যক্তির রূপ দান করতে পারেন না। সেক্ষেত্রে বিশেষত সময়ের বিভঙ্গকে যথার্থ শিল্পের আঙ্গিকে নানা মাত্রায় দেখাতে নারীর আবির্ভাব শুধু প্রয়োজনীয় নয়, অবধারিতও বটে। লক্ষ্য করতে হয়, রবীন্দ্রনাথের 'করুণা' একমাত্র উপন্যাস, যার নামকরণ সরাসরি নায়িকার নামানুসারেই আসে। যদিও প্রশ্ন ওঠতে পারে, সংস্করণের ছোঁয়া পেলে এ নামকরণ পাল্টে যেতেও পারতো। যেমনটা ঘটে 'শেষের কবিতা'র ক্ষেত্রে তার পূর্বতন 'মিতা' নাম পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে।[৪৩] যদিও এ ব্যাপারেও কোনো নায়িকার নাম সরাসরিভাবে আসে না, কিংবা এক্ষেত্রে নামবদলের সম্ভাবনা থাকলেও যা ঘটে না, তার সম্পর্কে অন্য আলোচনা আপাতত স্থগিত রেখে একথা নিশ্চয়ই বলা যায় করুণা চরিত্রই উপন্যাসটির মূল লক্ষ্য— প্রথম থেকে শেষ। কিন্তু করুণাকে সময় দিয়ে ধরতে তাকে ঘিরে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ সহযোগী যে অন্যান্য তিনটি নারী চরিত্রের সমাবেশ হয়, তাদের প্রত্যেকেরই বিশেষ বিশেষ ভূমিকার আলোচনা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে দেখা যায় এরা প্রত্যেকেই করুণার কেবল বর্তমান সহযোগী নয়, বরং করুণার সমস্যাটিকে সময়ের বৃহত্তর পরিধিতে তুলে ধরার মানসে তার ভিন্ন ভিন্ন মাত্রাবোধ। যার যোগ্য সংমিশ্রণে 'করুণা' উপন্যাসকে ছাড়িয়ে লেখকের অবিচ্ছিন্ন মানসিকতার প্রসারণ অবারিত। তাই মোহিনী বঙ্কিমের রোহিনী কিংবা কুন্দের মতই বিধবা, অথচ তার মনের বিবাহিত জীবনের আসক্তি কোনো সমালোচনার দ্বারা বিদ্ধ নয়, বরং নীরব প্রবৃত্তিতে নির্দিষ্ট হয়ে ওঠার সুযোগ পায় এবং সমবেদনাও জাগায়। মানবিক দৃষ্টিতে তার কান্নাকে কান পেতে শুনে নিতে হয়। রজনীর ক্ষেত্রে তার সীমাহীন জিজ্ঞাসা স্বাভাবিকতাকে অতিক্রম না করে যন্ত্রণায় দীর্ণ হয়। আবার মনোরম ক্ষেত্রটি প্রস্তুত বলেই নিবেদিত প্রাণ দিয়েই মহেন্দ্রকে সে সার্থক করে তোলে। অন্যদিকে কাত্যায়নী তার চরিত্রের মৌল প্রকৃতি নিয়ে ব্যতিক্রমিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে সময়ের কাছে মানবিক চাহিদার পূর্ণ রূপায়ণ ঘটায়।

রবীন্দ্রনাথ কোনো ক্ষেত্রেই তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর নন, বরং উল্টোদিক দিয়ে তাদের প্রতিষ্ঠা ঘটান। কিন্তু লেখকের বক্তব্য এখানেই শেষ নয়, আসলে এদের প্রত্যেকের সময়ের কাছে সফলতা এবং বিফলতার পর্যায়গুলি এক এক করে তিনি করুণার মধ্যে সংগ্রহ করে তোলেন—

১) মোহিনীর মতন অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে।
২) রজনীর মতন সেই আকাঙ্ক্ষার ক্ষেত্রটিকে উর্বরা করে।
৩) কাত্যায়িনীর মতন সাহস সঞ্চয়ে অনুর্বর বর্তমান থেকে বেরিয়ে পড়ার প্রবণতায়।

করুণা চরিত্রে প্রত্যক্ষভাবে এই স্তরগুলো দেখানো কঠিন বলেই লেখক মানসিক সময়ের ক্রমউন্মোচনের চিত্রটি আলাদা তিনটি চরিত্রে ভাগ করে দেন। অবশ্য এক্ষেত্রে কাত্যায়নী উপন্যাসে যে ঘটনার সৃষ্টি করে এবং একটি নূতন কাল-মানসিকতার আলো দেখায়, তাতে করুণার সঙ্গে তার কোনোভাবে সংযুক্তি আপাতভাবে আপত্তিকর হতে পারে। অতএব তার একটি ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

দেখা যায় বাস্তব অর্থে পরপুরুষের হাত ধরে স্বামী-গৃহ থেকে করুণা বেরিয়ে আসে না। সেক্ষেত্রে কাত্যায়নী যা করে, তার চরিত্রের মৌল লক্ষণের সঙ্গে করুণাকে কোনোভাবেই মিলিয়ে নেওয়া যায় না। কিন্তু কাত্যায়নীর প্রসঙ্গটি উপন্যাসের সময়মাত্রার এক গভীর ইঙ্গিতবাহী। তার কারণ, একজন পরিপূর্ণ নারী হিসেবে সে তার অন্তরে যে বর্তমানকে লালন করে, বয়োবৃদ্ধ সার্বভৌমের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী হয়ে সেই বর্তমানের অস্তিত্ব হয় বিঘ্নিত স্বাভাবিক ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার অভাবেই। অতএব একটি রঙিন বর্তমানকে টিকিয়ে রাখার জন্যই গদাধরকে নিয়ে ছুঁয়ে থাকা বাহ্যিক বর্তমানকে ছেড়ে অন্য একটি বর্তমানে আশ্রয় খোঁজা। সেক্ষেত্রে সামাজিক নিয়ম অচল। কেননা সমাজ কাত্যায়নীকে আবদ্ধই করতে চায়। সামাজিক কাল যে মানবিক কালকে পোষকতার বদলে প্রতিবন্ধকতা ঘটায়, কাত্যায়নী তাকে স্বীকার করে না। করুণার জীবনের দিকে তাকালে সেখানেও তো সেই সামাজিক আধিপত্য কার্যকরী। মানুষ হিসেবে সেও তো জীবনে একটি বর্তমান কামনা করে। অথচ তার পরিচয় পর্যালোচনা করে দেখা যায়, সেখানে হয়তো সে নরেন্দ্রর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী নয়, কিংবা বয়সের পার্থক্যও তাদের বিপুল নয়। তবু স্বামী-সংস্পর্শে কতটুকুই বা সে ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা লাভ করে। অবশ্য সেক্ষেত্রে কাত্যায়নীর মতন হয়তো বাহ্যিক বর্তমানকে করুণা ছুঁড়ে ফেলতে পারে না ঠিকই, কিন্তু অন্তিম পর্বে সে অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয় নরেন্দ্রের মধ্য থেকে আরেক নরেন্দ্রকে খুঁজে নিতে। দীর্ঘদিনের সাধ্বী অভিধায় ভূষিত সংস্কারকে কাত্যায়নী, দামিনীদের মতন সোচ্চার

ভাবে সরিয়ে রাখার ক্ষমতা সকলের নেই। কিন্তু পতিই পরম দেবতা, এই আখ্যা দ্বারা কুলাঙ্গার চরিত্রহীন পুরুষ দৈবক্রমে সামাজিক প্রয়াসে একটি নারীর জীবনে আবির্ভূত হলেই যে অবিরত নির্মাণ হয়ে ওঠা যুগের বাতাস পেয়ে শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারে না— লেখকরাই তার প্রথম সূত্রটি ধরিয়ে দেন। অতএব সামাজিক শাসনে একটি যুগের হাতে অসুস্থ হয়ে ওঠা মানবমন নীড় সন্ধানী হয়—'আজ করুণা একবার নরেন্দ্রকে ডাকিয়া আনিবার জন্য মহেন্দ্রকে অনুরোধ করিল'।[৪৪] পুনরায় খুঁজে নিতে থাকে তার সত্তার শেষ অস্তিত্ব—''করুণা' কম্পিত হস্তে নরেন্দ্রের হাত ধরিল',[৪৫] কিন্তু তারপরও প্রতিক্রিয়াহীন বন্ধ্যারূপ অবলোকনে তার নীরব হয়ে পড়া যেন প্রনিধানগত সাদৃশ্যে প্রমাণ করে, কাত্যায়নীর মতই তার চিরদিনের বর্তমানকে সে খুঁজে চলে। এইজন্যই 'করুণা' উপন্যাসের উপসংহারে এসেও রবীন্দ্রনাথ কোনো প্রত্যক্ষ মৃত্যুর নির্দেশ দেন না। বরং করুণার পীড়াকে বৃহত্তর করে একটি যুগমানস আর একটি যুগমানবের অস্তিত্বকে দাঁড় করান নির্মাণের পথে। 'বউঠাকুরাণীর হাটে'ও সেই নির্মাণ সম্পূর্ণ নয়, অপেক্ষা করতে হয় 'রাজর্ষি' পর্যন্ত।

একজন তত্ত্ববিদ ব্যক্তিত্বের প্রকাশ প্রসঙ্গে আলোচনায় উল্লেখ করেন—

"Concern with personality manifest itself in many ways, two of which are especially important. The first is a desire to create a favorable first impression on others, and the second is a desire to judge accurately the personalities of others."[৪৬]

কথাগুলো অপূর্বভাবে হয়তো একজন ঔপন্যাসিকের ব্যক্তিত্ব-সৃজনমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়। কেননা লেখকের যা বক্তব্য তাকে তিনি অভিজ্ঞতার ছোট ছোট সময়ের পটেই ধরেন এবং যে নিটোল ছবি তাঁর উপন্যাস-রাজ্যে গড়ে ওঠে; তাকে তৈরি করে তুলতে অবাধে সেখানে নিজেকে প্রবেশ করাতে সংকোচ বোধ করেন না। বরং উপন্যাসের নানান ঘটনার মাঝখানে লেখক ধরিয়ে দিতে চান অপরতার সঙ্গে সত্তার অস্তিত্বকে। অন্যদিকে ঔপন্যাসিক কেবলমাত্র যদি এখানেই বাঁধা পড়েন তবে তাঁর সাময়িক অভিনন্দন কোনোক্রমে জুটে গেলেও দূরতম ভবিষ্যৎ তাঁকে কখনও ক্ষমা করে না। কাজেই লেখক এ জায়গাতেই একটি কালের পটে নিজেকে আগে গড়ে তারপর তাঁর সৃষ্টি দিয়ে সাবালক করে তোলেন ভাবীকাল। তখন তাঁর দায়িত্ব ব্যাপক হয়ে ওঠে শুধুমাত্র নিজের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে অপরের ভাবমূর্তির আলোকে সাজিয়ে নিয়ে নয়, তাকে বিচারের আলো দ্বারা অপরকে যাচাই করার কাজেও।

রবীন্দ্রনাথের 'করুণা' আলোচনায় দেখা গেছে বঙ্কিমের অমোঘ শক্তিকে অবধারিত জেনে তাঁকে এড়িয়ে যাবার প্রচেষ্টা যেমন করেন না লেখক, আবার বন্যার প্রবল তাড়নায় নিজেকে অসহায়ের মত তাতে সমর্পনও করেন না। আর তারই ফলে নিজের শক্তিতেই স্রোতকে সময়ের সাহচর্যে ধীরে ধীরে প্রতিহত করে তার গতি পাল্টান। অতএব বলা যায় ভবিষ্যতের ব্যক্তিত্বকে যাচাই করার কাজে উপন্যাসের বহুমাত্রিক স্বরের এই সূচনাপর্ব রবীন্দ্রনাথে ওঠে আসে 'করুণা'র বিবৃত উপস্থাপনায়। সময়ই যেন এক এক করে তাঁর আত্মপ্রতিকৃতি অঙ্কনের স্বরূপকে আবিষ্কার করে চলে।

রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় উপন্যাস 'বউঠাকুরাণীর হাট' প্রসঙ্গে এ যাবৎ যে সকল আলোচনা হয়, তাতে এই প্রবণতার অনুক্রম ধরে গভীর অন্বেষণ নেই। যে কারণে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এর বাহ্যিক গুণ ধর্ম কিংবা কাঠামোগত নির্মাণ শিল্প নিয়ে পর্যালোচনা সীমিত। আর সেক্ষেত্রে 'করুণা'র মতই এরও বিরূপ সমালোচনা হয় পরিণত রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনা দিয়ে। যার পরিণাম স্বরূপ উপন্যাসটির বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মূল্যাঙ্কন ঘটে একটি উপন্যাসের মর্যাদায় নয়, ফ্ল্যাট্ প্রতিবেদন রূপে।

এক্ষেত্রে আলোচনার শুরুতে যে কথাগুলো প্রথমেই গ্রহণ করা যায়, তাতে উপন্যাসটিকে অনেকগুলো খণ্ডকালের ছবির সমাহার রূপেই মনে করা উচিৎ। সমালোচক ভূদেব চৌধুরীও তাঁর আলোচনার একটি জায়গায় অন্যভাবে উল্লেখ করেন— ''বউঠাকুরাণীর হাট' আসলে এক গুচ্ছ উজ্জ্বল চরিত্রের মালা।'[৪৭] কিন্তু এখানেও প্রশ্ন ওঠে, এ কথাগুলো কি উপন্যাস মাত্রেই সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়! কেননা, তীক্ষ্ণ বিচারে বলতেই হয়, উপন্যাস প্রকরণ তো টুকরো ছবির ভিড় দিয়ে গড়া একটি সৃষ্টি। কিন্তু এখানে আসলে যোগ্য সম্পাদনাই তার জীবিত হয়ে ওঠার মূল চাবিকাঠি। লেখক যাকে ধরে রাখেন এবং পাঠককে তা বুঝে ওঠার সুযোগ দেন না— বরং দীর্ঘ প্রসারিত কালের নানা ছবিকে এক নিঃশ্বাসে হাজির করেন। এ প্রসঙ্গে 'বউঠাকুরাণীর হাটে'র মৌলিক যে আলোচনা হয়, তাতে তার এই যোগ্য সম্পাদনার অভাবকেই দায়ী করার অবকাশ থাকে। সম্ভবতঃ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার কাজে বিশেষ করে উপন্যাসটির সূচনায় রবীন্দ্রনাথের স্বযুক্তিকেই প্রধান অবলম্বনরূপে বেছে নেবার প্রয়াস থাকাটাও বিচিত্র নয়। কেননা রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টই বলেন—

''চরিত্রগুলির মধ্যে যেটুকু জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে সেটা পুতুলের ধর্ম ছাড়িয়ে উঠতে পারেনি। তারা আপন চরিত্র বলে অনিবার্য পরিণামে চালিত নয়, তারা সাজানো জিনিস একটা নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে।''[৪৮]

'করুণা' উপন্যাসেও হয়তো এই ঘটনাগত সমগ্রতা সম্পর্কে বিপত্তির প্রশ্ন তোলা যায়। কিন্তু আলোচনায় দেখি কোনো কোনো ক্ষেত্রে কাহিনীর শাখাপর্ব অযথা পরিসর বৃদ্ধি করলেও তাদের 'পরিণাম' যোগ্য একটি সংহতিতে ধরা পড়ে। 'বউঠাকুরাণীর হাটে' সেই বিপত্তির সীমানা সঙ্গত কারণেই বেশি। তার কারণ এখানে রবীন্দ্রনাথ শুধু তাঁর যুগাধারেই গল্পকে সীমিত রাখতে চান না, প্রসারিত করেন দূরতম অতীতে— তথ্য এবং কল্পনা নির্ভর ইতিহাসের পাতায়। অতএব নির্মাণের জন্য তথ্য সঞ্চয় এবং তার কোনো কোনো অংশের দ্বারা প্রাণিত হবার প্রয়াস সেক্ষেত্রে কাজ করে। রবীন্দ্রনাথ এখানে বিচরণ-ক্ষেত্র গড়েন উনবিংশ শতক, গ্রহণ করেন ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলার বারো ভূইঞার অন্যতম রাজা প্রতাপাদিত্যের কাহিনী।

রবীন্দ্রজীবনীকার প্রশান্ত কুমার পাল এ সম্পর্কে যে তথ্য প্রদান করেন, তাতে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর মূল প্রেরণাসূত্র পান পৌষ ১২৮৭ সংখ্যা ভারতীতে প্রকাশিত কৈলাস চন্দ্র সিংহের লেখা 'বাংলার দ্বাদশ ভৌমিকের ইতিহাস' নামক প্রবন্ধ থেকে।[৪৯] জীবনীকার উল্লেখ করেন—

"এই প্রবন্ধে প্রতাপাদিত্য ও রামচন্দ্র রায়ের সম্পর্ক এবং তার পরিণতি নিয়ে কিংবদন্তীমূলক একাধিক কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ তার মধ্যে যেটি সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক সেটি বেছে নিয়ে তাঁর কল্পনার জাল বুনেছেন; উদয়াদিত্য, বসন্তরায়, রামাই ভাঁড়, রামমোহন মাল প্রভৃতি ঔপন্যাসিক চরিত্র গুলির নাম ও তাদের প্রকৃতির পরিচয় সূত্রাকারে প্রবন্ধটিতেই আছে, বউ ঠাকুরানীর হাট নামটিও উক্ত প্রবন্ধ থেকে নেওয়া।"

স্বভাবতই ইতিহাসের পাতায় মুদ্রিত কয়েকটি খণ্ডকালকে লেখক সমকালীন জীবনের খণ্ডকালের সঙ্গে সংযুক্ত করতে চান এবং সে কারণেই উপন্যাসটিতে ইতিহাসের ষোড়শ শতকের গুরুত্ব পরিণামে অনেক জায়গায় হারিয়ে একটি আলাদা মাত্রায় ওঠে আসে। হয়তো 'করুণা' রচনার পর তাঁর এই সময় পর্যটন যুগের কাছে বঙ্কিমের আদর্শ মেনে নিজের ব্যক্তিত্বকে যাচাই করতে চাওয়া, আবার সেই ইতিহাস থেকেই এক আধুনিক সময় ধর্মকে সমস্যার রহস্য দিয়ে সাজিয়ে তাঁর ব্যক্তিত্বকেই প্রসারিত করা। প্রাথমিকভাবে এই উভয় কাজ করতে গিয়ে সময়ের এত বিস্তৃত পটে লেখক অনেক ঘটনা এবং সেই ঘটনাকে ধরে চরিত্র অঙ্কন করেন, যার কোনো কোনোটা যথেষ্ট যুক্তির উপর সংস্থাপিত নয়। যেমন উপাদানগত ভাবে অত্যন্ত সাধারণ এক পারিবারিক কলহ এর বিষয়বস্তু। যেখানে প্রদর্শিত হয় অত্যন্ত খামখেয়ালী এক শাসকের দ্বারা নিপীড়ত কিছু মানুষের ছবি। যে কারণে দূর অতীতে

স্থাপন করে কোনো কাহিনী রচনার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। তাছাড়া ইতিহাসের কাহিনী-সত্যও উপন্যাসে যথার্থ প্রকাশ পায় না। মূল ইতিহাসের কথাবস্তু থেকে প্রতাপদিত্য ও রামচন্দ্র চরিত্রকে উপন্যাসে অতিরিক্ত মসীবর্ণে চিত্রিত করা হয়। অতএব ইতিহাসে যেখানে রামচন্দ্রের সঙ্গে প্রতাপাদিত্য-কন্যা বিভার মিলনের নিদর্শনস্বরূপ 'বউঠাকুরানীর হাট' নামটি গ্রহণযোগ্য, উপন্যাসে তা ট্র্যাডেজির দ্বারা রূপান্তরিত। তাতে গল্পের জোড় মেলে না। [৫১] এছাড়াও উপন্যাসের গল্প হিসেবেও যে চরিত্রগুলি আপাতভাবে প্রাধান্য পায়, তাতে প্রতাপাদিত্য - বসন্ত রায়-উদয়াদিত্যরাই দাঁড়িয়ে থাকেন প্রথম সারিতে। অথচ উপন্যাসের নামকরণে যে ভবিষ্যৎকালটি (আজকের বর্তমান) তার ষোড়শ শতকের বর্তমানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, তাতে উল্লেখিত প্রথম সারির চরিত্রগুলো দিয়ে কোনো যোগ্য সমাধান মেলে না। হয়তো উপন্যাসটির সময়স্তরের বিন্যাসে নানা অসঙ্গতি এবং সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সূচনার স্বকৃত মন্তব্য সংযুক্ত করে সম্পর্ক-সন্ধানের নানাবিন্দু থেকে এ কারণেই এর মূল্য আবিষ্কারের চেষ্টা হয় না।

একথা প্রায় সব সমালোচকই নানান বয়ানে বলেন 'বউঠাকুরাণীর হাটে' ইতিহাসের ঘটনা কেবল একটি ছুঁতো মাত্র, কাহিনী একটি পারিবারিক জীবনের। বিবৃত ঘটনার তুলনামূলক বিচারে ক্রমান্বিত সময়ও খুবই সংক্ষিপ্ত— প্রধানত গ্রীষ্ম ও বর্ষা, এই দুই ঋতু। [৫২] তবু এই ক্রমান্বিত সময় দ্বারা যে সীমানা নির্দিষ্ট হয়, তাতে তার ক্ষেত্রকে অন্তঃসময়ের প্রসারণ দ্বারা পরিবর্ধিত করলে একটি সামাজিক পরিধিও নজরে পড়ে। পারিবারিক সময় পরিসর ছাড়িয়ে সামাজিক পরিসর গল্পে অদৃশ্য, তার কারণ প্রতাপাদিত্যের নিষ্ঠুর শাসন এবং একনায়কতন্ত্র তাকে কণ্ঠরোধ করে রাখে। রবীন্দ্রনাথ একথাগুলোই ইতিহাসের কাহিনীকে নিয়ে একদিকে সময়কে বিস্তার ঘটিয়ে কৌশলে প্রয়োগ করেন, (আয়ত্ব করে নেন অতীত দিয়ে নিজের শক্তিকে) অন্যদিকে তাকেই সমকালীন বর্তমানে পারিবারিক কাহিনী হতে রাজকাহিনীর সংযুক্তিতে ক্ষেত্রকে বৃহত্তর করে তোলেন। উপন্যাসের শুরুতে যুবরাজ উদয়াদিত্যের যে আক্ষেপ আমরা শুনি, তার বীজ একটি ভূঁইঞা পারিবারের পারিবারিক সমস্যার কেন্দ্রে লুকিয়ে থাকলেও আসলে বনস্পতিটি দাঁড়িয়ে থাকে বৃহত্তর সময়ের কাছে। কেননা উদয়াদিত্য তো একজন রাজ্যের সাধারণ প্রজা নন, তিনি যুবরাজ। আর যুবরাজের উপরই নির্ভর করে ভবিষ্যৎ গোটা দেশের সার্বিক প্রতিপত্তি। অথচ উদয়াদিত্য যে নিষ্ঠুর বর্তমানকে দেখেন, তাকে আরো প্রসারিত করতে ভবিষ্যৎ শাসকের মর্যাদা তিনি চান না। কিন্তু সেই সঙ্গে একটি শাসককূলে তাঁর জন্ম বলেই তাকে এড়িয়ে যেতেও পারেন না। অবধারিত ভাবে তাই তিনি

একদিকে পিতার ক্রোধের কারণ হন, অন্যদিকে স্ত্রী সুরমার মধ্য দিয়ে সান্ত্বনা বাক্যে খুঁজে বেড়ান মুক্ত আকাশের সন্ধান। 'মুক্তধারা' নাটকেও অভিজিৎ চরিত্রে এই উদয়াদিত্যের প্রকাশ ঘটে। কেননা সেখানে শিবতরাইয়ের সমাজিক জীবনের সফল প্রতিচ্ছবি অভিজিৎই নিয়ে আসে। এক্ষেত্রে উদয়াদিত্য আকাঙ্ক্ষার স্তরকে পেরিয়ে মুক্তি ঘটাতে পারেন না, মুক্তি ঘটাতে গিয়ে ক্রান্তিকালের ব্যথা অনুভব করেন।

উপন্যাসে ইতিহাসের কাল (ষোড়শ শতক) হয়তো তেমন গুরুত্ব পায় না, কিন্তু ইতিহাসের কালে অবস্থানরত রাজাদের রাজনৈতিক সম্মানবোধের অসি চালনায় যে আড়ালে আড়ালে অনেক ব্যক্তিজীবন বিনষ্ট হতে থাকে, তার খবর প্রচলিত ইতিহাস না দিলেও ঔপন্যাসিক দেন। অতএব অপ্রত্যক্ষ হলেও সেদিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসকে কাজে লাগান, একথাটিও আমাদের ভেবে দেখতে হয়। প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণিত উদয়াদিত্যের রাজ্যচালনায় যে প্রথাগত পারদর্শিতা নেই, তার পরিচয়কেও প্রতাপাদিত্যের প্রতাপের সময় দ্বারাই নির্দিষ্ট করে ধরা হয় স্বয়ং উদয়াদিত্যের সংলাপে—

"আমার যখন ষোলো বৎসর বয়স তখন মহারাজ কাজ শিখাইবার জন্য হোসেনখালি পরগণার ভার আমার হাতে সমর্পন করেন। ছয়মাসের মধ্যেই বিষম বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল। খাজনা কমিয়া গেল, প্রজারা আশীর্বাদ করিতে লাগিল। কর্মচারীরা আমার বিরুদ্ধে রাজার নিকটে অভিযোগ করিতে লাগিল। রাজসভার সকলেরই মত হইল, যুবরাজ প্রজাদের যখন অত প্রিয়পাত্র হইয়া পড়িয়াছেন তখনই বুঝা যাইতেছে উঁহার দ্বারা রাজ্য শাসন কখনো ঘটিতে পারিবে না।"[৫৩]

'বউঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাসে নানা চরিত্রের ভিড় আছে। অনেক চরিত্রের ক্ষেত্রে তার ঐতিহাসিক নাম উপন্যাসে স্বাভাবিকভাবে গৃহীত হলেও এর অন্তর্নিহিত গভীর ইঙ্গিতও রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে ধরা দেয়। যে সংঘাতকে এখানে দেখা যায়, তাতে দুই বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে থাকে দুই মানবগোষ্ঠী। একদিকে প্রতাপাদিত্যের প্রতাপ আর অহংকারের ঔদ্ধত্য (যেখানে চন্দ্রদ্বীপরাজ রামচন্দ্রকেও যুক্ত করা যায়), অন্যদিকে বসন্ত রায়ের উন্নত নির্মল প্রেমিক চিত্ত (যেখানে উদয়াদিত্য, বিভা, সুরমাও সংযুক্ত)। অতএব প্রতাপ আর বসন্ত— দুই বিপরীত শক্তি একইকালে প্রবহমান। কিন্তু কালের এই অবধারিত ইতিহাসকে রবীন্দ্রনাথ কখনোই চান না প্রকাশ্য করে তুলতে। তার কারণ জীবনের অহংকারী মন স্থূল প্রতিবেদনেই প্রকাশ্য, অন্যদিকে যে শুভশক্তি বিরাজমান; তার গতি সূক্ষ্ম, চলন

অদৃশ্য, প্রসার প্রচ্ছন্ন। তাই হয়তো অনেক ক্ষেত্রে রবীন্দ্রসাহিত্যে নঞর্থক মানসকালের পাত্রপাত্রীরা বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে আমাদের চোখে পড়ে, সদর্থক পথের যাত্রীরা সেক্ষেত্রে প্রতিভাত হয় শক্তিহীন রূপে। সেজন্যই 'রাজর্ষি' উপন্যাসে রঘুপতিকে আমাদের যতটা প্রথমদিকে চোখে পড়ে, গোবিন্দমাণিক্যকে ততটা নয়। 'ঘরে বাইরে'তে নিখিলেশের পাশে সন্দীপ কেবল আমাদের চোখেই বিভ্রম ছড়ায় না, কাহিনীর নায়িকাকেও পথভ্রষ্ট করে সর্বনাশের উপান্তে নিয়ে আসে। কিন্তু পরিণামে নঞর্থক চরিত্ররা গল্পে যে নানান বিশৃঙ্খলা জাগায়, তার সমস্ত টুকরো ছবির সামঞ্জস্য রক্ষা করে লুকিয়ে থাকা আপাত বর্ণহীন চরিত্ররাই। তার কারণ, সময় সচেতনশিল্পী লক্ষ্য করেন নঞর্থক কালের চলন যতই ক্ষিপ্র হোক, বৃহত্তর কালপরিধিতে তা তৎসাময়িক। কাজেই অধিপত্য দিয়ে গোটা যুগ এবং যুগের প্রজন্মকে কেউই শাসন করে যেতে পারেন না চিরকাল। ক্ষণকালের মধ্যেই যে তার কর্মকাণ্ড সীমায়িত তা হয়তো সেই ব্যক্তিই সবচেয়ে বেশি বোঝেন, কিন্তু অনুভব করেন না বলেই টিকে থাকার মানসে তার চমকটাকেই প্রতিপত্তি কিংবা শাসনের চোখ রাঙানো শক্তিতে দেখিয়ে দিতে চান। এ ব্যাপারে দুটো কারণ রয়েছে বলে মনে হয়—

(১) বৃহত্তর সময়ের কাছে এর আয়ু ক্ষণিক বলেই দ্রুততাই একমাত্র অন্যতম লক্ষণ।

(২) অস্তিত্ব প্রতি মুহূর্তে সংকটপূর্ণ থাকায় তাকে রক্ষার তাগিদে স্থূল অপপ্রয়াস।

অবশ্য এই রহস্যকে আবিষ্কারের পেছনে পাঠকের দৃষ্টিকোণেরও বৃহৎ ভূমিকা থাকে। যার কারণে একদিকে সূক্ষ্ম গৌণ হতে পারে, আবার মুখ্যরূপও পেতে পারে। কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়টি পরিশীলিত উন্নত চিন্তার অপেক্ষা রাখে, যা সময়কে যোগ্যভাবে কাজে লাগিয়ে বোধ করা সম্ভব।

রবীন্দ্রনাথ 'বউ ঠাকুরানীর হাটে' একদিকে প্রতাপাদিত্য, অন্যদিকে বসন্তরায়কে যেভাবে চিত্রিত করেন তাতে কাহিনীর আবর্ত সৃষ্টি কিংবা সামগ্রিকভাবে অধিকার কায়েম রাখার পক্ষে প্রথম চরিত্রকে দ্বিতীয় চরিত্র থেকে নিঃসন্দেহে শক্তিশালী করে তুলছে বলে মনে হয়। সে কারণেই দুই প্রতিপক্ষকে লেখক যেভাবে দাঁড় করান, তাতে আদৌ কোনো প্রতিযোগিতাই হয় না। কিন্তু একথা সত্য হতে পারে একটি কালের কাছে, যার বৃত্তটি বড় করে দেখালে অন্য একটি সত্য আমাদের চোখে পড়ে যায়। ঔপন্যাসিকের লক্ষ্যভূমি সেদিকেই। অতএব সময়কে কৌশল

করে রবীন্দ্রনাথ যে কথাটি বলতে চান, তা নিচের দুটো ছকের মাধ্যমেও দেখিয়ে দেওয়া চলে—

ছক নং — ১
উপন্যাসে লেখকের দেখাবার উদ্দেশ্য
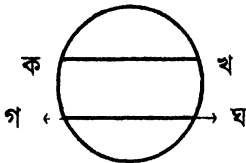
ক্ষুদ্র সময় বৃত্ত

ছক নং — ২
উপন্যাসে লেখকের দেখবার উদ্দেশ্য
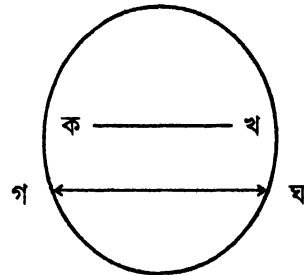
বৃহত্তর সময় বৃত্ত

ক, খ সরল রেখা— প্রতাপাদিত্য গোষ্ঠী
গ, ঘ সরল রেখা— বসন্ত রায় গোষ্ঠী

প্রথমটির ক্ষেত্রে (ছক নং ১) প্রতাপাদিত্য গোষ্ঠীই মুখ্য এবং বসন্ত রায় গোষ্ঠী শুধু গৌণ নয়, কাহিনীর পরিণামে তারা কেউ প্রতাপের গুপ্ত ঘাতকের দ্বারা নিহত, কেউ বা রাজ্যের সমস্ত সত্ত্ব ত্যাগ করে কাশীবাসী। কিন্তু বিবৃতির এই বক্তব্যকে ছাড়িয়ে যেখানে দ্বিতীয় ক্ষেত্রটি (ছক নং ২) দাঁড়িয়ে আছে, তার আভাসই হচ্ছে উপন্যাসটির অদৃশ্য সূত্র। রবীন্দ্রনাথ দেখাতে চান, প্রতাপাদিত্যের অতিরিক্ত আত্মমর্যাদাবোধ, তার সন্দেহের ঘনছায়া বিপন্ন অস্তিত্বেরই আভাস। দু'একটি উদাহরণে তাকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া যায়—

(১) উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বসন্তরায়কে গুপ্ত ঘাতকের দ্বারা বিনাশ করতে প্রতাপাদিত্য মন্ত্রীর কাছে যে যুক্তি তুলে ধরেন তাতে সনাতন আর্যধর্মের গৌরব অক্ষুন্ন থাকার অজুহাত উত্থাপিত। এ যুক্তিতে বসন্তরায় যেহেতু পরধর্মের প্রতি সহানুভূতিশীল, অতএব মহারাজের পিতৃব্য হয়েও তিনি বংশের কলঙ্ক। কিন্তু যুক্তির নামে এই কুযুক্তি প্রতাপাদিত্যের মনে যে দ্বন্দ্ব ঘনিয়ে তোলে তা তিনি মন্ত্রীর উপর চাপিয়ে বলতে চান - 'তুমি মনে করিতেছ নিজের পিতৃব্যকে হনন করা সকল সময়েই পাপ ; 'না' বলিয়ো না, ঠিক এই কথাই তোমার মনে জাগিতেছে।'[৫৪] কিন্তু পরক্ষণেই মন্ত্রীর জবাবের অপেক্ষা না করে নিজের আত্মপক্ষ সমর্থন - ধর্মের নামে পিতৃব্যকে বধ করা কোনো পাপ নয়।

২) পঞ্চম পরিচ্ছেদে প্রজাদের উপর শাসনের রাজত্ব সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনায় প্রতাপাদিত্য মন্ত্রীকে নিজের রাজ্য যশোহরের সঙ্গে বসন্ত রায়ের রায়গড়কে টানেন। তাঁর শাসন ব্যবস্থায় প্রজারা যদি একটিও বিরুদ্ধ কথা বলে, তবে তার জিহ্বা তপ্ত লোহা দিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হবে। কিন্তু একথাগুলোর মূলে যে রাজার ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার অভাব কার্যকর, মন্ত্রীর কাছে সে রহস্য ধরা পড়ে যায়। মন্ত্রী তাই মনে মনে হেসে উল্লেখ করতে ভোলেন না— 'প্রজার জিহ্বাকে এত ভয়! তথাপি মনকে প্রবোধ দিয়া থাকেন যে, কোনো প্রজাকে ডরাই না!'[৫৫]

৩) চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদে বন্দী উদয়াদিত্যকে রাজ্য ছেড়ে যাবার আদেশ দিয়েও প্রতাপাদিত্যের সংশয় কাটে না। তাই আত্ম অস্তিত্বের 'ভবিষ্যৎ' কনিষ্ঠপুত্র সমরাদিত্যের সিংহাসন নিষ্কন্টক রাখার উদ্দেশ্যে প্রতাপাদিত্যের কাছে উদয়াদিত্যকে কেবল মুখের কথা দিয়ে নয়, মা কালীর চরণ স্পর্শ করেই চিরদিনের মতন দেশত্যাগের প্রতিজ্ঞা নিতে হয়।

অথচ অন্যদিক দিয়ে অবস্থানের কারণে বসন্তরায় কিংবা উদয়াদিত্যের অস্তিত্ব-বিলুপ্তির ব্যথা থাকলেও আশংকা নেই। বরং, যে ক্ষুদ্র সময়বৃত্ত দিয়ে তাঁদের অপূর্ণতা ঘনীভূত হয়ে ওঠে, তা পূর্ণতারই পরিপূরক। অবশ্য এক্ষেত্রে বিভার অবদান সকলের অগোচরে অদৃশ্য বয়নে সম্পর্ক সন্ধান করে ফেরে— সময়ের নানা পর্যটনের শেষে (ছক নং ২) যা আবিষ্কার করে নিতে পারি। রবীন্দ্রনাথ এ কারণেই এক জায়গায় খুব চমৎকারভাবে বলেন—

'মনে রাখিতে হইবে পূর্ণতার বিপরীত শূন্যতা ; কিন্তু অপূর্ণতা পূর্ণতার বিপরীত নহে, বিরুদ্ধ নহে, তাহা পূর্ণতারই বিকাশ'[৫৬]

অতএব এক্ষেত্রে প্রতাপাদিত্যকে সময় ধর্মই বলে দেবে তার শূন্যতার কোন অবস্থানে তিনি দাঁড়িয়ে, কিন্তু বসন্তরায়-গোষ্ঠী চলেন তাদের খণ্ডকালের ঘটনাগত অপূর্ণতা থেকে অবিচ্ছিন্ন কালের পূর্ণতার পথে।

সময়কে যদি কোনো মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে স্বতন্ত্র করে দেখা হয় তবে তার ভাল-মন্দ, কাঙ্ক্ষিত-অনাকাঙ্ক্ষিত, সত্য-অসত্য কোনো বিচার নেই। এক্ষেত্রে সাহিত্য-বিজ্ঞানীর চোখ দিয়েই যথাযথ ধরা দিতে পারে তার সঠিক অবস্থান। যেখানে সম্পর্কের মধ্য দিয়ে একদিকে নৈর্ব্যক্তিকরণ, অন্যদিকে তার আত্মীকরণ। 'করুণা' উপন্যাসের নরেন্দ্র প্রসঙ্গ আলোচনায় দেখি তার উপস্থাপনা আগাগোড়া রবীন্দ্র-উপন্যাসের চোখে সৃষ্টির একটি প্রয়াস মাত্র। যার গণ্ডীকে অবিমিশ্র সংকীর্ণ করে তোলায় সময়ের মূল্যাঙ্কন একমুখী। রবীন্দ্রনাথ তাই দ্বিতীয়বার এর আর পুনরাবৃত্তি না ঘটিয়ে বরং তার আদলটিকে ছড়িয়ে দেন অন্যান্য উপন্যাসে। যেহেতু কালের

পটভূমিকায় সর্বত্রই মানবিকতার পাশাপাশি একটি অমানবিক স্বর বিরাজ করে চলে।

রবীন্দ্রনাথ সময়ের হাত ধরে তাঁর জীবন দিয়েই মানুষের ক্রমবর্ধমান শোষণকে দেখেন, অন্যদিকে সংগঠিত মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামও তাঁর নজরে পড়ে। গোটা অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপের ইতিহাস যে সংগ্রামের ইতিহাস, তাতে অমানবিকতার মাঝখানে মানবিকতাকেই তীব্রতর করে তোলার প্রয়াসকে লেখক খুঁজে বেড়ান। ফ্যাসিবাদের জন্মদাতা বেনিতো হোয়ারেজ মুসোলিনির সর্বগ্রাসী চিন্তা চেতনায় ব্যক্তিস্বাধীনতা যেখানে মানুষের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়, সেখানে তার সর্বব্যাপকতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ সাবধান বাণী উচ্চারণ করেন ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে।[৫৭] কিন্তু তার আগেই রবীন্দ্রনাথ মানুষের ব্যক্তিমর্যাদার প্রশ্ন কোনো বিশেষ ইতিহাস কিংবা স্থান-কাল-পাত্রের নিরিখে নয়, সামগ্রিকভাবে তোলেন বলেই করুণার পাশে নরেন্দ্রের ভূমিকা দুটো বিশেষ ব্যক্তি কিংবা বিশেষ গোষ্ঠীরূপে চিহ্নিত হয় না। স্বভাবতই এ প্রসঙ্গে 'বউঠাকুরাণীর হাট' এর প্রতাপাদিত্য সম্পর্কে তার তুলনামূলক বিচার এসেই পড়ে। তার কারণ, গোটা উপন্যাসটিতে সর্বনাশের ইতিহাস তিনিই সৃষ্টি করেন এবং তাঁর প্রচণ্ড জেদ ব্যক্তিকে বিনষ্ট করে নিষ্ঠুরভাবে মানবিক কালকেই মুষ্ঠিবদ্ধ করে। আগাগোড়া সর্বগ্রাসী এই চরিত্র ইতালির ফ্যাসিস্টদের থেকে কোনো অংশেই ব্যতিক্রম নয়, এবং নানা যুগের নানান নামকরণ নিয়ে ব্যক্তির কণ্ঠরোধকারী যেকোনো শক্তির সঙ্গেই হয়তো তাকে মিলিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু তবু রবীন্দ্রনাথ স্বাভাবিকভাবে তাঁর পর্যবেক্ষণ এবং বোধ থেকে অনুভব করেন সমস্ত অশুভশক্তির ভেতরে থেকেই শুভশক্তির জাগরণ ঘটে। তাই শোষণ আর বঞ্চনার ইতিহাস থেকেই তার মোচনের ইতিহাস জন্মলাভ করে - যুগের দৃষ্টান্ত স্বরূপ রুশ কিংবা ফরাসী বিপ্লব যার প্রমাণ। অতএব 'করুণা' উপন্যাসে নরেন্দ্রকে গড়ে লেখক যেখানে তার ভাঙনের চিহ্নটিকে স্পষ্ট করে নিতে পারেন না, প্রতাপাদিত্যের ক্ষেত্রে তার পরিত্রাণ না ঘটালেও বীজকে বপন করে নেন। এ ব্যাপারে উভয় উপন্যাসের দুই অমানবিক কালের মুখপাত্রদের পাশাপাশি একই অবস্থান ঘটিয়ে সতর্ক পার্থক্যের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে।

'করুণা' উপন্যাসে নরেন্দ্র তার নঞর্থক বর্তমানকে (লেখকের দৃষ্টিতে) যেকোনো উপায়ে অব্যাহত রাখতে সমস্ত নীতিবোধ, প্রয়োজনে আত্মমর্যাদাও খর্ব করতে ভাবে না। অন্যদিকে 'বউঠাকুরানীর হাট' - এর প্রতাপাদিত্য তাঁর আত্মমর্যাদা রক্ষার্থেই নঞর্থক বর্তমানকে ডেকে আনেন, যেখানে একে একে তার বিকারের কারণে পরিবারের ধ্বংশকেও প্রত্যক্ষ করেন। এক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভাবেই দু'জনের

কাহিনীগত উপস্থিতির পরিসরও আলাদা— একজন একদা আশ্রিত, অন্যজন কাহিনীর সূচনা থেকেই স্বাধীন রাজ্যের সম্রাট। আবার মানবিক কালের কাছে দু'জনের মানসিক কাল অশুভশক্তিতে প্রসারিত হলেও নরেন্দ্র যতটা স্থূল, প্রতাপাদিত্য সেখানে একেবারে দ্বন্দ্বের উর্ধ্বে নন। রবীন্দ্রনাথ প্রতাপাদিত্যকে সৃষ্টি করে নরেন্দ্রের তুলনায় তার ক্ষেত্রকে ভবিষ্যৎ ফসলের অনুকূল হিসেবে দেখেন বলেই ভবিষ্যতের 'যোগাযোগ' উপন্যাসের মধুসূদনকে প্রবণতার দিক দিয়ে নরেন্দ্র নয়, প্রতাপাদিত্যের সঙ্গেই দূর আত্মীয়তা গড়েন।

প্রতাপাদিত্য চরিত্রে যে ভাবটা প্রবল, তা হল প্রচণ্ড আত্ম অভিমান। প্রতিটি যুগে প্রাথমিক ভাবে ব্যক্তির দ্বারা মানবিক কাল গঠনে নিশ্চয়ই তার বিশেষ মূল্য অস্বীকার করা যায় না। কেননা মানুষ কেবল তার চেতনায় শারীর অস্তিত্ব নিয়েই বেঁচে থাকতে রাজি নয়। যে কারণে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে যেখানে রুশ বিপ্লবের পরিণাম স্বরূপ জার তন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে রাশিয়ার চমৎকার সংস্করণে অভিভূত করেছিল, সেখানেও তিনি তার শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেন - 'ছাঁচে ঢালা মনুষ্যত্ব কখনো টেঁকে না—।' [৫৮] অতএব এক্ষেত্রে মানুষ তার অস্তিত্ব কথাটিকে অন্যভবে বোঝে, তার প্রমাণ হিসেবে রিপাবলিকান সোভিয়েত রাশিয়ার বর্তমান ভাঙন দিয়েই অনুভব করা যায়। কিন্তু মানুষের অস্তিত্ব সন্ধানী সম্মানবোধ যদি শুধু আত্মকেন্দ্রিক থাকে এবং সে সম্মানবোধ যদি অপরতার মধ্যে প্রসারিত হতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়, তবে সময় মতন তার পরিচর্যা না হলে, নিজের অজান্তেই সংকটের সঞ্চার ঘটে। সম্ভবত লেখক প্রতাপাদিত্যে এই নিদর্শনকে দেখাতে চান। অতএব তার দম্ভ এবং কোনো কোনো স্থানে আশঙ্কার দ্বারা লালিত অযথা কঠোর সিদ্ধান্ত দেখেই বোঝা যায় তার ছিন্নমূল সত্তার পরিচয়। অথচ অত্যন্ত সুকৌশলে 'করুণা'র নরেন্দ্রের পর শুভ-অশুভ বোধের মিশ্রণ দিয়ে সময়ের অগ্রগতিতে প্রতাপাদিত্যে রবীন্দ্রনাথ কালো রঙের পটে উষার বিভাসকে সাময়িক হলেও উন্মোচিত করেন—

১) পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে উদয়াদিত্যের নির্ভিক স্বীকৃতি প্রদানের চিত্র প্রতাপাদিত্যকে মানসিকভাবে আকর্ষণ করে বলেই লেখক তাঁর বর্ণনায় উল্লেখ করেন — 'উদয়াদিত্যের ধীর গম্ভীর বিনীত স্বর ও তাঁহার সুসংযত কথাগুলি প্রতাপাদিত্যের নিতান্ত মন্দ লাগিল না।' [৫৯]

২) পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদে আবার যেখানে প্রতাপাদিত্য উদয়াদিত্যকে কারারুদ্ধ করেন, সেখানে কোনো ব্যক্তির প্রবেশের আদেশ নেই। অথচ শেষপর্যন্ত কন্যা বিভাকে যাবার সম্মতি প্রদানে তাঁর আত্মাভিমানকে কিছুটা হয়তো নম্র করে।

এছাড়াও একটি মানুষের মধ্যে একাধারে পরপর নঞর্থক -সদর্থক ভূমিকায়

আবর্ত কিভাবে রচিত হতে পারে ; প্রতাপাদিত্যের চরিত্রে সেই দ্বিধার বিতর্ক দশম পরিচ্ছেদে নিজ কন্যার স্বামী চন্দ্রদ্বীপ অধিপতি রামচন্দ্রের মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা প্রদানে ব্যক্ত হয় আত্ম সংঘর্ষের সংলাপে—

"একবার এক মুহূর্তের জন্য মনে হইয়াছিল লছমন সর্দারকে ফিরিয়া ডাকিবেন। কিন্তু সে সংকল্প তৎক্ষণাৎ মন হইতে দূর হইয়া গেল। প্রতাপাদিত্য কখনো দুইবার আদেশ করেন? যে মুখে আদেশ দেওয়া সেই মুখে আদেশ ফিরাইয়া লওয়া? আদেশ লইয়া ছেলেখেলা করা তাঁহার কার্য নহে। কিন্তু বিভা? বিভা বিধবা হইবে। রামচন্দ্র রায় যদি স্বেচ্ছাপূর্বক অগ্নিতে ঝাঁপ দিত, তাহা হইলেও তো বিভা বিধবা হইত। রামচন্দ্র রায় প্রতাপাদিত্য রায়ের রোষাগ্নিতে স্বেচ্ছা পূর্বক ঝাঁপ দিয়াছে, তাহার অনিবার্য ফলস্বরূপ বিভা বিধবা হইবে।"[৬০]

রেখাচিত্রের আকারে সংলাপটি এবার স্পষ্ট করা যায়—
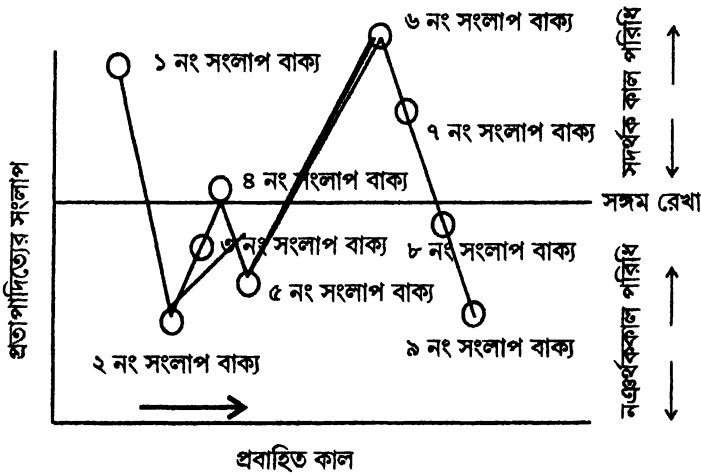
মোট নয়টি বাক্য সংলাপ-অনুচ্ছেদটিতে কেমন করে একবার ওঠে এবং নামে সেইসঙ্গে সমস্ত শুভ চিন্তাধারাকে তর্কের মানসিকতায় নঞর্থক উপসংহার করা হয়, তা স্পষ্ট করে তোলে চরিত্রটিকে। যদিও শেষপর্যন্ত প্রতাপাদিত্য চরিত্রে শুভকালের বিকাশ ঘটে না সময়ের প্রবাহিত ধারার পূর্ণবৃত্ত সম্পূর্ণ হয় না বলেই। সেক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন আত্মমুখী জগত যেহেতু প্রভাবশীল, অতএব তার অনুকূল যুক্তি প্রদর্শনই যথাযোগ্য। তবুও একজন কালের দ্বারা নির্মিত সামাজিক মানুষ বলেই প্রতাপকেও যে নিজের সঙ্গে লড়াই করতে হয়, লেখক এ কথাও আমাদের ধরিয়ে দেন। নরেন্দ্রের মধ্যে এই লড়াইবোধ নেই বলেই তার সম্ভাবনাও সীমিত।

'বউঠাকুরানীর হাট' উপন্যাসের বসন্ত রায়ের একটি পূর্বসূরী পরিকল্পনা 'করুণা' উপন্যাসে মহেন্দ্রের মধ্যে বীজের আকারে আছে, কিন্তু বসন্তরায় কালের পরবর্তী সৃষ্টি বলেই নানাভাবে তার ক্ষেত্র প্রসারিত হয় মহেন্দ্রের দিকে। বরং বলা ভাল বসন্ত রায় চরিত্রটির একটি মৌলিক উপস্থাপনা সার্থক হতে পারে বলেই রবীন্দ্রনাট্যজগতে পরবর্তীকালে যেসকল চরিত্র সূত্রধারের ভূমিকা নেয়, তাতে তাঁর প্রভাবমুক্ত আন্তরিকভাবে লেখক হতে পারেন না। দেখা যায়, 'করুণা'র পর 'বউঠাকুরানীর হাটে' যে সময়ের ভাস্কর্য রচনা করেন বসন্ত রায়, তাতে স্থিতাবস্থা কিংবা পশ্চাতোপসরণ নেই। কেননা, 'করুণা' উপন্যাসে মহেন্দ্রকে যেখানে সংসারী রূপে বিশেষ প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়, সেখানে বসন্ত রায় সংসার থেকে নৈর্ব্যক্তিক হয়ে ওঠেন। আবার সংসারের সুখ-দুঃখের সঙ্গেও জড়িত হয়ে যান। তাই শুধু বন্ধনের দিকে নয়, বন্ধন এবং মুক্তিকে নিয়ে তাঁর পথ মহেন্দ্রের চেয়ে অনেক বেশি অনাবৃত। পরবর্তী কালে 'রাজর্ষি' উপন্যাসে যে বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে।

বসন্ত রায় চরিত্রটি যে রবীন্দ্র অভিজ্ঞতা থেকে জন্ম, তাতে তাঁর সম্পর্ক রচনা হয় বিভা-সুরমা-উদয়াদিত্যের ভালবাসার বন্ধনে। আবার এই ভালবাসার প্রসারণশীল পরিধি থেকে নিষ্ঠুর প্রতাপাদিত্যও মুক্ত নন। আর এখানেই তাঁর ব্যক্তিকে ঘিরে থাকা মনটির সহজ আত্মীকরণ, অন্যদিকে গোটা রায়গড়ের প্রতি তাঁর স্বাধীনতা দান সেই আত্মীকরণকেই করে ব্যাপ্ত। সেখানে নিহিত থাকে নির্বিশেষ ভালবাসা। 'করুণা'র মহেন্দ্রের মধ্যেও এই মানবিক কালের সম্প্রসারণ দেখি হতভাগ্য করুণার প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশে। কিন্তু এক্ষেত্রে বসন্ত রায় কেবল সহমর্মিতা প্রকাশ এবং আশ্রয় দান করেই সীমিত নন বরং ভালবাসা দিয়ে ভবিষ্যৎকে গঠনেরও প্রয়াসী। বসন্ত রায় কেবল একটি পরিবারের সদস্য নন, একটি রাজ্যের রাজ্যপ্রধান। তাই তৈরি করে তোলা বর্তমানকে উপহার দেবার মানসিকতা ও দায়িত্ববোধ তাঁর অনেক বেশি। পঞ্চম পরিচ্ছেদে প্রতাপাদিত্যকে সে কারণেই তিনি বলেন—

"প্রতাপ, একবার রায়গড়ে চলো। অনেকদিন সেখানে যাও নাই। অনেক পরিবর্তন দেখিবে। সৈন্যরা এখন তলোয়ার ছাড়িয়া লাঙল ধরিয়াছে; যেখানে সৈন্যদের বাসস্থান ছিল সেখানে অতিথিশালা—" [৬১]

অর্থাৎ শুধু চোখে ধরিয়ে দিয়েই সময়কে প্রতিষ্ঠা দেওয়া নয়, তাকে পোষকতা করাও চাই। আর এই গঠনমূলক প্রক্রিয়া রবীন্দ্রনাথের যে কতটা প্রিয় ছিল তার নানা প্রমাণকে নিয়ে বসন্ত রায়ের ভবিষ্যৎ-মূর্তি রবীন্দ্রসাহিত্যে বারবারই ধরা দেয়— কোথাও কবি, কোথাও খ্যাপা, কোথাও ঠাকুরদারূপে। বসন্ত রায় তাই এক উজ্জ্বল সংযোজন, নম্রতার আড়ালে যার পৌরুষদীপ্ত বিনয় সময়ের যাত্রাপথে

ধাপে ধাপে এগিয়ে চলে। 'ভারতী' পত্রিকায় উপন্যাসটির প্রকাশিত পাঠে বসন্ত রায়ের দীপ্ত যোদ্ধা অভিব্যাক্তিটি খুবই স্পষ্ট, যেখানে একটি জায়গায় তিনি উল্লেখ করেন -

"বীরত্বের বিষয়ে বসন্ত রায়কে নতুন প্রমাণ দিতে হইবে না। অল্প বয়সেই এমন সুন্দররূপে তলোয়ারের কাজটা সারিয়া রাখিয়াছি যে, এখন আর তাহা ছুঁইবার আবশ্যক করে না"।[৬২]

কিন্তু বর্তমান পাঠে এই অংশটি যে রবীন্দ্রনাথ বর্জন করেন, তার কারণ হিসেবে মনে হয়, তিনি চান না পাঠক তাঁকে অবলীলায় আবিষ্কার করুক। বরং সময়ের দ্বারাই তাঁর প্রকাশ ঘটুক — এ আকাঙ্ক্ষাই তাঁকে ইঙ্গিতের দ্বারা বলতে উজ্জীবিত করে।

তবুও 'বউ ঠাকুরানীর হাটে' বসন্ত রায়ের অপূর্ণতার প্রসঙ্গটিও তোলা যায়। এক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ 'রাজা' নাটকের ঠাকুরদা চরিত্রকে তার উত্তরসূরী হিসেবে বেছে নিয়ে তুলনা করলে দেখবো, ঠাকুরদা কেবল রাজার সখা হিসেবে সবার কাছে শুধুমাত্র মিলনের বার্তাকে পৌঁছে দিয়ে যান না, প্রয়োজনে মিলনকে অক্ষুন্ন রাখতে দম্ভকে দূর করে রাজার সৈনাপত্যের ভূমিকায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। অথচ বসন্ত রায়েরও এই বাসনা যথেষ্ট পরিমাণে থাকলেও তিনি অশুভ বর্তমানের (প্রতাপাদিত্য) কাছে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করেন, যা তাঁর কাঙ্ক্ষিত নয়। অথচ সময় থাকতে এর সচেতন যোগ্য প্রতিবিধান তিনি করেন না। উপন্যাসে যেখানে বসন্ত রায়ের বেঁচে থাকার অত্যন্ত প্রয়োজন সেখানে প্রতাপাদিত্যের দম্ভের কাছেও অভিমান নিয়েও তার বলা উচিৎ হয় না—

"বসন্ত রায় অনেকদিন বাঁচিয়া আছে - না প্রতাপ? সময় হইয়া আসিয়াছে, এখনো যে কেন ডাক পড়িল না বিধাতা জানেন। কিন্তু আর অধিক বিলম্ব নাই।"[৬৩]

উল্লেখিত সংলাপটির তিনটি বাক্য কাহিনীর এই অবস্থান বিন্দুতে নঞর্থক কাল বৃত্তে সদর্থক কালের আত্মসমর্পণ। যা উদয়াদিত্যের উপরও প্রভাব ফেলে। ক্ষয়িষ্ণু শুভবোধের চিত্রকে সংলাপটি থেকে আমরা এভাবে বেছে নিতে পারি—

১) প্রথম বাক্য নঞর্থক বর্তমানের কাছে জিজ্ঞাসা দ্বারা অনুসন্ধান।

২) দ্বিতীয় বাক্য সেই অনুসন্ধান সূত্রটিকে আবিষ্কার করে অনিশ্চিতের হাতে নিজেকে সমর্পণ।

৩) তৃতীয় বাক্য আসন্ন অনাগত দিনে আত্ম অস্তিত্বের বিলুপ্তি দ্বারা সদর্থক কালের উচ্ছেদ।

অতএব উপন্যাসের সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদে তাঁর ব্যক্তিজীবনকে যে বেদনার

আলোকে তিনি উপলব্ধি করেন, সেখানে প্রকৃতি বর্ণনায় বাইরের সময় জগতের সংকেত নিয়ে ক্রমশঃ তাঁর আন্তররাজ্যের সময় ধর্মের শূন্যতাই ব্যাপ্ত হয়ে ওঠে— 'সম্মুখে এক প্রশস্ত মাঠ দেখা যাইতেছে। মাঠের প্রান্তে খালের পরপারে একটি আম্রবনের মধ্যে সূর্য অস্ত যাইতেছেন।'[৬৪] এই চিত্রে সম্ভাবনার চাইতে হারাবার রিক্ততাই প্রধান। মাঠ যেখানে ফসলময় পূর্ণতা হতে পারতো, সেখানে বিশাল শূন্যতা হয়ে ওঠে। অন্যদিকে 'আম্রবনের মধ্যে সূর্য' শক্তি ও স্নিগ্ধতা নিয়েও বিলীয়মান। কাজেই জীবনের উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রটি বৃহত্তর হয়েও তার যাত্রাপথের ভাঙনকে যে বসন্ত রায় এড়াতে পারেন না, এখানেই তাঁর দুর্বলতা। আমাদের মনে হয়, সময়ের অশুভ শক্তি যখন 'ক্ষমতাবান', তখন কখনো কখনো শুভ শক্তিরা সেই অন্ধকারের আগুনে আত্মাহুতি দেন। আর সেইসঙ্গে সতর্ক করে যান ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে। হয়তো এ কারণেই ঠাকুরদার জন্ম সম্ভবপর হয়। একজন সমালোচকের বক্তব্য এদিক দিয়ে বসন্ত রায়ের ভূমিকায় লুকিয়ে থাকা ঈঙ্গিতটিকে তুলে ধরে— "সে (বসন্ত রায়) বিশেষ বটে কিন্তু নির্বিশেষ হইবার মুখে চালিত, সে ঠাকুরদা ভাবাপন্ন বটে কিন্তু এখনো ঠাকুরদা হইয়া ওঠে নাই, তাহাকে বিশ্লেষণ করিলে দুই জগতেরই সন্ধান মেলা সম্ভব। ইহাই বসন্ত রায় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব।"[৬৫]

বসন্ত রায় উপন্যাসে প্রধানতঃ দুটো দিক দিয়ে সময়ের আবর্ত রচনা করে অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করেন—

১) পারিবারিক ক্ষুদ্রতম স্নেহবন্ধন দিয়ে বৃহত্তরকে ফুটিয়ে অশুভ বর্তমানের মধ্যে অনুভূতিশীল শুভবোধ প্রয়াসী চরিত্রদের (ভবিষ্যৎ গঠনে পারদর্শী) নিরাপত্তা প্রদান।

২) তাঁর স্বাভাবিক নমনীয় গুণের দ্বারা কঠোরকে কোমল করার প্রচেষ্টা।

কিন্তু উপন্যাসের সময় বৃত্তে তাঁর এই দুটো কর্তব্যেই তিনি ব্যক্তিগতভাবে কৃতকার্য হতে পারেন না। যদিও সেই সময়ের বন্ধন যখন কেটে যাবে তখন নিশ্চয়ই তাঁর সততা ও নির্ভীক চিত্তটি আমাদের চোখে পড়বে। পরবর্তী উপন্যাস 'রাজর্ষি'তে যার প্রমাণ আছে। কিন্তু 'বউঠাকুরানীর হাটে' তাঁর প্রচেষ্টার সঙ্গে পরিণামের সামঞ্জস্যহীনতাকে (ক্ষুদ্রকাল পরিধির নিরিখে) কোনোভাবেই এড়ানো যায় না। যদিও রবীন্দ্রনাথ এখানেও আরো গভীর একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রাখেন। বিভা চরিত্র পর্যালোচনায় যা স্বতন্ত্রভাবে প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

আমাদের মনে হয় লেখক উপন্যাসটিতে যে দুটো প্রধান মানসিক কালের দ্বন্দ্ব একটি পরিসরে অঙ্কন করতে চান, তাতে তাঁর দেখাবার উদ্দেশ্য সামঞ্জস্য জ্ঞানহীনতার নানা মাত্রা। এক্ষেত্রে প্রতাপাদিত্য বৃহত্তর যুগের কাছে, বসন্ত রায়

ক্ষুদ্রতম কাহিনীবৃত্তে সেই মাত্রাকে ধারণ কবে আছেন। পাশাপাশি এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তৃতীয় একটি রণাঙ্গন উন্মুক্ত করেন চন্দ্রদ্বীপ অধিপতি রামচন্দ্র। কিন্তু প্রতাপাদিত্যের অসামঞ্জস্যবোধের দিকটিকেই প্রকট করে তুলতে যে একই প্রজাতি রূপে তাকে 'নির্মাণ' রূপ দেওয়া হয়, তা সহজেই বোঝা যায়। প্রতাপাদিত্যের মতই তাঁর সম্মানবোধের তাড়না, সেই সঙ্গে সংশয়। সামঞ্জস্যহীনতার কারণে নিজের মৌলধর্ম যেহেতু তিনি বোঝেন না, তাই যথার্থ জায়গায় তাকে তিনি খুঁজে বেড়ান না। এ কারণেই রামাই পণ্ডিতের স্থূল বিনোদনের কর্মভূমি থেকে তার বেরিয়ে আসার ক্ষমতা নেই। একজন দেশেব শাসক হিসেবে গঠনমূলক কর্মপদ্ধতির সঙ্গে সম্পর্ক নেই। নিজের বিবাহিত স্ত্রীকে কোথায় নিয়ে এলে যোগ্য সম্মান দেখানো হয়, এই বোধটুকু রামমোহন মালের মতন ভৃত্যশ্রেণীর কর্মচারীকেই বরং ধরিয়ে দিতে হয়। বিভার প্রতি অনুরাগ দীপ্ত হয়েও যে তিনি তাকে প্রত্যাখান করতে পারেন, সে তো অন্যভাবে প্রতাপাদিত্যেব শ্রেণীগত পরিচয়। অতএব উভয়েই উপন্যাসের নায়িকার গভীর সংযোজক হয়েও তাঁর মর্যাদা রাখেন না। বরং তাঁদের নিজেদের সামঞ্জস্যজ্ঞান সম্পর্কে তারা এতটাই অসচেতন - বিপুল আয়োজনে যা বিভার দিক দিয়ে দেখানো হয়।

উপন্যাসের উদয়াদিত্য চরিত্রটি মানবিক কালের সামগ্রিক পরিণতিতে সম্ভাবনাময়। তাঁর নির্ভীক সততা, আদর্শ নিষ্ঠা, মানবপ্রেম ইত্যাদি সমস্ত টুকরো ছবি নিশ্চয়ই স্বল্প-অতিক্রান্তি দ্বারা গড়া নয়, তার পেছনে আছে বসন্ত রায়ের দীর্ঘতম প্রেরণার অভিজ্ঞতা। আবার যে খণ্ডকালগুলোতে উদয়াদিত্য তাঁর প্রেরণার সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন, তার প্রবহমান যাত্রাও অব্যাহত। কিন্তু তবু তিনি যে-পরিমাণে সৎ এবং প্রেমিক, সেই পরিমাণে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রখর প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ নন। তাই তাঁর কারাবাসের দীর্ঘকাল অবসান ঘটে না। বর্তমান পাঠের প্রথম পরিচ্ছেদ থেকেই তাঁকে ঘিরে থাকে 'রাত্রি' ও 'গ্রীষ্ম'কালের সময় ভূমিকা। তার মানসিক জগৎ প্রতিমুহূর্তেই অশুভ বর্তমানের হাতে বিপর্যয়ের কম্পন অনুভব করে। অথচ প্রচুবতম সম্ভাবনা নিয়ে সেই নঞর্থক কালকে ছিন্ন করে তোলার প্রচেষ্টা তাঁর মধ্যে দেখা যায় না। গুপ্ত ঘাতকের দ্বারা বসন্ত রায়ের মৃত্যু অনিবার্য, এ আভাস পেয়ে তিনি তাঁর প্রেরণার উৎসস্থল 'দাদামশায়'কে সাবধান করে দিতে চান সত্য, কিন্তু শেষ রক্ষা করে যেতে পারেন না। হয়তো সময়ের এই পরিধিতে এটাই নিষ্ঠুর বাস্তব, আর এভাবেই রবীন্দ্রনাথ যেন উদয়াদিত্যকে নিয়ে আরেক অসামঞ্জস্যকে তুলে আনেন। যে কারণে উপন্যাসের বর্তমান পাঠের প্রথম পরিচ্ছেদে স্ত্রী সুরমার কাছে তার নিজের একটি অভীষ্ট কালকে গড়ার তাগিদ নেই বরং

পালাবার প্রয়াস আছে। তাই তাঁর কামনা- 'কী তপস্যা করিলে এ সমস্ত অতীত উল্টাইয়া যাইতে পারে!'[৬৬] অর্থাৎ, সে হচ্ছে সেই অসম্ভব কল্পনা, বাস্তবের মাটিতে তাকে প্রতিষ্ঠিত করে গঠনমূলক শক্তির অপরিহার্যতা দিয়ে যা দৃঢ় প্রত্যয়ে অম্বিত নয়, বরং এ জায়গায় স্ত্রী সুরমা অনেক বেশি সংগঠক। অতীতের শিক্ষা নিয়ে সে ভবিষ্যতের প্রত্যাশী, আকাঙ্ক্ষা - অনুকূল বর্তমান। অতএব যে 'অতীত' মনকে নির্জীব করে, তাকে সে চায় না। বরং সান্ত্বনা বাক্যে উদয়াদিত্যের মধ্যে আগামী ভবিষ্যতের আলোকদীপ্ত বর্তমানটিকে আত্মশক্তিতে গড়ে দিতে চায়। যার পরিণাম স্বরূপ উদয়াদিত্যকে স্বীকার করতেই হয়—

"এতদিন আমি অগোচর ছিলাম, তুমি আমাকে বাহির করিয়াছ, সুরমা, তুমি আমাকে আবিষ্কার করিয়াছ, এখন আমার মনে যাহা ভাল বলে তৎক্ষণাৎ তাহা আমি সাধন করিতে চাই।"[৬৭]

কিন্তু সুরমার মত মাধ্যমকে পেয়েও তো তার আত্মবোধ তাকে স্বাবলম্বী করে না। তা না হলে সুরমার মৃত্যুর পর যে শূন্যস্থান তার জীবনে গড়ে ওঠে তাকে পূর্ণতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার সামর্থ্য তিনি হারাতেন না। এক্ষেত্রে যে শূন্যতা নিয়ে উদয়াদিত্য উপন্যাসে প্রবেশ করেন, সুরমার মৃত্যু তাতে মাত্রার সংযোজন করে মাত্র; পরিণামে উজ্জীবিত করে না। বরং মৃত্যু পথযাত্রী সুরমার অন্তরের ইচ্ছাকে বিভা রূপায়িত করে উদয়াদিত্যকে সকল দিক দিয়ে মানসিক আশ্রয়দানের মধ্যে। তাই সকল ইচ্ছাকে দমন করে একমাত্র উদয়াদিত্যের জন্যই রামমোহন মালের সঙ্গে প্রথমবার স্বামীগৃহে সে যাত্রা করে না।

উপন্যাসে সুরমার উজ্জ্বল রূপ প্রথম থেকেই তার গুরুত্বকে প্রকাশ করে চলে। আর ততোধিক সেই গুরুত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে মঙ্গলা নামক এক আপাত গৌণ চরিত্রকে দাঁড় করানো হয় তার বিপরীতে। এতে একদিকে সময়ের গঠনমূলক শক্তি, অন্যদিকে তার বিধ্বংসী রূপ— পাশাপাশি দুই নারী চরিত্রের অবস্থানে লেখক দেখিয়ে দিতে চান তাদের মূল লক্ষ্যস্থলটিকে, উদয়াদিত্য যার আধার। অতএব সুরমা উদয়াদিত্যের মধ্যে গঠনমূলক বর্তমানকে গড়ে নিতে চাইলেও মঙ্গলা সেখানে জৈবিক প্রবৃত্তির দাসত্ব দিয়ে নির্মাণ করে নিতে ইচ্ছুক আরেক 'বর্তমান'। সুরমা এক্ষেত্রে উদয়াদিত্যের অতীত জীবনের চরিত্র বিচ্যুতির অভিশাপকে বারে বারেই মুছে দিতে চায়, কিন্তু সফল হতে পারে না। বরং বন্ধ্যা অতীতের দ্বারা তাকে বরণ করে নিতে হয় মৃত্যু। অতএব এক্ষেত্রে মঙ্গলার পাশে সুরমার উজ্জ্বল রূপ সময়ের কাছে শেষ পর্যন্ত ঢাকা পড়ে যায় বলে আমাদের সকল তৃপ্তিরও অবসান ঘটে।

হয়তো 'বউঠাকুরানীর হাট' উপন্যাসটির এই নানা অসামঞ্জস্যবোধ বিভিন্ন

সমালোচককে তাড়না করে দীর্ঘকাল। কিন্তু আমরা ভুলে যেতে পারি না উপন্যাসটির মধ্যে উৎপাদনেরও কৌশল আছে, যেখানে লুকিয়ে থাকে তার সমস্ত নির্মাণের তাৎপর্য, যাকে ঘিরে নানা অসামঞ্জস্য — নানা অসত্য — নানা বিচ্ছিন্ন রূপ। কিন্তু সে তাৎপর্যটি কি? একবার গোটা উপন্যাসটি উপর থেকে বৃহত্তর সময়ের পটে ধরলে তার ক্ষেত্রটি স্পষ্ট হয় অসামঞ্জস্য দিয়েই ক্ষেত্রটি খুঁজে নিতে সময়ের পটে একবার আলোচিত চরিত্রগুলো সংক্ষেপে দেখে নেওয়া যেতে পারে।

১) প্রতাপাদিত্য — বন্দী বর্তমান দিয়ে ভবিষ্যৎ অস্তিত্বে সংশয়ী।

২) রামচন্দ্র — সদর্থক ও নঞর্থক বর্তমানে সঙ্গতিহীন।

৩) মঙ্গলা — আত্মকেন্দ্রিক বর্তমানে বিশ্বাসী। অতীত -ভবিষ্যৎ শূন্য।

৪) বসন্ত রায় — ভবিষ্যৎ অস্তিত্বশীল হলেও কাহিনীর বর্তমানের হাতে নিহত।

৫) উদয়াদিত্য — বেঁচে ওঠার প্রয়াসী কিন্তু আত্মবিশ্বাসে বর্তমান গঠনে অক্ষম।

৬) সুরমা— ভবিষ্যৎ গঠনে সক্ষম হলেও কুটিল বর্তমানের শিকার।

অতএব সমস্ত চরিত্রগুলোই সময়ের কোনো না কোনো দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচ্ছিন্ন। আর এখানেই প্রশ্ন জাগে, কেন এত বিচ্ছিন্নতার ছড়াছড়ি! এক্ষেত্রে কেবলমাত্র উপন্যাসটির বিভা চরিত্রে সমাধান মেলে।

আলোচনার শুরুতে উপন্যাসটির নানান খণ্ডকালের যোগ্য সম্পাদনার অভাব প্রসঙ্গে এর নানা অভিযোগ প্রাধান্যের কথা আছে। কিন্তু বিভাকে নিয়েই এই সমস্যা সমাধানের ছবি দেখা যেতে পারে। ফলে, প্রথম থেকেই তার সূক্ষ্ম বিচার না করে যদি সমালোচকের মন্তব্য অনুযায়ী বিভাকে একটি উপপ্রসঙ্গ রূপে ধরা হয়,৬৮ তবে গোটা উপন্যাসের অন্তর্লীন সংযোজক গতিই হয় ব্যাহত। এক্ষেত্রে বিভাকে আবিষ্কার করলে উপন্যাসটির সমস্ত সময় - অবতল তারই কেন্দ্রমুখী উদ্দীপন ধারা বলে মনে হয়। তার মধ্যে কেউ হয়তো ভালবাসার মিলন সেতুতে, কেউ হয়তো আঘাত প্রদানে সংযোজক হয়ে ওঠে। কিন্তু প্রত্যেকটি উপস্থাপনা সেখানে বিভা চরিত্রের উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে বাজিয়ে নেওয়া হয়।

রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধির পথে এগিয়ে যান বিভাকে নিয়ে। উপন্যাসের নামকরণে তারই ইঙ্গিত। লক্ষণীয়, 'করুণা' উপন্যাসে করুণা চরিত্রের মতন সরাসারি নাম উল্লেখের প্রচেষ্টা আর এখানে নেই। বরং তাৎপর্যে বিভাকে প্রচ্ছন্ন রেখে তার বাসনাকে লেখক ভবিষ্যৎ হৃদয়বান পাঠকের অন্তরদৃষ্টিতে উদ্দীপ্ত করতে চান। আর তারই ফলে সুদূর অতীতের ইতিহাস পট থেকে স্বামীগৃহে বিভার 'বউঠাকুরানী' রূপের অভিব্যক্তি আজকের কালেও এসে ধাক্কা দেয়। উপন্যাসটিও রবীন্দ্রনাথ তাই শেষ করেন একটিমাত্র বাক্য দিয়ে গড়া অনুচ্ছেদে—

"চন্দ্রদ্বীপের যে হাটের সম্মুখে বিভার নৌকা লাগিয়াছিল, অদ্যাপি তাহার নাম রহিয়াছে - 'বউঠাকুরানীর হাট'"।[৬৯]

বিভাকেই যে লেখক নানা সময়ের অভিজ্ঞতা দিয়ে প্রথম থেকে প্রবহমান ধারা করতে চান, সে প্রবণতা আরো স্পষ্ট হয় 'ভারতী'তে প্রকাশিত ও গ্রন্থ হিসেবে প্রথম সংস্করণের পাঠ পর্যালোচনা করে।[৭০] সেখানে উপন্যাসটির প্রথম পরিচ্ছেদে বিভার স্বামী রামচন্দ্রের পুনর্বিবাহ অনুষ্ঠানের বর্ণনা আছে এবং এক নামহীন নগণ্যা নারীর ব্যর্থ কামনা পরিহাসের দ্বারা বিক্ষত হয়েছে। এই নামহীন নারী উপন্যাস-সমাপ্তিতে পূর্ণাঙ্গরূপে বেরিয়ে আসে। অর্থাৎ বিভাকে কাহিনীর ভিত্তিতে গেঁথে নিয়ে শুরুতে তার ক্ষেত্রটিকে শুধু নাটকীয় আদল দেওয়া নয়, কেন্দ্রীভূতও করতে চান লেখক। নামহারা নারীকে ধীরে ধীরে প্রকাশের আলোতে নিয়ে আসেন সময়ের হাত ধরেই। তাছাড়া প্রথম সংস্করণের পাঠে বিভাকে যতটুকু তেজস্বী করে আঁকা হয়, তাতে তার রাজকন্যাসুলভ দীপ্তি যেমন প্রকাশ পায় তেমনি ব্যক্তিত্ব দ্বারাও তাকে উজ্জ্বল করে তোলে।

তবে পরবর্তীকালে যে তার পরিবর্তন লেখক উভয়দিক দিয়ে ঘটান, (অর্থাৎ প্রথম পরিচ্ছেদের গোটা বিষয়টিকে বাদ দিয়ে এবং বিভাকে অনেক বেশি কোমল করে তুলে) কারণ হিসেবে মনে হয় রবীন্দ্রনাথ তাঁর উদ্দেশ্যকে তখনও স্পষ্টভাবে উপন্যাসে দেখাতে প্রস্তুত নন। এছাড়াও উপন্যাসটি রচনা করে তাঁর বীক্ষণগত সিদ্ধান্ত তিনি নেন, বিভাই হবে তাঁর শিল্প রচনার সময় ভাষ্য; কিন্তু তার গতি হবে তথাকথিত সমস্ত উজ্জ্বল আলোর আড়ালে। খণ্ডকালের নানা অসামঞ্জস্য দিয়ে গাঁথা সেই আলো যেদিন কালের নিয়মে বিলুপ্ত হবে, সেদিনই আবিষ্কারের আলোয় আসবে বিভা। চরিত্রের নামকরণেও সেই দীপ্তির নির্যাসটুকু থাকে।

উপন্যাসের বর্তমান পাঠে কোথাও বিভা আগাগোড়া প্রাধান্য বিস্তার করে না। সেক্ষেত্রে নানা পরিচ্ছেদে চরিত্রের যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব -সংশয় নিয়ে প্রতিক্রিয়া ঘটে, তাকে সকল দিক দিয়ে বিভার মধ্যে সমাহিত করা হয়। আবার অন্যদিক দিয়ে বিভার মধ্যে প্রতিফলিত রূপের সমীক্ষা চালান লেখক। অতএব ভেতরে ভেতরে যে সময়ের ভিত্তি উপন্যাসটিতে গড়ে ওঠে, তার নানা বর্ণসমারোহ বিম্বিত আলোক-রশ্মিতেই মূল্যায়িত। তবু বিভা কেবলমাত্র প্রতিফলিত আলোকরশ্মির আধার হিসেবে একটি জড়বস্তু মাত্র নয়। অতএব লেখক তাকে যতই আড়াল করে রাখুন, তার প্রতিভাস বেরিয়ে পড়ে। বর্তমান সংস্করণের অষ্টম পরিচ্ছেদে চন্দ্রদ্বীপ অধিপতি রামচন্দ্রের আগমন উপলক্ষে তারই বিবাহিতা স্ত্রী বিভাকে সাজাবার ক্ষেত্রে মাতা-কন্যার-সূক্ষ্ম সময় পার্থক্যের কৌশল ধরা পড়ে। তাতে শুধু দুটো যুগ মানসিকতার

বিচ্ছেদ নয়, বরং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রুচিবোধের তারতম্যও অনুভূত হয়, যাকে অবলম্বন করে থাকে বিভা। গোটা বর্ণনাটি তাই বিভাকে কোথাও আড়াল করে না, বা পরবর্তীকালে স্বয়ং লেখকও তাঁর কোনো সংস্করণে, একে বর্জনের উদ্যোগ নেন না। কিছুটা অংশকে উদাহরণস্বরূপ নিম্নরেখ চিহ্নের দ্বারা উল্লেখ করা যেতে পারে—

"সাজাইবার পদ্ধতি সম্বন্ধে বয়স্কা মাতার সহিত যুবতী দুহিতার নানা বিষয়ে রুচিভেদ আছে; ... বিভা জানিত যে তাহার ছোটো সুকুমার মুখখানিতে নথ কোনোমতেই মানায় না - কিন্তু মহিষী তাহাকে একটা বড়ো নথ পরাইয়া তাহার মুখখানি একবার দক্ষিণ পার্শ্বে একবার বামপার্শ্বে ফিরাইয়া গর্ব সহকারে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ইহাতেও বিভা চুপ করিয়াছিল, কিন্তু মহিষী যে ছাঁদে তাহার চুল বাঁধিয়া দিলেন, তাহা তাহার একবারে অসহ্য হইয়া উঠিল।"[৭১]

এই রুচিভেদের চিত্রটি আরও গভীরতর স্তরে নবম পরিচ্ছেদে বিভা ও রামচন্দ্রের শয়ন-কক্ষেও দুটো ব্যক্তিকালের আধারে ওঠে আসে। যেখানে দীর্ঘ অপেক্ষার শেষে সময়ের একটি বিশেষ বিন্দুতে স্পর্শ সুখ উপভোগের বদলে বিভার কাছে কতটাই না অনাকাঙ্ক্ষার পরিস্থিতি ডেকে নিয়ে আসে! একটি অস্তিত্ব যখন সম্পর্ক-প্রসারে অগ্রসরমান, অন্যটি তখন স্থূলতার আবরণে প্রতিক্রিয়াহীন। এ চিত্রটি থেকে এ যুগের পাঠক হিসেবে আমরা কোন ভাবনাকে বেঁছে নেবো,— তা স্পষ্ট হয়ে যায়, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সেখানেও যখন সময়-সত্যকে আগাম উচ্চারণ করেন। যে কারণে বিভার গঠনমূলক শুভশক্তির জোর পেয়ে রামচন্দ্রও আর প্রতিক্রিয়া-শূন্য হয়ে থাকতে পারেন না। স্থূলতার নির্মোক ভেঙে তার চোখেও বিভা তখন হয়ে ওঠে — 'অশ্রুপ্লাবিত করুণ কচি মুখখানি।'[৭২]

তবু 'বউঠাকুরানীর হাট' উপন্যাসটির পরিসর যে কালসীমার দ্বারা পরিচালিত, তাতে রাত্রির অন্ধকারই প্রকট। অতএব বিভাকে সময়ের বন্ধ্যারূপের মর্মমূলে যুক্ত করে তার শূন্যকালকে লেখক অনাবৃত করেন—

"রাত্রি দুই প্রহরের পর একটা বাতাস উঠিল, অন্ধকারে গাছপালাগুলো হা হা করিয়া উঠিল। বাতাস অতি দূরে হূ হূ করিয়া শিশুর কণ্ঠে কাঁদিতে লাগিল। বিভার মনে হইতে লাগিল যেন দূর দূর-দূরান্তরে সমুদ্রের তীরে বসিয়া বিভার সাধের স্নেহের প্রেমের শিশুগুলি দুই হাত বাড়াইয়া কাঁদিতেছে, আকুল হইয়া তাহারা বিভাকে ডাকিতেছে, তাহারা কোলে আসিতে চায়, সম্মুখে তাহারা পথ দেখিতে পাইতেছে না, যেন তাহাদের ক্রন্দন এই শত যোজন লক্ষ যোজন গাঢ়, স্তব্ধ অন্ধকার ভেদ করিয়া বিভার কানে আসিয়া পৌঁছিল।"[৭৩]

লক্ষ্য করবার বিষয়, এই শূন্যকাল বিভার নিজের সৃষ্টি নয়, পরিস্থিতিই তাকে সেখানে পৌঁছে দেয়। অথচ বিভা তাকে দূর করে দিতে চায়, কিন্তু একার প্রচেষ্টায় এ আবরণ মুক্ত হওয়া কতটুকুই সম্ভব। তাই উপন্যাসের শেষে কাশীযাত্রার মাধ্যমে কায়িক ভাবে বেঁচে থেকে এবং স্বামীগৃহে 'বউঠাকুরানী' অভিধায় প্রজাদের দ্বারা ভূষিত হবার আকাঙ্ক্ষাকে বর্তমানের সঙ্গে সংযুক্ত করে সে প্রভাতের অন্বেষণ করেই যায়, প্রতিবন্ধকতা কাটে না। অন্যদিকে যে চরিত্রগুলো আগাগোড়া বিভাকে নিয়ে আবর্তিত; তারা কেউই তাকে পূর্ণাঙ্গ করে তুলতে সহায়ক নয়। উদাহরণগুলো এভাবে সাজিয়ে দেখানো যেতে পারে—

ক্রমিক নং	চরিত্রের নাম	বিভার সঙ্গে সম্পর্ক	ব্যক্তিকাল	বিভা চরিত্রের উপর প্রভাব
১)	প্রতাপাদিত্য	পিতা	সংশয়ী ও বিরোধী	মান অপমানের তাড়না দিয়ে শূন্যকাল গঠন
২)	রামচন্দ্র	স্বামী	পরিণামে বিরোধী	প্রত্যাখান করে শূন্যকাল গঠন
৩)	বসন্ত রায়	দাদামশায়	বিরোধী বর্তমানের দ্বারা মৃত্যু	সুযোগ বঞ্চিত হয়ে শূন্যকাল গঠন
৪)	উদয়াদিত্য	ভ্রাতা	বিরোধী বর্তমানের দ্বারা বিচ্ছিন্ন	পথ সন্ধানে বিভ্রান্ত হয়ে শূন্যকাল গঠন
৫)	সুরমা	ভ্রাতৃবধূ	সহমর্মিতা প্রদর্শন করলেও অসমাপ্ত	সম্ভাবনা জাগলেও মৃত্যুর মাধ্যমে শূন্যকাল গঠন

কাজেই আমরা দেখি বিভা চরিত্রের উপর প্রতিটি ক্ষেত্রেই শূন্যকাল গঠনকে ছাড়িয়ে কোনো মুক্তির পথ খুলে রাখার প্রয়োজনবোধ তখনও লেখক 'কাহিনী বৃত্তে' পরিণত করে তোলেন না। হয়তো তখনও উনবিংশ শতকের উদীয়মান আধুনিক জীবনের খণ্ড কালে দুঃসাহসিক কর্মচাঞ্চল্যের ছবি জীবিকা কেন্দ্রিক আত্মমুখী সংকীর্ণতাকে পূর্ণাঙ্গরূপে ভেদ করে উত্তীর্ণ হতে পারে না। তাই পাহাড় প্রমাণ সামঞ্জস্যের ব্যর্থতা শিল্পী প্রাণে আঘাত দিয়ে যায় অশুভ সময়ের ছুঁয়ে থাকা প্রকোপে তার আশু মুক্তি নেই জেনেই। কিন্তু বর্তমান সহযোগিতার অভাববোধ থেকে পরিপূর্ণ সংহতিকে বেছে নেবার আকাঙ্ক্ষাটুকু তাঁর সম সময়ে চিরকালেরই

প্রতিনিধিত্ব করে - যার দৃঢ় ভিত্তিমূল অদৃশ্যভাবে 'অবলম্বন' সন্ধান করে স্থিতিশীল সমাজ কল্পনার বাইরে।

তাই সময়ের প্রবাহিত ধারায় উনবিংশ শতক সকল দিকে দিয়ে নিশ্চয়ই আধুনিকতাকে আনতে না পারলেও এই শতকের অধিকাংশ চিন্তানায়কেরাই এর স্বপক্ষে। আবার আধুনিকতার নামে যে প্রাচীন সমাজ ও সংস্কৃতিকে ধ্বংশ করে আরেকটি সামাজিক যন্ত্রণা মানুষের চিন্তাকে বিপন্ন করে - যে বৈষম্য, শোষণ ও অত্যাচারের সৃষ্টি হয়, সেই অবস্থা থেকে উত্তরণের পথ তাঁরা সন্ধান করেন। তাঁরা সময়ের একই অভিব্যক্তির নানা মুখোশকে আধুনিকরূপে চিহ্নিত করতে চান না। পর্যালোচনা করেন মুখ আর মুখোশের আলাদা দুই মাত্রা। আর এই ভিন্নতা দেখিয়ে তাঁরা স্পষ্ট করেন আধুনিকতার সংজ্ঞা কি হতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সকলেই কিন্তু কোনো একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হতে পারেন না, বরং নানা দিক দিয়ে জটিলতা বেড়ে যায়। সেজন্য ফরাসী বিপ্লবের অন্ধকার দিকগুলোকে রোনাল্ড, ম্যায়েস্ত্রি, বার্ক প্রমুখেরা যখন আলোকপাত করেন তখন এই বিপ্লবের ফলে সমাজের যে সনাতন প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংশ হয়, নষ্ট হয় রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, তাতে পরিবর্তনের জোয়ারে সমাজজীবনের গভীর বিশৃঙ্খলা আর নৈরাজ্যকে তাঁরা আধুনিকতার ফসল হিসেবে মানেন। কিন্তু স্বাভাবিক ভাবেই স্বাগত জানান না। সমাজতাত্ত্বিক ওয়েবার নূতন সময়ের ছবিকে যান্ত্রিক যুক্তিবাদের জয় হিসেবে দেখেন, যা সমাজ জীবনে ও সংস্কৃতির প্রতিটি স্তরকেই প্রভাবিত করে এবং এই অভ্যুদয় মানবমুক্তির পরিবর্তে তাকে যে অন্য আধিপত্যের অনুশাসনে বদ্ধ করবে সে আশঙ্কাও ধ্বনিত হয়। অতএব যে নূতন সময়ের সৃষ্টিশীল রূপ প্রাচীন সামাজিক চিত্রটির ধ্বংশ সাধনের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিসত্তার বিশিষ্ট জগৎটি গড়ে নেয়, একইসঙ্গে বিচ্ছিন্নতার জগতে মানুষকে নিক্ষেপ করে তার বিশিষ্ট জগৎটিকে বিধ্বংশও করে।

অতএব পাশাপাশি এই উভয় দিককেই বিচার, বিশ্লেষণ এবং আবিষ্কার করে বিভ্রান্ত মানুষের চোখে ধরিয়ে দেবার দায়িত্ব কেবল চিন্তাবিদদের থাকে না। শিল্পস্রষ্টাদের মধ্যে ঔপন্যাসিকও তার দায় বহন করেন। কিন্তু আধুনিকতা সম্পর্কে ঔপন্যাসিকদের দৃষ্টিভঙ্গি মৌলিক একটি সত্যে পৌঁছাতে পারে এ কারণে, যে তিনি তাঁর বিশ্বাসের জগৎটি অপরতার উপকরণ দিয়ে সৃষ্টি করেন ঠিকই, কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি সিদ্ধান্ত দিতে পারেন মানবিক অনুসন্ধানের সময়ক্ষেত্র দিয়েই। অন্তত নূতন সময়ের নানা জটিলতার স্তরকে তাঁরা দেখিয়ে দিতে পারেন এবং সময় দ্বারা মানুষের গঠনের ক্ষেত্রটি কি হাতে পারে, তার ইঙ্গিতও তাঁরা দেন। কোনো একটি বিষয়কে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে বিচ্ছিন্নতাই সৃষ্টি হয়। তার কারণ 'তত্ত্ব

হল মুখ্যত একটি ধারণা, একটি অন্তর্দৃষ্টি, এই জগত ও জীবনকে দেখার একটি পথমাত্র'।[৭৪] অথচ জগতকে জানতে কিংবা বুঝতে তার স্বরূপ উপলব্ধি অন্যভাবে একজন উপন্যাস-শিল্পী করেন বলেই তিনি বোঝেন—

"আমাদের চেতনার গভীরে অবস্থিত পার্থক্যবোধ ও ভগ্নাংশবোধ পৃথিবীতে যে সংকট ডেকে আনে তার থেকে উত্তরণের জন্যে প্রয়োজন নতুন অন্তর্দৃষ্টি, জগত ও জীবন সম্পর্কে নতুন সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি।"[৭৫]

রবীন্দ্রনাথ একজন ঔপন্যাসিক হিসেবে তত্ত্ববিদের দৃষ্টিতে জীবন ও জগৎকে সময়ের পটে দেখেন না, বরং চলমান সময়ের ফাঁকে ফাঁকে যে আলোড়ন তিনি উপলব্ধি করেন— একদিকে খণ্ডকালের বিচ্ছিন্নতা, অন্যদিকে তার মিলন— উভয়কে সম্মিলন ঘটান। তত্ত্বের বেড়াজালে তাই তাঁকে উদভ্রান্ত হতে হয় না। গড়ে নিতে হয় না এমন কোনো অবিশ্বাসের জগৎ। 'করুণা', 'বউঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাস পর্ব তাই যেমন নঞর্থক সময়ের বাস্তব, রাজর্ষি'র ক্ষেত্রে তাই আবার সদর্থক উত্তরণ।

অতএব এই উত্তরণ পর্বটির নির্মাণের নেপথ্যে কতগুলো প্রশ্ন উদ্রেককারী সূত্র ধরে আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যায়—

১) 'রাজর্ষি' উপন্যাসের বর্তমান সংস্করণের পরিচ্ছেদ সংখ্যা চুয়াল্লিশ। কিন্তু 'বালক' পত্রিকায় এর প্রকাশ ছাব্বিশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত। অর্থাৎ গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় লেখক পূর্ণাঙ্গ রূপটি প্রদান করেন। অথচ প্রথম গ্রন্থ প্রকাশের (১২৯৩ সাল) অনেককাল পর এর সঙ্গে একটি সূচনাংশ যোগ করা হয় (শ্রাবণ ১৩৪৭), যেখানে স্পষ্ট ভাষণে চতুর্থ অনুচ্ছেদে বলা হয় — 'বস্তুত উপন্যাসটি সমাপ্ত হয়েছে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে।'[৭৬]

২) উপন্যাসটির কাহিনীপট ঐতিহাসিক। ইতিপূর্বে 'বউ ঠাকুরানীর হাট' উপন্যাস ও 'মুকুট' গল্পে ইতিহাসকে টানার প্রয়োজন বোধ করেন লেখক। কিন্তু 'রাজর্ষি'র ক্ষেত্রে এর কাহিনী গঠনের জন্য ঐতিহাসিক তথ্যের অধিক প্রয়োজন তিনি অনুভাব করেন।[৭৭] সেই অনুসারে রবীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক তথ্যের বিশুদ্ধতা রক্ষার্থে ত্রিপুরার তৎকালীন মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যকে পত্র লেখেন (২৩ বৈশাখ ১২৯৩ সাল) এবং সে পত্রে তথ্যের জন্য প্রয়োজনে উপন্যাসটির যথাসাধ্য পরিবর্তন তিনি করবেন বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর এই প্রতিশ্রুতি রক্ষার কোনো নিদর্শন মেলে না।[৭৮]

৩) রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস জগতে সৃষ্টির দিক দিয়ে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে এই উপন্যাস দ্বিতীয় ও অন্তিম নিদর্শন। বঙ্কিমচন্দ্রের মত ঐতিহাসিক পট

কিংবা প্রবণতা দিয়ে পরবর্তী কালে তিনি সমকাল আঁকতে প্রবুদ্ধ নন্। অবশ্য পরবর্তীতে 'রাজর্ষি'র গল্পাংশ নিয়ে 'বিসর্জন' নাটক তিনি রচনা করেন। কিন্তু ইতিহাস সেখানে তুলনায় অনেক অবদমিত। অথচ বঙ্কিমের আদর্শের দ্বারা প্রাণিত হয়ে যুগের দাবী মেনেই রবীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সাজাতে শুরু করেন 'বউঠাকুরানীর হাট' থেকেই।

স্বভাবতই এই চিহ্নায়ক সূত্রগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা, রবীন্দ্রনাথ 'রাজর্ষি' উপন্যাসকে ধরেই তাঁর একটি মাত্র বয়ান গঠন সম্পন্ন করেন না। একটি বৃত্তকে ধরে পূর্বতন বৃত্তগুলোকে পূর্ণাঙ্গ এবং পরবর্তী বৃত্তগুলোকে আভাসিত ও আন্দোলিত করেন। ঔপন্যাসিক যেখানে তাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে দেখা ভগ্নাংশ ছাড়িয়ে ওঠে আসেন, সেখানে তিনি নানাভাবে সতর্ক এবং সকল দিক দিয়ে বাজিয়ে নিতেও অনীহাগ্রস্ত নন্।

উপন্যাস-লেখকের এই শক্তি আছে বলেই তিনি সেই শিল্প রূপ সম্পূর্ণ করেন, যা সমগ্র মানুষকে গ্রহণ করে তাকে পূর্ণরূপ দিতে চায়। সমালোচক তাই বলেন—" ..the first art to attempt ot take the whole man and give him expression."[১৯] এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ মানুষকে তুলে ধরতে তার পারিপার্শ্বিক বৈচিত্র্য, প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষ বহু অনুভূতি দ্বারা যুক্ত ভাবনার প্রকাশ স্বাভাবিক। সেইসঙ্গে নানাদিক দিয়ে সম্পূর্ণ মানুষটির হয়ে ওঠার পেছনে লেখকেরও হয়ে ওঠা। আর সকল স্পন্দনকে ছুঁয়ে সময়ের দৃষ্টি দিয়ে নিরন্তর অনুসন্ধান। রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের বিস্তৃত অবসরে এই প্রচ্ছন্ন উচ্ছ্বাসকে সুচারুভাবে ধরিয়ে দিতে প্রচুর সুযোগ পান বলেই, তাঁর প্রতিটি নির্মাণের সোপান বেয়ে এক একটি ইঙ্গিতকে গভীরভাবে ভেবে দেখার এবং ভাবিয়ে তোলার অবকাশ তৈরি করেন। সেজন্য বারে বারেই 'রাজর্ষি' উপন্যাসে এসে তাঁকে ভাবতে হয়, সাবালক হয়ে ওঠার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে হয়।

রবীন্দ্রনাথ যখন 'রাজর্ষি' লেখেন, তখন তিনি 'করুণা' ও 'বউঠাকুরানীর হাট' উপন্যাসদ্বয়ের পূর্ব-অভিজ্ঞতাকে নিশ্চয়ই ছাড়িয়ে আসেন। অতএব পূর্ব-অভিজ্ঞতার সঙ্গে বর্তমান-অভিজ্ঞতার মিলন এখানে স্বাভাবিক। কিন্তু এই মিলন পূর্ব অভিজ্ঞতার সূত্রে নবীন-অভিজ্ঞতার সংযোজন মাত্র নয়, বরং পূর্ব অভিজ্ঞতার মানবিক সংশোধন, তাকে সাঙ্গীকরণ করে তার সংগঠন। অতএব 'করুণা ও 'বউঠাকুরানীর হাটে' সময়ের যে আলো নিভে আসে, একে এখানে পুনুরুজ্জীবিত করা হয় বললে কম বলা হবে, বরং সময়ের নানা বিচ্ছিন্নতাকে কাটিয়ে ঔপন্যাসিক-শক্তিতে সমস্যার উত্তরণের নির্দেশ দেওয়া হয়। তাই নঞর্থক কালের ভ্রান্তি আর সংঘাতকে ছাড়িয়ে

নয়, তার দীর্ঘ ক্ষমতাধারী প্রবাহে ভয়ংকর সংগ্রাম চালিয়ে তবেই অঙ্গে ধারণ করে নিতে হয় সমাধান। প্রবাহিত কাল ধরে তখন এর গতি আরো কুটিল হয়, বিচিত্র নৈপুণ্য নিয়ে ছদ্মবেশ ধরে। লেখক তাঁর এই গোটা পর্বে সময়কে লাফিয়ে লাফিয়ে অতিক্রম করেন 'করুণা' থেকে 'রাজর্ষি'তে - বহুরাত্রি আর প্রভাতের সমাবেশ ঘটিয়ে। কিন্তু শুরু থেকে মধ্যপর্ব পর্যন্ত যখন তিনি দেখেন নঞর্থক শক্তি 'বাসনার অন্ধকার'কেই ধরে রাখে, তখন বিভ্রান্ত দর্শকের মত শুধু দেখে যাওয়া নয়, শুধু বিচ্ছিন্নতা দিয়ে আধুনিকতার বৈচিত্র্য গঠন নয়। তার প্রতিবিধানের ব্যবস্থা নেওয়া হয় সামগ্রিক বোধের অন্তরজগৎ থেকে। পূর্ববর্তী উপন্যাসদ্বয়ে তাই যেখানে সম্পর্ক দানা বাঁধতে পারে না, 'রাজর্ষি'তে এসে তার গঠনের দায়িত্ব সম্পন্ন হয়। জার্মান দার্শনিক নিৎসের দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা দেখা নূতন সময়ের বিশ্বজনীন মানবাধিকার, নীতিবোধ ও সভ্যতা সম্পর্কিত বুদ্ধি বিভাসিত আন্দোলনের[৮০] অবাস্তবতা বোধ সাহিত্য সৃষ্টিকে এখানে নিশ্চিহ্ন করতে পারে না।

উপন্যাসটি যেখান থেকে যাত্রা শুরু করে, ক্রমান্বিত কাল প্রবাহধারায় তখন প্রভাতের পটভূমিকা। একজন সাহিত্য সমালোচক উল্লেখ করেন—

"বউঠাকুরানীর হাটে' শক্তি মদমত্ত রাজকীয় দম্ভের যে কৃষ্ণবর্ণ ছবি কবি দিয়েছেন, রাজর্ষিতে যেন তারই বিপরীত, আত্মিক শক্তিতে বলীয়ান, অথচ নম্র, উদার, ক্ষমাশীল, স্নেহপরায়ণ, রাজকীয় রূপের বিস্ময়কর চিত্র আঁকলেন।"[৮১]

কিন্তু এই বিস্ময়কর চিত্রের বিপরীত অনিবার্যতা শুধু বিপরীত মাত্রাকে ছুঁয়ে বৈচিত্রসৃষ্টির তাগিদ থেকে নয়, সময়ের ধারাবাহিক গতিতে যে পরিণাম 'বউঠাকুরানীর হাটে' বর্তমান গড়ে নেয় অথচ যা চিরকালের সমকাল আদর্শের নয়, সেই স্থবির হয়ে পড়া যুগকে ক্ষমতার অপশাসন থেকে সহজাত নিয়মে মুক্ত করে তার স্বতন্ত্র চিত্রধারণ স্বাভাবিক। লেখক যে কেবল তাঁর আদর্শের বাস্তব প্রকাশের খাতিরে সূচনাপর্ব থেকে রাত্রি অবসানে প্রভাতের ছবিকে মীমাংসার সূত্র হিসেবে অবলম্বন করেন, তা নয়। বরং সময়ের অবিরত পালা বদলের স্বভাব লক্ষণকে তিনি ধরেন। তাই উপন্যাসটির পট পরিবর্তন কোনো আদর্শের দায় বহনে নয়, অবধারিত রূপে আসে। রবীন্দ্রনাথ সে সত্যকে স্বীকৃতি না দিয়ে থাকতে পারেন না বলেই মানবিক কালের বিজয় তাঁর পর্যবেক্ষণের কাঙ্ক্ষিত ফল হলেও উপন্যাসে অধিকার প্রয়োগ করে (যেহেতু, উপন্যাসটি গড়ে উঠেছে তাঁরই চেতনায়) তাকে চেপে ধরেন না। প্রবাহিত সময় ধর্মকে মেনে অপেক্ষা করেন, ধৈর্য্য ধরেন — জোর করে তার স্বাভাবিকতাকে বদলে দিতে চান না। 'করুণা'র নরেন্দ্র আর

'বউঠাকুরানীর হাটে'র প্রতাপাদিত্য তাই তাদের অনুকূল বাতাবরণে নঞর্থক কালের রাজত্ব চালিয়ে যেতে পাবে। কিন্তু নির্বিশেষ কালের সীমানা কে নির্ধারণ করবে? নিশ্চয়ই নরেন্দ্র-প্রতাপাদিত্য সম্প্রদায় নয়! অতএব স্বয়ং লেখক যখন রাত্রিব অন্ধকারকে ছাড়িযে প্রভাতেব আলোককে দেখেন, তখনই তাঁর কাছে পরিষ্কাব হয়ে পড়ে সময়েব বৃহত্তর আর ক্ষুদ্রতর সীমা। বৃহত্তর কাল ক্ষুদ্রতরকে ধারণ কবে এগিয়ে যায়, ক্ষুদ্রতর তার ক্ষুদ্রতম পরিধিতে আটকে পড়ে। লেখক শেষ পর্যন্ত এই অভিজ্ঞতালব্ধ উপকরণকে ধীরে ধীরে প্রস্তুত করে তাঁব প্রেরণার সূত্রকে আবিষ্কাব করেন।

'করুণা' উপন্যাসে করুণা চরিত্রের সূচনাপর্বকে 'জীবনের প্রত্যুষ কাল' বলে রবীন্দ্রনাথ কাহিনীর সূচনাতেই উল্লেখ করেন। কিন্তু নদীর উৎস হতে প্রসারণের ফলে নূতন নূতন ক্ষেত্র অধিকারে স্বাভাবিক দূষণ যেমন তাতে ঘটে, তেমনি করুণাব প্রত্যুষকালীন জীবন সময়-প্রসারণে স্বপ্নের রাজমহলকে ভেঙে মধ্যাহ্নের প্রখব সূর্যালোকে দগ্ধ হয়ে রাত্রির অন্ধকারেও পথ-সন্ধান করে ফেরে। যার পরবর্তী সূত্রটি ধরে থাকে 'বউঠাকুরানীর হাটে'র বিভা। অতএব করুণার মত সূচনাতেই তাব জীবনের প্রত্যুষকালের সহজ-সরল বাতাবরণ নেই। অনুপকুমারের নিবিড় স্নেহেব দ্বারা সিক্ত বাল্যের ক্রীড়াভূমিকে ছাড়িয়ে, নবেন্দ্রের দ্বারা নঞর্থক কালের হাতে বিক্ষত হতে হতে করুণা এবার রূপান্তরিত হয় বিভায়। তাই রাজকন্যা হয়েও তাকে প্রত্যাখানের অপমান আর অসহযোগী মানবগোষ্ঠীর দ্বারা সৃষ্ট অনিশ্চিত অবস্থানকে ধারণ কবে নিতে হয়। নঞর্থক কালের নিয়ন্ত্রণে সে মানবিক চরিত্রের কাছ থেকেও পূর্ণাঙ্গ আশ্বাস পায় না। অতএব 'রাজর্ষি'র সূচনা কোনো পরিকল্পনাহীন কিংবা বিচ্ছিন্ন ভাবনার আধার থেকে নয়, কুটিল রাত্রির পর সহজ সকালের, সমযের বৃত্তগত ধারণারই প্রকাশ। কিন্তু সময়ের মাত্রা জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তার দ্রুত ও ধীর— নানা স্বর প্রয়োগ কাহিনীর বিচিত্র গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের মাঝখানে অদৃশ্যভাবে যেখানে 'করুণা' থেকে 'রাজর্ষি' পর্যন্ত ব্যক্তিকে উন্মোচিত করে ও মানবিক কালে তার রূপান্তর দেখায়, সেখানেই দৃষ্টিকোণের প্রতিফলন ঘটে শিল্পভাবনা নিয়ে। এই রূপায়ণ 'করুণা' থেকেই সম্ভাবনাময় ছিল বলে 'বউ ঠাকুরানীর হাটে' তার সূক্ষ্ম প্রসার, আর 'রাজর্ষি'তে বহুবিধ শাখার প্রয়োজনীয় সম্মিলন ও সমাপ্তি ঘটে শিল্পসৃষ্টির আয়োজনকে ঘিরে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই এক একটি বৃত্ত রচনা করে লেখক সময়ের স্থানিক পরিধি ধরিয়ে দিতে চান, কিন্তু পাশাপাশি খোলা থাকে তার অন্তরযোগসূত্র। 'রাজর্ষি'তে এসে কালের সীমিত মাত্রার সঙ্গে

সেই আভাসে ব্যক্ত অন্তর-যোগসূত্রটি মূর্ত হয়ে ওঠে। ফলে যুক্ত হয় বৃত্তের আরেকটি আলাদা মাত্রা। ছকের দ্বারা ব্যাপারটি এভাবে বোঝানো যায়—
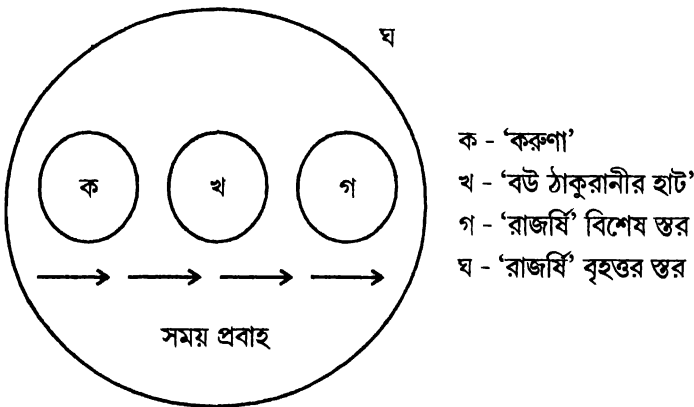
অতএব, 'রাজর্ষি' রবীন্দ্রনাথের এমন একটি প্রথম উপন্যাস যার সংহতি ও সম্প্রসারণ সুস্পষ্ট ও বহুমুখী। যে কারণে তার শিল্প আঙ্গিককে প্রকাশ ঘটাতে গিয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে নানা পরিকল্পনা এবং পরিচর্চার প্রয়োজন। আলোচনার শুরুতে তাই যে চিহ্নায়ক সূত্রগুলো উত্থাপন করা হয়, তার জবাব পর্যালোচনার ফাঁকে ফাঁকেই অনুসন্ধান করে নিতে পারি।

পূর্ববর্তী উপন্যাস 'বউঠাকুরানীর হাট' প্রসঙ্গে আলোচনায় বলা হয়, — রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসের পটে সেখানে গল্পকে সাজান, অথচ প্রতাপাদিত্যের শাসনতন্ত্র নিয়ে যে ঐতিহাসিক আখ্যান রচিত হয়, তাতে সে যুগ নামমাত্র উপস্থিত। অর্থাৎ বৃত্তটি পূর্ণ আকারে সে-কালকে চোখে ধরিয়ে দেয় না। এমনটাই স্বাভাবিক, কেননা, ক্রমান্বিত কাল পরিধিতে তখন একনায়কতন্ত্রের তীব্র আধিপত্য চলছে। কোনো জন-সম্মিলনের প্রকাশ এবং তাকে গঠনমূলক প্রচেষ্টা-দান সেখানে নেই বলেই প্রতাপাদিত্য গোটা যুগটিকে শাসন করেন সত্য, কিন্তু ভবিষ্যতের সঙ্গে তার পরিচয় সম্পন্ন করে যেতে পারেন না। 'রাজর্ষি' উপন্যাসের ক্ষেত্রটি এ ব্যাপাকে আলাদা। রাজার শাসন এখানে ব্যক্তি এবং তাকে ঘিরে সমাজ গঠনের কাজে নিয়োজিত বলেই জনগণকে দিয়ে সে-যুগ প্রকাশ হতে পারে। কাহিনীতে ইতিহাসের পটভূমিকায় শাসনের দণ্ড তখন রাজা গোবিন্দমাণিক্যের হাতে, যিনি প্রথম থেকেই তাঁর ব্যক্তিচেতনা দিয়ে ভাবনার প্রসারণ ঘটান। কিন্তু পাশাপাশি দুই উপন্যাস, 'বউঠাকুরাণীর হাট' কিংবা 'রাজর্ষি'— যাই হোক, ইতিহাসের পাতায় দু'টো ক্ষেত্রেই কাল-সন্ধান রবীন্দ্রনাথের বিশেষ একটি উদ্দেশ্যের বাহন হয়ে ওঠে। বঙ্কিমচন্দ্র যে

ভাবনাকে নিয়ে ইতিহাস অনুসন্ধান করেন, সেখানে স্বভাবত রোমান্স ও রোমান্টিকতাকে তাঁর শিল্পধর্মের পরিপোষক করার কাজে ব্যবহৃত। সমকালীন কলকাতা-জীবনের ঘূর্ণিপাককে তিনি উপন্যাসে প্রায় এড়িয়ে চলেন,[৮২] আর সে কারণেই বর্তমান থেকে তাঁর আশ্রয় খোঁজা ইতিহাসের পাতায়। অর্থাৎ বর্তমান গঠনের অপূর্ণতা থেকেই লেখকের স্বপ্ন প্রয়াণ ঘটে দূর অতীতে। রবীন্দ্রনাথ 'বউঠাকুরানীর হাট' উপন্যাসে কেবল বর্তমান গঠনের অভাব বোধ থেকেই ইতিহাসের অতীতে মুক্তির পথ অনুসন্ধান করেন না। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'করুণা'তে যে সমকাল তিনি আঁকতে চান, তারই সমস্যা আরো প্রসারিত হয়ে ইতিহাসের অতীত পটে সংযোগ স্থাপন করে। কেননা, "The past, as presented in history, is not over and done with"[৮৩] কিন্তু বিস্তৃত অতীত (ঊনবিংশ শতক থেকে ষোড়শ শতক) তাঁর বর্তমানকে কাটিয়ে উঠলেও, অতীত তখনো মানবিক কলস্বর নিয়ে ব্যক্তি এবং সমাজ গঠনে অসমর্থ— এই অতৃপ্তি বোধ থেকেই পুনরায় 'রাজর্ষি' উপন্যাসে লেখকের ইতিহাস অনুসন্ধান চলে।

কিন্তু কোনো একটি সমস্যাকে সময়ের বৃত্ত থেকে দূর অতীতে নিয়ে লেখক শুধু তাঁর আকাঙ্ক্ষাই ব্যক্ত করেন না, সেই সঙ্গে নিজের শিল্পবোধকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে প্রচুর প্রসারণ-দক্ষতাও অর্জন করেন। লেখক তাঁর বর্তমানের সংকোচন ধর্মকে সাবালক করে তুলতেই এই প্রসারণ শক্তিকে আত্মস্থ করে নেন। অতএব ইতিহাস দিয়ে অতীত-অবস্থানে রবীন্দ্রনাথ নিজের ঔপন্যাসিক শক্তিকে বাজিয়ে নিতে চান সময়ের অতীত-ভবিষ্যৎ গমনাগমনের পথটিকে স্বচ্ছ করে তোলার তাগিদে। প্রতিমা নির্মাণের আগে শিল্পী যেমন তার আয়োজনকে সম্পূর্ণ করেন, রবীন্দ্রনাথ তেমনি অতীতের প্রসারণ শক্তিকে প্রস্তুত করে নিজেকে তৈরি করেন। 'বউঠাকুরানীর হাটে' তাঁর আংশিক সাফল্য এবং অতৃপ্তিবোধ তাঁকে 'রাজর্ষি'তে পুনরায় ইতিহাসের অতীত-পরিসরে ব্যাপৃত হতে প্রেরণা যোগায়। লক্ষ্যণীয়, এই সাফল্য অর্জনের জন্য তিনি বর্তমান ক্ষেত্রকে পরিষ্কার করতে নিবিড় অভিনিবেশ নিয়ে তথ্য সন্ধান করেন। উপন্যাসটির ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদের উপকরণ স্টুয়ার্টকৃত বাংলার ইতিহাস হতে সংগৃহীত এবং উপসংহারের শেষ দুই অনুচ্ছেদ কৈলাশচন্দ্র সিংহের ত্রিপুরার ইতিহাস থেকে উদ্ধৃত বলে উল্লেখিত। ত্রিপুরার মহারাজকে এ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ পত্রও দেন, আলোচনার শুরুতে যা উল্লেখিত। তবু সমস্ত আয়োজনের মূল লক্ষ্য ইতিহাস নয়, উপন্যাস গঠন। তার চেয়েও বড় কথা, সময় দিয়ে শিল্পলোকের রহস্যকে আবিষ্কার করতে চাওয়া এবং তাতে চিরকালের সমকালকে প্রতিষ্ঠিত করা। অতএব কোনো একটি ঐতিহাসিক ঘটনাকে নিয়ে

সকল তথ্য-সমাহার ঘটানোর কার্যটি এক্ষেত্রে গৌণ। ইতিহাসের কাহিনী সেখানে লক্ষ্যবস্তু নয়, প্রলম্বিত শক্তি দিয়ে অতীত-সৃষ্টিতে সংকোচন বর্তমান-বোঝানোই তার কাজ। তাই 'রাজর্ষি' উপন্যাসে ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে যাবার পর লেখক পরবর্তী কোনো উপন্যাসে ইতিহাসের দ্বারা অতীত-অনুসন্ধানের প্রয়োজনবোধ আর করেন না, তেমনি ইতিহাস গঠনই তাঁর কেন্দ্রীয় স্তর নয় বলেই ত্রিপুরার রাজপরিবারের অনেক তথ্য বীরচন্দ্র মানিক্যের কাছ থেকে পেয়েও রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী 'রাজর্ষি'র সংস্কার সাধনের জন্য ব্যস্ত হন না।

উপন্যাসটির কাহিনী বৃত্ত নিয়ে যদি বিচার করা হয়, তবে তাতে স্পষ্ট দু'টো পর্ব চোখে পড়ে। প্রথম পর্বে ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্যের সঙ্গে রাজ্যের ভুবনেশ্বর মন্দিরের পুরোহিত রঘুপতির দ্বন্দ্বের কাহিনী ঘনিয়ে ওঠে রাজার দ্বারা জীববলি নিষেধের আদেশ অনুসারে। সেখানে শেষপর্যন্ত রঘুপতি তাঁর স্নেহের একমাত্র অবলম্বন জয়সিংহের আত্মবিসর্জনকেও প্রত্যক্ষ করেন। ইতিহাস এখানে নামে মাত্র অস্তিত্বশীল, যেমনটা ঘটে 'বউঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাসে। কিন্তু মন্দিরের পুরোহিতের সঙ্গে রাজার দ্বন্দ্বের এই সামান্য সূত্র ধরেই অধিকারবোধের দীর্ঘদিনের ঘুমন্ত প্রবৃত্তি একদিকে জাগ্রত হয়ে ওঠে, অন্যদিকে রাজার রাজনৈতিক আদর্শ কতটা মানবিক কাল গঠনে সমর্থ, তার শক্তির ক্ষেত্রটিও মূল্যাঙ্কিত হয়। অতএব দ্বন্দ্বটির পরিসর বৃহত্তর হয়ে রঘুপতির মাধ্যমে উপন্যাসে প্রবেশ করে দ্বিতীয় পর্বে এবং সেখানে মুঘল সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালের ইতিহাস অবগুণ্ঠন ত্যাগ করে বেরিয়ে আসে। রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে যে উপন্যাসটি সূচনায় উল্লেখ করেন — মূলত এর সমাপ্তি ঘটছে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে, অথচ তার পরের পরিচ্ছেদগুলোকে তিনি প্রয়োজনহীন বলে বর্জন করেন না। তাতে মনে হয়, আসলে মুঘল-ইতিহাসের যুগকে তুলে এনে তিনি বর্তমান মানুষের আত্মিক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের জটিলতাকেই রূপ দিতে ব্যাপ্ত পরিসর হিসেবেই কাজে লাগান। যেখানে ইতিহাসপট প্রয়োজনীয় নয়, কিন্তু একদিকে বিস্তৃতি, অন্যদিকে অতীতের শক্তি দিয়ে তাকে সজীব করার আয়োজন থাকে। পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে রঘুপতির জীবনের ক্ষেত্রও একটি বিশেষ মাত্রায় এসে আঘাত পায়। যে ক্ষমতাকে আত্ম ঐশ্বর্যের বাহন করে তিনি অস্তিত্ববান, গোবিন্দমাণিক্যের সঙ্গে তাতে তাঁর নিরন্তর সংঘর্ষ। তবু তার পরাভব নেই, বরং নূতন নূতন পরিকল্পনা নিয়ে কূটনীতির দ্বারা তিনি উত্তীর্ণ হতে চান। কিন্তু প্রাণ ভ্রমরের মত যে একটি মাত্র অবলম্বনকে ঘিরে তাঁর সমকাল গঠন, সেই জয়সিংহের আত্মবিসর্জন উক্ত পরিচ্ছেদে রঘুপতিকে শুধু জগতের কাছে পরাজিত করে না, অন্তরের কাছে নিঃস্বও করে। কাজেই—

"রঘুপতি চীৎকার করিয়া উঠিলেন— জয়সিংহকে তুলিবার চেষ্টা করিলেন,

তুলিতে পারিলেন না। তাঁহার মৃতদেহের উপর পড়িয়া রহিলেন। রক্ত গড়াইয়া মন্দিরের শ্বেত প্রস্তরের উপর প্রবাহিত হইতে লাগিল। ক্রমে দীপগুলি একে একে নিবিয়া গেল। অন্ধকারের মধ্যে সমস্ত রাত্রি একটি প্রাণীর নিঃশ্বাসের শব্দ শুনা গেল; রাত্রি তৃতীয় প্রহরের সময় ঝড় থামিয়া চারিদিক নিস্তব্ধ হইয়া গেল।"[৮৪]

অন্তর্ভেদী বেদনার এই ক্রমান্বিত সময় পট ধরে তার পরিণামকে ছুঁয়েই রবীন্দ্রনাথ প্রমাণ করেন, মানবিক কালের দ্বারাই সমকাল গঠন এবং তার সুরক্ষা প্রদান সম্ভব। পূর্ববর্তী উপন্যাসের নরেন্দ্র, রামচন্দ্র কিংবা প্রতাপাদিত্যের মতন চরিত্রদের অন্যকে আঘাত করে নিজের আত্মতন্ত্রের লক্ষ্মণ-রেখা টেনে সমকাল গঠনের প্রয়াস কখনোই সার্থক নয়। তাদের অস্বচ্ছ পথই উত্তরাধিকার সূত্রে রঘুপতির মধ্যে ধর্মের ছদ্মবেশ নিয়ে দেখা দেয়। যে ধর্মে সুপ্ত হয়ে থাকে ক্ষমতার দ্বারা লোভ, প্রতিহিংসা, প্রতিপত্তি স্থাপনের অদম্য ইচ্ছা। কিন্তু অন্যদিক দিয়ে মানুষ হিসেবে তাঁর মধ্যে জয়সিংহকে কেন্দ্র করে বিরাজ করে ভালবাসার নন্দনকানন, যেখানে আত্মসম্মানবোধের তাড়না, ক্ষমতার দাম্ভিকরূপকে ছাড়িয়ে অন্য-রঘুপতির অবস্থান। কিন্তু এই দুই জগতের দুই রঘুপতির মিলন তখনও সম্ভব নয়, সময়ের আরো অভিজ্ঞতা অর্জনেব ক্ষেত্রটিকে ছাড়িয়ে। অতএব ক্ষমতার লিপ্সা নিয়ে তাঁরই অস্ত্র যখন তাঁকেই উল্টে এখানে আঘাত হানে, তখন তাঁর গৃহশূন্যরূপটিকে প্রকটিত করতে রবীন্দ্রনাথ হয়তো এ কারণেই এখানে থামবার কথা বলেন। কারণ তাঁর শিল্পসৃষ্টির উদ্দেশ্যটি পূর্ববর্তী উপন্যাসদ্বয়ের অভিজ্ঞতাকে ছাড়িয়ে এখানেই সম্পূর্ণ হতে পারে।

তবু এখানেই থেমে গেলে রঘুপতিকে কেন্দ্র করে উপন্যাসটির দুটো ছবি অসম্পূর্ণ থাকে—

(১) গৃহচ্যুত বঘুপতির ক্ষমতার সমকাল গঠনে প্রতিহিংসার ধ্বংসাত্মক চরিতার্থতা নিয়ে তাঁর পরিব্যাপ্ত রূপ— অনাবৃত ইতিহাস-পট যার সঙ্গে কাহিনীসূত্রে যুক্ত।

(২) ইতিহাসের সাক্ষ্য রেখে স্থূল ক্ষমতা অর্জনের চরিতার্থতা শেষে সমস্ত রাজনৈতিক কোলাহলকে ছাড়িয়ে নিঃস্ব সংসারটিকে আরো নিঃস্বরূপে উপলব্ধি করা, —যেখানে গোবিন্দমাণিক্যের নির্দেশিত পথের আশ্রয় তাঁকে সঠিক অবস্থান দেয়।

লক্ষ্যকে সামনে রেখে নিরত কর্মপ্রণালীর ব্যস্ততা নিয়ে ইতিহাস-পট উপন্যাসে প্রবেশ করে, অথচ লক্ষ্য সমাপ্ত হলে রঘুপতি উপলব্ধি করেন তাঁর ব্যক্তি-সমকাল গঠনের নিদারুণ ব্যর্থতা। জয়সিংহের মৃত্যুকে দ্বিতীয়বার অনুভবই হচ্ছে তাঁর দীর্ঘকালের সঞ্চিত অন্ধসংস্কারের অবসান। সেজন্য তখনই সম্ভব হয়ে ওঠে গোবিন্দমাণিক্যকে অনুসরণ— চিরকালের সমকাল গঠনের যা অনুকূল। অতএব

দ্বিতীয় পর্ব সম্পন্ন না হলে একদিকে রঘুপতি ও গোবিন্দমাণিক্যকে নিয়ে বলি প্রথাকে কেন্দ্র করে ত্রিপুরার সীমায় যে অস্পষ্ট ইতিহাস উপন্যাসে রচিত হয়, নিশ্চয়ই অতীত প্রসারণে সার্থকভাবে লেখক তার উদ্দেশ্যকে সম্পন্ন করতে পারেন না। অন্যদিকে জীববলি প্রথাকে উপলক্ষ্য করে নঞর্থক কালের ক্ষমতা অধিগ্রহণের বহুদিনের সংস্কারকে ইতিহাসের পাতায় স্বার্থ-সর্বস্ব বৃহত্তর সংঘর্ষে লিপ্ত করে না দেখালে তার ছদ্মবেশ খসে পড়ে না। সেইসঙ্গে ক্ষণজীবী সংস্কারের পরাজয় ঘটিয়ে চিরদিনের মানুষ ওঠে আসে না, — তার মিলনের প্রেরণাও হয় অবাস্তব। কাজেই সর্বদিক দিয়ে 'রাজর্ষি' উপন্যাস মারাত্মকভাবে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় বলেই নানা সময়ের ব্যাপক অদলবদল ঘটালেও তাঁর পূর্ণবৃত্ত গঠনের কল্পনা থেকে সরে আসেন না রবীন্দ্রনাথ।

উপন্যাসটির আরম্ভ রাজা গোবিন্দমাণিক্যের প্রসঙ্গ ধরেই। তার কারণ, লেখকের গোটা দৃষ্টিকোণের মধ্যবর্তী বিন্দু তিনিই। কিন্তু এই মধ্যবর্তী বিন্দুটি উজ্জীবিত হবার অপেক্ষা রাখলেও তার উপযুক্ত সঞ্জীবন-উৎসেরও প্রয়োজন। এক্ষেত্রে হাসি নামক সামান্য একটি ছোট মেয়ে, আর তার ছোট ভাই পর্বটিকে পূর্ণাঙ্গ করে। হাসির মধ্য দিয়েই গোবিন্দমাণিক্য তাঁর চলার পথটির আদর্শ বেছে নেন এবং যার ভবিষ্যতকে প্রসারিত করে ছোট ভাই। বালিকা হাসির একটি সহজ প্রশ্ন রাজার রাজত্বের দীর্ঘদিনের ক্ষমতার যে অপব্যবহার চলে, তার ভারকে বুঝিয়ে দেয়। তাই হাসির প্রশ্ন— 'এত রক্ত কেন?'— আমাদের চোখে একটি শ্রেণীগত স্বর— দীর্ঘকালের অবদমিত নঞর্থক কালের শাসনে বন্দী-প্রাণের বহু মানুষের মানবিক কালের কণ্ঠধ্বনি। গোবিন্দমাণিক্যের মতন সুস্থ এবং সংবেদনশীল মাধ্যম পেয়ে যা ধরা দিতে শুরু করে। আসলে এ প্রশ্ন একজন দেশশাসককে করা হলেও সাধারণ মানুষ হিসেবে স্বয়ং গোবিন্দমাণিক্যেরও তা মনের কথা। তাই এতদিনকার শুভ আলোকে দেখা ভুবনেশ্বর মন্দিরের জীববলিকে কেন্দ্র করে তার নেপথ্য-অশুভ রূপের ছদ্মবেশ খসে গিয়ে রাজার মনে চিন্তার উদ্রেক হয়। অনেকদিনের প্রচলিত বিশ্বাসের আড়ালে যে অমানবিক দর্শন মন্দিরের পবিত্রতাকে ঢাল করে আলোর বদলে অন্ধকারকেই নিয়ে আসে, হাসি আর তার ছোট ভাই তাকে মুছে দিতে চায়—

"হাসি জলে আচল ভিজাইয়া সিঁড়িতে বসিয়া ধীরে ধীরে রক্তের রেখা মুছিতে লাগিল, তাহার দেখাদেখি ছোটো হাত দুটি দিয়া তাতাও তাহাই করিতে লাগিল। হাসির আঁচলখানি রক্তে লাল হইয়া গেল। রাজার যখন স্নান হইয়া গেল, তখন দুই ভাইবোনে মিলিয়া রক্তের দাগ মুছিয়া ফেলিয়াছে।"[৮৫]

কিন্তু সুদীর্ঘকাল যে আত্মপরতন্ত্রের শাসন চলে আসছে, তাকে এত সহজে কি

মুছে দেয়া যায়। হাসি তাই এরই সূত্রে অসুস্থ এবং মৃত্যুবরণ করে। লক্ষণীয়, এতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর সময়কে একজন মানুষ হিসেবে গোবিন্দমাণিক্য অন্বেষণ করেন। কিন্তু হাসির মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যে অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করেন, সেই বিশেষ মুহূর্ত ধরেই রাজা হিসেবে এবার তিনি উপলব্ধি করেন শাসনশক্তিকে কাজে লাগানো প্রয়োজন নঞর্থক শক্তির উচ্ছেদ ঘটাতে।

রাজার ক্ষমতাকে এই বিশেষ সময়ে প্রয়োগ না করলে হাসি যে রক্তরেখাকে মুছে দিতে চায়, বড় শক্তির সাহচর্য ছাড়া তার বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। অতএব যে শাসনের অধিকার পেয়ে দীর্ঘদিন নরেন্দ্র করুণার উপর তার প্রবৃত্তিকে চাপিয়ে চলে, যে শাসনকে রাজার সম্পত্তি করে আত্ম-অহংকারের আবরণে প্রতাপাদিত্য গড়ে তোলেন অন্ধকারের রাজ্য, যে ধর্মীয় বিশ্বাসের নেপথ্যে পুরোহিতের শাসনতন্ত্র জীবের কণ্ঠরোধ করে বাতাস ভারি করে তোলে, সেখানে হাসির মাধ্যমে একটি মুহূর্তে গোবিন্দমাণিক্য তার গোটা চিত্রটি প্রত্যক্ষ করেন। তাই রাজার শাসন-শক্তির অধিকার নিয়ে তিনি মানবিক কালের অধিকারকেই ফিরিয়ে দিতে চান।

'রাজর্ষি' উপন্যাসে এখান থেকেই সচেতন সংঘর্ষের সূত্রপাত, আর এখান থেকেই রাজনৈতিক সময়েরও আলোড়ন শুরু। নঞর্থক কালের ক্ষেত্রটি তখন ধর্মীয় বিশ্বাসের আধারে প্রকাশমান। গোবিন্দমাণিক্যই রবীন্দ্র উপন্যাস জগতের প্রথম একজন ব্যক্তি, যিনি এই প্রকাশের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। তাকে সরিয়ে ফেলতে কোনো আবেদন নয়, কোনো প্রস্তাব প্রদান নয়— সরাসরি আদেশ করেন। কিন্তু দীর্ঘ সময়ের দ্বারা লালিত যে চেতনার ভগ্নাংশ দেখা দেয়, তাকে পূর্ণাঙ্গরূপে বোধ করাও তো সামান্য মুহূর্তে সম্ভব নয়। তাই গোবিন্দমাণিক্যের শুভ সিদ্ধান্ত তাঁর নিজের কাছে পূর্ণাঙ্গ হলেও অপরতার চোখে এর ফলাফল সহজে নিষ্পত্তি হতে পারে না। 'করুণা' কিংবা 'বউঠাকুরানীর হাটে' এই অপরতার অস্তিত্বকে নঞর্থক কালের প্রভাবে স্বীকৃতি নয়, বিলোপ ঘটানো হয়। তাই বিপরীত কোনো সংঘর্ষ নেই বলেই একটি মাত্র শক্তিই রাজত্ব চালিয়ে যায়। কিন্তু সেখান থেকে অভ্যাসের দাসত্ব ছাড়িয়ে গোবিন্দমাণিক্য যখন নূতন সময়ে অপরতার সম্মিলনে সত্তাকে জাগ্রত করে তুলতে চান, তখন স্বভাবতই 'রাজর্ষি' উপন্যাসে সংগ্রাম ঘনীভূত হয়ে ওঠে। যুক্ত হয় জটিলতার বিপুল গ্রন্থী, নানা-স্বরগ্রামের উচ্চাবচতা।

শাসনের অধিকার প্রাপ্ত হয়ে এককালে যারা রাজনৈতিক পরিসরে বিরাজ করতেন তাতে ভূসম্পত্তিধারী জমিদাররা হতেন মুখ্য। কিন্তু পরিচালনার অনেক ক্ষেত্রে তাদের উদারতা যেমন থাকত না তেমনি ছিল না শৌর্য। প্রজাকে তারা জড় সম্পত্তিরূপেই দেখতেন। অন্যদিকে বিস্তৃত পরিধি নিয়ে যারা সাম্রাজ্য স্থাপন

করে গেছেন, একনায়কতন্ত্রের অধিকার নিয়ে তারা ক্ষমতাকে খেয়াল রূপে ব্যবহার করতেন। তার ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাজার দ্বারা প্রজার মঙ্গলসাধন হলেও সেই মঙ্গলও রাজার সবুজ সংকেতের উপর নির্ভরশীল ছিল। অবশ্য অনেকক্ষেত্রেই তার ব্যতিক্রম হয়তো মিলবে। কিন্তু ব্যতিক্রম কখনও গোটা যুগের পূর্ণাঙ্গ স্বরূপ নয়। কাজেই দেখা যায়, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যোগ্য গণতন্ত্রের আদর্শ তখন সুদূর পরাহত। আবার রাজার ভূমিকা যখন নিষ্প্রভ হয়ে আসে, ধর্মের পুরোহিতের দ্বারা তখন শাসন নিয়ন্ত্রিত হতে শুরু করে। এই শাসনের ক্ষমতা সময়ের প্রবহমান ধারায় নানা ভাবে হস্তান্তর হয়, কিন্তু কলিযুগের অবসান হয় না। আমরা আজও এই যুগে বাস করছি বলেই সত্যযুগ আমাদের কছে স্বপ্নের মতই কল্পিত মূর্তি। আমরা আজও ছেড়ে আসতে পারি না মধ্যযুগ, যা ধর্মের আড়ালে পুরোহিত শক্তিকে দিয়ে একবিংশ শতকের বিজ্ঞান-মনস্ক জীবনেও কখনো কখনো সংস্কারকে বহন করে নিয়ে আসে। কাজেই সেই দৃষ্টিতে বিচিত্র নয় 'রাজর্ষি'তে রঘুপতির প্রতিমা বিসর্জনের ভেতর সমালোচকের দেখা হিন্দুদের সাকার পূজারীতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রচ্ছন্ন বিরোধিতা।[৮৬] কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এখানে কোনো একটি সম্প্রদায়ের মানুষ হিসেবে, অন্য সম্প্রদায়কে আঘাত করতে উদগ্রীব হয়ে শিল্প সৃষ্টি করেন না। ধর্মের ব্যাপারটিই এখানে গৌণ, মুখ্য, মানুষের সেই সত্যযুগের সন্ধান যা আমাদের বর্তমান সময় দিয়ে 'রাজর্ষি'র পুনর্পাঠে সচেতনভাবে ধরিয়ে দেবে এক একটি অদৃশ্য সূত্র। আমরা তাই পারছি না 'বউ ঠাকুরানীর হাটে'র অন্য একটি সমস্যার সঙ্গে 'রাজর্ষি'র কাহিনীকে আলাদা করতে। সমালোচককেও স্বীকার করতে হয়, যেখানে ব্যক্তির যন্ত্রণা উদারতম মুক্তির উত্তরণের আভাস, সেখানে অন্য একটি কাহিনীতে বিশ্বানুভূতির পূর্ণ প্রতিষ্ঠা। "লেখক প্রভাত সঙ্গীতের নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ অথবা প্রভাত উৎসবের কাল অতিক্রম করে অনেক দূর এগিয়ে এসেছেন।"[৮৭]

'রাজর্ষি'তে সামাজিক ও মানবিক কাল গঠনে মানুষের কাজের মৌলিক দায়িত্ব এবং তার সীমার পরিমাণ দেখানো হয়। গোবিন্দমাণিক্য তাই ছোট ভাই নক্ষত্ররায়ের রাজ্যলিপ্সার প্রেরণার পেছনে যে অশুভ প্রতাপধারী পুরোহিততন্ত্রের চক্রান্ত দেখেন, তারই পাশে রাজার রাজনৈতিক কর্তব্যকেও সূচিত করেন। অধিকারের ক্ষেত্র একটি মানুষের কর্তব্য অনুসারে কতটুকু চিহ্নিত, রঘুপতির ক্ষমতা এবং রাজার ক্ষমতা কতটুকু বিস্তারিত— তৃতীয় পরিচ্ছেদে নূতন চেতনার বার্তা নিয়ে নূতন সময়ের ঘণ্টাধ্বনিতে বেজে ওঠে মানুষ-গোবিন্দমাণিক্যের প্রেরণায় রাজা-গোবিন্দমাণিক্যের আদেশ— 'এ বৎসর হইতে মন্দিরে জীববলি আর হইবে না।' এই আদেশ কোনো একনায়কতন্ত্রের শ্রেণীগত স্বর নয়, ক্ষমতার অপব্যবহার নয়, কিংবা অন্য একটি শক্তির সঙ্গে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়াও নয়। এই স্বর দীর্ঘদিনের অন্যায় আর সীমা

লঙ্ঘনকারী শক্তির দ্বারা সৃষ্ট কালের সংস্কার সাধন। কিন্তু রাজার আদেশকে সেই নঞর্থক বর্তমান দিয়ে রঘুপতি মানবে কেন। বরং তাঁর মনে হয়, রাজাই নিজের সীমা নিজে লঙ্ঘন করছেন। কাজেই সেই সীমানার কথাটিই সতর্ক ভাষণে বলা হয়— "মহারাজ, রাজকার্য আপনি ভাল বুঝেন সন্দেহ নাই, কিন্তু পূজা সম্বন্ধে আপনি কিছুই জানেন না।"[৮৮] কিন্তু ক্ষুদ্র গণ্ডীর এই পূজার মাহাত্ম্য কি ধরনের তার চিত্রটি এরপর ক্রোধান্বিত রঘুপতির সংলাপে ধরা পড়ে সাম্প্রদায়িক শক্তিতে নঞর্থক কালের স্বরূপটিকে চিহ্নিত করে— "তুমি রাজা, তুমি ইচ্ছা করিলে প্রজার সর্বস্ব হরণ করিতে পারো, তাই বলিয়া তুমি মায়ের বলি হরণ করিবে! বটে! কী তোমার সাধ্য! আমি রঘুপতি মায়ের সেবক থাকিতে কেমন তুমি পূজার ব্যাঘাত কর দেখিব।"[৮৯] এ যেন একটি বিচ্ছিন্ন জগতের দাম্ভিক মানুষের দ্বারা অন্য আরেক বিচ্ছিন্ন জগতের প্রতি লড়াইয়ের আহ্বান। রাজা ইচ্ছা করলে প্রজার সর্বস্ব হরণ করতে পারেন, এই একনায়কতন্ত্রের অশুভ লক্ষণটিও রঘুপতি অনায়াসে উচ্চারণ করতে লজ্জাবোধ করেন না। রাজার কর্তব্যের এই অনুচিত ধর্ম সম্পর্কে তাঁর কোনো প্রতিবাদ নেই, কিন্তু মায়ের বলি বন্ধ করার মধ্যেই তিনি রাজার স্বেচ্ছাচারিতাকে উপলব্ধি করেন। নঞর্থক কালের সুদীর্ঘ সংস্কারের ভার এভাবেই রবীন্দ্রনাথ দেখান এবং পুরোহিত রঘুপতির জোরালো সমর্থনে তাঁর দিক দিয়ে যুক্তির দ্বারা বক্তব্যকে সদর্থক করে পক্ষান্তরে লেখক আমাদের সেই সংলাপ ধরেই বলে রাখেন— 'করুণা' থেকে 'বউঠাকুরানীর হাট' পর্যন্ত এ কোন্ কালের অবস্থান তার গভীর শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে চলে। যেখানে ধর্মের দ্বারা মঙ্গলের ধ্বজাবাহী মানুষও নূতন যুগের আলো দেখাতে পারেন না।

সময়কে গঠন করে সমাজের মঙ্গল সাধন যার ধর্ম সেই রঘুপতির দ্বারা ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে জনগণের মধ্যে বিদ্রোহ জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে উচ্চারিত হয়— "রাজা কে! মায়ের সিংহাসন কি রাজার সিংহাসনের নীচে?"[৯০] অর্থাৎ এখানেও একটি সময় গঠন চলে। কিন্তু তা চিরকালের সমকাল দিয়ে সমাজের মঙ্গল সাধন নয়। অথচ অন্যদিক দিয়ে রাজনৈতিক আদর্শকে সম্প্রসারিত করেন গোবিন্দমাণিক্য। কিন্তু তা রাজার ক্ষমতার শুভ প্রয়োগের দ্বারা শুধু কাল সীমানা নয়, সদর্থক সমকালও গঠন করে—

"সহস্র লোকের দুঃখকে আপনার দুঃখ বলিয়া গ্রহণ করো, সহস্র লোকের বিপদকে আপনার বিপদ বলিয়া বরণ করো, সহস্র লোকের দারিদ্র্যকে আপনার দারিদ্র বলিয়া স্কন্ধে বহন করো - এ যে করে সে-ই রাজা, সে পর্ণকুটিরেই থাক আর প্রাসাদেই থাক।"[৯১]

গোটা সংলাপটিই অপরতার সঙ্গে সত্তার সংযোগ। তাই এই কর্তব্যবোধের আবেদন কোনো একটি খণ্ড কালে সীমায়িত নয়। তথাপি যখন কোনো একটি যুগে অশুভ সমকালের অন্ধকার রাজত্ব করে চলে, তখন তার প্রতিটি যুগের মর্মবাণী কোনো না কোনো মানুষকে দিয়ে কোনো একটি মানুষকে শোনাতে হয়, এক্ষেত্রে গোবিন্দমাণিক্যের মাধ্যমে নক্ষত্র রায়ের মতো একটি বিভ্রান্ত যুগকে আলোড়িত করে। তার জন্য বিশেষ পরিবেশের দ্বারা একটি বিশেষ খণ্ড কাল গঠনও জরুরী। যে কারণে ঘন অরণ্যের মাঝখানে একটুখানি ফাঁকা জায়গায় সেই অবিচ্ছিন্ন ধর্মকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া যায়। মুহূর্তটির অস্তিত্ব একটি বিশেষ মাত্রায় সম্ভাবনাময় বলেই রাজার আদেশ-বাক্য দিয়ে চিরন্তনীকে উদ্দীপ্ত করে — 'সেই মুহূর্তে কালের স্রোত যেন বন্ধ হইল'।[৯২] অথচ তৃতীয় পরিচ্ছেদে সভাশুদ্ধ লোকের মাঝখানে রাজার আদেশ যখন মানবিকতার উচ্চ আদর্শে রাজনৈতিক ক্ষমতা নিয়ে ধ্বনিত হয়, তখন তার উপযুক্ত মুহূর্তটি নেই বলেই কেউই তার মূল্য অনুভব করে না। বরং মন্ত্রী সময়কে প্রলম্বিত করে অতীত পর্যন্ত টেনে পিতৃপুরুষদের বিশ্বাসের সেই পুরনো ক্ষেত্রটি দিয়ে রাজাকে প্রভাবিত করতে চান।

'করুণা' থেকে 'রাজর্ষি'র প্রথম ভাগ পর্যন্ত সময় পরিসরে রাজা গোবিন্দমাণিক্যই যথার্থ রাজনৈতিক শক্তি দ্বারা প্রথম যুগ গঠনে সার্থকতা অর্জন করে চলেন। অতএব অন্ধকারে পথ চলতে গিয়ে তিনি অপরতা ভিন্ন পথ-সৃষ্টি সম্ভব নয়, অনুভব করেন। কিন্তু অভ্যাস-দগ্ধ নঞর্থক কালের জগতে এই মুখ নূতন। তাই সাধারণ মানুষ অন্ধ সংস্কারের দ্বারা গঠিত কালের প্রতিমা হয়ে গোবিন্দমাণিক্যকে চিনতে পারে না। বরং তার বিপরীত চিত্র দেখে অসন্তুষ্ট হয়। মনে রাখতে হবে, এই নঞর্থক কালের বিশ্বাসের আবরণ দিয়ে রঘুপতিরও অস্তিত্ব। সরল সার্বভৌম মহাশয়ের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম তখন 'করুণা' বৃত্ত থেকে সরে এসে সময়ের দীর্ঘ পথ আধিপত্যের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে 'রাজর্ষি' পর্যন্ত সংস্কারান্ধ হয়ে ওঠে। যে কারণে তিনি নিজে তো বটেই, সেইসঙ্গে সাধারণ মানুষ বলি প্রথার প্রতি বিশ্বাস অর্জন করে বেশি। তাই গোবিন্দমাণিক্যকে পথ অতিক্রম করতে হয় অনেক — রাজা থেকে ঋষিতে, ঋষি থেকে রাজর্ষিতে। পূর্ণাঙ্গ এই পালা-বদলের ইতিহাস অনেক অপরতার সন্দেহ, সত্তার সংশয় এবং দীর্ঘ সংগ্রাম পেরিয়ে আসা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার মাধ্যমে একটি সদর্থক কাল-গঠন সম্ভবপর হয়ে উঠতে শুরু করে বলেই এই যুগের প্রতিভূ হিসেবে বিল্বনের আবির্ভাব পরবর্তীতে সম্ভব হয়। বিল্বন চিরকালের সমকাল আদর্শের যথার্থ ফসল, রঘুপতির মত তাঁরও ব্যক্তি পরিচয় ব্রাহ্মণ হিসেবেই। কিন্তু সেই পরিচয়কে ছোট গণ্ডীতে আবদ্ধ না রেখে তার প্রসারণ তিনি ঘটান অথচ

কর্তব্যবোধেব সীমানা লঙ্ঘন করেন না। সদর্থক কালের সৃষ্টি তখন সত্তার সঙ্গে অপরতার সম্মিলনে নির্মাণ হতে শুরু করে বলেই রঘুপতি যে সর্বনাশেব খেলায় মেতে ওঠেন, যে বিভেদের বীজ বপন করেন তাকে বিল্বন প্রত্যক্ষ করেন এবং জাতিগত প্রশ্ন তোলেন— 'এ তো ব্রাহ্মণেব কাজ নয়।'[১৩]

এক্ষেত্রে দুই পরস্পর ভিন্ন সমকাল আদর্শ বিল্বনেব সঙ্গে রঘুপতির তুলনা দিয়ে ব্রাহ্মণের অধিকার বিচার স্পষ্ট হয়। ব্রাহ্মণের বাহ্যিক আচার দ্বারা জীববলি, উপবীত ধারণ ইত্যাদি সমস্তই তাঁর ক্ষমতার আগ্রাসন স্পৃহাকে বাড়ায় — যার দুর্বার স্রোত সাম্রাজ্য অধিকারের আবর্তে এসে মিলিত হয় অথচ মানুষের বৌদ্ধিক বিকাশেব পথটিকে উন্মুক্ত করে তোলে না। কিন্তু সদর্থক কালেব উজ্জ্বল আলো নিযে গোবিন্দমাণিক্য যখন ভিন্ন উচ্চারণ সৃষ্টি কবে তোলেন, তখন সেই জগত থেকেই এমন এক ব্রাহ্মণের আবির্ভাব হয যিনি মুখোশেব কারবার করেন না, মুখ অন্বেষণ করেন। তাই উপবীত ধাবণ, জীববলি কিংবা মন্দিবের দেবী আরাধনাকেই কর্তব্য বলে বিল্বন মানেন না। ব্রাহ্মণ্য ধর্মেব বিদ্যাব অধিকাব নিযে তিনি দেশ গঠনের তৃণমূল পর্যায়ে অবতীর্ণ হন, কুসংস্কাব-সংশযকে দূর করে চলেন। এজন্যই মানুষের রোগের চিকিৎসার প্রচেষ্টাও তাঁব দ্বাবাই দেখানো হয়। অপ্রত্যক্ষভাবে তিনি ক্ষত্রিয়কেও সাহায্য করে চলেন বাজাব সংশয়কে দূর করে। অতএব গোবিন্দমাণিক্য যে একা সদর্থক কালকে নিযে এসে তাব সৃষ্টিকর্তা হয়ে ওঠেন না, নূতন কালের স্বভাবধর্ম অনুসাবে অপবতার সঙ্গে সত্তাকে বাজিয়ে নিতেও তিনি অনেক ভ্রান্তি থেকে বিল্বনের মাধ্যমে উত্তরিত হবাব প্রেরণা পান — তার পরিচয় পাওযা যায়। উদাহরণ হিসেবে দ্বাচত্বারিংশ পবিচ্ছেদে গোবিন্দমাণিক্য বিল্বনের আদর্শ অনুসরণ করেই লোকালয়ের মধ্যে ফিবে আসার ব্রত গ্রহণ করেন। ত্রিংশ পরিচ্ছেদে রাজা গোবিন্দমাণিক্য যেখানে এতদিনের ধ্রুব আদর্শ পথটি নিয়ে সংশয়ের মধ্যে পড়েন— 'আমি কি মায়ের বলি বন্ধ করিযা পাপ করিয়াছি?'— সেখানে বিল্বন তার সদুত্তর দেন। বিল্বনেব কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে তাই রাজাকেও বলতে হয় 'তোমার কাজ দেখিলে আমার লোভ হয়'। সমাজ গঠনের ভেতর নূতন সময়ের নির্মাণের কাজে মানুষের সকলেরই ব্যক্তিগত স্তরের কর্মপদ্ধতি আছে, কিন্তু প্রত্যেক কাজই একটি আরেকটির যোগে সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। বিল্বনের মধ্যে এই শক্তি দেখা দেয় বলেই রাজার সঙ্গে রঘুপতির মত তাঁর বিবাদ ঘটে না, বরং রাজার ধর্মকে সম্পূর্ণ করতে তিনি সত্য উচ্চারণ করেন—

"মহারাজ, আমি তোমারই তো এক অংশ। তুমি ঐ সিংহাসনে বসিয়া না থাকিলে আমি কি কাজ করিতে পারিতাম! তোমাতে আমাতে মিলিয়া আমরা উভয়ে সম্পূর্ণ হইয়াছি।"[১৪]

অন্যভাবেও বোঝা যায়, 'বউঠাকুরানীর হাটে' প্রতাপাদিত্যের রাজনৈতিক ক্ষমতা দ্বারা যে সংকীর্ণ জগৎ তৈরি হয়, ব্রাহ্মণের জ্ঞানকে সেই জগতে করে তোলে সীমিত। রঘুপতি সেকালের দৃষ্টান্ত নিয়েই 'রাজর্ষি' উপন্যাসে প্রবেশ করেন। কিন্তু গোবিন্দমাণিক্যের মত বৃহৎ মন নিয়ে যখন রাজনৈতিক ক্ষমতাকে ব্যবহার করা সম্ভব হয়, তখনই বিল্বনের আবির্ভাব সম্ভবপর হয়ে ওঠে। বিল্বন রাজার মধ্যে প্রচ্ছন্ন সেই শক্তিকে সম্মান জানিয়ে শুধু স্বীকৃতি এখানে রাখেন না, বরং প্রেরণাসূত্র গড়ে তোলেন যুগের অনিবার্যতাকে ঘিরে।

রঘুপতি প্রতাপাদিত্যের দ্বারা গড়ে তোলা যুগের মানুষ। অথচ তাঁর অবস্থান তখন এমন এক পর্যায়ে, যখন রাজনৈতিক সময় পরিবর্তিত হয়ে চলে। গোবিন্দমাণিক্যকে যুগ দর্পন-গঠনের দায়িত্ব দিয়ে জনগণের দুঃখ-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সন্দেহ-সংশয় প্রকাশিত হতে শুরু করে। রঘুপতির দৃষ্টিতে তখন স্বাভাবিক ভাবে দেবী মন্দিরকে মানব মন্দিররূপে প্রকাশমান করে তোলার কথা। কারণ কোনো একটি স্থানের অস্তিত্ব সময়ের দ্বারা চিহ্নিত হয় মানুষের মাধ্যমেই। মানুষই নিজেকে শ্রেণীতে রূপান্তরিত করে, মানুষই সেই শ্রেণীকে নিয়ে সদর্থক কিংবা নঞর্থক কালকে প্রকাশ করে। আবার দুই কালের সহাবস্থান হলে লিপ্ত হয় সংঘর্ষে। 'করুণা' উপন্যাসের করুণা চরিত্রের ক্ষেত্রে নরেন্দ্রের সংস্পর্শে কৈশোরের মাধুর্য নিয়ে একটি লয়ের মাত্রা থেকে সময় দ্বারা অগ্রসর হতে পারে। অন্যদিকে 'বউঠাকুরানীর হাটে' প্রতাপাদিত্যের শাসনে বিভা, সুরমা, উদয়াদিত্যদের অবস্থান প্রতিমুহূর্তেই পরিবর্তিত হয়। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই পরিসর সেখানে যে শাসককুলকে শ্রেণীগত পরিচয়ের দ্বারা অভিসিক্ত করে, নঞর্থক কালই হয় তার ভিত্তিমূল। 'রাজর্ষি'তে রঘুপতি মন্দিরকে ধরে সেই ভিত্তিমূলকেই ধর্মীয় নিয়ম করে রাখতে উদ্যোগী। কিন্তু অবস্থার তখন পরিবর্তন হয়ে চলেছে। নঞর্থক কালের অনুকূল বাতাবরণের উৎস যে এবার দেশের রাজা নন, বরং রাজাই তার বিরোধী— এই অবস্থা অবলোকনে রঘুপতির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা ছাড়া অন্য কোনও পথ খোলা নেই। আর এক্ষেত্রে তাঁর কূটনীতিতে রাজনৈতিক সময়ের মূল্য উপলব্ধি করে তিনি সিদ্ধান্ত নেন, দেশের শাসক পাল্টানো চাই। তাই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অপপ্রয়োগ করে তিনি মন্দিরের প্রতিমার মুখ ঘুরিয়ে রাজার বিরুদ্ধে প্রজাদের বিদ্রোহী করে তুলতে চান। নক্ষত্ররায়কে রাজত্বের স্বপ্ন দেখিয়ে ভ্রাতৃবিরোধ, পরিণামে ভ্রাতৃহত্যা ঘটাতে চান এবং সর্বোপরি নক্ষত্র রায়কে শিখণ্ডী সাজিয়ে বিদেশী শত্রুকে দেশে আহ্বান করে গোটা রাজ্যের সর্বনাশ সাধন করেন।

তবু তাঁর স্থূল লক্ষ্য পূরণ সম্ভব হলেও তার সফলতা তিনি উপভোগ করতে পারেন না। তার কারণ, পূর্ববর্তী 'করুণা' উপন্যাসে আমরা কি দেখিনি, নরেন্দ্র

করুণার উপর একাধিপত্য চালিয়েও বিভ্রান্তই থেকে গেছে! 'বউঠাকুরানীর হাটে' প্রতাপাদিত্যে আগাগোড়া সাম্রাজ্য শাসন করেও কি পেরেছেন আশঙ্কা আর একাকীত্ব থেকে মুক্ত হতে! অতএব কর্মপ্রণালীতে যেখানে গঠনমূলক উদ্দেশ্য, সেখানে সেই উদ্দেশ্যের বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কিছু কিছু ধ্বংসেরও প্রয়োজন। কিন্তু যেখানে ধ্বংস সাধনই একমাত্র উদ্দেশ্য,— ধ্বংসের পর শূন্যতা ছাড়া সেখানে আর কিছুই থাকে না। রঘুপতি অভীষ্ট লক্ষ্যের মধ্যেও তাই বিপ্লবের মত কোনো সংগঠন কর্মপদ্ধতি নেই বলেই জয়সিংহকে ধরে মূল অবলম্বনটুকুকেও তিনি হাবান। কিন্তু এই হাবানো যে কত বড় শূন্যকালকে তাঁর জীবনে নিয়ে আসছে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে তাকে কেবল বিকৃতির চোখ দিয়েই তিনি দেখেন। কোনো বিশ্বাসের প্রজন্ম তিনি বেখে যেতে পারেন না বলে দীর্ঘ আক্রোশের ক্ষেত্রটি যখন চত্বারিংশ পরিচ্ছেদে বাজনৈতিক আবর্ত হতে নেমে এল, ব্যক্তির লোলুপ প্রবৃত্তি অপরতার মাঝখানে আপাত প্রতিষ্ঠিত হয়ে ব্যক্তির একাকীত্বকে সঙ্গীহীন করে তুলল, তখন সেই শূন্যতাবোধ নিদারুণ ভার হয়ে উঠল। নক্ষত্র রায়কে তিনি গড়ে তোলেন না, বরং তাঁর প্রবৃত্তির চরিতার্থতা করেন বলেই সেখান থেকেও তাঁকে আঘাত পেতে হয়। আর শূন্যতার সময়োচিত যে উপলব্ধি, তা জয়সিংহেব মৃত্যুকে দ্বিতীয়বার অনুভব করে নেওয়া। এই উপলব্ধি থেকে শূন্যকালের তাড়া পেয়ে তাঁকে রাজার কাছে ছুটে যেতে হয় আশ্রযের সন্ধানে।

অথচ গোটা উপন্যাসে রঘুপতি যে আবর্ত রচনা করেন, তাকে সুচারুভাবে রূপ দিতে বহুদিনের কৃচ্ছ্রতা আর প্রচেষ্টায় কোনো ফাঁকি নেই। লক্ষ্য বস্তুটি যদি এক্ষেত্রে ভ্রান্ত না হয়, তবে এই কত পথ, কত নদী অতিক্রম করে আসা প্রচেষ্টা কত বৃহৎ কর্মপ্রণালীকে না উপহার দিতে পারে! রাজার সঙ্গে মিলনে এই লক্ষ্য স্থির হয়ে উঠল বলেই প্রচেষ্টার মৌলিকত্ব এবার ধরা দেবে—'রাজর্ষি' উপন্যাসে এই অবকাশ শেষপর্যন্ত তৈরি হয়ে ওঠে।

উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দুতে ভুবনেশ্বর দেবীর মন্দির সূচনা থেকেই দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে। মন্দিরের রূপায়ণ এখানে রঘুপতির ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যের সাম্রাজ্য হয়ে ওঠলেও, মন্দির মানুষের মিলনের স্থলও বটে। তাই মন্দিরকে কেন্দ্র করে দর্শনার্থীদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত সময়ের বিচিত্র অভিব্যক্তি প্রকাশ পায়। মন্দিরে রাজার আদেশে বলি বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং পুরোহিতের দ্বারা কদর্থক ভাবে তার প্রকাশ মানুষের বিশ্বাসের জগতে গভীর আঘাত হানে। বর্তমান সময় তাই তাদের চোখে নির্দিষ্ট হয় অসময়রূপে। কিন্তু সেই জনগণের মধ্য থেকে চিন্তামণি চাষা যখন সে বৎসর ধান সস্তা হয়েছে বলে কৃষকের কপালকে অনিশ্চয়তার দুর্গতি চিহ্ন হিসেবে নির্দিষ্ট

করে, তাতে সাধারণের কাছে তার যে একটি শুভ দিক থাকে লেখক তাকে দেখিয়ে দেন। যেহেতু মানুষ এখানে সবাই বিচ্ছিন্ন দৃষ্টিতে সময়কে মূল্যায়ন করে, ফলে, রঘুপতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বিশ্বাস নিয়েই গোবিন্দমাণিক্যের নূতন কালকে তারা বরণ করে নিতে পারে না[৯৫]। কিন্তু মনে রাখতে হয় 'রাজর্ষি' উপন্যাস সময়ের সকল বন্ধনকে খুলে দিতে উৎসাহী। আভাস নয়, উদ্যোগের আয়োজন চলছে। তাই ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে রঘুপতির কথার দ্বারা যে সংশয় জনতার মধ্যে ঘনীভূত হয়ে ওঠে, সেখানে আত্মপরিচয়হীন সমাবেশ ভেদ করে একজন দীর্ঘ প্রস্থ লোক উচিৎ মন্তব্য করে—

"সন্তান যদি অপরাধ করে থাকে তবে মা তাকে শাস্তি দিন, কিন্তু মা সন্তানকে একেবারে পরিত্যাগ করে যাবেন এ কি কখনো হয়"।[৯৬]

এই প্রশ্ন মানুষ জনতারই, নূতনকালের স্বভাবধর্মের হাওয়া এসে তাদের একজনের মাধ্যমে স্বরকে উচ্চগ্রামে তুলে দেয় মাত্র।

যেহেতু সত্যকে আচ্ছন্ন করে রঘুপতি স্বয়ং ভ্রান্ত পথের যাত্রী, অতএব কালের রূপরেখাকে তিনি মানুষের কাছে কি দিয়ে বোঝাবেন! তবু যেখানে জনতাকে চুপ করিয়ে রাখা যায় সেখানে জনতার চেয়ে জয়সিংহ তাঁর কাছে বাঁধা অতিক্রম করতে কঠিন মাধ্যম। কেননা জয়সিংহ তাঁর বিশ্বাসের ক্ষেত্র অধিকার করে আছে, অথচ সেই বিশ্বাসকে তিনি যুক্তি দিয়ে নিজের বিশ্বাসের অনুকূল করে তুলতে পারেন না। অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদ থেকে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে তিনি তাই মন্দিরের কালিকার ভূমিকাকে ধ্বংসাত্মকরূপে প্রকটিত করেন। যে রূপ রঘুপতি জনতাকে দেখিয়ে ভ্রান্ত করতে পারেন, কিন্তু জয়সিংহকে পারেন না। তাই তাঁর প্রচেষ্টা যে কালধর্মকে প্রকাশ করে, সেখানে তা শাস্ত্রের মহানির্বাণ তন্ত্রে উল্লেখিত কালের ধ্বংসাত্মক রূপেরই অভিব্যক্তি। জয়সিংহ তাই তার উত্তরে তৃপ্ত নয়, যেহেতু তার প্রকাশই আংশিক।

মহানির্বাণ তন্ত্রের ভাষ্যটিতে আছে-

"তিনি মহাকাল, তিনি সর্বপ্রাণীকে কলন অর্থাৎ গ্রাস করেন বলিয়াই মহাকাল; দেবী আবার এই মহাকালকে কলন অর্থাৎ গ্রাস করেন, এই নিমিত্ত তিনি আদ্যা পরম 'কালিকা'। কালকে গ্রাস করেন বলিয়াই দেবী কালী। তিনি সকলের আদি, সকলের কালস্বরূপা এবং আদিভূতা, এই নিমিত্তই লোকে দেবীকে আদ্যাকালী বলিয়া কীর্তন করে।"[৯৭]

কিন্তু বাংলাদেশের শক্তিসাধক রামপ্রসাদ সেনকে মহামায়ার ধ্বংসাত্মক রূপের এ চিত্র সুখী করেনি বলেই তাঁর ঐশ্বর্য সত্তার উপলব্ধি তিনি গ্রহণ করেন—

"ছিন্নমস্তা-তত্ত্বে নিজেকেই বিশ্বরূপে ভাগ করিয়া দিয়া সেই বিশ্বকে মা নিজেই আবার সর্বতোভাবে বিধৃত করিয়া আছেন, তাই মা যে বিশ্বোদরী— 'উদরে ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড!' বিরাট সেই বিশ্বোদবীর প্রকাশ রহস্য— লীলারহস্য! অনন্তকাল ব্যাপিয়া এই লীলার প্রকাশ ঘটিতেছে। এই মহাকালে প্রকাশিত মহাকালীর মর্ম কে জানিতে পারে? পারে একমাত্র মহাকাল; তাই সেই মহাকাল মায়ের পদাশ্রিত হইয়া দিনরাত্রি সেই মহাকালীর মর্ম অনুভব করিবার চেষ্টা করিতেছেন"।[১৮]

আসলে এই যুক্তিই হয়তো জয়সিংহের মধ্যে প্রতিষ্ঠা পেতে চায়। কিন্তু যে সমকালের স্নেহেব দ্বারা সে আজীবন মানুষ, যেখানে গড়ে ওঠে তার বিশ্বাসের জগৎ— সেখানে পথরোধ করে আছে সংস্কারের পাথর। তবু জয়সিংহের প্রত্যয় রঘুপতির দৃষ্টিতে দেখা মহাকালের ধ্বংসাত্মক গতিকে একক মাত্রায় মানতে পারে না। তার কারণ, সে ছোটবেলা থেকে পিতা রঘুপতির স্নেহের বন্ধনে চলার প্রত্যাশাকে খুঁজে পায়। পরে সহযোগী হয়ে ওঠে গোবিন্দমাণিক্যের সাহচর্য। 'করুণা', বউঠাকুরানীব হাট' উপন্যাস দ্বয়ে নঞর্থক কালের প্রতিনিধিদের দ্বারা যা সম্ভবপর হচ্ছিল না, 'রাজর্ষি'র রঘুপতির মধ্যে প্রথম থেকেই অন্তরের অন্য আরেকটি গভীর পথ তৈরী হয়ে ওঠে তাঁর মগ্ন চৈতন্যে। জয়সিংহ তার বোধী থেকে সে চৈতন্যকে উপলব্ধি করে, অথচ বাইরে দেখে তার ধ্বংসাত্মক রূপ। মন্দিরের দেবীকে নিয়ে যে সৃষ্টিশীল জগত সে গড়ে তোলে দিনের পর দিন, পুরোহিত রঘুপতিই যখন তাকে চুরমার করে দেন, তখন সেই অভিমান থেকেই তার উপলব্ধি ঘটে, রঘুপতির মগ্ন চৈতন্যে যে পিতার ধর্ম রয়েছে— তাকে তুলে আনা প্রয়োজন। জয়সিংহ অতএব আত্মপ্রাণ বিসর্জন দিয়ে রঘুপতির সদর্থক পথটিকে খুলে দিতে চায় এবং এভাবে দেশ ও কাল গঠনে সেও হয়ে ওঠে রাজার সহযোগী।

প্রতিটি সাময়িকত্বের মধ্যে যদি সামগ্রিক সত্য লুকিয়ে না থাকে, তবে তার শূন্যতালোকের যাত্রাই অভীষ্ট হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে রঘুপতির মধ্যে সেই সত্য অন্তরীণ। যাকে উপলব্ধি করে জয়সিংহ। জয়সিংহ তাই মন্দির ছেড়ে বাগানের মধ্যে আত্মসন্ধান করে, রঘুপতির কুটিল সন্দেহকে ছাড়িয়ে তার ভেতরের শক্তিকে ধরিয়ে দেবার উদ্দেশ্যেই কোনো জাতিগত বিভেদের স্বর থেকে নয়, চিরকালের সমকাল আদর্শে জানায়—'আপনার কাছ হইতে আমাকে কেহ বিচ্ছিন্ন করে নাই, আপনিই আমকে দূর করিয়া দিয়াছেন'।[১৯]

জয়সিংহের মৃত্যু তাই প্রতীকী। দীর্ঘদিনের সহস্র মানুষের নিরন্তর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ব্যথা নঞর্থক কালকে যেখানে আঘাত দিতে পারে না, সহযোগিতা করে; সেই নঞর্থক কালের ভেতর থেকেই এবার বোঝানো হয় তার যন্ত্রণা। সেই যন্ত্রণাও

হয়তো কালের পরিসীমাকে উন্মুক্ত করে। অহংকারের আগুনকে লেলিহান শিখায় ক্রমাগতই উচ্চ থেকে উচ্চতর শীর্ষে নিয়ে যায়। কিন্তু যে মুহূর্তে রসদ ফুরোয়— তখন আর ফিরে যাবার উপায় থাকে না।

যে কোনো সৃষ্টিতে তৎসাময়িকের উগ্রতা বরাবরই বেশি। অতএব একজন স্রষ্টা হিসেবে ঔপন্যাসিকের বক্তব্য শেষ পর্যন্ত যে সত্যেই পৌঁছাক না কেন, সাময়িককে তিনি সমকালের সঙ্গে যুক্ত করতে বাধ্য। কারণ নিজের আত্ম-অনুসন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে লোকের মনোরঞ্জন করাও একজন সাহিত্যিকের সচেতন দায়, যা বাইরের দিকে সামাজিক চিত্তাকর্ষক ঘটনাকেই প্রাধান্য দিতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ তাই উপন্যাস লিখতে 'করুণা' বৃত্তের উপস্থাপনায় বঙ্কিমী রীতির যেমন বিন্যাস ঘটান, আবার ঊনবিংশ শতকের সামাজিক প্রেক্ষাপট নিয়ে কলকাতার জীবনকেও স্পর্শ করেন। যে কলকাতা 'আলালের ঘরের দুলালে'র মত প্রত্ন উপন্যাসেরও পরিসর। অন্যদিকে 'বউঠাকুরানীর হাটে' উদয়াদিত্য-সুরমাকে নিয়ে লেখক প্রেমের বাতাবরণ সৃষ্টি করে তার মধ্যে উদয়াদিত্যের নারীঘটিত দুর্বলতার একটি পূর্ব ইতিহাস চকিতে অঙ্কন করে তোলেন তারই সংলাপে। 'রাজর্ষি'তে বলি প্রথাকে কেন্দ্র করে রঘুপতির সঙ্গে গোবিন্দমাণিক্যের দ্বন্দ্বের চিত্তাকর্ষক কাহিনী উত্তরোত্তর বাড়িয়ে তুলতে হয় ইতিহাসকে অনাবৃত করে— বিশ্বাসঘাতকতা, শঠতার প্রতিচিত্র অঙ্কনে। লক্ষ্যবস্তু তাই এভাবেই শান পেয়ে পেয়ে সীমা অতিক্রম করে, সাময়িক ছবি উগ্র হয়ে ওঠে। 'রাজর্ষি'তে রঘুপতি যতটুকু সাময়িক, গোবিন্দমাণিক্য ততটুকুই সাময়িককে ছাড়িয়ে চিরসত্যের পরিণামমুখী। তবু রঘুপতি উপন্যাসে না থাকলে 'রাজর্ষি' উপন্যাসের মূল কৌতূহলের স্থানই যে শূন্য হয়ে পড়ে, সেকথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

উপন্যাসে গোবিন্দমাণিক্য চিরকালের সমকালকে অভিজ্ঞতার স্তর থেকে ধরেন। তাঁর দায়িত্ব সময়ের ক্রমান্বিত ধারার বহু দিনরাত্রি অতিক্রম করে বেড়ে যায়। 'করুণা'তে নরেন্দ্রকে তিনি দেখেন, পাশাপাশি মহেন্দ্রকেও। 'বউঠাকুরানীর হাটে' প্রতাপাদিত্যের প্রখর আধিপত্যের পাশাপাশি সতেজ বসন্ত রায়ের ছবিও তাঁর আছে। আবার সেই নিষ্ফল ছবির পাশে সফল ছবির বনেদি শ্রেণীকে ছাড়িয়ে অত্যাচারিত করুণা, বিভার অবদমিত কান্না বহু যুগ হতে তাঁর কানে এসেও পৌঁছায়। তবু আগাগোড়া উপন্যাসটিতে গোবিন্দমাণিক্যের অন্তর জগতই একটিমাত্র বিষয় যেমন নয়, লক্ষ্যও নয়। একজন যোগ্য সামাজিক মানুষ হিসেবে একটি মানুষের দায়িত্ব কেবল নিজেকে তুলে ধরা নয়, সমাজ জীবনকেও নিজের মধ্যে তুলে আনা। গোবিন্দমাণিক্যকে তাই একজন সাধারণ সামাজিক মানুষরূপে নয়, একজন রাজা

হিসেবেও দায়িত্বকে আরো দক্ষতা নিয়ে পালন করা প্রয়োজন। তাই তিনি ধ্রুবের মাথায় রাজার মুকুট পরিয়ে যতই আপন একটি ছেলেমানুষের জগত উন্মুক্ত করে তুলুন না কেন, নক্ষত্ররায়ের চোখে এ দৃশ্য ভালো ঠেকে না। আবার রাজার ক্ষমতা নিয়ে ধর্মীয় প্রথার দীর্ঘদিনের অভ্যাসে তিনি কুঠারাঘাত করেন সাময়িককে আঘাত করে, অথচ দীর্ঘ অবকাশ নিয়ে এর পরিণাম সম্পর্কে ভাবেন না। সবচেয়ে বড়কথা, সেই সাময়িককেই প্রতিহিংসা গ্রহণের সুযোগ করে দেন তাকে নির্বাসন দণ্ড দিয়ে। এর জন্য অবশ্য রাজাকে শেষপর্যন্ত রাজ্য ত্যাগ করতে হয়। কিন্তু সেই সঙ্গে বিল্বনের কণ্ঠস্বরকে দেশ রক্ষার কাজে আমল না দিয়ে ব্যক্তি রাজ্য গঠনের স্বতন্ত্র জগত তিনি ধ্রুবকে নিয়ে কল্পনা করেন। অথচ সেই ধ্রুবকেই তিনি সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন না। তার কারণ, যে 'ধ্রুব' প্রেরণা নিয়ে তিনি পথ সন্ধান করেন, সেই সন্ধানেও যখন দায়িত্ববোধের প্রস্তুতি পর্বের অভাব ঘটতে থাকে, তখন তিনিও যে একটু একটু করে বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করেন, বুঝতে পারেন না। তাই 'রাজর্ষি'র এত বড় কর্মকাণ্ডেও তিনি একা, সামাজিক জনজীবন মানুষ-গোবিন্দমাণিক্যের পাশে এসেও দাঁড়ায় না। রাজত্ব পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি তাঁর যা কর্তব্য তা পালন করেন সত্য, তবু বিশাল মানব সমাজকে ছাড়িয়ে ধ্রুবকে নিয়েই তার কাল অতিক্রান্ত হয় বেশি। একজন মানুষ হিসেবে এ আকাঙ্ক্ষা তাঁর যতই ফলদায়ক হোক, রাজা হিসেবে রাজনৈতিক সময়কে এক্ষেত্রে বিপর্যস্ত করে। তাই রাজার দায়িত্ববোধকে উপন্যাসের সূচনায় যেভাবে নূতন কাল গঠনে সহযোগিতার হাত বাড়ায়, সাময়িকের টানে কিংবা সাময়িককে অস্বীকার করে উপন্যাসের পরবর্তী পর্যায়ে তাঁর পলায়ন প্রবণতা কখনই অভিনন্দিত হতে পারে না। তাছাড়া গোবিন্দমাণিক্যের মধ্যে রাজার ভূমিকা এবং ঋষির ভূমিকা— দুটো ক্ষেত্রেই সময়ের সহযোগিতায় সত্তার সঙ্গে অপরতার মেল বন্ধন বাঁধাপ্রাপ্ত। অতএব গোবিন্দমাণিক্য যেখানে নুতন সমাজ গঠনের দায়িত্ববোধ থেকে রাজার শাসনকে ব্যবহার করেন, সেখানে রাজ্যের প্রজারা হয়তো তাকে রাজার আদেশরূপেই শিরোধার্য করে। কিন্তু মানুষ-গোবিন্দমাণিক্যকে বিশ্বাস করে নিতে পারে না বলেই রাজার সঙ্গে তাদের দূরত্ব ঘোচে না। তাছাড়া ক্ষমতার দণ্ড যিনি এককভাবে দীর্ঘদিন ধরে থাকেন, সেখানে সময়কে স্পর্শ করে তার অপব্যবহার ঘটার প্রবণতাও দেখা দিতে পারে। সমকাল হয়তো আবার বিন্যাস পরিবর্তন করে ফিরে যেতে পারে প্রতাপাদিত্যের রাজত্বে। অতএব এক্ষেত্রে রাজত্বের লোভ ও প্রতিপত্তিকে ছাড়িয়ে ঋষির নির্মল নিরাসক্তি তাঁকে বাঁচাতে পারে। কিন্তু ঋষির নিরাসক্ত রূপের পাশে যদি রাজার দায়িত্ববোধের সাংসারিক আসক্তি না আসে, তবে সেক্ষেত্রে একজন মানুষ হয়তো তাঁর পারলৌকিক পথকে সময় দিয়ে

প্রসারিত করেন। কিন্তু অপরতা সেখানে মর্যাদা পায় না। অতএব দেশ ও কাল গঠনে যেখানে সামগ্রিক বিকাশ সম্ভব হয়ে ওঠে, সেখানে অতীতের পূর্বতন অভিজ্ঞতা বর্তমানের সমাবেশে এমন এক ভবিষ্যৎ গঠনের প্রত্যয়কে জাগ্রত রাখে, শিল্পীপ্রাণ যেখানে সান্নিধ্য নিয়ে বেঁচে ওঠে। ভবিষ্যৎ গঠিত হয় চিরদিনের কাঙ্ক্ষিত সমকাল ধরে। গোবিন্দমাণিক্যের রাজর্ষি রূপ তাই একটি উপন্যাসের নামকরণের সার্থকতা নিয়ে নয়, গোটা রবীন্দ্রভাবনায় তথা শিল্প ভাবনায় সময়ের সাবালকত্ব নিয়ে খণ্ডের মাঝখানে অবিচ্ছিন্নের সার্থক প্রবাহধারী।

লক্ষনীয়, উপন্যাসটির শুরু ও মধ্যপর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ মানুষ-গোবিন্দমাণিক্যের পারিবারিক আত্মীয় সম্বন্ধের স্থানটি ফাঁকাই রাখেন। একমাত্র ছোটভাই নক্ষত্র রায়ের সঙ্গে একটি সম্পর্ককেধরে রাখা হয়। সমালোচক এ বিষয়ে খুব সত্য করেই বলেন—

"রাজা নিঃসন্তান, এবং উপন্যাসে তাঁহার পারিবারিক জীবনের বিশেষ কোন উল্লেখ না থাকায় মনে হয় সংসারে তাঁহার সান্ত্বনার ক্ষেত্র খুবই সংকীর্ণ ছিল। সেইজন্য হৃদয়ের সবটুকু স্নেহ পড়িয়াছিল ছোটভাই নক্ষত্ররায়ের উপর"।[১০০]

কিন্তু রাজার আদর্শ নিয়ে সেই ছোটভাইকে যখন নির্বাসন দণ্ড দিতে হয়, তখন কোলাহলের মাঝখানে তিনি আরো নিঃসঙ্গ হয়ে ওঠেন। পরিণামে তাঁর সংসারের অপরতার প্রতি নিস্পৃহতা সৃজনের উৎসমুখ সন্ধানে শূন্যকালের পরিচয়ই প্রকাশিত হয়। পরবর্তী কালে লেখা 'চতুরঙ্গ'-এর শচীশের ক্ষেত্রেও অন্য পরিস্থিতিতে যা প্রচুর সম্ভাবনাকে নিয়ে দীর্ণ করে, এক্ষেত্রেও গোবিন্দমাণিক্যকেও নির্দিষ্ট পরিধিতে আবৃত করে তোলে। অতএব হাসির মধ্য দিয়ে উপন্যাসের সূচনায় যে বিস্তৃত অতীতের অপশাসন - মুক্ত নির্মল ছবিকে দেখেন, তাকেই ভবিষ্যৎ-সমকাল গড়তে ধ্রুবকে প্রেরণাস্থল হিসেবে পান। কিন্তু যখনই এই কর্মযজ্ঞে সংগ্রাম চালিয়েও তিনি নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে তুলতে থাকেন বৃহত্তর সময় থেকে, তখন সেই ধ্রুবের সংস্পর্শ থেকেও বঞ্চিত হন। তাই ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদে খুড়ো কেদারেশ্বর ধ্রুবকে রাজার সঙ্গে অরণ্যে যেতে দেন না।

কিন্তু যিনি সময়ের নানা ছবিকে তুলে ধরছেন, সেখানে সকল ছবিকে কেবল প্রতিবেদনরূপে উপস্থাপন করে তাঁর কাজ সমাধা হতে পারে না। অতএব 'রাজর্ষি'র শেষ পর্বে এসে কেবলমাত্র গোবিন্দমাণিক্য-রঘুপতিকে নিয়ে নয়, তাদের মধ্য থেকেই লেখককে ভাবতে হয় করুণাকে, ভাবতে হয় বিভাকে। স্মরণ করতে হয় মহেন্দ্রের মানবিক অভিব্যক্তি, বসন্ত রায়ের উৎসর্গীকৃত সম্মেলন-প্রয়াসের ধারাবাহিক রূপ। সেইসঙ্গে মিলিত হয়ে ওঠে হাসির সারল্য আর জয়সিংহের আত্মত্যাগ। অতএব সময়ের এত অভিজ্ঞতাকে বহন করে এত সদর্থক কর্মকাণ্ডের

নিষ্ফল পরিণাম বাস্তব হতে পারে না। তাই আভাস থেকে আয়োজনের গোটা পর্বে যেখানে শূন্যতার অবস্থান পথকে রুদ্ধ করে, সেখানে সময় মসৃণভাবে চিত্র রচনা করে চলে। গোবিন্দমাণিক্য তাই রাজার এবং ঋষির নিঃসঙ্গতাকে ছাড়িয়ে রাজর্ষি হন— ধ্রুবকে তখন কেবল তিনি একমাত্র করে পান না, বরং সেইসঙ্গে তাকে সকল বিরোধী পক্ষের স্ববিরোধকে কাটিয়ে মিলিত করেই দেখেন। তখন তাঁকে সত্তা দিয়ে অপরতার সম্মানে সময় গঠনের দায়িত্ব নিয়েই সিংহাসনে বসতে হয়। রঘুপতির মত বিরোধী শক্তিও তাঁর শূন্যকালকে ছাড়িয়ে রাজর্ষির সঙ্গে মিলিত হবার প্রেরণা পায়, রাজর্ষিও তাঁর শূন্যকালকে ছাড়িয়ে সেই মিলনকে আবাহন করে নেন। আর হয়তো এভাবেই শেষ হতে পারে করুণা-বিভা-উদয়াদিত্যের যন্ত্রণা; শেষ হতে পারে নরেন্দ্র-প্রতাপাদিত্যের আধিপত্য স্পৃহা; শেষ হতে পারে জনতার দীর্ঘদিনের নঞর্থক কালের সংস্কার। কেননা—

"...............the poetic word ever attemps to reach the inward ear, to sink into the human soul and enrich it ; the poetic word is the least meterial of all media, and is akin rather to a winged squadron of the spirit that annihilates space and time and links the human soul with infinity and eternity."[১০১]

উল্লেখপঞ্জি

১। শ্রেণী চেতনা, বিভ্রান্তি, রবীন্দ্র উপন্যাস প্রসঙ্গ ঃ যোগাযোগ ।। ক্ষেত্র গুপ্ত ।। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রতিভা ঃ স্বাতন্ত্র বিচার ।। সম্পাদনা ঃ ওয়াকিল আহমেদ ।। এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ ।। প্রথম সংস্করণ ।। পৃষ্ঠা - ৯৪

২। সম সময়ের ছোটগল্প এবং কোয়ান্টা ।। সাধন চট্টোপাধ্যায় ।। 'কোরক' শারদীয় আশ্বিন সংখ্যা ১৪০২ বাংলা ।। পৃষ্ঠা - ৯

৩। A Handbook of Critical Approaches to Literature. ।। Wilfred L. Guerin, Earle Labor, Lee Morgan, Jeanne C. Recsman. John R. Willingham ।। Fourth Edn. ।। Oxford University Press ।। পৃষ্ঠা - ৯২

৪। মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্নে ঃ বিংশ শতাব্দীর বাংলা উপন্যাস ।। অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় ।। প্রথম প্রকাশ ।। দে'জ পাবলিশিং ।। পৃষ্ঠা - ১

৫। Tagore as a Novelist ।। Bhabani Bhattacharjee ।। Centenary Volume ।। পৃষ্ঠা - ৯৭

৬। রবীন্দ্রনাথ ঃ কথাসাহিত্য ।। বুদ্ধদেব বসু ।। তৃতীয় সংস্করণ ।। নিউ এজ পাবলিশার্স ।। পৃষ্ঠা - ১৩

৭। জীবনস্মৃতি ।। বিশ্বভারতী ।। পৃষ্ঠা - ৯৪

৮। ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ ।। রনেন্দ্র নারায়ণ রায় ।। প্রথম সংস্করণ ।। দাশগুপ্ত এণ্ড কোম্পানী ।। পৃষ্ঠা-৮

৯। সূচনা ।। রবীন্দ্র রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) ।। বিশ্বভারতী ।। পৃষ্ঠা-৩৬৯
১০। রবি রশ্মি (প্রথম পর্ব) ।। পৃষ্ঠা-৩
১১। পঞ্চম সংস্করণ ।। নিউ এজ পাবলিশার্স ।। পৃষ্ঠা-৩৯৩
১২। রবীন্দ্র উপন্যাস সমীক্ষা (প্রথম খণ্ড) ।। দ্বিতীয় সংস্করণ ।। জিজ্ঞাসা ।। পৃষ্ঠা-১
১৩। রবীন্দ্র উপন্যাস ঃ ইতিহাসের প্রেক্ষিতে ।। প্রথম প্রকাশ ।। দে'জ ।। পৃষ্ঠা-১৯
১৪। রবীন্দ্র উপন্যাস পরিক্রমা ।। প্রথম প্রকাশ ।। ওরিয়েন্ট ।। পৃষ্ঠা-১৯
১৫। রবীন্দ্র উপন্যাসের নির্মাণ শিল্প ।। প্রথম প্রকাশ ।। দে'জ ।। পৃষ্ঠা-৪১
১৬। বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত ।। সংশোধিত সপ্তম সংস্করণ ।। মডার্ণ ।। পৃষ্ঠা-৪৭৮
১৭। Tagore A Life ।। Third Edition ।। National Book Trust India ।।পৃষ্ঠা-৩০
১৮। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (চতুর্থ খণ্ড) ।। প্রথম আনন্দ সংস্করণ ।। পৃষ্ঠা-৩১৫
১৯। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর ।। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ।। পরিবর্ধিত প্রথম দে'জ সংস্করণ ।। পৃষ্ঠা-১২৯
২০। রবীন্দ্র রচনাবলী (সপ্তবিংশ খণ্ড) ।। পুনর্মুদ্রণ ।। আশ্বিন ১৩৮১ ।। পৃষ্ঠা ১১৭
২১। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (সপ্তম খণ্ড) ।। অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ।। প্রথম সংস্করণ ।। মডার্ণ ।। পৃষ্ঠা-৪৬
২২। উনিশ শতকে নারীমুক্তি আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য ।। রণ্‌জিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ।। প্রথম প্রকাশ ।। পুস্তক বিপণি ।। পৃষ্ঠা-১৯
২৩। তদেব ।। পৃষ্ঠা-১১৬
২৪। An Address on Native Female Education ।। Hur Chunder Dutt (Calcutta, 1856) ।। পৃষ্ঠা-৩
২৫। রবীন্দ্র রচনাবলী (সপ্তবিংশ খণ্ড) ।। বিশ্বভারতী ।। পৃষ্ঠা-১১৭
২৬। তদেব ।। পৃষ্ঠা-১১৭
২৭। তদেব ।। পৃষ্ঠা-১১৮
২৮। ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ ।। রনেন্দ্র নারায়ণ রায় ।। প্রথম সংস্করণ ।। দাশগুপ্ত এণ্ড কোম্পানি ।। পৃষ্ঠা-৩৩
২৯। 'কলকাতায় যৎসামান্য স্ত্রীশিক্ষা প্রচারিত হয়েছিল, কিন্তু মফঃস্বলে দীর্ঘদিন আধুনিক যুগের স্ত্রীশিক্ষার বিন্দুমাত্র আলোও প্রবেশ করতে পারেনি।' বাংলাসাহিত্যের ইতিবৃত্ত (সপ্তম খণ্ড) ।। অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।। প্রথম সংস্করণ ।। মডার্ণ।। পৃষ্ঠা-৪৬
৩০। রবীন্দ্র রচনাবলী (সপ্তবিংশ খণ্ড) ।। পৃষ্ঠা - ১২০
৩১। রবীন্দ্র রচনাবলী (নবম খণ্ড) ।। বিশ্বভারতী ।। পৃষ্ঠা - ৩৯১
৩২। রবীন্দ্র উপন্যাস পরিক্রমা।। অর্চনা মজুমদার।। ওরিয়েন্ট।। প্রথম প্রকাশ।। পৃষ্ঠা - ২০
৩৩। ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ ।। রনেন্দ্র নারায়ণ রায় ।। প্রথম সংস্করণ ।। দাশগুপ্ত এণ্ড কোম্পানি ।। পৃষ্ঠা-১৫
৩৪। রবীন্দ্র রচনাবলী (সপ্তম খণ্ড) ।। বিশ্বভারতী ।। পৃষ্ঠা-৪৬৬
৩৫। রবীন্দ্র রচনাবলী (সপ্তবিংশ খণ্ড) ।। বিশ্বভারতী ।। পৃষ্ঠা-১২৫
৩৬। তদেব ।। পৃষ্ঠা-১২৫
৩৭। তদেব ।। পৃষ্ঠা-৪৮৩

৩৮। রবীন্দ্র রচনাবলী (সপ্তবিংশ খণ্ড) ।। বিশ্বভারতী ।। পৃষ্ঠা-১২৫

৩৯। তদেব ।। পৃষ্ঠা-১৬৬-১৬৭

৪০। নায়কের বিবর্তন ঃ বাংলা উপন্যাস ।। শ্যামল সেনগুপ্ত ।। সাহিত্য বিহার সংস্করণ ।। ওরিয়েন্টাল ।। পৃষ্ঠা-৭০

৪১। রবীন্দ্র চিন্তায় ও সৃষ্টিতে নারীমুক্তির ভাবনা ।। নির্মাণের সামাজিকতা ও আধুনিক বাংলা উপন্যাস ।। মালিনী ভট্টাচার্য ।। দে'জ পাবলিশিং ।। প্রথম সংস্করণ ।। পৃষ্ঠা-৮৪

৪২। Crisis and Criticism and Literary Essays ।। Alick West ।। Lawrence and Wishart, London ।। পৃষ্ঠা-৮৮

৪৩। রবীন্দ্র জীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য প্রবেশক (তৃতীয় খণ্ড) ।। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়।। তৃতীয় সংস্করণ ।। বিশ্বভারতী ।। পৃষ্ঠা - ৩৬৯

৪৪। রবীন্দ্র রচনাবলী (সপ্তবিংশ খণ্ড) ।। বিশ্বভারতী ।। পৃষ্ঠা-১৮৪

৪৫। তদেব ।। পৃষ্ঠা-১৮৪

৪৬। Personality Development ।। Elizabeth B Hurlock ।। TMH Edition ।। TATA Mc GRAW-HILL Publishing Company LTD New Delhi ।। পৃষ্ঠা-১০

৪৭। রবীন্দ্র উপন্যাস ঃ ইতিহাসের প্রেক্ষিতে ।। প্রথম প্রকাশ ।। দে'জ ।। পৃষ্ঠা-২৪

৪৮। সূচনা ।। রবীন্দ্র রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) ।। বিশ্বভাবতী ।। পৃষ্ঠা-৩৬৯

৪৯। রবি জীবনী (দ্বিতীয় খণ্ড) ১২৮৫-১২৯১ ।। আনন্দ পাবলিশার্স ।। প্রথম সংস্করণ ।। পৃষ্ঠা-১২০

৫০। তদেব।। পৃষ্ঠা-১২০

৫১। রবীন্দ্র উপন্যাস ঃ ইতিহাসের প্রেক্ষিতে ।। ভূদেব চৌধুরী ।। প্রথম প্রকাশ ।। দে'জ ।। পৃষ্ঠা-২১

৫২। রবীন্দ্র উপন্যাসের নির্মাণ শিল্প ।। গোপিকানাথ বায় চৌধুরী ।। প্রথম প্রকাশ ।। দে'জ ।। পৃষ্ঠা-৪৩

৫৩। রবীন্দ্র রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) ।। বিশ্বভারতী ।। পৃষ্ঠা-৩৭৪

৫৪। তদেব ।। পৃষ্ঠা-৩৮১

৫৫। তদেব ।। পৃষ্ঠা-৩৯৪

৫৬। সংকলন ।। বিশ্বভারতী ।। পৃষ্ঠা-১৯৪

৫৭। অমানবিক দর্শন ও রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়া ।। প্রদীপ্ত সেন ।। পশ্চিমবঙ্গ ঃ রবীন্দ্র সংখ্যা ১৪০৫ ।। পৃষ্ঠা - ১১০

৫৮। রাশিয়ার চিঠি ।। রবীন্দ্র রচনাবলী (বিংশ খণ্ড) ।। বিশ্বভারতী, শ্রাবণ ১৩৮৩ ।। পৃষ্ঠা-২৭৫

৫৯। রবীন্দ্র রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) ।। বিশ্বভারতী ।। পৃষ্ঠা-৪৪১

৬০। তদেব ।। পৃষ্ঠা-৪১৯

৬১। তদেব ।। পৃষ্ঠা-৩৯৫

৬২। রবীন্দ্র উপন্যাসের পাঠান্তর। । সুচিত্রা পাল প্রথম প্রকাশ ।। মডেল ।। পৃষ্ঠা-২৯ (গ্রন্থটি থেকে আহৃরিত)

৬৩। রবীন্দ্র রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) ।। পৃষ্ঠা-৩৯৫
৬৪। তদেব ।। পৃষ্ঠা-৪৭৯
৬৫। রবীন্দ্র সাহিত্য বিচিত্রা ।। প্রমথ নাথ বিশী ।। পরিবর্ধিত সংস্করণ ।। ওরিয়েন্ট ।। পৃষ্ঠা - ৩৫৫
৬৬। রবীন্দ্র রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) ।। পৃষ্ঠা-৩৭৩
৬৭। তদেব ।। পৃষ্ঠা-৩৭৭
৬৮। রবীন্দ্র উপন্যাস ঃ ইতিহাসের প্রেক্ষিতে ।। ভূদেব চৌধুরী ।। দে'জ ।। পৃষ্ঠা-২১
৬৯। রবীন্দ্র রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) ।। পৃষ্ঠা - ৫২০
৭০। রবীন্দ্র উপন্যাসের পাঠান্তর ।। সুচিত্রা পাল ।। প্রথম প্রকাশ ।। মডেল ।। পৃষ্ঠা - ২১-২৪
৭১। রবীন্দ্র রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) ।। পৃষ্ঠা-৪০৮
৭২। তদেব ।। পৃষ্ঠা-৪১৫
৭৩। তদেব ।। পৃষ্ঠা-৪৭৩
৭৪। আধুনিকতা, উত্তর আধুনিকতা ও একটি বিকল্পের অনুসন্ধান ।। অমল চট্টোপাধ্যায় ।। ভারতী বুক স্টল ।। প্রথম প্রকাশ ।। পৃষ্ঠা-১৫
৭৫। তদেব ।। পৃষ্ঠা-১৬
৭৬। রবীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড) ।। বিশ্বভারতী ।। পৃষ্ঠা - ৩৭৩
৭৭। রবীন্দ্র উপন্যাসের পাঠান্তর ।। সুচিত্রা পাল ।। প্রথম প্রকাশ ।। মডেল ।। পৃষ্ঠা-৩৮
৭৮। তদেব ।। পৃষ্ঠা-৩৯
৭৯। The Novel and the People ।। Ralph Fox ।। পৃষ্ঠা-২
৮০। আধুনিকতা, উত্তর আধুনিকতা ও একটি বিকল্পের অনুসন্ধান ।। অমল চট্টোপাধ্যায় ।। ভারতী বুক স্টল ।। প্রথম প্রকাশ ।। পৃষ্ঠা - ২৩
৮১। রবীন্দ্র উপন্যাস পরিক্রমা ।। অর্চনা মজুমদার ।। ওরিয়েন্ট ।। প্রথম প্রকাশ ।। পৃষ্ঠা-২৭
৮২। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর ।। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ।। পরিবর্ধিত প্রথম দে'জ সংস্করণ ।। পৃষ্ঠা-৮৮
৮৩। Imagination and Time ।। Mary Warnock ।। First - Pub. ।। Blackwell ।। পৃষ্ঠা-১০৮
৮৪। রবীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড) ।। বিশ্বভারতী, ফাল্গুন ১৩৮১ ।। পৃষ্ঠা-৪১৫
৮৫। তদেব ।। পৃষ্ঠা-৩৭৮
৮৬। রবীন্দ্র নাট্য সাহিত্যের ভূমিকা ।। সাধন কুমার ভট্টাচার্য।। পৃষ্ঠা - ২১৭
৮৭। রবীন্দ্র উপন্যাস সমীক্ষা (প্রথম খণ্ড) ।। সত্যব্রত দে ।। দ্বিতীয় সংস্করণ ।। জিজ্ঞাসা ।। পৃষ্ঠা - ১১৯
৮৮। রবীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড) ।। বিশ্বভারতী ।। পৃষ্ঠা-৩৮০
৮৯। তদেব ।। পৃষ্ঠা-৩৮১
৯০। তদেব ।। পৃষ্ঠা-৪০৮
৯১। তদেব ।। পৃষ্ঠা-৪০২
৯২। তদেব ।। পৃষ্ঠা-৪০১

৯৩। তদেব ।। পৃষ্ঠা-৪৬৯
৯৪। তদেব ।। পৃষ্ঠা-৪৫৬
৯৫। তদেব ।। পৃষ্ঠা-৩৯৮
৯৬। তদেব ।। পৃষ্ঠা-৪০৮
৯৭। উদ্ধৃত । ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য ।। শশিভূষণ দাশগুপ্ত ।। সাহিত্য সংসদ ।। পৃষ্ঠা - ৭১
৯৮। তদেব ।। পৃষ্ঠা-২৬৭
৯৯। রবীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড) ।। বিশ্বভারতী ।। পৃষ্ঠা-৪০৬
১০০। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (চতুর্থ খণ্ড) ।। সুকুমার সেন ।। প্রথম আনন্দ সংস্করণ ।। পৃষ্ঠা-৩১৭
১০১। The Adventure of Criticism ।। Art and the Arts ।। K. R. Srinivasa Iyengar ।। Sterling Publisher, 1985 ।। পৃষ্ঠা-৩১

তৃতীয় অধ্যায়

চোখের বালি থেকে গোরা ঃ অন্তর্বৃত্ত এবং বহির্বৃত্ত সময়ের শিল্পরূপের বিন্যাস

বর্তমানের সাহিত্য সমালোচকরা 'উপন্যাস কোন পথে' এই প্রশ্নে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। কেউ হয়তো তার গতির দিকটা দেখতে চান,[১] কেউ বা বর্তমান অবস্থান।[২] তবু বর্তমানের অনিশ্চিত যুগলক্ষণের দ্বারা আক্রান্ত হয়েও দ্বন্দ্ব জর্জরিত হৃদয় শুধু অন্ধ-ভবিষ্যৎ আর ব্যক্তিত্বহীন সমকালের দিকে তাকিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করতে পারে না। অন্তত উপন্যাস বিশ্বে— তার মৌল স্বভাব গুণের কারণেই। আমাদের বর্তমান সমাজ, সময় এবং দেশকে নিয়ে বেঁচে থাকবে কি, সে সংশয় হয়তো আছে। কিন্তু সেই সমাজ যখন উপন্যাসে বিবৃত, তখন তার নিরাপত্তাই আমাদের সচেতন করে। একালের একজন সাহিত্য সমালোচককে তাই বলতে হয়—

"উপন্যাসের জীবন আধুনিক অন্যান্য শিল্পের মতই ধ্বংস ও পুনরুজ্জীবনের দিকে ধাবিত। কালের 'duration' -এর স্রোতে সংকল্প নিশ্চয়ই নিহত হচ্ছে, কিন্তু উপন্যাস সময়ের শিল্প, সময়ের কোলে কেবল নঞর্থককে বিকশিত করা যায় না।"[৩]

সময়কে তাই ধরতে চাওয়া হয় শিল্পে। যেখানে উপন্যাস আর সময়ের যুগলবন্দীতে জীবনকে করে তোলে মরণজয়ী। এক নিঃশ্বাসে এই প্রাগুক্ত সমালোচককে বলতে শুনি—

"উপন্যাস ছাড়া সমাজ বাঁচতে পারবে না— উপন্যাসের স্থাপত্যেই সমাজ সচেতন হয়ে উঠে নিজের সম্পর্কে।"[৪]

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে রবীন্দ্র উপন্যাসের প্রথম পর্বের আলোচনায় এই মন্তব্যকে নিশ্চয়ই পরীক্ষিত সত্য বলে ধরে নেওয়া গিয়েছে নানান প্রমাণের চৈতন্যগত সূত্রে। সেইসঙ্গে 'করুণা' থেকে 'রাজর্ষি' পর্যন্ত কাল ও পরিসরের বুননে যে উপন্যাস প্রবাহ 'প্রতিষ্ঠিত-সামাজিক' চিত্রকে নির্মাণ করে, তাতে বারবার পুনর্মূল্যায়ণ ঘটেও সমালোচকের বক্তব্যকেই স্পষ্ট করে। উপন্যাসে যে সময়ের জগৎ রচিত হয় তাতে হয়তো নঞর্থকতা অপরিহার্য, কিন্তু পরিণামী কখনই নয়। নঞর্থক সামাজিক ছবি

'করুণা', 'বউঠাকুরাণীর হাট'। কিন্তু তাদের পরিণাম 'রাজর্ষি'। তাই অপরিহার্য নঞর্থকতার মূল্য এখানেই, তার পূর্ণাঙ্গ বৃত্তটির অনিবার্যতায়। 'রাজর্ষি'র সদর্থক উপসংহারই গোটা পর্বের এক সূত্রে বন্ধনের অন্যতম রূপান্তর। তাই অলক্ষ্যে সময়, আর প্রত্যক্ষে ইতিহাসকে টেনে 'সমাজ' রবীন্দ্র উপন্যাসে ক্রমশঃ সৃষ্টিশীল—নেপথ্যে একটি শিল্পকে অবলম্বন করে বহুমাত্রার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। অতএব দেখা যায়, একটি বৃত্তকে পূর্ণাঙ্গ হতে গিয়ে নঞর্থকতা আসে, কিন্তু উপসংহার হয় ক্রমশঃ নির্মাণমুখী। ধ্বংসাত্মক প্রতিক্রিয়া সেখানে মুখোশ মাত্র।

তবু নির্দিষ্ট কাঠামোটি সম্পূর্ণ হয়ে ওঠার পরও চলমানতার নিবৃত্তি নেই উপন্যাস-শিল্পে। তার কারণ, বিবরের গর্ভে অদৃশ্য হয়ে থাকা সময়ের প্রবৃত্তি। অতএব সদর্থক প্রকাশে উপসংহার নেমে এলেই উপন্যাস থেমে যেতে পারে না, অন্য ধারা স্রোতেও তাকে নিমগ্ন হতে হয়। 'রাজর্ষি'র পর রবীন্দ্রনাথের কাজ তাই শেষ হয়ে যায় না, বরং শৈলী আরো ধারালো, স্বনির্ভরশীল, সঞ্জীবিত হয়। যেহেতু নির্মাণের ঝোক্ ক্রমশঃ সৃষ্টিশীলতার পেছনে জীবন অন্বেষণ - 'রাজর্ষি' দিয়ে তাই শেষ নয়, বরং সূচনা হয়ে দাঁড়ায়।

এখানে আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ আরো বিচিত্র বলে রবীন্দ্রনাথের দায়িত্ব বেড়ে যায়। তাঁর মনের ভেতর সহস্র স্বর সময়ের সঙ্গী হয়ে কথা বলে উঠতে চায়। এই কথাগুলোকে তিনি কোথায়, কিভাবে উপস্থাপন করবেন! 'রাজর্ষি' উপন্যাসে এসে হয়তো লেখকের বন্দীদশা ঘোচে। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি দূরাগত শিল্পলোকের সম্ভাবনাকে আরো কী বিচিত্র রূপে দেখেন! রবীন্দ্রনাথ ভাবতে বসেন, সন্দেহ হয়, হয়তো তিনি কিছুটা বিস্ময়ের বিভ্রান্তিতেও ভোগেন। তাই 'রাজর্ষি'র পর দীর্ঘদিন তাঁর সময়ের শিল্পকে প্রকাশ ঘটান সাহিত্যের অন্য মাধ্যমে, ছোটগল্পে। কিছুটা সময় এখানে তাঁকে দিতে হয়। সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় এই মুহূর্তকেই চিহ্নিত করে বলেন—

"যে আত্মসচেতনাতায় একটা যথার্থ নতুন উপন্যাসের উপাদান সংগৃহীত হয়, নির্মিতি নির্ভুল হয়, তার তখনও দেরি ছিল। 'রাজর্ষি'র পর রবীন্দ্রনাথ আর উচ্চাকাঙ্ক্ষা উপন্যাস লিখতে চাইলেন না প্রায় ষোল বছর"।[৫]

কিন্তু ভেতরে ভেতরে যে উপকরণ সঞ্চিত হতে থাকে এক্ষেত্রে বদ্ধতার নিগড়কে প্রতিহত করতে ক্ষণিক আশ্রয় ছোটগল্পের সীমিত সময় আবরণে রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করতে হয়। এভাবে উনবিংশ শতকের অবয়বকে সামাজিক প্রেক্ষিতে মধ্যবিত্তের মূল্যবোধের মধ্যে ধরেন রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু তাকে সংকুচিত করে স্বাভাবিকভাবে প্রসারিত করার যে সময়ের শিল্প,— উপন্যাসের মাধ্যম ছাড়া তাকে

প্রকাশের স্বতঃস্ফূর্ততা কোথায়! তাই লক্ষ্য করা যায়, সময়ের অবতলকে প্রকাশ ঘটাতে সমাজ যখনই আরো বিস্তৃত পরিসর দাবি করে, রবীন্দ্রনাথ তখন ছোটগল্পের সীমিত ক্ষেত্রকে বাড়িয়ে দেন, প্রথাগত নিয়মের কাছে অসতর্ক হয়ে। 'মেঘ ও রৌদ্র' এবং 'নষ্টনীড়' এই অন্তর্বর্তী কালেরই ছোটগল্প, কিন্তু উপন্যাস প্রয়াসী। একদিকে ছোটগল্পের সীমিত প্রকৃতিতে নিজেকে খুঁজে দেখা, অন্যদিকে বিস্তৃতিতে স্বস্তির সন্ধান— এই সংকটের আবর্তে পড়তে হয়। আর পড়তে হয় বলেই 'রাজর্ষি'র অনুসন্ধান ডানা মেলতে পারে খোলা আকাশে - 'চোখের বালি'তে।

'রাজর্ষি'তে লেখকের অনুসন্ধিৎসাবৃত্তি তৃপ্ত নয় বলেই নিগূঢ় রহস্যময় মানবজীবন সময়ের ঘর্ষণে কিভাবে জ্বলে ওঠে, তার চিত্রকে বার বার দেখে নিতে চায়। তাকে নানান জিজ্ঞাসা দিয়ে হয়তো আবিষ্কার চলে, কিন্তু খুঁজে পাওয়া যায় না সেই বিন্যাস, যা নিছক কোনো তত্ত্বে এসে আটকে যায়, জীবনের মুখোমুখি হয় না। আর জীবন তো কেবল তত্ত্বের মত কতগুলো সরল প্রতিবিম্ব নয়। তাতে সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, সততা-শঠতা পরিমাণগতরূপে পরিবেশিত না হয়ে বরং অঙ্গাঙ্গী জড়িত থেকে তাকে ছাড়িয়ে অন্যকিছু। বুদ্ধি দিয়ে আবিষ্কার এখানে যথার্থ নয় বলেই উপন্যাসেরই সামাজিক দর্পণে প্রতিষ্ঠা দিতে চায়। এই প্রতিষ্ঠারই নামান্তর, প্রতিমা হয়ে ওঠা। তাই 'রাজর্ষি'র নির্মাণ স্তর থেকে রবীন্দ্রনাথের এই সরে আসাটা গত শতাব্দীর একজন সমালোচককে এভাবে ভাবায়—

"কবি ও ভাবুক রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস সাধনার খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ প্রয়াস হইতে এখানেই তাঁহার ঔপন্যাসিক সত্তার সুস্পষ্ট ও পুনর্বিকশিত অভিব্যক্তি।"[৬]

এই অভিব্যক্তির ফসল যে উপন্যাসটিকে ঘিরে, সেই 'চোখের বালি'-র দেশ কাল কি 'নষ্টনীড়ে' সংগুপ্ত নয়! 'নষ্টনীড়ে' রবীন্দ্রনাথ তাই অনুসন্ধান করেন মানুষের মনোভূমিকে, আর 'মেঘ ও রৌদ্রে' থাকে তার সামাজিক প্রেক্ষাপট। এই উপকরণ সঞ্চয় প্রতিমা নির্মাণের আগেই তার শেষ হয়ে যায় বলে— মানুষের মনোভূমি ক্রমশঃ সামাজিক পটভূমি হিসেবে দেখা দেয়। সময় বিন্যাসের এই দীর্ঘসূত্রী প্রবাহ আঁকা হয় উপন্যাসের বৃহত্তর কর্মকাণ্ডে - সময়কে অবলম্বন করে। দাঁড়িয়ে থাকা 'চোখের বালি' হতে 'গোরা' বৃত্তে।

'চোখের বালি'তে যে দেশ-কাল ব্যবহৃত, তাতে রবীন্দ্র সাহিত্য গবেষক মাত্রেই সকলে স্বীকার করেন, এর প্রবহমান কালের ভূমিকা আপেক্ষিক গৌণতায় থেকে মর্যাদা দেয় চরিত্রের আন্তর-সময়ের নানা জটিল প্রকাশকে। 'করুণা'র মত তা কেবল বাইরের গতিধারার ব্যাপক অনুষঙ্গ নয়, আবার 'ঘরে বাইরে'র মানসিক জগতের মত পূর্ণ অন্তরাভিসারীও নয়। অথচ এই দুটো অধ্যায়ের সঙ্গে একটি

সংগতি বিধান করে আছে। করুণা চরিত্রের দুঃখ-বেদনা ছুঁয়ে যে-কাল আবর্ত্তিত, তাতে অন্তর্জগত সহযোগী হলেও স্পষ্টতঃ দানা বাঁধতে পরে না বলেই প্রত্যাশার ছবিটি অসম্পূর্ণ। 'চোখের বালি'তে 'রাজর্ষি' পর্ব শুধু ছাড়িয়ে আসা নয়, পর্বোত্তর কালের পরীক্ষার দ্বারা উত্তীর্ণ ছোটগল্পের দেশকালকেও পেরিয়ে আসা। অতএব এর অন্তর্জগত— তা সে আলোকের দ্বারা ভাসিত, কিংবা অন্ধকারে আচ্ছন্ন হোক, - পর্যালোচনা হয় বাইরের জগতের মাধ্যমে। আবার বাইরের জগত এসে প্রবেশ করে কঠিন নির্মমতায়।

রবীন্দ্রনাথ 'চোখের বালি'র ভূমিকায় উপন্যাসটি তাঁর মধ্যে আকস্মিক বলে উল্লেখ করেন। এক্ষেত্রে যে কোনো সৃষ্টিশীলতার পেছনেই আকস্মিক ব্যাপারটি জড়িত, অস্বীকার করবার উপায় নেই। অতএব সেই অর্থে কেবল 'চোখের বালি' নয়, 'করুণা' উপন্যাসও বঙ্কিমযুগ-পরিবেশে রবীন্দ্রনাথের এক আকস্মিক সৃষ্টি। কেননা পূর্ববর্তী অধ্যায় আলোচনায় একথা স্পষ্ট হয়, সময়ের পালাবদলে 'করুণা' যেমন সহযোগী, তেমনি ব্যতিক্রমিক পরিবর্তন-প্রয়াসী হয়েও ওঠে। তাই এ প্রশ্ন মনে জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক - রবীন্দ্রনাথ কি জানেন না যে তাঁর 'চোখের বালি'র পেছনে 'করুণা'রই নির্মাণ স্তর লুকিয়ে আছে! যে সামাজিক কালটিকে রবীন্দ্রনাথ 'করুণা'তে দেখাতে চান, 'চোখের বালি'তেও কি সেই সমাজ ওঠে আসে না। বরং বলা যায়, এক্ষেত্রে বাহ্যিক সামাজিক-পরিসর তো আরো সংকুচিত। যেহেতু 'করুণা'তে মূল কাহিনী সূত্রকে ধরে পাশাপাশি অন্য দুই কাহিনীসূত্র (মহেন্দ্র-রজনী বৃত্ত, সার্বভৌম-কাত্যায়নী বৃত্ত) সামাজিক স্তরকে অনেকটাই খুলে দেয়। 'চোখের বালি'তে সেখানে মূল বৃত্তকে ছাড়িয়ে চলার আকাঙ্ক্ষা সামান্যই। বরং মহেন্দ্রের পরিবারকে ধরে যে বৃত্তটি উপন্যাসে আবর্তিত তা ক্রমশঃ পরিবার ও ব্যক্তিমুখী। সমাজ বিচ্ছিন্নতাই এই পারিবারিক পরিসরের মৌলধর্ম। উপন্যাসের সমস্যা নয়, উপন্যাসেই এই সমস্যাকে সময় ধর্মের ক্ষেত্রে কাজে লাগানো হয়।

তবু করুণার যে সময় এবং পরিসর বাইরে ব্যাপ্ত, অন্তর্জগত সৃষ্টিতে তার ভূমিকা ক্রমশ ক্ষীণ হতে হতে নীরবতা অর্জন করে। উপন্যাসের শেষে করুণা-নরেন্দ্র পর্ব তাই অন্য দুই শাখা কাহিনীর সঙ্গে মিলিত হয়েও সময়ের চলমানতাকে স্পষ্টতঃ পূর্ণতা দিতে পারে না। বস্তুতঃ বিস্তৃত সামাজিক প্রেক্ষাপটে ওঠে আসতে চাইলেও তাকে নেপথ্যলোকে হারিয়ে যেতে হয়। এই হারিয়ে যাওয়া মানবকালের দর্পণে ব্যক্তির অন্বেষণ এবং তার সৃজন সম্পূর্ণ হয় 'রাজর্ষি'র গোবিন্দমাণিক্যের মধ্য দিয়ে। তবু 'করুণা' থেকে 'রাজর্ষি' পর্যন্ত সামাজিক বহু মানুষের দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে সময়ের নানা ব্যঞ্জনার প্রকাশ কতটুকু! তাই সামাজিক ছবিটি বাইরের দিক

থেকে একরকম বা আরো সংকোচনশীল বলে মনে হলেও আসলে 'চোখের বালি'র উপন্যাস-বয়ান পরিসরকে নানা মাত্রায় সাজিয়ে তোলে। সেই সঙ্গে বহু শাখায়িত রূপে ধরা দেয় সময়। একটি সামাজিক স্তর থেকে আসা চরিত্র আরেকটি সামাজিক স্তরের গৃহকোণকে অবরুদ্ধ পরিবেশ থেকে কতটুকু বিস্তৃত সামাজিক-পরিসরে নিয়ে যেতে পারে— তারই ছবি এই উপন্যাস। আর এই বিন্যাসগত উৎকর্ষতা তত্ত্বগত নয়, অনেক বেশি মানবীয়। ইতিপূর্বে বয়ান গঠনের নানা ছক মিলে যে পরীক্ষার সূত্রপাত হয়, তার প্রস্তুতিপর্ব রবীন্দ্রনাথ শেষ করেন 'রাজর্ষি'তে। নূতন পর্বের উন্মেষ 'নষ্টনীড়' গল্পটি ধরেই। কিন্তু সেখানে ঔপন্যাসিক দ্বিধাকে কাটান না বলেই তাকে ছোটগল্প করেই রেখে দিতে হয়। আর ক্ষণকাল পরেই সাহস সঞ্চয় করে 'চোখের বালি'তে তাঁর প্রবেশ সম্ভব হয়ে ওঠে। মনের মধ্যে জমিয়ে রাখা বিস্তৃত সময় ও পরিসর দিয়ে গড়া সামাজিক ভাবনাকে আর ছোটগল্পে নয়, মুক্ত উপন্যাসপ্রকরণে আলাদা ভাবে তার সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় সাফল্য আর নূতন সন্ধানী দৃষ্টির মধ্যে— বিনোদিনীই যার চারণভূমি।

'চোখের বালি'তে সময়কে যারা প্রধানত চিহ্নায়িত করে, তারা প্রথমতঃ আত্মবিচ্ছিন্ন। অথচ সেই সঙ্গে তারা প্রগতিশীল মনের অধিকারী হয়ে ওঠার জন্যও প্রস্তুত। উপন্যাসে সমাজ যদি সময় এবং পরিসরের যুগল মিলন ক্ষেত্র হয়, তবে তার প্রকাশের স্তরটি থাকে এর পাত্রপাত্রীদের উপর। আবার উপন্যাসের পাত্রপাত্রীরা শুধু তথ্য প্রকাশের আধার মাত্র নয়, রক্ত মাংস দিয়ে গড়া মানুষ। অতএব স্পষ্টত তারা তাদের ব্যক্তিসত্ত্ব নিয়ে আলাদা-আলাদা হয়েই থাকে। আর তাতে আলাদা-আলাদা সামাজিক দ্বীপ রচিত হয়। তখন তারা সংঘবদ্ধ কোনো বৃহত্তর সময়ের কথা বলে না। কিন্তু উপন্যাস-বয়ানে সময়ের একটি চলমান স্রোত যখন সকল বিচ্ছিন্ন ভূমিখণ্ডকে ছুঁয়ে যেতে থাকে, লেখক তখন তাদের মধ্যে শিল্পের তাগিদেই সঙ্গতি খোঁজেন। এই সঙ্গতি তিনি সময়কে আশ্রয় করেই পান। চরিত্রগুলো সংঘবদ্ধ হতে থাকে, তাদের বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিসত্ত্ব সংশোধিত হয়। 'চোখের বালি'তে তাই যে সামাজিক মঞ্চ গড়া হয়, তার প্রথম পর্দা উঠলেই চোখে পড়ে বিচ্ছিন্নতার ভেতরে-ভেতরে সামঞ্জস্যের প্রয়াস। এ সামঞ্জস্য লেখকের দ্বারা গঠিত নয়, সেই যুগ পরিবেশের মধ্যেই নিহিত। তাই মহেন্দ্র-বিনোদিনী-বিহারী— তিনটি একে ওপরের আবর্তিত চরিত্রে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ভূমিকাও যুক্ত হয়। গ্রামীণ জনজীবনকে ছাড়িয়ে ঔপনিবেশিক জীবনের সংগতিহীন বিচ্ছিন্নতার মাঝখানেও আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রসার সংযোগের সম্ভাবনাকে নিয়ে আসে। মনে রাখতে হয়, নিশ্চয়ই এ শিক্ষা পুরুষের ক্ষেত্রে আর জমিদার তন্ত্র কিংবা রাজতন্ত্র পরিচালনার নয়— 'করুণা'

থেকে 'রাজর্ষি' পর্যন্ত যার ছবি ইতিপূর্বে আমাদের নজরে পড়ে। নারীর ক্ষেত্রে সন্তান পালন এবং আত্মরক্ষার পাঠই একমাত্র নয় - আত্ম অধিকারের চেতনা হয়ে ওঠে বড়। অথচ শিক্ষার এই ভূমিকা জীবনের মানকে যেখানে পরিবর্তিত করে, সেখানে সহজে সামঞ্জস্য আসে না। তাই আধুনিক শিক্ষার আলোক প্রাপ্ত হয়েও মহেন্দ্র-বিনোদিনী-বিহারী কেউ-ই তাদের চারিত্রিক বিচ্ছিন্নতাকে ত্রুটি বলে স্বীকার করে না। স্বীকার করে সময়ের নানান উচ্চারণে আবর্তিত হয়ে - স্পর্শে, সঞ্জীবনের ধারায়, ধীরে - প্রতিমা যে লক্ষ্যে একটু একটু করে শিল্পীর হাত ধরে গড়ে উঠতে থাকে।

অথচ যে বিচ্ছিন্নতার কথা বলা হয়, তাকে বিচারকের আসন থেকে দেখেন না লেখক। তাকে আর নির্দয় সমালোচনা নয়, স্বীকার করে বিস্মিত হওয়া। স্বীকার করা, - যেহেতু তা একটি বিশেষ সময়বিন্দুর পরিচায়ক; বিস্মিত হওয়া— যেহেতু প্রবহমান কালের দরবারে বিযুক্তি থেকে সংযুক্তির সঞ্চারণ। বিযুক্ত আছে বলেই যুক্ত হবার আকাঙ্ক্ষা— মহৎ ঔপন্যাসিকের মতই রবীন্দ্রনাথের এই ভাবনা,— এই প্রজ্ঞা-বিস্ময়। তাই আগে থেকেই 'চোখের বালি'তে 'করুণা'র মত কোনো সাবধান বাণী সোচ্চার কণ্ঠে স্বয়ং লেখকের অনুপ্রবেশের মধ্য দিয়ে করতে দেখা যায় না। দায়িত্বকে আর সামাজিক কর্তা হিসেবে নিজের উপর না রেখে সামাজিক ঘটনার উপর সিদ্ধান্তকে ছেড়ে দেওয়া হয়। 'চোখের বালি' তাই লেখকের প্রত্যক্ষ মনোলোক না হয়ে আপন স্বাধীনতায় মানবলোকের দর্পন হয়ে ওঠে। আপন মর্জিতে ছুটে, অথচ লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে পারে না— উপন্যাসের আশ্চর্য সময় বন্ধনের সূত্রে। এতে সমালোচনা, প্রতিবাদ, ঈর্ষা, বীভৎস আদিম লিপ্সা— সমস্ত উচ্চারণ ধ্বনিত হয়। কিন্তু সজ্জিত হয় একটি অন্যটির বিপরীত দৃষ্টিকোণে। তাকে আর সাজাতে হয় না, তীব্র সময় বোধের তাড়নায় অদৃশ্য লেখকের চিন্তাভূমি থেকে ক্রমাগতই তা জাগরিত। সে কারণেই প্রতিটি চরিত্রই বাহ্যিক সময়ের একমুখী ধর্মের সীমানায় একে-অপরের কাছে সংযত হয়েও মানসিক কালের জগতে বিচিত্রমুখী তোরণকে খুলে দেয়। আর হয়ে ওঠে সেই জগৎতে ঘিরে এক একটি স্তম্ভ।

আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বের সূত্র সন্ধানের আলোচনায় আমাদের কাছে এ কথাটি আজ স্পষ্ট যে, সময় পরিসর ভিত্তিক নির্দ্ধারিত - সময় ও স্থান সমতুল্য। ঘড়ির কাঁটার গতি পারিপার্শ্বিক মাধ্যাকর্ষণ ফিল্ডের উপর নির্ভরশীল, সময় বাঁধা মাধ্যাকর্ষণ ও ত্বরণের কাছে। উপন্যাসের ক্ষেত্রেও চরিত্রের মানসিক কাল পরিসর সমবায়েই নির্দিষ্ট। 'চোখের বালি' উপন্যাসে তাই মহেন্দ্র-বিনোদিনী-বিহারী-আশা-রাজলক্ষ্মী প্রত্যেকেই বিশেষ পরিসর ভিত্তির ফসল। তাদের মানসিক জগতের

বিচ্ছিন্নতাও পরিসর সঞ্জাত। আর তাদের মানসিক একাকীত্বকে মানবিক পূর্ণতা প্রদানের মূলেও আছে পরিসরের পট পরিবর্তন, তার সম্প্রসারণ। এই আলাদা-আলাদা স্তর যখন প্রথম উন্মোচিত হয়, তখন আমরা তাতে শুধু উপন্যাসের মৌল সংকটকেই দেখি না, পরিসর এবং কালের সংকটকেও দেখি। আর এই সংকট যখন ঘনীভূত হতে থাকে, তখন প্রত্যেকটি চরিত্র তাদের ছিন্ন পরিধি থেকে একে অপরের বিরুদ্ধে বিচারক হয়ে ওঠে। মহেন্দ্র তাই খণ্ডিত দৃষ্টিতে পরিধিবৃত বিহারীকে দেখে; বিহারী, রাজলক্ষ্মী,আশা কিংবা বিনোদিনীও তাই। এই দেখার মধ্যে পরিচয়ের চিহ্ন নেই, তাই উদ্দাম হয়ে ওঠে একাধিপত্যের বাসনা। কিন্তু অদৃশ্য সময় নামক শক্তিটি মৌলধর্মে পরিবর্তন প্রয়াসী। এই পরিবর্তন সম্মুখগামী কি পশ্চাৎমুখী, সে বিজ্ঞানের, নীতিশাস্ত্রের আলোচনা হতে পারে। কিন্তু উপন্যাস শিল্পে তার প্রসারণ ক্রিয়াই সত্য। কারণ, একমাত্র এই সত্যের পেছনেই মানুষের জীবনকে খুঁজে পাওয়া যায়। অতএব সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে পরিসর পরিবর্তন অনিবার্য। আর এই পরিবর্তন সকলেই সমানভাবে নিয়ে আসতে পারে না। সেই পারে, যে ঘন ঘন পরিসর বদলের ভেতর দিয়ে জীবনের অন্বেষণে ছুটে। বিনোদিনীর ক্ষেত্রে পরিসর পরিবর্তন কিছুটা ভাগ্যনির্ভর হলেও তার জীবনের অন্বেষণ আন্তরিক। 'চোখের বালি'র বৃহত্তর পরিণতির স্তর তাই বিনোদিনীকে মাধ্যম না করে এগুতেই পারে না।

আশার প্রতি বিনোদিনীর চোখের বালি সম্পর্ক পাতানোর মধ্যে ঈর্ষার ছদ্মবেশ ধরা দেয়। কিন্তু তাকেই গুরুত্ব দিয়ে লেখক যখন গোটা উপন্যাসটির নামকরণের মতো সূক্ষ্ম এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সন্ধান করেন, তখন খুব সরলভাবে ভাববার পেছনেও সময় ব্যঞ্জনার ধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। বিনোদিনীকে এখানে তো শুধু বর্তমান দিয়ে দেখা নয়, তার ঈর্ষার কারণ অনুসন্ধানে অতীত প্রেক্ষিতটিকেও তুলে আনা। যে মহেন্দ্র তার স্বামী হতে পারতো, যে মহেন্দ্রের গৃহ তার গৃহ হয়ে উঠতো, যে শিক্ষার আলোকে রুচিশীল জীবনকে আরো সুন্দর করে গড়া যেতো— সমস্তই তা তাসের ঘরের মত ভেঙে যায়। বিনোদিনীকে মহেন্দ্র, মহেন্দ্রের গৃহ হারাতে হয়। বৈধব্য নিয়ে পল্লীগাঁয়ের বদ্ধতায় দিনের পর দিন উজ্জ্বল কল্পনালোককে দলিত হতে দেখে। অথচ এই লাঞ্ছনা, সামাজিক অবমাননা বিনোদিনীর জীবনেই কেন? সে কি মহেন্দ্রের খেয়ালী মনের ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রশ্নে! বিনোদিনীই তার প্রাথমিক জীবন পর্যালোচনায় দেখায়, তা নয়, আসলে পরিসর তখন পুরুষশাসিত। সামাজিক কাল তাই পুরুষকেই সহযোগিতা করে। নারী— একমাত্র নারী বলেই বিনোদিনীকে শিক্ষিত হয়েও মহেন্দ্রের ইচ্ছা-অনিচ্ছামুখী হতে হয়। রুগ্ন পুরুষকে

স্বামী হিসেবে বরণ করে অকালেই তার জীবনে ঘটে যায় বৈধব্যযোগ। আর তার মানুষী বাসনাকে চিরতরে রুদ্ধ করে দিয়ে সমাজ তাকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে। অতএব বাইরের লোক হিসেবে মহেন্দ্রের পরিবারে পদার্পন করে আশাকে দেখে এক এক করে বিনোদিনী নিজের সময়ের অতীত স্তরটিতে অবগাহন করে নেয়। কিন্তু পর্বের এই অধ্যায়েই বিনোদিনী আশার মধ্যে আত্মদর্শন করতে শুরু করে। তাই অন্তরে যে শূন্যতাকে নিয়ে সে ভারাক্রান্ত, তার বোঝা মহেন্দ্রের পরিবারে এসে বরং আরো বেড়ে ওঠে। তার লালিত ব্যক্তি কালের সঙ্গে মহেন্দ্রের পারিবারিক কালের আপাত সুখ-সমৃদ্ধির মধ্যে ব্যবধান সে অনুভব করে। আর তাকেই বিরোধী শক্তিরূপে সে দেখে আশার মধ্যে। কাজকর্ম, সৌন্দর্য বৃত্তি - সকল দিক দিয়ে সে প্রতিদ্বন্দ্বীর ভূমিকায় আশাকে অনুসন্ধান করে। হয়তো তার জন্য পল্লীগ্রামের সংকীর্ণতা এবং মহেন্দ্রের পরিবারের ক্ষুদ্র গণ্ডীবদ্ধতা তাকে প্ররোচিত করে। কিন্তু এই মিথ্যার আবরণকে বিনোদিনীই প্রথম খসে যেতে দেখে সময়ের অভিজ্ঞতাকে ধরে। আশাকে কোনোভাবেই তাই প্রতিদ্বন্দ্বীর যোগ্যতা দিতে না পারার মধ্যে তার দ্বিতীয় উপলব্ধি ঘটে অতি সূক্ষ্মভাবে, - আশাও এই বৃহত্তর সামাজিক আধিপত্যের একটি পুতুল। নিজের জীবন তখনই আশা পর্যন্ত তার সম্প্রসারিত, কিন্তু আত্মদর্শন তখনও দূরাগত। তাই 'আশা' এবার বিরোধী শক্তি নয়, চলার পথের হাতিয়ার। অনুসন্ধানের পর্বে পর্বে চোখের বালির তিক্ততাকেই বিনোদিনী পরিসর আর সময়কে ভাঙার কাজে শক্তির উৎসরূপে দেখে। বিনোদিনীর পক্ষে তিক্ততার পথটাই হল বাস্তব, কারণ তার অভিজ্ঞতার স্তরটাই যে এভাবে গড়ে ওঠে।

মহেন্দ্র যে স্বেচ্ছাচারী বৃত্তিটি সামাজিক স্তর থেকে গ্রহণ করে। তাকে শুধু লালন নয়, প্রদানের দায়িত্বটুকুও নেন সামাজিক অনুশাসনের দ্বারা বন্দি এক নারী - রাজলক্ষ্মী। অতএব যদি মহেন্দ্র বিনোদিনীর উদ্দিষ্ট পথে বারবার সমালোচিত হতে থাকে, তবে তার দায়ভার থেকে রাজলক্ষ্মী কি এড়িয়ে যেতে পারেন! ক্রমশঃ বিনোদিনী তাই যে ভূমিকা উপন্যাসে গ্রহণ করে, তার মূলে নিশ্চয়ই পুরুষতন্ত্রী যুগাবসান ঘটিয়ে মানব তন্ত্র নয়, অমানবিকতার বিরুদ্ধে মানবিককে জীবনে প্রতিষ্ঠা-কল্পে যুগচিত্তকে গড়ে নিতে চাওয়া। ঈর্ষার বিষে জর্জরিত স্থবির জীবন বিনোদিনীর কাঙ্ক্ষিত সত্য হয়ে ওঠে না বলে তার পরিসর থেকে সকলের পরিসরে সে সম্মিলিত হতে পারে। সম্মিলন ক্রিয়ার ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন পরিসরে সময়ের অনুসন্ধান সে করে এবং তার বদ্ধতাকে দূরীভূত করতেও চায়। কারণ যে রাজলক্ষ্মী পুত্রের মাধ্যমে বদ্ধতার সংস্কারকে ধরে আছেন, দেখা যায় সে তো দীর্ঘদিনের সময় বাহিত, অথচ আত্মপরিচয়হীন একই পরিসর দ্বারা বৃত সমাজ কাঠামোর একমাত্রিক ধারণায়

নির্ভরশীল। বস্তুত চিরকালের সমকালের যে রূপায়ণ, তা তো হঠাৎ করে তৈরি নয়। পুরোটার মূলেই আছে প্রগতির পাশাপাশি দীর্ঘদিনের অতীত অভিজ্ঞতার প্রশ্ন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দাপট তো এখানে কেবল সামান্য তরঙ্গ বিক্ষেপ মাত্র। ক্ষমতাবানের আধিপত্যের অস্ত্রে জর্জরিত হওয়া মানবলোককে শুধু মাত্র বহুদূর পর্যন্ত সময়কে বিস্তৃত করেই দেখা যেতে পারে। মহেন্দ্র নিজেকে এই বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে সত্যকে আবিষ্কার করতে চায় না। আশা, রাজলক্ষ্মী, বিহারীর ক্ষেত্রেও তা সমান সত্য আর তারা যে বৃত্ত থেকে ওঠে আসে, নানা অভিজ্ঞতার ছোঁয়া থাকলেও সামঞ্জস্যপূর্ণ পূর্ণাবয়ব তাতে নেই। তাই তারা নিজেরাই নিজেদের বর্তমানটিকে সচেতনভাবে চেনে না। অতএব মহেন্দ্র বিনোদিনীতে উৎসাহ না দেখিয়েও বিনোদিনীমুখী হয়, বিহারী আশার প্রতি মানবিক মমতা প্রদর্শন করতে গিয়ে বিনোদিনীর প্রতি অমানবিক হয়ে ওঠে, রাজলক্ষ্মী নিজের একাধিপত্যকে বর্তমান রাখতে পুত্রের বধূপ্রীতিকে স্ত্রৈণতা বলে ভাবেন এবং তুলনা দিতে ভোলেন না — তার যুগের কর্তারা গৃহিনীদের প্রতি কি ব্যবহার করতেন।

লক্ষণীয়, জীবনকে উপলব্ধি করতে সময়ের দুটো ধারা দিয়ে যাত্রা সম্ভব। এক হচ্ছে ক্রমান্বিত কাল - নানা অভিজ্ঞতার সঞ্চরণ; দুই, সিদ্ধান্তকাল— নানা অভিজ্ঞতাকে একটি পূর্ণাবয়বে অবলোকন-উপলব্ধি-সাঙ্গীকরণ। একথা না বলে উপায় নেই, 'চোখের বালি'তে প্রতিটি চরিত্রই কোনো না কোনোভাবে নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সঞ্চারিত হয়ে জীবনের একটা স্তরে এসে পূর্ণাবয়বে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত এতটাই অসম্পূর্ণ, যে তার ফলে ব্যক্তি এবং পরিবারকে ছাড়িয়ে সামাজিক দৃশ্যপট অদৃশ্য হয়ে পড়ে। তবু এ অসম্পূর্ণতা মূল্যহীন নয়, ভেতরে ভেতরে সংগ্রাম অব্যাহত। ঠিক এরকম একটি ক্ষেত্র থেকে সকলের জন্য প্রয়োজন বিনোদিনীর মত কোনো শক্তিকে। যার দ্বারা প্রত্যেকের ব্যক্তি অভিজ্ঞতার ক্রমান্বিত কাল অপরতা - শূন্য অক্ষমতায় আক্রান্ত না হয়ে একটি যৌগিক কর্মধারায় পূর্ণায়ত ছবিতে বিভাসিত হবে। উপন্যাস - সূচনায় বিনোদিনীর যে টুকরো ছবিকে প্রচ্ছায়ার মত একটুখানি আবিষ্কার করা যায়, সেখানে তার আংশিক পরিচয় সে একজন রুচিশীলা শিক্ষিতা কন্যা। মানবিক উচ্চাশাকে নিয়ে তার মধ্যবিত্ত আধুনিক বিবেকসম্পন্ন পিতা একমাত্র এই কন্যাটির জন্য মিশনারী মেম রেখে বহু যত্নে পড়াশুনা ও কারুকার্য শেখান। কিন্তু বস্তুত যে পরিসর তখন প্রত্যক্ষ, সেখানে বিনোদিনীর আত্মপ্রকাশের কোনো অবকাশ নেই।

কিন্তু মহেন্দ্রের পরিবারে তার আগমন উপন্যাস-বয়ানের গুরুত্বপূর্ণ দিক। ঈর্ষার অবগুণ্ঠন আর আধুনিক শিক্ষার রুচিশীলতাকে অন্তরে ধারণ করে পরিবর্তনের

বিপুল দায়িত্ব তার মধ্যে ধরা দেয়। নারীর প্রথাগত সৌন্দর্যের মানসীমূর্তি তাই আর আঁকতে চান না রবীন্দ্রনাথ। প্রতিমা সৃষ্টি করেন এই প্রথম— স্নিগ্ধতার নয়, জ্বলে ওঠবার। সমালোচকের কথা চমৎকার প্রযুক্ত হতে পারে এক্ষেত্রে—

"পুরুষানুক্রমিক নানা অভিজ্ঞতায়, জীবন চেতনায় সে জাগছে কাল থেকে কালে নানা অভিঘাত ও দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে। সমাজ বিজ্ঞানীর মতে এ গতি কখনই সরল নয়— দেশ ভেদে, তার পরিবেশ ভেদে, প্রতিবন্ধকতার চরিত্রভেদে তার আদলও একরকম থাকে না।"[১০]

বিনোদিনীকেও তাই পরিসর অনুসারে জাগতে হয় অন্য মূর্তিতে। আশার সঙ্গে চোখের বালি-সম্বন্ধ যার প্রথম পাঠ। একদিকে ইতিহাসের (অতীত) ছবিকে পাল্টানো, আরেকদিকে ইতিহাস (পূর্ণাবয়ব) তৈরি হয়ে ওঠা, যা ঘাত-প্রতিঘাত, সংগ্রাম-সংঘর্ষের মধ্য দিয়েই সম্ভব।

'চোখের বালি'তে মহেন্দ্রের পরিবারকে নিয়ে যে একটি নিশ্চল-পরিসর সীমানার দ্বারা নিশ্চিত, বাইরে থেকে উল্কার মত বিনোদিনীর আবির্ভাব তাকে যথাযথ ধাক্কা মারে। গতির সূত্র অনুসারে বলা যায় এই ধাক্কার সমানুপাতিক বিপরীত শক্তি জাগাটাও স্বাভাবিক। আর তার ফলে লড়াই জমে ওঠে বিভিন্ন মোটিভে। নেপথ্য-সমাজকে জাগরিত হয়ে ওঠতে, পরিবারকে (platform) সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিবর্ধিত করে তোলে ব্যক্তি সময়ের বিচিত্র টানাপোড়েন। বলা যেতে পারে বাজিয়ে নেওয়া হয় গোটা পর্বটিকে,— ক্রমান্বিত সময়ের নিয়মে,— বিনোদিনীকে কেন্দ্রে রেখে। এছাড়া বিনোদিনী যখন মূল পর্বে নেই, তখন ক্রমান্বিত সময়ের ধারা উদ্দেশ্যহীন। এবার তার স্পষ্ট আকার পাওয়া যায় নিজস্ব নিয়ম অনুসারে।

ইতিপূর্বে আলোচনার দ্বারা দেখি, রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসে নারীবাদী কিংবা পুরুষতন্ত্রী— কোনো পক্ষ ধরেই একমাত্র কথা বলেন না। কিংবা নারী পুরষের মধ্যে মানসিক স্তরে বিচ্ছিন্ন রেখা ধরিয়ে দিয়ে কোনো বক্তব্য রাখতেও প্রবল উৎসাহী নন্। যদিও নারী ও পুরুষের দুই আইডেনটিটি তিনি স্বীকার করে এগোন অনিবার্যগতিতে। এই স্বীকৃতিতে একদিকে ব্যক্তির থেকে ব্যক্তির আত্মপরিচয় দিয়ে বৈচিত্র যেমন আনেন, তেমনি অন্তরালে নির্দিষ্ট হয় সময় ও পরিসর। শরৎচন্দ্র নারী ও পুরুষকে আলাদা মর্যাদায় মূর্তিমান করেন সত্য, নির্দিষ্টও করেন বিশেষ কতগুলো সময়-পরিসর। কিন্তু পরিকল্পিত উপায়ে সর্বস্তরে তাদের দ্বৈত মিলনে অদৃশ্য এবং শান্ত ভাবে অবস্থানরত মানবায়নের অন্তরালে বিশাল সময় প্রতীতী অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েও তাঁর সৃষ্টিতে ব্যাপকভাবে ওঠে আসে না। শরৎচন্দ্রের নারী - পুরুষরা তাই কম-বেশি প্রায় সমমাপের চরিত্র লক্ষণের দ্বারা পুষ্ট। তারা দেশকালের

সঙ্গে গভীর অভিনিবেশ ও তাৎপর্যে যুক্ত নয়।[১১] কিছু ব্যতিক্রম দৃষ্টান্ত বাদ দিলে দেখা যায়, তারা কোনো একটি বা দুটি বৃত্তের পৌনঃপুনিক অবস্থান। কিন্তু রবীন্দ্র উপন্যাসে 'নারীর সমস্যা' বিশেষ কালের সমস্যা, 'ব্যক্তির সমস্যা' আরো বড়। আর সে কারণেই তা সহজে নিষ্ক্রিয় হতে চায় না। 'করুণা' উপন্যাসে করুণা, 'বউ ঠাকুরাণীর হাটে'র বিভা, 'রাজর্ষি'র হাসি— ইত্যাদি স্তর পরম্পরায় সময়কে ব্যক্তির মধ্যে সঞ্চয় করে তোলে। করুণা আর বিভার সমস্যা যদি দুটো প্রেক্ষাপটে এক হয়ে থাকেও, 'রাজর্ষি'র বালিকা চরিত্রটি অন্য আরো বৃহত্তর সমস্যার ইঙ্গিত দেয়। যে সমস্যায় করুণা আর বিভার জীবনও যুক্ত হয়ে পড়ে। 'চোখের বালি'র প্রতিমা নির্মাণে বিনোদিনীর ভূমিকা তাই নারীর অধিকারের লড়াই হিসেবে ভাবলে ভুল হবে। নারী-পুরুষের ব্যবধানগত যে সমস্যা, - রবীন্দ্র উপন্যাসেই তার মূলগত উত্তর পাওয়া যায় সামাজিক আধিপত্যের নিয়ন্ত্রণে। অর্থাৎ বিশেষ পরিসর সম্পৃক্ত সময় বোধই তার সৃষ্টি। অথচ সেই বিশেষ পরিসর ভিত্তিক সময় সম্পৃক্তির আবরণ তুলে দেওয়াই হয় তাঁর কাজ। তুলে দেওয়া মানুষের জন্যই। বিশ্বকালকে নানান গতিতে ঔপন্যাসিক এ কাজে ব্যবহার করেন।

অবশ্য এক্ষেত্রে নারীর মাতৃত্ববোধ ও প্রবৃত্তি তাকে সামাজিক একাধিপত্য ছাড়াও সর্বকালের পুরুষের থেকে আলাদা করে তোলে। শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিকোণে যার ব্যবহার গুরুত্বের সঙ্গেই করা হয়। রবীন্দ্রনাথ সুকৌশলে এই পর্বটিকে ছোটগল্পে কিছু কিছু আনলেও উপন্যাসে কিন্তু এড়িয়ে যান। হয়তো উপন্যাসের সৃষ্ট জগতের অবতরণিকায় করুণা কিংবা বিভার মধ্যে মাতৃত্ববোধের আভাসকে ধরতে চাওয়া হয়। কিন্তু অস্তিত্বের সমস্যার চাইতে তা কখনো বড় হয়ে ওঠে না, কিংবা অস্তিত্বের সমস্যা থেকেই সন্তান-বন্ধন মুখ্য হয়ে পড়ে না। 'যোগাযোগ' উপন্যাসে তার স্পষ্ট স্বীকৃতি আমাদের সচেতন করে। কুমু সেখানে সোচ্চার ভাবে নিজের বিপন্ন অবস্থান থেকে উৎক্রান্ত হবার লক্ষ্যে সন্তানের প্রতি মায়ের স্নেহ বন্ধনকেও কার্যকারণ সূত্রে বড় করে তুলতে পারে না। পরে অবশ্য তার পরিবর্তনটি কোন অবস্থা কিংবা অবস্থানের চাপে ঘটলো— সে স্বতন্ত্র। কিন্তু দাদার কাছে তার বর্তমান হয়ে ওঠার বাসনা প্রচলিত ভাবনা থেকে রবীন্দ্র চিন্তার ব্যতিক্রমিক দিককেই নির্দেশ করে। হয়তো নারীকে মানুষী করে তোলার লক্ষ্যে এও তাঁর এক বিশেষ প্রতিমা, বিশেষ খাঁচার বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসা। সময় ও সময় বদলের সকল পথকেই উপন্যাসের মসৃণ পথে তুলে ধরার সুযোগ আছে বলেই সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ মাতৃত্ববোধের একটি তন্ত্রীতে নারীকে স্বতন্ত্র করে বেঁধে রাখতে চান না। 'চোখের বালি'তে বিনোদিনী বিশেষ কোনো মূর্তিতে চিহ্নিত নয়। সময়ের দ্বারা তৈরি হয়ে ওঠা নিষ্ক্রিয়-বিনোদিনী

বরং ঈর্ষাপরায়ণ; কিন্তু তারপর ব্যক্তিত্ব অর্জনে তার লক্ষ্য ও আকাঙ্ক্ষা সমকালকে গড়তে কিভাবে এগিয়ে যায়, কিভাবে প্রাথমিক অবগুণ্ঠনকে তুলে দিয়ে ব্যাপক চলমানতার পথে পাড়ি জমায় এবং তার ফলে নিজের শুধু পরিবর্তন নয়— পারিপার্শ্বিককেও নাড়িয়ে দেয় — তাকে বিচার করেই আমাদের এগিয়ে যেতে হয়। প্রতিমা ক্রমশঃ স্পষ্ট হতে থাকে।

বিনোদিনী যখন মহেন্দ্রের পরিবারে প্রথম প্রবেশ করে, তখন সে যে পরিবর্তন আকাঙ্ক্ষা করে, তা সচেতন কোনো সামাজিক পালাবদলের প্রতি দায়বদ্ধতা নিয়ে নয়। নিজের ব্যক্তিজীবনের অপ্রাপ্তিই তাকে কেবল প্রাণীত করে। এরজন্য বারে বারেই আশার সঙ্গে তার নিজের প্রতিতুলনা সে করে। আর ক্ষতবিক্ষত হতে হতে কঠিন পরিস্থিতিতে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় আক্রোশ। 'রাজর্ষি' উপন্যাসের সময় পরিবর্তনের সঙ্গে এখানেই বড় পার্থক্য। গোবিন্দমাণিক্য হাসির মাধ্যমে বৃহত্তর সামাজিক চিত্রটিকে জিজ্ঞাসা দিয়ে সূচনা থেকেই অনুসন্ধান করেন। অথচ ব্যক্তির নিভৃত লোক থেকে ব্যক্তির বিস্তৃত লোকে মুক্ত সমাজ অনুসন্ধান করতে ধীরে ধীরে আবরণ উন্মোচিত হতে যে অবকাশের প্রয়োজন— সেখানে সময়ের ইতিহাস সাক্ষ্য হয়ে থাকে। যা 'রাজর্ষি'তে স্পষ্ট করা হয় না। একমাত্র উপন্যাস মাধ্যমেই যে এই সম্ভাবনাকে ধারণা করা যায়, 'চোখের বালি'র বিনোদিনীতে তাকেই সম্পূর্ণ করে তোলা হয়। অবশ্য এক্ষেত্রে দুটো উপন্যাসের দুটো চরিত্রের অবস্থানবিন্দুও আলাদা। গোবিন্দমাণিক্য যেখানে একটি দেশের শাসক বলেই তাঁর নিভৃত ব্যক্তি অধ্যায় তেমন আবরণ মোচন করে ধরা দিতে পারে না, অন্যদিকে বিনোদিনী সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে হয়েও উনবিংশ শতকের শিক্ষার আলোককে পর্যাপ্ত পরিমাণে না পেলেও অনেকটাই ছুঁয়ে যায়। আর তাই দিয়ে সে যে ব্যক্তি পরিধি রচনা করে তাতে ক্রমশ তার ভেঙে যাওয়া ছবিটি দেখতে থাকে। অতএব ব্যক্তি জীবনকে ছাড়িয়ে বৃহত্তর সমাজ জীবনকে দেখার অবকাশও তার ছিল না, দায়িত্বও না। বরং সামাজিক বৃত্তের একটি অংশের দ্বারা নিপীড়িত হয়ে তার মনে বিতৃষ্ণার পাহাড়ই জমে ওঠে। তাই নিজের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে অসংশয়ী হয়ে যখন মহেন্দ্রের পরিবার ও কলকাতার সামাজিক বৃত্তে সে ওঠে আসে, তখন তার মধ্যে প্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি শুধু দৃঢ় হয় না দুর্নিবার গতিতে অনমনীয়ও হয়। খণ্ড সময়ের একটি আশ্রয়কে পেয়ে পরাজিত সৈনিকের মত সে উদ্ধার করতে ব্যস্ত হয় আত্মভূমি। আঁচড় কেটে পদচিহ্নকে করে মুদ্রিত।

বিনোদিনীর এই স্বভাব বৈশিষ্ট্য মহেন্দ্রের পরিবারে এসে শুধু ভবিষ্যৎ নির্মাণ নয়, সে তার অতীতকেও উপলব্ধি করতে শুরু করে। সমতলে এই সংযোজক হয়ে

ওঠা নিয়েই মূল স্রোতের সঙ্গে তার সম্পর্ক তৈরি হয়। এখানে বঙ্কিমের রোহিনী চরিত্র সৃষ্টির সঙ্গেও বিনোদিনীর আবার এক বৈসাদৃশ্য। তার কারণ, রোহিনীর অতীত ধারাবাহিক ইতিহাসকে মর্মের সঙ্গে ফুটিয়ে তোলা হয় না। অন্যদিকে সে আবার যে সমকাল কামনা করে, সেখানে ভোগ সন্ধানের মধ্য দিয়ে আত্মসুখ বড় হয়ে ওঠে। অন্য ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য, কিংবা সেই সান্নিধ্যের সময়-অনু দিয়ে অন্য কোনো পথরেখাও সে গড়ে নিতে পারে না। তাই গোবিন্দলালও তার কাছে যা, নিশাকরও তাই। বঙ্কিমচন্দ্রের মানসিকতায় তখন বড় নিকটের বর্তমানটি সামাজিক আধিপত্য নিয়ে জেগে ওঠে। তাই মানুষের মুক্তিপ্রীতিকে তিনি ভোগের ব্যভিচারে দেখেন। সময়ের বিস্তৃত সৃষ্টিশীলতাকে এক্ষেত্রে তিনি দেখতে পারেন না বলেই লেখক সত্তাকে তৎসাময়িক-রক্তচক্ষুর আজ্ঞাবহ করেন। অতএব যে তথাকথিত সামাজিক সময়ের খণ্ডতা রোহিনীকে বিকাশের পথে বাঁধাস্বরূপ হয়, অনুসন্ধানে দেখা যায়, এর মূলে থাকে বিধবা রোহিনীর বৈধব্য রীতি ভঙ্গের নিদারুণ অপরাধ। এই অপরাধ বঙ্কিম সহ্য করতে পারেন না। অথচ ওই একই উপন্যাসে স্বামীকে ভক্তির অযোগ্য বিবেচনা করা ভ্রমরকে তিনি অন্যভাবে বিচার করেন।

রবীন্দ্র উপন্যাসে অনুশাসন ভাঙার কথাই বড়। তা সে যে কোনো ছদ্মবেশেই ধরা দিক না কেনো। আর তার কারণ, সময় কখনো অচলায়তনকে স্বীকার করে না। যা কিছু স্থবির, মুছে যায়; যা কিছু প্রসারণশীল, চলতে থাকে। বিনোদিনী তাই রুচিশীলা— একথাই বড়। বৈধব্য নিয়ে সে কোনো আবেষ্টনে কলঙ্করূপে চিহ্নিত হয় না। বরং উপন্যাসের পরিসর-বদ্ধতাকে বহুবিচিত্র পরিসরে সংযুক্ত করে, সম্ভাবনাকে নিয়ন্ত্রণহীনতা থেকে নিয়ন্ত্রণাধীন করে। তার বৈধব্য স্পর্শ, গোপন ঈর্ষা, ভোগাকাঙ্ক্ষা— সমস্তই তো সময়ের সাত সিঁড়ি বেয়ে গৌণ হয়ে ওঠে - যুগের বিস্তৃত পরিধিকে তৃপ্ত করে।

তবু একটি প্রেক্ষাপট রচনার প্রয়োজন আছে বিনোদিনীকে প্রতিষ্ঠা ঘটানোর আগে। তার নিঃসঙ্গতাকে সুকৌশলে প্রবিষ্ট করানোর মধ্যেও রয়েছে সমাজ প্রতিকৃতিটির একটি বাস্তব চিত্র। যেহেতু বাস্তবতাটি সেখানে খণ্ডসময় নির্ভর। রাজলক্ষ্মী ও মহেন্দ্র সেখানে মাতা ও পুত্র। কিন্তু দুজনের সম্পর্ক গড়ে ওঠে নাড়ীর টানে নয়, আত্মপরতন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে। নিজ নিজ ব্যক্তিকাল নিরন্তর ক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে নিজের গণ্ডীবদ্ধতাকে বিস্তার করে অন্যকে আঘাত করে, অন্যকেও যে এই প্রসারণ-যজ্ঞে গ্রহণ-বর্জন -গঠনে আত্মীকরণের প্রয়াসে ধরা উচিত, মনে করে না। সেজন্য এক নং পরিচ্ছেদে মহেন্দ্র বিবাহের ব্যাপারে মাতৃভক্তি অতিরিক্তভাবে প্রদর্শন করে বিবাহেই অনিচ্ছা জানায়। আর রাজলক্ষ্মী আত্মঅহং-য়ের তাড়নায়

একাধিপত্যকে কায়েম রাখার লক্ষ্যে পুলক অনুভব করেন। কিন্তু অন্তরালকে সরিয়ে দেখতে পারেন না, মহেন্দ্রের মধ্যে পুরুষের আইডেনটিটি নিয়ে অন্য একটি অহংকার বর্দ্ধিত হচ্ছে। এই আত্মপরতন্ত্রে কোনো অপরতার সন্ধান নেই। মহেন্দ্র একভাবে তৃপ্ত, রাজলক্ষ্মী আরেকভাবে। আর তার ফলে যে অচলায়তন গড়ে ওঠে, সেখানে তৃতীয় স্বর উচ্চারণ করেন রাজলক্ষ্মীর বিধবা জা অন্নপূর্ণা। মহেন্দ্রকে তিনি শোনান—

"এ তোমার বাছা, বাড়াবাড়ি। যখনকার যা তখন তাই শোভা পায়। এখন মার আঁচল ছাড়িয়া বউ লইয়া ঘরকন্না করিবার সময় আসিয়াছে, এখন ছোটো ছেলেটির মতো ব্যবহার দেখিলে লজ্জাবোধ হয়।"[১২]

কিন্তু এই সতর্ক বার্তা প্রকাশের সামাজিক জোর তখন কোথায়! অন্নপূর্ণা স্বামী-সন্তানহীন অবহেলিতা। আশ্রয়ের মধ্যে অস্তিত্বই যার বর্তমানের দ্বারা পদদলিত, সেখানে তার সত্য ভাষণও বিপরীত প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করে। ইতিহাসে এই সাময়িকের শাসন কি আমরা দেখিনি! বিজ্ঞানী গ্যালিলিওকে মরতে হয় অন্ধকূপে, দার্শনিক সক্রেটিসকে খেতে হয় বিষ। কেন? তাঁরা সত্য বলেন সাময়িকের কাছে আপোস না করে। সত্যের কি নিষ্ঠুর পরিণাম! অতএব সম্ভাবনাকে নিয়েও অন্নপূর্ণা প্রতিষ্ঠা পেতে পারেন না। তাঁর টিকে থাকা, না-থাকা নির্ভর করে স্বামী ও পুত্রের সম্পর্ক বন্ধনে। সেই বন্ধন তার নেই বলেই রাজলক্ষ্মীর চোখে তিনি শত্রুরূপে নির্দিষ্ট হন।

আসলে জীবনের দৈনন্দিন ছবি যত সামান্যই হোক, তার প্রতিটি স্তর গুরুত্বপূর্ণ। কেননা দৈনন্দিন সময় খণ্ড ধরেই যে প্রবাহ জন্মায়, তার থেকেই ধারণার উৎপত্তি। পরিণামে যা চিরন্তন হতে পারে। রাজলক্ষ্মীর সংসারে মহেন্দ্র যেভাবে পালিত, তাতে দৈনন্দিন চিত্র আছে। কিন্তু সেই চিত্রের প্রবাহ ধারা কোথায়! কোন্ জায়গাকে ছুঁয়ে-ছেনে আমরা বলতে পারি, সময়ের গতি এভাবেই দিক নির্দেশ করে। অন্নপূর্ণা সচেতনার কথা তোলেন, কিন্তু তার কণ্ঠকে বারেবারেই রুদ্ধ করে দেওয়া হয়। রাজলক্ষ্মী নিজের খণ্ডিত মন নিয়ে মহেন্দ্রকে নির্মাণ করেন মাতৃত্বের দাবি, এবং কাছে পাবার সুযোগকে ধরে। মহেন্দ্র এখানে ক্যাঙগারো শাবকের মত, জন্মের পরও মাতৃথলিকেই নিরাপত্তার আধার বলে ভাবে। স্বয়ং লেখকও এই উপমাই দেন। অতএব এই মহেন্দ্র আলাদা কেউ নয়, রাজলক্ষ্মী থেকে বেরিয়ে আসা ভূত-ভবিষ্যতহীন এক জড়পিণ্ড। পিঞ্জিরাবদ্ধ এই মানুষটির তাই ব্যক্তিত্ব বিকশিত হবার পথ থাকে একমাত্র জৈবিক ধর্মের নিয়মেই। প্রাণীজগতে যেভাবে মায়ের থেকে বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে আলাদা হয়ে যায় তার সন্তান। অতএব একদিকে বিবাহ করে মাকে অবহেলা করা হবে— মহেন্দ্রের এই অহেতুক ভীতি যেমন যথেষ্ট যুক্তিনির্ভর

নয়, অন্যদিকে বিনোদিনীকে বিবাহে আপত্তি জানিয়ে বন্ধু বিহারীর জন্য কন্যা দেখে নিজেই বিবাহ করার মনস্থ গ্রহণ, তার মাত্রাহীনতার পরিচয় দেয়। আভাসিত করে আত্মকেন্দ্রিক মানসিকতা। আশাকে তাই অবহেলা, কিংবা করুণা— যেভাবেই সে গ্রহণ করুক না কেন, স্ত্রীরত্ন লাভে তার দৈনন্দিন জীবনের সামান্য পালাবদলও ঘটে। রাজলক্ষ্মীকে সে তখন বিচ্ছিন্ন করে চেনে বলেই মায়ের প্রয়োজন তার ফুরোয়। অতএব এতদিন যে মায়ের অবহেলা হবে বলে তার মিথ্যার আবরণ রচনা, বিবাহ করে সেই আবরণকেই বহন করা তার পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে।

কিন্তু এই অবহেলার পরিচয়কেও কেবল মহেন্দ্রের দিক দিয়ে দেখা চলে না। তার অনেকটাই দাঁড়িয়ে থাকে রাজলক্ষ্মীর অবস্থানগত পরিসরে। কেননা, তিনি নিজেও সহনশীল দৃষ্টিতে পুত্রকে বিবেচনা করেন না। সময়ের কাছ থেকে কোনো শিক্ষাই তিনি নিতে পারেন না বলেই, এই কৌণিক বিন্দুতে স্বাভাবিকভাবে তিনি ক্রমাগত পুনরুদ্ধার করতে চান পুত্রকে। তাঁর আত্মধর্মী ব্যক্তিকাল যদি এতটা সমাজবোধ শূন্য না হত, তবে তিনি নিজেকে জীবনের স্তর থেকে আত্মদর্শন করে দুর্বলতার চিহ্নগুলোকে অন্বেষণ ও আবিষ্কার করতে উৎসাহী হতেন। কিন্তু তা হবার নয় বলেই তাঁর সমস্ত ক্রোধ কেন্দ্রীভূত হয় নবাগতা পুত্রবধূ আশার উপর। অন্নপূর্ণাকে ছাড়িয়ে তিনি দ্বিতীয় আরেকটি শত্রুর তোরণ আবিষ্কার করেন। আর বলা যায় তাঁর এই ঐতিহাসিক ভুলই উপন্যাসে তাঁকে স্থানান্তর করে, বিনোদিনীকে নিয়ে আসার পথকে করে সুগম।

লক্ষনীয়, ঔপন্যাসিক যে সমাজ ও সময়ে বাস করেন, তার ক্রটিগুলির মধ্যে তিনি খুঁজে বেড়ান সমকালীনতার স্বর। কিন্তু শুধু তাই নয়, এই খুঁজে বেড়ানোর ছবিটি যখন অঙ্কিত হয়, তখন সেকালকে যেমন নির্দেশ করে, তেমনি একালেও তার ধাক্কা এসে পড়ে। প্রশ্ন জাগে, সত্যি কি লেখকের সমকালটি ছাড়িয়ে এসেছি! ঘড়ির সময় সূত্র হয়তো তাই বলে। কিন্তু যে মিথ্যার সৌধ রচিত হয়, তার মায়াজাল ছিন্ন করা কি এতই সহজ! তবু কোনো কোনো ঔপন্যাসিক এভাবেই বেঁচে থাকতে চান না। ভাবীকালকে তিনি সংশোধনের সুযোগ করে দেন। আর তখন একটা সত্যই কেবল নিরূপিত হয় না, অন্যটাও আভাস দিতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ তারই আকাঙ্ক্ষী— 'চোখের বালি' যার প্রথম বলিষ্ঠ উদাহরণ।

অতএব, ক্রটির পরিধি নির্দিষ্ট করে কোনো একটি বা দুটি চরিত্রের আলোচনায় 'চোখের বালি' কে বোঝানো যায় না। মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ যে কত নিপুণভাবে সমকালটি বেষ্টন করে বিনোদিনীর আবির্ভাবকে অনিবার্য করে তুলছে— তার জন্য সময় কতটুকু দায়ী আর কতটুকু দাবিদার, এর মধ্যেই থাকে প্রতিমা নির্মাণ

এবং মুখশ্রীর রহস্য।

উপন্যাসে রাজলক্ষ্মীর প্রাচীর ঘেরা সংসার মহেন্দ্রকে আত্মকেন্দ্রিক হতে শেখায়। আবার আশার সঙ্গে তার বিবাহে এই আত্মতন্ত্র যে কতটা ব্যক্তিসুখ অভিলাষী, তাও প্রকাশ পায়। কিন্তু এ ব্যাপারটি ছাড়াও, আশা নামক নববধূটির আরেক বিচ্ছিন্নতার ছবি কি চোখে পড়ে না। প্রশ্ন জাগে, আশার মধ্যে ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠতে পারল না কেন। এক্ষেত্রে জেঠার বাড়িতে আশ্রিতা এই মেয়েটি অবহেলা আর লাঞ্ছনারই শিকার। অতএব সে শুধু সমর্পণ করতেই শেখে, পেতে শেখে না। তাই তার গঠনের মধ্যে অস্তিত্ব উচ্ছেদের লক্ষণ, যে অবস্থান ধরেই সে মহেন্দ্রের পরিবারে আসে। অথচ মহেন্দ্রের পরিবার তখন যে বিশেষ আকৃতি গঠনের অনুকূল নয়, তা স্পষ্ট। ফলে, এমন ক্ষেত্রে পরিসরকে সঞ্জীবিত করে তোলার কাজে যে মেয়েটির প্রয়োজন, আশা তার উপযুক্ত হয়ে আসে না। বরং স্বামীর খেয়ালীপ্রীতি এবং হঠাৎ স্বাধীনতা তাকে ভাসিয়ে নেয়।

পাশাপাশি উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র বিহারী। সে ঊনবিংশ শতকের নব্য চেতনায় শিক্ষিত এবং মার্জিত। আত্মকেন্দ্রিক ভাবনা ছাড়িয়ে মহেন্দ্রের পাশে তার অবস্থান বিপরীত ধর্মী। পরদুঃখে সে কাতর, অপরতার দর্পণে তার আত্মতৃপ্তি। ফলে, সামগ্রিকভাবেই প্রথম থেকে ঔপনিবেশিক সামাজিক এই পরিসরে বিহারী ভিন্ন আলোকে সময়কে চকিত ও আলোড়িত করে। কিন্তু সেই সঙ্গে যুগের দাসত্ব থেকে বেরিয়ে আসার প্রচেষ্টা তার মধ্যে না পেয়ে হতাশ হতে হয়। মধ্যবিত্তের সামাজিক পরিসীমা তখন রাজলক্ষ্মীর পরিবারের ঘেরাটোপে বন্দি, আর বিহারী সেই ঘেরাটোপেই স্বেচ্ছায় আবদ্ধ এবং উদ্দেশ্য শূন্য। তাই অন্ধের মত তার প্রচুর শক্তিকে সে নিঃশেষে উজাড় করে দিতে থাকে এই ক্ষেত্রে। সম্ভাবনাকে বহন করেও তাকে ওই আবদ্ধলোকে অবস্থান নিতে হয় এবং পরিত্রাণের উপায় নির্দেশ না করে তার আত্মলীনতা এই পরিসরে কেবল সাহায্যেরই আধার হয়ে থাকে। অতএব অপরতা শূন্য রাজলক্ষ্মী-মহেন্দ্রের বিশ্বাসের পরিসরে বিহারীর আলাদা ব্যক্তিকালের স্বীকৃতি নেই, নেই তাকে উপলব্ধি করার অবকাশও। বরং স্টীমবোটের পশ্চাতে আবদ্ধ গাধা বোটের মতো ভারবাহী সামগ্রীর পরিচয়টাই হয় বিহারীর বড়।

কাজেই বিহারীর চরিত্র-বৈশিষ্ট্য সম্ভাবনাময় হলেও লক্ষ্যস্থল শূন্য বলেই মানবদরদী হয়েও দর্পণে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখে না। চিন্তাশীল হলেও সংগ্রামী নয় এবং বোধীর দীপ্তি থাকলেও উদভ্রান্ত। সেজন্য রাজলক্ষ্মী-মহেন্দ্র যতদূর আত্মকাল সর্বস্ব, বিহারী ততদূর আত্মবিচ্ছিন্ন। মহেন্দ্রের পরিবারের প্রতি তাই তার নির্ভরশীল নিষ্ঠা— তার দিকেই বারবার ছুটে যাওয়া। সমালোচকও তাই মহেন্দ্রের বিরূপ

আলোচনায় বিহারীর নঞর্থক ভূমিকাকে অগ্রাহ্য করেন না বলেই বলতে পারেন—

"মহেন্দ্র যে ঘড়ি ঘড়ি তার বায়না পাল্টায় আর তার এই স্বভাব যে আশা ও বিনোদিনী পর্যন্তও যেতে পারে, তার জন্যে তো বিহারীর প্রশ্রয়ও অনেকটা দায়ী।"[১৩]

অতএব বিহারীর মধ্যে নির্মাণের অভাববোধ আছে বলেই মহেন্দ্রের পরিবারে বিনোদিনীর আবির্ভাবে জটিলতা আসবে— দরদী সংবেদনশীলতা নিয়ে আবিষ্কার এবং প্রতিক্রিয়া তার মধ্যে ধরা পড়লেও তার ব্যক্তিকাল জাগ্রত হয়ে ওঠে না, যদি উঠতো তবে ব্যক্তির গহনে অন্বেষণ চালিয়ে সে বিনোদিনীকে বুঝে নিতে পারতো। ব্যক্তি ব্যষ্টিতে গিয়ে মিলবে, অপরতার কোলাহল থেকে জ্বালিয়ে নেবে তার মনের আগুন। সে আগুনের আলোয় পথ চিনে চিনে ব্যক্তি আর ব্যষ্টির পথকে সুগম করবে। বিহারীর অনুভব সেক্ষেত্রে অপরতাতেই অবস্থান করে, তাতে আগুন জ্বলে না। বিনোদিনীকে তাই তার চেনা সম্ভব নয়।

ব্রিটিশ শাসনে প্রাচীন সামন্ত গোষ্ঠীর বিলোপ ঘটিয়ে ভূস্বামীদের উদ্ভব হয়। আর তার থেকেই আসে 'বাবু' সংস্কৃতি। ক্রমে এই বাবু সংস্কৃতি মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে গড়ে তোলে। এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় পরবর্তী গণতন্ত্র ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য প্রকাশের মুখ্য মাধ্যমও হয়ে ওঠে। উনিশ শতকে শিক্ষিত গণমাধ্যমের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে নবজাগরণ দেখা দিতে পারে। কিন্তু তবু এই জাগরণ খণ্ডিত সত্য। ইংরেজদের দ্বারা যে যুগপরিবর্তন অনিবার্য হয়ে ওঠে, তাতে মধ্যযুগীয় প্রভাবমুক্ত হয়ে পাশ্চাত্যের আলো এসে পড়ে এই দেশে। মানসিকতা তখন ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত হতে পারে। কিন্তু উপনিবেশ স্থাপনের মধ্য দিয়ে যে মধ্যবিত্ত চাকুরে সম্প্রদায়ের জন্ম হয়, তাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কতটুকু বাস্তবমুখী আর কতটুকু তারা প্রগতির মূল স্রোতের সঙ্গে জড়িয়ে, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে। একজন সমালোচক যথাযথ তার জবাব দেন—

"পাশ্চাত্য দৃষ্টান্তকে সামনে রেখেই উনিশ শতকে বাঙলাদেশের জীবনবোধে আমূল পরিবর্তন এসেছিল। কিন্তু দেখা গেছে সেই নতুন চেতনার সঙ্গে সাধারণ মানুষের কোন সম্পর্ক ছিল না।"[১৪]

অতএব সীমাবদ্ধ এই প্রগতিবাদিতা কোনো পরিকল্পিত কাঠামো রচনা করতে পারে না। বিহারী এই পাশ্চাত্যের আলোকদীপ্ত হতভাগ্য যুগপ্রতিনিধি। আবার এ যুগেরই অন্তর্বর্তী হয়ে উচ্চশিক্ষিত মহেন্দ্র এম. এ পাশ করে ডাক্তারী পড়ে যথেচ্ছ খেয়ালখুশির খেলায় মত্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হয়েও আলোর তৃষ্ণায় দীপ্ত নয়।[১৫] সেক্ষেত্রে বিহারীও তাকে উপযুক্ত পথ দেখাতে পারে না।

লক্ষ্য করতে হয়, বিনোদিনীকে ছাড়া একমাত্র অন্নপূর্ণা চরিত্র যুগের নানা

'বিচ্ছিন্ন-আমিকে' ছাড়িয়ে কিছুটা জীবনের মূল স্রোতে যুক্ত। কিন্তু তিনিও পরিবেশের কাছে সুতীব্রভাবে সোচ্চার হতে পারেন না। চার নং পরিচ্ছেদে রাজলক্ষ্মী তাই যখন অন্নপূর্ণার বোনঝি, তথা পুত্রবধূ আশাকে নিজ পরিকল্পনা অনুসারে স্বামী-বঞ্চিতা করে আত্মঅধিকার অক্ষুন্ন রাখেন, তখন তার পরিণামগত দিকটিকে বিচার করেও আশার সহযোগী হয়ে ওঠার বদলে তার থেকে দূরে থাকাই কাম্য মনে করেন অন্নপূর্ণা। নিশ্চয়ই তার জন্য তিনি দুঃখ অনুভব করেন, কিন্তু সেই সঙ্গে তার নিরূপায় অবস্থান বারবারই আপোস-সন্ধানী হয়ে ওঠে পারিবারিক শৃঙ্খলা এবং শান্তির অন্বেষায়। অথচ সময় আমাদের নির্দেশ করে, ক্রমাগত আপোস-সন্ধানী ব্যক্তি যতই তার পরিত্রাণ খুঁজে বেড়াতে প্রান্তঃসীমা অবলম্বন করুন না কেন, স্থানের পরিধি তার কমতেই থাকে। পাঁচ নং পরিচ্ছেদে আশাকে নিয়ে তাই মহেন্দ্রের অতিরিক্ত দাম্পত্য ভোগ এবং পারিপার্শ্বিক সমাজবোধ শূন্যতা যখন পরীক্ষার বিরূপ ফলাফলের উপর দিয়ে যায়, তখন তার জন্য দায়ী হন অন্নপূর্ণা। ছয় নং পরিচ্ছেদে তাই অবধারিত হয় পিস্‌তুতো ভাইয়ের বাড়িতে অন্নপূর্ণার বাসা বদল। এই বদল তার ইচ্ছাকৃত এবং শান্তির উদ্দেশ্য থেকেই আগত। কিন্তু একেবারেই বাধ্যবাধকতা শূন্য, তা কি বলা যায়! অতএব এই জীবন প্রবাহে তাঁর ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো সফলতা নেই বলেই, মহেন্দ্রের পরিবারে আবার তাঁকে ফিরে আসতে হয়। ফিরে আসতে হয় নিজের জন্য নয়, মহেন্দ্রের পরিবারটিকে ধরে অনাগত সুস্থির বিশ্বরচনার তাগিদে। রাজলক্ষ্মী বক্রোক্তি করে জোড় হাতে অন্নপূর্ণার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন তাঁর ব্যর্থতার ক্রোধের দ্বারা। অন্যদিকে মহেন্দ্র আশাকে নিবিড় করে পাবার আকাঙ্ক্ষায় আশার অনুরোধেই আশার সম্পর্ক সূত্রে মাসী হিসেবেই তিনি গুরুত্ব পান, মহেন্দ্রের খুড়ী হিসেবে নয়। অবশেষে আমাদের অবাক করে ছয় নং পরিচ্ছেদের অন্তে রাজলক্ষ্মী যখন পুত্র-অভিমানে গৃহত্যাগ করেন, তখন অন্নপূর্ণা তার জন্য প্রত্যক্ষ-পরোক্ষে কোনোভাবে দায়ী না হয়েও সংকুচিত হন। হতে পারে এ তাঁর চরিত্রগত লক্ষণ, হতে পারে বিনয়। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর মারাত্মক অসহায়তা প্রমাণ করে, অন্নপূর্ণার দ্বারা বিপুল সময় গঠন সম্ভব নয়।

এই নানান অসম্পূর্ণতার মাঝখানে বিনোদিনীর আবির্ভাব এবং প্রতিষ্ঠা। ফলে প্রতিমা সৃষ্টিতে তার গুরুদায়িত্ব অনেক। কারণ জীবনকে গঠন করতে আত্মতা থেকে অপরতা স্তরে যাত্রা সফল-উদ্দিষ্ট ঠিকই, কিন্তু আত্মকে কোনোভাবেই বঞ্চিত করে তা পূর্ণ নয়। বিনোদিনীর কাছে তা আকাঙ্ক্ষার বস্তু হয়ে ওঠে না। বরং অপ্রাপ্তি, প্রত্যাখ্যান জীবন-উচ্ছেদের এই নেতিবাচক দিকগুলোই তাকে ব্যক্তি সম্পর্কে সচেতন করে। সেইসঙ্গে অপরতার মাঝখানে ব্যক্তিটি কিভাবে কেন্দ্রীয় হয়ে ওঠে, তাকেও

সুনির্দিষ্ট করে। এ বোধটুকু শুধু জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে নয়, বেঁচে থাকার দুর্বার আবেদন থেকে সে পায়।

আমাদের জানা আছে, বহিঃসময়ের দীর্ঘ প্রবাহ যখন একমুখী অগ্রসরণকে ছাড়িয়ে আনতে পারে না, তখন কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে তার প্রকাশ ঘটে। 'রাজর্ষি'র হাসিকে ধরে রাজা গোবিন্দমাণিক্যেরও এই পরিবর্তন স্পষ্ট হয়। রাজতন্ত্রের ভেতর থেকেই প্রতিষ্ঠা ঘটে গণতন্ত্রের। 'নৌকাডুবি'তে দুর্ঘটনার ফল যাই হোক, তাকে একান্ত ভাবে মানবমুখী করা হয় কমলাকে অবলম্বন করে রমেশ এবং নলিনাক্ষের দিক থেকে, গণতন্ত্রের দীক্ষায় যার উদ্ভব। আর 'শেষের কবিতা'য় ভেসে বেড়ানো অমিত একটি বিশেষ শ্রেণীর চিহ্ন বহন করেও লাবণ্যকে সুপ্ত নিদ্রা থেকে জাগিয়ে মানুষকে ভালবাসতে শেখায়, গণতন্ত্র যে ভালবাসার স্তরেই টিকে থাকে। সর্বাবস্থায় এই গণতন্ত্রের স্বরূপ হয়তো একরকম বলে মনে হবে না, পরিবেশগত সময়ের কারণেই। কিন্তু এর সাধারণ বৈশিষ্ট্যটি একটু অনুসন্ধানে চোখে পড়ে, যা হল প্রেরণা। এই প্রেরণার টানেই 'চোখের বালি' উপন্যাসে বিনোদিনীর কেন্দ্রীয় ধারণার উপর মহেন্দ্র, বিহারী, আশা, রাজলক্ষ্মীর আত্মসংশোধন। কিন্তু এই প্রেরণাকেও বহন করে সময়। অতএব প্রেরণার আগে সবাই যখন বিনোদিনীকে ভুল বোঝে, তখন যেমন তা সময়ের সত্য হয়; তেমনি নূতন উপলব্ধিতেও কার্যকরী থাকে তার নিঃশব্দ পদসঞ্চার। বিনোদিনীর দিক দিয়েও সকলকে ভুল বোঝার যে ক্ষেত্র রচিত হয়, জীবন-জিজ্ঞাসায় প্রেরণার কাছে দীক্ষা নিয়েই সেই দেখার দৃষ্টি তার পাল্টায়।

অতএব একটি উপন্যাসে সময়ের শিল্প তখনই সার্থক, যখন তা মীমাংসা-সন্ধানী। অথচ তার আগে ভাল বা মন্দের আদলে তা খুব নির্দিষ্ট নয়। নরেন্দ্র, প্রতাপাদিত্য, উদয়াদিত্য, বসন্ত রায়, গোবিন্দমাণিক্য— এরা তাই খুব স্পষ্ট বর্গ। ভালো এবং মন্দ দিয়ে নিখুঁতভাবে আলাদা করা। অথচ এভাবে আলাদা করা কি সম্ভব! আমরাই বা আলাদা করার কে। সমালোচকের এ সতর্কবাণী মনে রাখা উচিত—

"সভ্যতার যাত্রা কোনো একটি যুগে এসে থেমে যায় না। সুতরাং সংস্কৃতি ও সভ্যতার ক্ষেত্রে কোনো যুগই শেষ কথা বলার অধিকারী নয়।"[১৬]

'চোখের বালি'তে কোনো চরিত্র কিংবা বর্গ প্রসঙ্গে অতি নির্দিষ্ট মতামত নেই। সময়ের নানা অবতলের দ্বারা তারা প্রকাশ হিসেবেই নির্মাণের সার্থকতা লাভ করে। সেইসঙ্গে তাদের ধারণ করেই উপন্যাসের অন্তর্বয়ন পৌঁছে যায় একটি সামগ্রিক লক্ষ্যে। চরিত্রের এই সহাবস্থানমুখী চলমানতার পেছনে কার্যকর থাকে অতীতের

নির্মাণস্তর। 'করুণা' উপন্যাসে তাই যেখানে নরেন্দ্রের বর্তমান স্বেচ্ছাচারিতার পেছনে কোনো স্পষ্ট অতীতের প্রচ্ছদ থাকে না, 'চোখের বালি'তে মহেন্দ্রের পেছনে সেখানে অবস্থান করে রাজলক্ষ্মীর আবরণ-বিশিষ্ট স্নেহ। একনায়ক বৃত্তির সামাজিক কোলাহল যেখানে ইন্ধন যোগায়। ছোটবেলা থেকে তাই যে মর্জি আর শাসনপ্রবৃত্তি নিয়ে মহেন্দ্র তার পরিবেশটিকে চেনে, তাকেই সে সত্য বলে জেনে নেয়। কিন্তু এই সত্যের পেছনে আরো যে বড়-সত্য আড়ালে থেকে যায়, তাকে তার পারিপার্শ্বিক সুহৃদবৃন্দও চিনিয়ে দিতে পারে না— না মায়ের ভূমিকায় রাজলক্ষ্মী, না বন্ধুত্বের সান্নিধ্যে বিহারী, না পত্নীত্বের অধিকারী হয়ে আশা। পারে না, তার কারণ, খণ্ড সময়ের বিশেষ আধারে তারাও যে গড়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথ সময়কে যখন ব্যক্তির মাধ্যমে তুলে আনেন, তখন সেই ব্যক্তি নারী না পুরুষ তার গুরুত্ব যতটা, ব্যক্তি হিসেবে নারী বা পুরুষের খোলস ছেঁকে প্রবহমানতায় সে কি পেলো, কি সংযোজন করলো— বড় হয়ে ওঠে। 'চোখের বালি' ধরে যার শুরু হয় যাত্রা, ব্যক্তি খুঁজতে থাকে তার আত্ম পরিচয়। আশার জীবনে তাই প্রথম দুটো পর্যায়ে— জেঠার বাড়ি এবং স্বামীর ঘর— বোধীকে দীপ্ত করে না, কেবল তাড়না করে। বিনোদিনী-সান্নিধ্য তার তৃতীয় এবং বিস্তৃত পর্যায়। এই পর্যায় থেকেই সে শেখে স্বামীকে অন্ধের মত অনুসরণ নয়, তাকে অনুভবও করা চাই। তাই মহেন্দ্রের প্রতি বিনোদিনীর ভালোবাসার খেলা দেখে সে একদা যে জ্বালা অনুভব করে, সময়ের অভিজ্ঞতায় আর বিনোদিনী থেকে দীক্ষা গ্রহণ করে তার উপলব্ধি ঘটে মহেন্দ্রকে না ভালোবেসে কোনো মেয়ের পক্ষেই থাকা সম্ভব নয়।

'চোখের বালি' উপন্যাসটি রচনা ও প্রকাশ যে সময়ে ঘটে, দেখা যায় তা ঊনবিংশ শতকের অন্তিম সীমা এবং বিংশ শতকের শুরু। বাংলা উপন্যাস তখন স্বাভাবিকভাবেই আরো জিজ্ঞাসা তৈরি করে এগিয়ে যাবার আয়োজনে ব্যস্ত। ঠিক এই দুটো যুগের মাঝখানে মানুষকেই নিবিড় ভাবে দেখার তাগিদে সামাজিক প্রেক্ষাপটে নানান পরিবর্তনের সূত্রপাত তখন ঘটতে শুরু করে। নবজাগরণ তখন সামগ্রিক হতে পারে না সত্য। তবে কিছুটা যে তার বাতাস এসে ধাক্কা দেয়, তাকে অস্বীকার করাটাও ঐতিহাসিক ভুল। এই নবজাগরণের মূলে একটা দিক নিশ্চয়ই মেয়েদের শিক্ষা। এই শিক্ষার ব্যাপারে সকলেই সমান উৎসাহী, তা নয়। কেউ কেউ নারী শিক্ষাকে নারীবর্গেই সীমিত রাখতে ইচ্ছুক, কেউ আবার তার সীমানার বেড়ি তুলে দিতে প্রয়াসী।

সামাজিক স্তরে নারীকে পুরুষের থেকে আলাদা যে করা হয়, সেখানে শিক্ষার

ক্ষেত্রও হয় আলাদা। কেন এই তারতম্য। ভালো করে দেখলে এক দীর্ঘ ইতিহাসকে খুঁজে পাওয়া যায়। সভ্যতা বিকশিত হবার সেই কালটিতে মানুষকে টিকে থাকার দায়ে শিখতে হয় শিকার, পরে অধিকার লড়াইয়ে যুদ্ধবিদ্যাকে হাতিয়ার করতে হয়। পুরুষকে তাই রক্ষক হিসাবে নিপুণ হতে হয় সকল দিক দিয়ে। কিন্তু নারীর ভূমিকায় প্রাকৃতিক ভাবেই যেহেতু সন্তান ধারণ করতে হয়, অতএব ঘরের বিন্যাস এবং পালন ক্রিয়াই হয় তার কর্তব্য। যুগ যুগ ধরে প্রবাহিত এই ধারা সংস্কারের জন্ম দেয়। আজ পরিসর পাল্টেছে, কিন্তু সেই সংস্কারকে মানুষ ছাড়তে পারছে না বলেই, নারীর ব্যবধান রচিত হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে কত সতর্কভাবে সংস্কারের এক একটি গ্রন্থী খুলছেন। বিনোদিনীকে তাই তার সাধারণ বিত্তবান পিতা বাড়িতে মেম্ রেখে বহু যত্নে লেখাপড়া শেখান এবং ইংরাজি শিক্ষার সুফল তার মধ্যে ঘটে যায়। ফলে এই শিক্ষার ধারণ ক্ষমতা কার কতটুকু, সে ব্যক্তির শক্তির উপর নির্ভর করে বলেই ওই গল্প-বয়ানে আধুনিক শিক্ষার সকল উপকরণ ও প্রতিষ্ঠা পেয়েও মহেন্দ্র যেখানে উদ্বুদ্ধ হয় না, বিনোদিনীর মধ্যে সেখানে রুচিবোধের স্পর্শ এসে ধরা দেয়। আবার তার পাশে শিক্ষার সঞ্জীবনী শক্তির অভাবে সেই আধুনিক শতকেও যে আশার মত অসংখ্য চরিত্রের স্থবিরায়ণ ঘটে, তার মধ্য দিয়েই প্রমাণিত হয় স্ত্রী শিক্ষার রূপায়ণ সম্পর্কে অনেকের আন্তরিকতার অভাবের প্রশ্ন। একটি অদ্ভুত যুগসন্ধিজাত দ্বন্দ্বও তখন ঘনিয়ে ওঠে। 'চোখের বালি' উপন্যাসে তাই একদিকে ছেলের সঙ্গে মেমের কাছে পড়াশুনা করা আধুনিক মেয়েকে বিবাহ প্রস্তাব রাজলক্ষ্মীর যুক্তিযুক্ত ঠেকে, অন্যদিকে আপন অধিকার চর্চায় একাল ও সেকালের মাঝখানটিতে মধ্যযুগীয় বৃত্তিকেই তিনি আবার আকড়ে থাকেন মহেন্দ্র ও আশার দাম্পত্য সম্পর্ককে ধরে। সেকালকে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর গত যুগের স্বামীর উন্নাসিকতাকে নিয়ে। কিন্তু তার মধ্যে যে কতটা অপমান লুকিয়ে আছে, তাকে তিনি বোঝেন না। আর এভাবে তিনি ঝুলে থাকেন দুটি কালের মাঝখানে।

এই কুটাভাসের পাশাপাশি পুরুষের দিক দিয়ে নারী ভাবনায় যে সুনিপুণ পরিবর্তন রূপ নিতে চলেছে, তার ছবিও চোখে পড়ে। নারী আজ ভোগ্য সামগ্রী নয়, সে ব্যক্তি— এই আকুতি 'করুণা' পর্ব থেকেই উচ্চারিত। 'চোখের বালি'তে কেবল বিনোদিনীর মধ্য দিয়ে নয়, আত্মকেন্দ্রিক মহেন্দ্রকেও এ ব্যাপারে একটু তৎসাময়িকের ধুলো ঝেড়ে আবিষ্কার করা যায়। আশাকে দেখার প্রথম ছবিতে তাই তার অনুকম্পার প্রকাশ থাকলেও কবিত্বও ধরা দেয়। তার শিক্ষালব্ধ জীবনের সামান্য হলেও এ তার গভীরতার দিক।

নারীর প্রতি সমবেদনা ও গুরুত্ব বিদ্যাসাগর-রামমোহন সম্প্রদায়ের হাত ধরেই

আসে। তার শিক্ষা, উত্তরাধিকারগত দাবি, বিধবার পুনর্বিবাহ ইত্যাদি সমস্তই মানবিক বোধী থেকে গ্রহণ করা। কিন্তু এর যথার্থ স্বীকৃতি আদায় করাটাই শুধু নয়, ব্যবহারিক দিক ছাড়াও আন্তরিক হওয়াটাও প্রয়োজন— সে প্রশ্নই এ সময়ে ঘুরে ফিরে আসে। মহেন্দ্র এই সমাজের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত না হলেও উচ্চশিক্ষার জোরে কিছুটা অন্তত তার মুখোমুখি নিশ্চয়ই হয়। তাই মহেন্দ্র 'করুণা'র নরেন্দ্র নয়। রাজলক্ষ্মীর সংসারে তার স্বেচ্ছাচারী মনোবৃত্তি প্রবল, অথচ তার মধ্যে রুচিশীল শালীনতা বোধও সঞ্চারিত। প্রথমেই তাকে দেখা যায় না, কিন্তু বিনোদিনীর সংস্পর্শে তার মধ্যে যথার্থ কামনার আগুন উন্মত্ত হয়ে উঠলেও বিনোদিনীর রূঢ়তম প্রত্যাখ্যানকে এড়িয়ে তার পক্ষে যা কিছু করাও প্রত্যাশিত হয় না। দেহ সর্বস্ব লুব্ধতা থেকে রুচিশীলতার দিকে তার যে পদচারণা, এখানেই নিবদ্ধ হয়ে আছে তার আন্তরিকতার প্রশ্ন। বিনোদিনীই এই অদৃশ্য শক্তিকে তার আরও অন্যান্য আত্মশক্তির মাঝখানে খুঁচিয়ে তুলে বলেই তার পক্ষে একথাটি বুঝতে হয়— যথার্থ আন্তরিক হতে গেলে অপরের মনকেও বুঝে নেওয়া চাই। ঠিক তেমনিই নিজের দেশ কাল ছাড়িয়ে অন্য দেশকালে প্রসারণ না ঘটলে ব্যক্তিরও মুক্তি নেই।

এবার এ প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়া যায়, বিনোদিনীর সঙ্গে বিহারীর কাঙ্ক্ষিত মিলন কেন ঘটালেন না রবীন্দ্রনাথ। কেন ঘটালেন না, তার পরিচয় আমরা উপরের আলোচনা থেকেই পেয়ে যেতে পারি। কেননা ঊনবিংশ শতকের নবজাগরণের ব্যবহারিক দিকটাই একমাত্র প্রতিষ্ঠিত কিন্তু তার আন্তরিকতার কোনো স্থান নেই, তা তো হতে পারে না। কাজেই বিনোদিনীব বৈধব্য স্তরকে উত্তীর্ণ করে বিহারীর সঙ্গে পুনর্বিবাহ সম্ভব নয়। বিবাহ করতে চাইলেই বিবাহ হবে, বিনোদিনী এত সহজে এ মন্তব্য করতে পারে না। সামাজিক সংস্কারের আন্তরিক স্পষ্ট অনুমোদন তার চাই।

'চোখের বালি' উপন্যাসে প্রেম-ভাবনায়ও ঊনিশ শতকে এসে কোনো স্থির দণ্ডের উপর স্থাপিত হতে চায় না, অথচ বঙ্কিমের উপন্যাসের মতই চিরকালের ধর্মে সমস্যা সৃষ্টিতে নর-নারীর প্রেমের ত্রিভুজ এখানে রচিত। কিন্তু সময় পরিবর্তনে চরিত্রের আঁতের কথাকেই যেখানে গুরুত্ব দিচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ, সেখানে প্রেম ভাবনায় একই পৌনঃপুনিকতা কেন আসবে। তাই বঙ্কিমের উপন্যাসে প্রেম ত্রিভুজ রচনায় দু'জন নারী একটি পুরুষে দু'দিক দিয়ে কেন্দ্রীভূত হলেও, রবীন্দ্রনাথ সেক্ষেত্রে দেখিয়ে দেন দুই পুরুষের মাঝখানে একটি নারীর অবস্থান। নারী চিরদিন পুরুষ নির্ভর এবং পুরুষমুখী হবে, এই প্রচলিত ভাবনার অবসান ঘটিয়ে তাকে উল্টো করেও দেখানো হয়— দূরবীনের মুখটিকে ঘুরিয়ে অণুবীক্ষণ করে তোলার মধ্যেই

থাকে সংস্কারকে ভাঙার পরিচয়, সময়ের আঁতের কথা। অতএব বিনোদিনীকে কেন্দ্রে রেখে মহেন্দ্র ও বিহারীর আবর্তন এবার অন্য দৃষ্টিতে দেখতে হবে বৈকি।

এই সংস্কারের অবগুণ্ঠন উঠেছে। কিন্তু তার মূলে যার অবদান সবচেয়ে বেশি, সেই বিনোদিনীর পক্ষে ভবিষ্যৎ সকল নাগপাশকে ছিন্ন করতে পারাটাও বড় কথা। তাই তার গড়ে ওঠার মধ্যেও আছে নিদারুণ নিরাপত্তা। হয়তো সে যখন পিতৃগৃহে ছিল তখন তার একটি ব্যক্তি সত্তাই জাগরিত। বৈধব্য তাকে নিঃসঙ্গ ও স্বাবলম্বী করে। মহেন্দ্রের পরিবারটিকে সে পায় প্রতিমা নির্মাণের ভূমিরূপে। এক দিনেই এই ভূমি তার আবিষ্কার হয় না। দিনের পর দিন সূত্র সন্ধান করে আত্মগঠনের। এক একটি দিনকে দিয়ে ঈর্ষা-অবসাদ-শ্রান্তি নিয়ে নিরলস সে নির্মাণ চালায়। ক্রমে সে অনুভব করতে শেখে, তাকে ঘিরে অন্য চরিত্রের অবরুদ্ধ সীমা। তখন সে আর স্থূলতার মধ্যে আত্মবৃত নয়, মহেন্দ্র-বিহারী-আশাকেও সৃষ্টি করে তুলতে তৎপর। সে কাজ তার একসময় শেষ হয় বলেই কাশী যাত্রার মধ্য দিয়েই সে কোনো একটি সংসারকে ত্যাগ করে যায়। এই ত্যাগ অনেকের চোখে হয়তো উপন্যাসের দুর্বলতা বা অসমাপ্তির অস্বস্তিরূপে ধরা দেয়। কিন্তু এই কাশীযাত্রা বিনোদিনীর জীবনে সন্ন্যাস তো নয়। অনেক কাল পরে লেখা 'স্ত্রীর পত্র' গল্পেও মৃণাল.তার সংসার ভূমিকে ছেড়ে সমুদ্রতটে এসে সন্ন্যাস নেয় না, সে বাঁচবার কথাই বলে। তবু দেখা যায় বিনোদিনী যেখানে সংসারকে গড়ে নিয়েই ছুটি নেয়, মৃণাল সেখানে তাকে ছিন্ন করেই চলে আসে। সেক্ষেত্রে কোনো সমালোচকের ভাষায় মৃণাল যদি সমাজ ব্যবস্থার অভিশাপকে বহন করে,[১৭] তবে অন্যদিকে বিনোদিনীর প্রতি কোনোভাবেই তা প্রযুক্ত হতে পারে না। বিনোদিনী কাশীতে যে চলে আসে, সেটা তার নিজেকে খুঁজে দেখার আরো অন্য একটা পথ। সে পথের সুস্পষ্ট ধারণার পরিচয় রবীন্দ্রনাথ দেন না সত্য, কিন্তু সে ধারণার আর কি কোনো প্রয়োজন আছে!

এক্ষেত্রে মহেন্দ্রের সংসার ও তার পারিপার্শ্বিক গণ্ডীর স্বাবলম্বী হয়ে ওঠাই হচ্ছে মূল লক্ষ্য। তাই শুধু বিনোদিনী নয়, মহেন্দ্র ও আশাকেও এবার সংসার গঠনে উদ্যোগ নিয়ে এগোতে হয়, বিহারী অতীতের কর্মহীন গ্রন্থি দূর করে এগিয়ে চলার যে অঙ্গীকার করে, তাকে রূপায়িত করতে হয়। দুঃসময়কে উৎপাটন কিংবা উপস্থাপন নয়, তাকে অঙ্গী করে এগিয়ে চলার নামই জীবন, এবং সে জীবনের মর্মমূলেই থাকে সাবলীলভাবে মানবিক কালের বিভাস। বিনোদিনী তার নিজের পথকে অন্যভাবে এই যে অনুসন্ধানে ফেরে, বিহারীও সেই রকম আরেকভাবে তাকে খুঁজতে থাকুক, সেই হয় লক্ষ্য। তাছাড়া নির্মাণ করে তোলা যে সম্পদ চিরকালের সমকালকে রূপায়িত করে, নানা প্রতিকূল-অনুকূল সময়খণ্ডে নিষিক্ত

হয়ে শুধু সন্নিহিতিতে তার সকল সুর বাজে না। বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসার প্রয়োজনও পড়ে। তাই 'চোখের বালি'র প্রতিমা হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষাটুকু যে অর্থে বিনোদিনীর জন্য প্রহর গুনে, ঠিক সেই অর্থেই বিনোদিনীকে ছাড়িয়ে চলার পথকে সুগম করতে চায়। রাজলক্ষ্মী তাই যেখানে বিনোদিনীকে আলোর বৃত্তে নিয়ে আসেন, তিনিই তাঁর অন্তিম কালে কৃতজ্ঞ হয়েও তাকে সরিয়ে দেবার কথা জানান। চুয়ান্ন সংখ্যক পরিচ্ছেদে মহেন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে তাই তাকে বলতে শুনি—

"তাহাকে (বিনোদিনী) তোদের সংসারের ভিতরে রাখিস নে, তোর প্রতি আমার এই অনুরোধ রহিল।"[১৮]

সাধারণ দৃষ্টিতে দেখতে গেলে 'চোখের বালি' উপন্যাসে সমকালের আন্দোলনের প্রত্যক্ষ যোগ নেই বলেই মনে হয়। সেক্ষেত্রে সমকাল কতটুকু ওঠে আসে, তাকে বুঝে নিতে তিনটি স্তরে মানুষের অভিব্যক্তিকে বিচার করতে পারা যায়। এই তিনটি স্তব হল— ব্যক্তি, সমাজ এবং ব্যক্তি ও সমাজের দ্বৈত পরিসর। 'চোখের বালি'তে সমাজ নেপথ্যে। কিন্তু ওই সমাজই বিধবা বিনোদিনীকে সৃষ্টি করে। বিনোদিনী যে যন্ত্রণা বহন করে মহেন্দ্র-রাজলক্ষ্মী বৃত্তে আসে, সেখানে ব্যক্তি মাত্রার গুরুত্ব প্রধান হলেও সে যন্ত্রণার মূলে কেবল মহেন্দ্রকেই দায়ী করা যায় না, সামাজিক একটা সংস্পর্শ সেখানে থাকে। তাই বারাসাতের গ্রামের বাড়িতে বিনোদিনীর নিঃসঙ্গতার পেছনে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার সংস্পর্শটিকে অবহেলা করা যায় না। বারো সংখ্যক পবিচ্ছেদে বিনোদিনীকে নিয়ে মহেন্দ্র ও বিহারীর আলোচনায় হাল্কা চালে 'দ্বিতীয় বিষবৃক্ষ' এবং 'বিধবার বিবাহ' কথা আসে সমকালটির সামাজিক দর্পণে। আমরা জানি, সেই সময় বা তার কিছু পূর্বে যে সকল সমস্যা বাঙালি সমাজকে বিব্রত করে, তাতে প্রবীণ ও নবীনের দ্বন্দ্ব বিশেষ করে দেখা দেয় বিধবা বিবাহকে কেন্দ্র করে। আধুনিক যুক্তিবাদী বিদ্যাসাগরকে তখন ব্যাপকভাবে যুদ্ধে নামতে হয়। এ সম্পর্কে একজন সামাজিক দর্পণকার লেখেন—

'ইতিপূর্ব্বে শাস্ত্রানুসারে বিধবা বিবাহের বৈধতা লইয়া যে বিচার চলিতেছিল তাহা পণ্ডিত ও শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যেই বদ্ধ ছিল। রাজবিধি প্রণয়নের চেষ্টা আরম্ভ হইলে, সেই আন্দোলন কিঞ্চিৎ পাকিয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় শাস্ত্রীয় বিচারে সন্তুষ্ট না থাকিয়া কার্য্যতঃ বিধবা বিবাহ প্রচলনে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন আপামর সাধারণ সকল লোকে একেবারে জাগিয় উঠিল। পথ, ঘাটে, হাটে-বাজারে, মহিলা গোষ্ঠীতে এই কথা চলিল। শান্তিপুরের তাঁতীরা, 'বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে' এই গানাঙ্কিত কাপড় বাহির করিল। এমন কি বিদ্যাসাগরের প্রাণের উপরেও লোকে হাত দিবে এরূপ আশঙ্কা বন্ধুবান্ধবের মনে উপস্থিত হইল।"[১৯]

অন্যদিকে এই সামাজিক পরিস্থিতিকে ইতিহাসের লিপিতে নয়, উপন্যাসের বন্ধনে সার্থকভাবে প্রথম রূপায়ণ ঘটাতে চাইলেন বঙ্কিম। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাস যার নিদর্শন। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে নগেন্দ্র দত্তের সমস্যা ব্যক্তিগত, কিন্তু বিধবা কুন্দের সমস্যা সামাজিক। বিধবা বিবাহকে বঙ্কিমচন্দ্র মনের দিক থেকে মেনে নিতে চান না, সামাজিক স্বরকে ধারণ করে। অথচ ব্যক্তি বঙ্কিমচন্দ্র কি তার জন্য তৃপ্ত ছিলেন! একটা দ্বন্দ্ব কিন্তু থেকেই যায়— 'বিষবৃক্ষ'ই যার দলিল। তাই 'বিষবৃক্ষে' বিধবা বলে কুন্দকে লেখক সরিয়ে রাখেন, বিধবা বলে হীরার প্রতিটি আচরণকে চড়া প্রবৃত্তির রূপ হিসেবে দেখান এবং তার জন্য প্রচুর প্রায়শ্চিত্তের পথ গড়ে তোলেন। অথচ ওই 'বিষবৃক্ষে'ই দেবেন্দ্রের মত চরিত্রকে দিয়ে দশম পরিচ্ছেদে পল্লীগ্রামে কতগুলো অন্ত্যজ শ্রেণীর বিধবার বিবাহ সম্পন্ন করেন। অবশ্য উপন্যাসে দেবেন্দ্র কখনোই আন্তরিকতার স্তরে ওঠে আসে না, ভোগবাসনাই তার প্রবল। ফলে 'বিষবৃক্ষ' কখনোই প্রধান অর্থে বিধবা বিবাহকে সমর্থন করে না,[২০] বরং বিধবা বিবাহের মারাত্মক সংস্কারই বহন করে। তাই একদিকে বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টাকে নিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি হওয়া এবং 'বিষবৃক্ষে' সেই প্রচেষ্টাকে পুরুষ এবং নারীর ভোগবাসনার মধ্যে সংযোজন করে জন সমর্থন আদায়— সেই সময়টিকে বিদ্যুৎগতি দান করে। 'চোখের বালি'র মহেন্দ্রের ঘেরাটোপের মধ্যেও সেই গতি প্রবেশ না করে পারে না। কিন্তু এই সামাজিক পরিবেশের আরেকটি দিক জুড়ে আছে ব্যক্তি। 'চোখের বালি'তে এই ব্যক্তি কেমন করে সমাজ-নিঃসঙ্গ হতে পারে— দু'রকম গোত্রে দাঁড়িয়ে থাকা বিনোদিনীর স্তর ও রাজলক্ষ্মী-মহেন্দ্রর স্তর যার নিদর্শন। বিনোদিনীর নিঃসঙ্গতা সামাজিক বৈষম্য থেকে তো বটেই, কিন্তু সেইসঙ্গে তার শিক্ষিত আধুনিক রুচিবোধও তাকে তৎকালীন সামাজিক স্তর থেকে আলাদা করে। অথচ রাজলক্ষ্মী যে অর্থে আলাদা হন, তাতে আবার নিবদ্ধ হয়ে থাকে শহুরে বিত্তভোগী মানুষের ভাব কেন্দ্রিকতা। গ্রাম্যজীবনে এর অবকাশ নেই। একদা গ্রামের মেয়ে হয়েও রাজলক্ষ্মী তাই গ্রামে এসে হাফিয়ে ওঠেন। আর এরই মধ্য দিয়ে প্রমাণ মেলে 'ব্যক্তির পরিবর্তন'; তার নিঃসঙ্গ হয়ে থাকার বাসনা। অতএব ব্যক্তি ও সমাজের দু'টো স্তরকে আলাদা করে দেখানো হয়। দেখানো হয় তার সময় পরিবর্তনের ছবিটুকু। কিন্তু এখানেই উপন্যাস শেষ হতে পারে না। বিনোদিনীর স্তরটিই সম্ভাবনাময়, তাই তার প্রকাশের মধ্যে সে একসময় সামাজিক স্বীকৃতি আদায় করে নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এই সমাজ বলতে, কোনটি! শুধু কি মহেন্দ্র-বিহারীর কলকাতা! হয়তো আপাতভাবে তাই। অতএব তেরো সংখ্যক পরিচ্ছেদে তাকে বলতে শুনি— "আমি কি জড়পদার্থ। আমি কি মানুষ না।" তবু এই উচ্চারণ

সামাজিক পরিসরে যখন ব্যক্তির প্রতিষ্ঠার আবেদন, তখন তা কেবল আর সীমিত ভৌগোলিক বৃত্তের অন্তর্বর্তী সামাজিক স্তর নয়। উপন্যাসের শেষে কলকাতা থেকে কাশীযাত্রা বিনোদিনীর সেই বৃহত্তর সামাজিক খণ্ডে ব্যক্তির মিশে যাবার দ্বৈত যোগের প্রয়াস। একজন সমালোচক যথার্থই উল্লেখ করেন, বিনোদিনীর সমস্যাটি আসলে ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের বিরোধ থেকে নয়।[২১] অতএব সামাজিক হয়ে ওঠার তাগিদ থেকেও বলা যায়, মহেন্দ্রকে নিয়ে সর্বনাশা প্রেমের খেলায় সে যেমন মজে, তেমনি তার সীমানাকে নির্দিষ্ট করতে করতে পরিশীলিত করে। বিহারীকেও যাচাই করার সামর্থ্য জুগিয়ে এবং ব্যক্তি মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেই তার আপাত কর্ম সমাপ্ত হতে পারে। নারীর মোহিনী শক্তি এখানে কার্যকর। কিন্তু তা ধ্বংস অর্থে নয়, গঠন অর্থেই প্রযুক্ত। শক্তিকে তাই বিপজ্জনকভাবে প্রয়োগ করে যেখানে বর্তমান বিশ্ব আজ ধ্বংসের মুখোমুখি হয়ে বসে আছে, সেখানে সেই শক্তি দিয়ে সামাজিক পরিসরকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ক্ষেত্রে সহযোগী করে তোলাই হচ্ছে স্রষ্টার ধর্ম। এ শুধু কবি-সাহিত্যিকের বাসনা নয়, বিজ্ঞানীরাও তার দলে। পারমানবিক বিস্ফোরণ একদা আইনস্টাইনকেও তাই দীর্ণ করে। শক্তিকে তাই সময় গঠনের কাজে, সময় হরণের কাজে নয়, বারবার ব্যবহারের পক্ষপাতী রবীন্দ্রনাথ। অতএব সেই সামাজিক পরিকাঠামোয় বিনোদিনী বিহারীর বিবাহ দেখালে সংস্কারের উপর বিধবা নারীর সম্ভোগবৃত্তিকেই তুলে আনা হয, যার ফলে ঘটে যেত বিপরীত ঔচিত্যবোধকে প্রশ্রয় দেওয়া।[২২]

তাছাড়া বিনোদিনীই রবীন্দ্র উপন্যাসের শেষ বিধবা নায়িকা নয়। 'চতুরঙ্গে' শ্রীবিলাসকে ধরে যে বিধবা মেয়ে বিবাহ বন্ধনে বারবার ফিরে আসার কথা ব্যক্ত করে, তার অনুকূলে সমাজটাকেও তো প্রস্তুত করে তুলতে হয়। অতএব সময়ের দাবি মেনে তথাকথিত সমাজকে সম্মান জানিয়েও প্রতিবাদ তোলা যায়। সমাজকে ব্যক্তি থেকে আলাদা করা নয়, কিংবা প্রতিবাদের জন্যই প্রতিবাদ— এ মন্তব্য জীবনরসিকের মূল অবলম্বন হতে পারে না। তার চেয়ে সমাজ ব্যক্তিকে কিভাবে নেয় এবং ব্যক্তি কিভাবে সময়কে মাধ্যম করে সমাজকে গড়ে, দেখতে হয়। 'নৌকাডুবি'তে তাই তার অগ্রসরণ এবং 'গোরা'তে ব্যক্তির বিভেদ এবং সংলগ্নীকরণ যেভাবে ঘটে, পর্যায়ক্রমিক তা লক্ষ্য করা যায়।

একটি খণ্ড সময়ের আবেষ্টনে সত্তা ও অপরতা নিয়ে যে সামাজিক ছবি, তাতে প্রধানত ব্যক্তির উপরই নির্ভর করে সম্ভাবনা এবং বিনষ্টি। 'চোখের বালি'র কাহিনী সত্তা-অপরতায় মিলে ঔপনিবেশিক শহুরে বিত্তজীবী মানুষের ছবিকে উপহার দেয়। মহেন্দ্র ও বিহারীর পূর্বপুরুষরা তাই তাদের জন্য সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক অবরোধ

দিয়ে শোষিত এত অর্থ রেখে যান, ফলে সারা জীবন তাদের যথেচ্ছ চলার জন্য যথেষ্ট। এক্ষেত্রে তাদের পক্ষে এক-একজন নরেন্দ্র হয়ে ওঠাও বিচিত্র নয়। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তাদের লক্ষ্যকে সেক্ষেত্রে অন্যমুখী করে। তবু বই-য়ের ভেতর দিয়েই তারা পৃথিবীর পরিচয়কে জানে। লক্ষ্য করি, এই জানার অসংলগ্নতা থেকে 'গোরা' উপন্যাসের বিনয়ও সর্বাংশে মুক্ত হতে পারে না। অতএব এত শিক্ষা, এত বিত্ত নিয়েও মহেন্দ্র-বিনয় সময় বদলের রূপকার হতে পারে না। বিহারীর জীবনে তাই কিছুই করার ছিল না। সে এম. এ. পাশ করে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে চায়, আবার একবছর নষ্ট করে ডাক্তারী পড়ে। অন্যদিকে মহেন্দ্রও এম. এ. পাশ করে ডাক্তারী পড়ে এবং একবছর ফেল করেও 'পড়া পড়া' নিয়ে খেয়ালখুশির খেলায় মত্ত হয়। ঔপনিবেশিক সমাজব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে তাদের সঙ্গে হয়তো চাকুরীজীবীদের বিত্তীয় সম্পর্কের মিল থাকে না, কিন্তু যে লক্ষ্যভ্রষ্ট চলার দাসত্ব— তাকে বারবার স্বীকার করে নিতে হয়। বিহারীর নিজের জন্য কিছু করার থাকে না, মহেন্দ্রের পরের জন্য ভাববার থাকে না। একজন সর্বত্র নির্ভরযোগ্য, অন্যজন নির্ভরশীল। দুটো ক্ষেত্রেই ক্রমান্বিত কালকে পর্যটন করে অন্ধভাবে চলা। কোনও ক্ষেত্রেই কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই বলেই তারা যা করে, তা কেবল নিত্য অভ্যাসের দাসত্ব। কিন্তু উপন্যাসের চূড়ান্ত পর্যায়ে তারা দু'জন জীবনকে গড়ে নেবার পথে সময় বদলের অঙ্গীকার করেই পথকে চেনে। এই চলার পথে সামাজিক সংজ্ঞা পাল্টে পাল্টে নিশ্চয়ই নূতন ভাবে সংযোজিত হয়। অতএব যে অসংখ্য খণ্ড সময়ের যৌগিক বিন্যাসে বিনোদিনী সময়-মুক্তির পথ খুলে দিয়ে বেরিয়ে যায়, তাকে অব্যাহত করে সামাজিক বহু জনতার স্রোতে তুলে ধরার দায়িত্ব কিন্তু থাকে এদের ওপরেই। উপন্যাসের পঞ্চান্ন সংখ্যক অন্তিম পরিচ্ছেদে মহেন্দ্র তাই বলে—

"যে জীবন আমি গঠন করিয়াছি তাহাকে লইয়া আলস্যভরে আর উপভোগ করিবার জো নাই— কর্মের দ্বারা তাহাকে যদি টানিয়া লইয়া না চলি, তবে কোন্‌দিন সে আমাকে টানিয়া অবসাদের মধ্যে ফেলিবে।"[২৩]

অন্যদিকে বিহারী জানায়—

"এখন তোমা হইতে আমাকে বঞ্চিত হইতেই হইবে। এখন আর সুখের জন্য চেষ্টা বৃথা, এখন কেবল আস্তে আস্তে সমস্ত ভাঙচুর সারিয়া লইতে হইবে।"[২৪]

রবীন্দ্রনাথ ইতিহাস অনুসরণ করে দেখেন, সামন্ততান্ত্রিক ভূমিব্যবস্থা ইংরেজদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে লুপ্ত হয় ধীরে ধীরে। ভূমির সঙ্গে কৃষির উপর মানুষের যে অধিকার এবং নির্ভরতা তা উঠে গিয়ে তারা আশ্রয় করতে শুরু করে চাকুরীজীবন। গ্রাম রূপান্তরিত হয় শহরে। কলকারখানা স্থাপনের মধ্য দিয়ে

উপনিবেশ তৈরি হয়ে ওঠে। গ্রামের কৃষি নির্ভর মানুষ শ্রমিকে রূপান্তরিত হয়ে তাদের চারিত্রিক গতির যে মৌল পরিবর্তন হয়, তাতে যথার্থ জীবনের সঙ্গে জীবিকার সম্পর্ক থাকে না। যন্ত্রের আরাধনায় তারা মানবযন্ত্রে রূপান্তরিত হয়। মানুষের তখন গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসার প্রবল হাতছানি। কেউ কেউ হয়তো তখন প্রবল বিত্তবান, কেউ কেউ সাধারণ স্তরে; কিন্তু সকলের ক্ষেত্রেই প্রাকৃতিক ভারসাম্য জীবন থেকে উবে যায় বলে, মানুষ নূতন কোনো আত্মপরিচয় খুঁজে পায় না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসে এই উপনিবেশের ক্ষেত্র হিসেবে বারে বারেই আনেন কলকাতার পরিসর। তিনি হয়তো তাঁর শ্রমিক শ্রেণীকে বৃহত্তর অর্থে আনেন না, কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক ভূমিব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে যে জমিদার শ্রেণী এককালে বসবাস করতো— তাদের উত্তর পুরুষকে ধরেন এই সময় পরিসরে। একদিকে অর্থের প্রাচুর্য্য হয়তো আছে; কিন্তু অন্যদিকে যন্ত্রসভ্যতার করাল গ্রাসে তারা দিক্‌ভ্রষ্ট। তাদের যৌবন শক্তির দ্বারা নূতন করণীয় কিছু নেই। পল্লীর সঙ্গে তাদের আন্তরিক বিরোধ। পল্লীপ্রীতি প্রসঙ্গে একটি শব্দও খরচ করতে তারা রাজি নয়। বিনোদিনী সেই পল্লীজীবন থেকে ওঠে এসেই মহেন্দ্র ও বিহারীকে স্পর্শ করে। 'নৌকাডুবি'তে সেই আত্মগঠন আন্তরিক বলেই নলিনাক্ষ গ্রামের মেয়েকেই বিবাহ করে এবং তার জন্য অপেক্ষাও করে। আর 'গোরা'য় গোরার মাধ্যমে সংযুক্ত হয়ে ওঠে শহর ও গঞ্জ। ঔপনিবেশিক সামাজিক পরিসর যেমন একটি সময়ের সত্য, তেমনি তার মহাসম্মিলন প্রক্রিয়াও আরেকটি সময়ের সত্য। রবীন্দ্রনাথ দেখান তার রূপান্তর। কর্মযজ্ঞে প্রতিমা রচিত হয়ে ক্রমশ তার মুখশ্রী আবিষ্কার হয়।

'চোখের বালি'র কাহিনীতে ছড়িয়ে থাকা ক্রমান্বিত সময়বিন্যাস বছর খানেকের একটু বেশি। আর এর উপস্থিতিও ঋতুচক্রের মাধ্যমে। যদিও পরিসরের মুখ্য অংশ জুড়ে আছে শহর, তবু সময় নিঃশব্দে চলে ঋতুর আবর্তনে, প্রকৃতির আলো-অন্ধকারে। অবশ্য উপন্যাসটির এক নং পরিচ্ছেদ অবতরণিকা মাত্র। মূল ঘটনার ক্রমান্বিত কালের সঙ্গে তার তিন বছরের ব্যবধান। রবীন্দ্রনাথ প্রকারণগত ভাবেই আগের উপন্যাসগুলো থেকে সময়কে এদিক দিয়ে অনেক সংযত করেন। বলা যেতে পারে, উপন্যাসের বহির্গঠনে সময়ের এই সংযত প্রকাশ গল্পকে পাঠকের চোখে ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে সাহায্য করে বেশি। আর বাহ্যিক জটিলতাকে এভাবে পরিহার করার মধ্যেও থাকে আরেক আধুনিক মানসিকতা। তার কারণ, মানুষকে যদি একাধারে বিপন্ন এবং একাধারে বিস্মিত হতে হয়, তবে বিপন্ন-বিস্ময়ের গোটা ছবিটিকে চোখে ধরিয়ে দিতে মসৃণভাবে মাধ্যমটি চালিত করা চাই। ফলে একসময় গল্পটা চিন্তাসূত্র থেকে সরে আসে নানা অবতলে অন্তর্সময়ের সাক্ষ্য হতে

হতে। জীবনের ছবিকে তখন প্রতিমার রূপে মেলে। সমালোচকও বলেন—

"যে মানুষ সমাজের মাঝে দাঁড়িয়ে পথ খুঁজে নিতে চায় একটা গঠিত জীবনযাত্রা এবং ইতিহাসের ভিতর থেকেই তার পারিপার্শ্বিক সে বিচার করে। অতএব সেই অতীতকে যখন সে অতিক্রম করতে চায় তখনও ভবিষ্যতের ওপর অতীতের ছায়া এসে পড়ে। ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে কোনো গোষ্ঠী অথবা সম্প্রদায় যে খণ্ডিত যুক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়, তাতে একইসঙ্গে থাকে বর্তমানের প্রান্তস্পর্শী পশ্চাৎকালের অন্তরঙ্গ পরিচয়, আবার সম্মুখের কর্মকাণ্ড তথা নতুন সমস্যার আভাস।"[২৫]

আধুনিক উপন্যাস এই সূত্রকেই তো প্রতিপালন করতে চায়।

আধুনিকতা— সময়ের সঙ্গে এই শব্দটি বারবার মিলেমিশে থাকে। কিন্তু কী সেই আধুনিকতা। বর্তমানের মানুষ প্রশ্ন রাখে জীবনের মূল্যকে নিয়ে। তার জন্ম এবং মৃত্যুর মাঝখানটিতে যে ছোট্ট সময়টি ধরে বেঁচে থাকা, তার বাইরেও সীমানা আছে— এ বিশ্বাস সাময়িকতাকে প্রতিহত করে অন্য একটি লক্ষ্যে পৌঁছাতে চায়। জীবনানন্দ ঘোষণা করেন— 'নব-নব মানবের তরে/ কেবলই অপেক্ষাতুর হ'য়ে পথ চিনে নেওয়া-/চিনে নিতে চাওয়া;'[২৬] কিন্তু তদ্‌গত সময়ের দৃষ্টিতে মানুষ যখন জন্ম-মৃত্যুর মাঝখানের সময়টিই নির্দিষ্ট করে, তখন তার আগে এবং পরের জীবন নিয়ে চিন্তিত নয়। বক্তব্য এখানে ঠিক পূর্বজন্ম-পরজন্ম সম্পর্কিত প্রচলিত বিশ্বাস নয়, একটি মানুষের প্রত্যক্ষ অস্তিত্বের সঙ্গে পূর্বতন ও পরবর্তী পরোক্ষ অস্তিত্ব সন্ধানের কথাই হচ্ছে। ফলে এই প্রত্নকাল থেকে সীমানা বৃদ্ধির আর্তি নিয়ে আসার বদলে কোথাও কোথাও আধুনিকতার ধ্বজাবাহী বিশ্বাসে বর্তমানের বেঁচে থাকাটাই একমাত্র ভাবলে এবং ভোগবাদী বিশ্বাসে মানুষকে শূন্যতা, বিরক্তি, একঘেয়েমির অর্থহীনতার মাঝখানে দাঁড় করালে যে দৃশ্যপট খুলে যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠিক সেই সময়টিকে উপভোগ করে নিতে পারেন না। ভাঙাচোরার ছবি তাঁর চোখেও পড়ে, কিন্তু তাকেই তিনি প্রতিমা নির্মাণের উপকরণরূপে কাজে লাগান, প্রতিমা বলেন না। ফলে আধুনিকতার যে শ্রেণী বিচার চলে, সেই অবিশ্রান্ত লক্ষ্যহীন পথে তিনি না এগিয়ে অসংলগ্নতার তাৎপর্য দেখেন। আর সময়ের অভিজ্ঞতা দিয়ে তার ভেতর থেকে বের করে আনেন যোগাযোগের কোনো এক সূত্র।

এই সূত্রের যোগ না থাকলে আধুনিকতা অনিশ্চিত, সময় অর্থহীন। রবীন্দ্রনাথ এভাবেই বুঝতে চান বলেই উপন্যাসের সম্ভাবনাময় প্রেক্ষাপটকে এত অভিনব উপায়ে কাজে লাগাতে পারেন। তাই কখনো কখনো জটিলতার স্তরে পৌঁছান, কখনো আপাত পশ্চাদোপসরণ ঘটে যায়। রবীন্দ্র উপন্যাস আলোচনায় তাই কত সরলভাবে বলে ফেলাটা সহজ— 'চোখের বালি'র পর 'নৌকাডুবি'তে তাঁর অগ্রগতি

ব্যাহত। এমন কি স্বয়ং লেখকও অন্যায়ভাবে বলে নেন্— 'ভিতরের দিকে গল্পের তাড়া ছিল না'।[২৭]

'নৌকাডুবি' রচনার প্রেক্ষাপটটি এক্ষেত্রে একটু দেখা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিজীবন তখন বাস্তবের সঙ্গে আঘাতের পর আঘাতে অতিক্রান্ত। মৃত্যুপথযাত্রী মাতৃহীনা পীড়িতা কন্যাকে নিয়ে তিনি হাজারিবাগে এসেছেন। তাঁর নিজের শরীর মন তখন ক্লান্ত এবং বহুভাবনায় অবসাদগ্রস্ত।[২৮] এই হাজারিবাগ বাসকালে 'বঙ্গ দর্শন' পত্রিকার তৃতীয়বর্ষ শুরু হয় এবং তার ফলে নিরন্তর কাগজ ভরাবার তাগিদ ঔপন্যাসিককে তাড়া করে। অতএব সৃষ্টিশীলতার পেছনে যে সুস্থির অবকাশ এবং অনুকূল পরিবেশটি থাকার কথা, 'নৌকাডুবি' রচনা কালে তা নেই এবং নেই বলেই 'নৌকাডুবি'র গল্পে (plot) কার্য্যকারণ সূত্রের অনেক অমিল ঘটে। পরে এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ সচেতন হন ও গ্রন্থাকারে প্রকাশেব কালে একে প্রচুর সংযত ও সংহত করে তোলেন।

লক্ষ্য করলে দেখা যায়, মানুষ আসলে গল্পের মধ্যেই তার আদিম প্রবৃত্তি থেকেই স্বস্তির আশ্রয় খোঁজে। 'নৌকাডুবি'র মধ্যে গল্পটাই তাই জোরালো হয়ে উঠতে চায়। অথচ রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে 'গল্প' বিষয়টি কখনও খুব জোরালো নয়।[২৯] তবু গল্প এখানে আশ্রয়, এবং গল্পের দুর্বলতাকে ছুঁয়ে তার ভেতরের কথাগুলোকে বহুমাত্রিক করা। সমস্যাটি এরকম যে, 'নৌকাডুবি' পড়তে গেলেই গল্পের আমেজই ছুটিয়ে নিতে থাকে। অথচ গল্পগুলো সময়ের বন্ধনে সুদৃঢ়, ও যৌক্তিক উপায়ে স্থাপন করা যায় না। সমালোচককে ঠিক এ জায়গায় ভ্রান্তিতে পড়তে হয়। অথচ সেই সমালোচকদের প্রতি তির্যক মন্তব্য ছুঁড়ে দিতে উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র রমেশ দ্বিধা করে না বলেই ছেচল্লিশ সংখ্যক পরিচ্ছেদে মন্তব্য করে—

"অদৃষ্ট একী বিষম কৌতুকে প্রবৃত্ত হইয়াছে। একদিকে আমার সঙ্গে কমলার ও অন্যদিকে নলিনাক্ষের সঙ্গে হেমনলিনীর এই মিলন, এ যে একেবারে উপন্যাসের মতো— সেও কুলিখিত উপন্যাস। এমনতরো ঠিক উল্টাপাল্টা মিল করিয়া দেওয়া অদৃষ্টেরই মতো বেপরোয়া রচয়িতার পক্ষেই সম্ভব— সংসারে সে এমন অদ্ভুত কাণ্ড ঘটায় যাহা ভীরু লেখক কাল্পনিক উপাখ্যানে লিখিতে সাহস করে না।"[৩০]

তাই 'নৌকাডুবি'র পুনর্বিশ্লেষণ প্রয়োজন। শুধু 'নৌকাডুবি'র জন্যই নয়, 'নৌকাডুবি'র সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকা 'প্রতিমা ক্রমশ মুখশ্রী'র সন্নিহিতিতে পৌঁছাতেও আমরা তাগিদ অনুভব করি। সময় আমাদের সূত্র নির্দেশক। অতএব তা গল্পের অন্তর্লোকে বারবার কোনো দ্বিচারী হয়ে ওঠে, ভেবে দেখার জন্য এগিয়ে যেতে হয়।

উপন্যাসটির অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য; একদিকে এর সকল ঘটনাগত বাহ্যিক সময় বিন্যাস

প্রায় একবছর— এক ফাল্গুন থেকে পরবর্তী শীতকাল পর্যন্ত। অথচ কাহিনীতে ব্যক্তির দ্বিধা দ্বন্দ্ব জড়িত অসংখ্য সময়কণিকা নানা জটিল শাখা প্রশাখায় ঘটনাকে বাড়িয়ে তোলে। 'চোখের বালি' থেকে এখানে এই জটিলতা বৃদ্ধির কারণই হয় সংবেদনশীল মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি, সেইসঙ্গে তার পরিসর। 'রাজর্ষি' উপন্যাসেও সেই বিস্তার ছিল, কিন্তু সেখানে ব্যক্তিকালের জটিলতার নানা গ্রন্থির চাইতে বাহ্যিক সময় পরিসীমা ব্যাপক। রবীন্দ্রনাথ এখানে যেন একটা অন্যকৌশলের আশ্রয় নেন। 'রাজর্ষি'র মত বড় সময় প্রেক্ষাপটকে ক্রমান্বিত ধারায় আনেন না, আবার 'চোখের বালি'র ছোট পরিসীমাতেও তাকে ব্যক্তিকালের দিক দিয়ে বাঁধতে চান না। আর বাঁধতে না চাওয়াটাই স্বাভাবিক। কারণ 'চোখের বালি' ধরে সময়ের বৃত্তটি তো বড় হতেই চায়। অতএব বিপুল ঘটনাকে একটি আরেকটির সঙ্গে এক বছরের সময় পরিধিতে ধরতে গিয়ে সম্পর্ক-সন্ধানে গল্প হয় তার পোষাক। সময়ের উপস্থাপনা প্রায় সর্বক্ষেত্রে হয়ে পড়ে প্রলম্বিত। তাই কমলা রমেশের স্ত্রী নয়, এ কথা বুঝতে রমেশের লেগে যায় তিন মাস; কমলার ক্ষেত্রে সেটা তো আরো বেশি। নলিনাক্ষ কমলার সম্পর্কে সচেতন থেকেও নৌকাডুবির পর দীর্ঘদিন সে তেমন উদ্যোগ নিয়ে খোঁজ নেয় না। কমলা সম্পর্কে জড়িয়ে যাবার পর হেমনলিনীর ব্যাপারে রমেশের সম্পর্কহীনতা, কিংবা কমলা-রহস্য আবিষ্কারের পর হেমনলিনীকে স্পষ্ট করে সহজে না বলার মধ্যে সময়ের উপস্থাপনার শ্লথতাও ধরা পড়ে। অবশ্য এই প্রলিম্বিতকরণই গল্পকে বাড়িয়ে নিতে সাহায্য করে।

তবু নির্মাণ সর্ত বলে একটা কথা আছে। রূপকথার আজব জগতও রাজপুত্রকে রাজকন্যার খোঁজে পক্ষীরাজ ঘোড়া দিয়ে সাহায্য করলেও এবং ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমীর মাধ্যমে রাক্ষসের প্রাণ ভ্রমরের গোপন খবর দিলেও, সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে, অনেক খুঁজে পেতে সেই প্রাণভ্রমর আবিষ্কারে রাক্ষস নিধনের পর অনেক সময়ের অপব্যয় করেই তবে রাজকন্যাকে পেতে হয়। সময়ের প্রলম্বিতকরণের কারণ এখানে নাও ঘটতে পারতো। তবু ঘটলো এ কারণে যে, মূল লক্ষ্যে পৌছাতে সময় ব্যয় না করে তার উপায় নেই। তা না হলে ঘটনা আসে না, কাহিনী হয় না। 'নৌকাডুবি' উপন্যাস কোনো ঘটনা বা কাহিনী সৃষ্টিকেই একমাত্র করার উদ্দেশ্যে চলতে পারে না। কারণ এর সামনে তখন রূপকথার শ্রোতারা বসে নেই। আবার এ কোনো আজব জগতের ঘটনাও নয়। সময়ের প্রলম্বিতকরণ, অতএব, এখানে আরো অন্য কোনো সংকেতবাহী।

প্রথমে যদি যুক্তি-বুদ্ধির কথাই তোলা হয়, তবে বলতেই হয় বিশ্বসাহিত্যের অনেক সফল সৃষ্টিই তার উপর স্থাপিত নয়। এ সম্পর্কে গ্রীক নাটক 'ইডিপাসে'র ইডিপাস চরিত্রটি ভুল করে তার বাবাকে হত্যা করে এবং মা'কে বিবাহ করে দুই

সন্তানের জনক হয়। অলিভিয়া বুদ্ধিমতী অথচ ছদ্মবেশী পুরুষের সাজে নারী সিজারিওকে প্রেমিক হিসেবে ভুল করে। ফলে, সত্য আবিষ্কারে এই ধীরতা কাহিনীগত বিশ্বাসভঙ্গ করে বৈকি!

'নৌকাডুবি', 'চোখের বালি'র উপনিবেশ পরিসরেরই সমসাময়িক দর্পন। বিনোদিনী যে পথের আলো দেখায়, তা হঠাৎ রাতারাতি একটি বৃহত্তর যুগকে পাল্টাতে পারে না। তাছাড়া নূতন করে যে আরো প্রতিবন্ধকতার জন্ম হবে না, সে কথাই বা কে বলতে পারে। 'নৌকাডুবি', 'চোখের বালি'র পরবর্তী সম্পর্ক সূত্র, কিন্তু একই উপন্যাসের তারা আলাদা পরিচ্ছেদ তো নয়। অতএব বিনোদিনীর কর্মক্ষেত্র যেখানে সাঙ্গ, আর মহেন্দ্র ও বিহারী যে স্থান থেকে কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত— সময়ের ঠিক এই পর্যায়ের পরবর্তী স্তর থেকে 'নৌকাডুবি' আসছে না। 'নৌকাডুবি'তেও তাই সমসাময়িক সামাজিক পরিকাঠামোয় নিষিক্ত হয়ে থাকা সময়ের চেতনাবিহীন অবস্থান রমেশের উপর এসে পড়ে। কিন্তু শুধু রমেশ নয়, যুগলক্ষণকে বহন করে সকল চরিত্রই গোরার মত তখনও কর্মপটু হয়ে ওঠে না। তারা হয়তো তখন তেমন আর লক্ষভ্রষ্ট নয়, কিন্তু লক্ষ্যাভিমুখীতা ধীরতাকে মাধ্যম করে। তবু সময়ের এই ধীরতাও যে আশীর্বাদরূপে বর্ষিত হয়, 'নৌকাডুবি'তে তার নিদর্শন মেলে কমলা চরিত্রে। কমলা যখন অনেকদিন পর জানে রমেশ তার স্বামী নয়, তখন আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে গিয়েও তড়িৎ সিদ্ধান্তকে সে রূপায়িত করতে পারে না। বরং নদীতে ডুবে মরতে গিয়ে, নদীর দীর্ঘ স্রোত ধারা বয়ে কাশী সন্নিধানে তার স্বামী দেবতাটির নামেই তাকে পথ চলতে সাহায্য করে। রমেশকে নিয়ে দীর্ঘদিনের একটি সময় রহস্যকে আবিষ্কারের পর খুব ধীরে নলিনাক্ষের দিকে তার পথটি খুলে যায়। রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস-সূচনায় নারীর স্বামী সংস্কারের কথা তোলেন। আর আমাদের জানা আছে, এ সংস্কার দীর্ঘ বছরকে ধারণ করেই এগিয়ে চলে। রমেশকে নিয়ে তাই অজান্তে তার যে অব্যাহত ধারার সাময়িক পথচ্যুতি যেখানে ঘটে, সেখানেই তো যাত্রা শেষ হতে পারে না। বরং এখান থেকেই ধরিয়ে দেওয়া প্রয়োজন রমেশ এবং কমলার সমস্যার সময় স্তরটি যত দীর্ঘ বলে মনে হয়, মূল পথটি আবিষ্কারে তাকে কত ক্ষণিক করে তুলতে পারে। ক্ষণিক কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। তার কারণ, রমেশ ও কমলা পর্ব আছে বলেই নলিনাক্ষ ও কমলা পর্ব এত বড় হতে পারে। তাছাড়া 'চোখের বালি' থেকে এই উপন্যাসে যে পরিব্যাপ্তির প্রয়োজন তাতে 'নৌকাডুবি'তে 'রমেশ-কমলা' এবং 'নলিনাক্ষ-কমলা' দুটো আলাদা আলাদা স্তর সৃষ্টি হয়। আর এই দুটো স্তর কিন্তু জড়িত হয়ে থাকে নৌকাডুবি-দুর্ঘটনার সঙ্গে। যে দুর্ঘটনা ছিন্নমূল কমলাকে ভাসিয়ে আনে। মনে রাখতে হয়, আমরা আজ যে অর্থে আধুনিকতাকে বিচ্ছিন্ন সূত্রে টেনে নিয়ে চলি, কোনো এক

দুর্ঘটনার ভেতর থেকেই তাকে কেবল অংশত দেখি। তাই সে অর্থে আধুনিক সময়ের সত্তা ছিন্নমূল। মানুষ তাই নিজের অজান্তেই কোনো এক সাময়িকের হাতে পড়ে যায়। যাকে আপন ভেবেও পরে আবিস্কৃত হয়, সে কেবল একটা বড় ভুল; কিন্তু প্রবল মিথ্যা নয়। 'নৌকাডুবি' উপন্যাসে রমেশ-কমলা বিন্দুই তাই সূচনা থেকে বেশি কথা বলে। কমলা দীর্ঘদিন ধরে জানতেই পারে না তার ভুলের অবস্থান। আর সেক্ষেত্রে নলিনাক্ষ থাকে গল্পকথনের অন্তরালে। অথচ রমেশ-কমলার ঘটনা যে ক্রমান্বিত সময় পরিধিতে, নলিনাক্ষ-কমলারও তাই। কমলা দুটো ক্ষেত্রেই সাধারণ (common) মূর্তি, কিন্তু রমেশ পর্বেই তার শারীর অবস্থান বলেই উপন্যাসের এই স্থূলতার দিকটাই প্রাথমিক কথনবিশ্ব হয়ে ওঠে; কিন্তু লেখকের না-বলা বাণী নলিনাক্ষকেই ইঙ্গিত করে। কথন-বিশ্বে স্থূলদিকটা নগন্য নয়। তাই রমেশ উপন্যাসে কোনো প্রতিনায়ক হয়ে ওঠে না, সদর্থক সহযোগী হয়। যদিও তার কর্তব্যজ্ঞানের মাঝে মাঝে শ্লথতা তাকে গৌণধর্মী করে; তবু উপন্যাস থেকে তার বিদায় নেবার আগে কমলার প্রতি শৈলজার সংলাপে পঞ্চান্ন সংখ্যক পরিচ্ছেদে ধ্বনিত হয়— 'ভাগ্যে তুই রমেশবাবুর হাতে পড়িয়াছিলি।'[৩১] অর্থাৎ তার স্বীকৃতিটুকু এভাবেই আদায় হতে পারে।

কতগুলো ছকের আশ্রয়ে 'রমেশ-কমলা', 'কমলা-নলিনাক্ষ' পর্ব দুটিকে উপন্যাস-অর্ন্তবয়ন থেকে এভাবে তুলে এনেও বিষয়টি স্পষ্ট করা যায়।
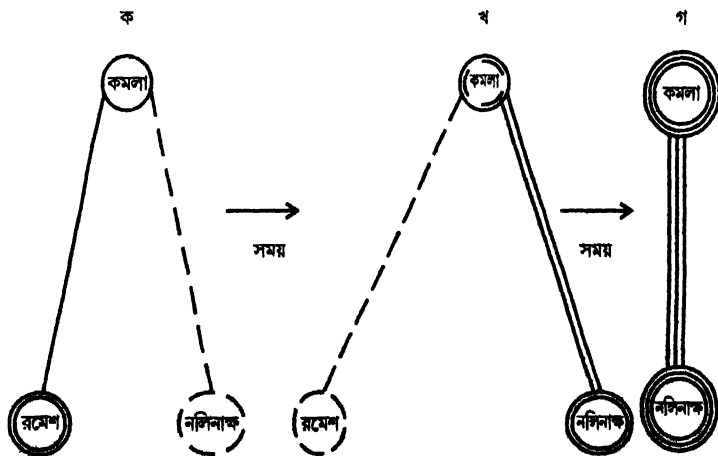
ক-চিত্র উপন্যাসের প্রথম পর্ব, রমেশের সঙ্গে কমলার পদ্মাতীরে নৌকাডুবির পর সম্পর্কসূত্র এবং চিঠির মাধ্যমে রমেশ-সত্য আবিষ্কার পর্যন্ত।

খ-চিত্র উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্ব, নলিনাক্ষকে স্বামী হিসেবে জানা থেকে কাশীতে এসে স্বামীপ্রাপ্তির নানান বিপর্যয় পথ পরিক্রমা, এবং—

গ-চিত্র উপন্যাসের তৃতীয় পর্ব, নলিনাক্ষের স্বীকৃতি ধরে কমলার জীবনে নূতন অভিষেক।

এবার হয়তো কমলাকে ধরে আরেকটা প্রশ্ন ওঠে। কমলা যে স্বামীভক্তিকে নিয়ে পথে নামে, তার সদা নিবেদিত প্রাণকে ঢেলে দিতে চায়, তা কি বিনোদিনীর পর সময়ের জগতে কিছুটা পেছন ফেরা হয়ে ওঠে না! যেহেতু স্বামীকে কোনোভাবেই যাচাই না করে স্বামী-সংস্কারের বশে সে এগিয়ে যেতে চায়। বিনোদিনী সে কারণে একবারও তার মৃত রুগ্ন স্বামীটিকে অনুকম্পা প্রদর্শন করে না— যাচাইয়ের প্রশ্ন ওঠে। কমলার ক্ষেত্রে সেখানে বিবাহের ধর্মীয় বন্ধনই মূল কথা। সেই বন্ধন তার এত দৃঢ়, মৃত্যুকেও সে জয় করতে পারে। কিন্তু বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের ভাবতে হয় বিনোদিনী যেখানে শিক্ষার দ্বারা বিচারশক্তিকে পায়, কমলা তো গ্রামের পরিধি ছাড়িয়ে সেই বৃত্তে এসে পৌঁছাতে পারে না। বাংলাদেশের সকল মেয়েই তো আর বিনোদিনীর হাত ধরে কোনো একটা যুগে একসঙ্গে বেরিয়ে আসে না। তাছাড়াও কমলার জীবনে যে পরিচ্ছেদ নৌকাডুবির মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়, তাকে বিপর্যয় ভেবে নিয়তির কাছে নিজেকে সঁপে দিয়ে কোনো অঘটন যেমন সে করে না, তেমনি তার অন্বেষণ-পর্যটনও উপন্যাসের বয়ানবৃত্তে স্বীকৃতি আদায়ের পর নিষ্ক্রান্ত হয় না। বিনোদিনীর কাছে কর্তব্য যেখানে বড় হয়ে ওঠে, কমলার ক্ষেত্রে তাই হয় রূপায়ণ। সময়ের চোখে বিনোদিনী তাই যেখানে অভিভাবক, কমলা হয় তার সৃজনভূমি। অতএব সংসারের সঙ্গে একটা আলাদা উচ্চতায় বিনোদিনী শেষপর্যন্ত যেখানে সম্ভ্রম আমাদের কাছে আদায় করে নেয়, কমলা সেখানে স্নেহ এবং ভালবাসা নিয়ে আবির্ভূত হতে থাকে।

তাছাড়া কমলা হয়তো সময়ের বড় নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠতে পারে না। তবু দৈবকৃত সত্য যখন অনেক দেরিতে হলেও তার চোখে পড়ে, ঠিক সেই মুহূর্তেই ভুল-সত্যকে ছেড়ে সংশোধনের জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। নৌকাডুবির দুর্ঘটনাকে ধরে যে দুটি পর্ব স্পষ্ট ও প্রচ্ছন্নভাবে একই পদ্মাতে একই সময়ে বিরাজ করে, সেখানে সত্য আবিষ্কারে স্পষ্ট ও প্রচ্ছন্নের বিভেদ তার ঘুচে যায়। নিজেকে অপবিত্ররূপে তখন আর ভাবতে পারে না। সেই সঙ্গে নবীনকালীর মত কোনো বিরোধী শক্তিও এই মিলনের পথকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। উপন্যাসের শেষে নলিনাক্ষের

সাদর গ্রহণের মধ্যেও আছে সেই শক্তির প্রতি সস্নেহ আহ্বান।

বিপুল এই শক্তিকে রমেশ কেবল গঠনের কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভাবে পোষকতা করে যায়। রমেশ তাই সেই সাময়িক কাল, যে জানে না তার পথ কি হবে। সময়ের যিনি স্রষ্টা, তিনি তৎসাময়িকের যত দুর্বলতাই দেখুন, তার প্রতি বিতৃষ্ণা প্রকাশ করতে পারেন না। বরং তার জন্য কিছুটা করুণা হয়তো বা লুকিয়ে থাকে। রমেশ তাই আমাদের মনে সাংঘাতিক নাড়া দেয় না সত্য, কিন্তু রমেশকে আমরা ভুলে যেতেও পারি না। রমেশের উদ্দেশ্যহীনতার ফলে যে দীর্ঘ ঘটনার জটিলতা বাড়ায়, তার জন্য নিজেও তো আত্মভূমিকে হারায়। তার আদর্শবান চরিত্রকে তো ভোলার নয়। নারীর অস্তিত্ব তার কাছে ভোগ বাসনার নয়, অন্যদিকে ঘর ছাড়া সন্ন্যাস জীবনও তার লক্ষ্য নয়। ঊনবিংশ শতকের শিক্ষিত সে-ই যুবক সে, যে আধুনিক যুগজীবনকে প্রবলভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়। তবু সময়ের একটা দ্বিধাকে ছাড়াতে পারে না। তার কারণ, শহুরে মধ্যবিত্ত মানসিকতায় সেই সঞ্চিত সাহস সে অর্জন করতে পারেনি। অতএব বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র রমেশ ধর্মের অন্ধতাকে দূর করে একদিকে ব্রাহ্ম পরিবারের মেয়ে হেমনলিনীর সঙ্গে ভালবাসার সম্পর্কে আবদ্ধ হয়, অন্যদিকে প্রাচীনপন্থী হিন্দু পিতার একনায়কবৃত্তিকেও সজোরে প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। হয়তো পিতার প্রতি সম্মানবোধের তাড়নায় বাধ্যবাধকতাকে এখানে সে এড়িয়ে যেতে পারে না সত্য। কিন্তু তাই বলে যে মেয়েটিকে সে ভালবাসা প্রদান করে, তাকেও যেখানে সত্য কথাটি বলে যেতে পারে না; কিংবা হেমনলিনীর প্রতি তার যে সময়ের বন্ধন গড়ে ওঠে, তা কমলার সুন্দর মুখচ্ছবিতেই ঢাকা পড়ে যায়; আবার কমলার সত্য আবিষ্কারের পর একপলকেই হেমনলিনীমুখী হওয়া ইত্যাদি সমস্তই তার চারিত্রিক স্বাস্থ্যের লক্ষণরূপে নিশ্চয়ই ধরা দেয় না।

এছাড়াও কমলা রমেশের বিবাহিত স্ত্রী নয়, এই সত্য জানার পর রমেশের দিক দিয়ে যে পরিবর্তন আসে, তাতে তার শিক্ষিত মনের খুব গভীর বিশ্লেষণও ধরা পড়ে না। তার কারণ বিবাহ বন্ধন মানুষের জীবনে কোনো সংস্কারের দ্বারা আবদ্ধ হবার অভিজ্ঞান নয়। দুটো মানুষের মানবিক দেওয়া নেওয়ার একত্র সহাবস্থানের সামাজিক স্বীকৃতি। কমলা হয়তো এভাবে না বুঝতে পারে, কিন্তু শিক্ষিত রমেশের কাছে তা আশা করা যায় না। অতএব সুদীর্ঘ তিন মাস সময়ধারায় কমলাকে যে অর্থে সে জানে, তাতে বিবাহ সংস্কারে আবদ্ধ হওয়াটাই বড় হয়ে ওঠে। বিবাহিত স্ত্রী নয় জেনে তার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক মুছে ফেলাটা যুক্তিপূর্ণ হলেও স্মৃতি থেকেও সম্পূর্ণ লোপাট করে দেওয়াটা কি করে তার সম্ভবপর হয়। বাইরে থেকে কোনো সামাজিক চাপও এক্ষেত্রে কার্যকরী নয়। তবু খণ্ড সময়ের দ্বিধা যে সংস্কার নিয়ে

আসে, ছুঁৎমার্গের মত তাকে কেবল মনের গভীরতল থেকে উচ্ছেদ না করে উপায়ও থাকে না। কমলা তাই রমেশের কাছে দায় হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে কমলাকে সত্য কথাটি বলা, কিংবা কমলার পথকে খুলে দেবার অন্য কোনো বিকল্প ব্যবস্থা করা— কোনোটাই তার হয়ে ওঠে না। খণ্ডিত সময়ের তৎসাময়িক নির্ভরতার এই হচ্ছে সমস্যা। অতএব হেমনলিনীর গৃহে তার পুনরায় আশ্রয়, এবং কমলাকে বোর্ডিংয়ে পাঠিয়ে সাময়িক পরিত্রাণ, তাকে আর পুরনো অবস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। সে চাইলেও না। তাই এক সময়ে উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে দীর্ণ হয়ে ওঠা রমেশের ভাগ্যাকাশে কালো মেঘের স্তর জমতে থাকে। সুন্দর কমলা তার জীবনে তখন দুর্ঘটনাকে বহন করে আনে। কমলাকে সে এড়িয়ে যেতে চায়, আবার কমলাকে সংসারের মাঝখানে অপদস্থও করতে চায় না— তার মধ্যবিত্ত সংকটকে তীব্র করে।

উপযুক্ত সমাহার না ঘটলে যে তার সমীকরণ হতে পারে না, দ্বন্দ্ব ঘনীভূত হয়ে ওঠে— রমেশ তা তার শিক্ষিত কেতাবী পরিধিতে এবং ব্রাহ্ম পরিবারের একটি স্তরে মিশে নিশ্চয়ই আবিষ্কার করতে পারতো না। অথচ জীবনে মাঝে মাঝে এমন সব প্রশ্নচিহ্ন এসে দেখা দেয়, যার উপযুক্ত জবাব দেবার জন্য সঠিক সময়েই প্রস্তুত হয়ে থাকতে হয়। রমেশের এক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষার সফল বৃত্তিটিও শূন্য ফলই প্রসব করে। উপন্যাসে তাই কোনো একটি সময়ের সে বাহক মাত্র, পরিত্রাতা নয়। তার নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া, প্রবহমান কালেরই আন্তরধর্ম। রবীন্দ্রনাথ সাময়িক পত্রে তাই যেভাবে রমেশের দ্বিধা-দ্বন্দ্বের দিকটি আঁকেন, অচিরেই তিনি বুঝতে পারেন, রমেশকে সেভাবে সম্পূর্ণ করা চলবে না— অসম্পূর্ণতাই তার গোত্র পরিচয়।

উপন্যাস তাই রমেশকে নিয়ে যতক্ষণ চলে, ততক্ষণ সময়ের নিয়ন্ত্রক হয় কোনো মানব চরিত্র নয়, নিয়তি। অথচ আধুনিক কুললক্ষণে উপন্যাস তো আর গ্রীক ট্র্যাজেডির মত দৈব অনুগৃহিত হতে পারে না। তাই নিয়তিকেই 'নৌকাডুবি' উপন্যাসে আমাদের চোখের লক্ষ্যস্থল করা হয় ঠিকই, কিন্তু উপন্যাস-পরিণতি ইডিপাস কিংবা নবকুমারের মত নিয়ন্ত্রণহীনতা দিয়ে শেষ হয়ে যায় না। মানুষের হাতেই তার বেঁচে থাকবার শেষ বাণটি তুলে দেন লেখক।

উপন্যাসের শুরুতে তাই যে প্রচ্ছন্ন সত্তারূপে নলিনাক্ষ অবস্থান করে, তার পরিসরটি ধীরে ধীরে স্পষ্ট হতে শুরু করে। আমাদের তাই বিচার করতে হয় জীবন মানে তো কোনো সরলরেখা নয়, জীবন মানে সহস্র ভুল আর ভুল সংশোধনের বক্রক্ষেত্রও বটে। একইসঙ্গে অনেক চরিত্র তাতে বিকশিত, একসঙ্গে তারা নানা তালে সাড়া দিতে থাকে। নানা বৈসাদৃশ্য থেকে বর্জন আর গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তারা

পরিণতিতে পৌঁছায়। রমেশ স্বরটি এক্ষেত্রে উচ্চনিনাদে আগে ওঠে আসে। কিন্তু তার বিলীয়মান সত্তার ক্রমনিষ্প্রভ অবস্থান ধরে সতর্কভাবে প্রকাশিত হয় নলিনাক্ষ। অতএব উপন্যাসের শুরুতে তাকে আমরা কমলার অন্তরালে দেখি, চিনি না। রমেশের দিশাহীন পথই ধীরে ধীরে তাকে আমাদের বুঝতে সাহায্য করে। রমেশ সেক্ষেত্রে উপন্যাসে যদি টুকরো টুকরো ইভেন্টস হয়, নলিনাক্ষ তার সূত্রধার। সমালোচক যে কথাটি নির্দেশ করে বলেন—

"Different kinds of stories may have different conventions, but within the respective frameworks consistency of tone should be preserved" [৩২]

নলিনাক্ষ সেইসূত্রে তারই অন্তর্নিহিত সুর লক্ষ্য। যদিও উপন্যাসের বিস্তৃত পূর্বাংশে তার অবস্থান নেপথ্যে। বাস্তবের ঘটনার চেয়ে এখানেই উপন্যাসের স্বতন্ত্র নির্মাণ। বাস্তব যেখানে অনুপ্রবেশ করে সময়ের কোনো স্বরান্তরকে সংলগ্ন করে তোলে না, উপন্যাস-বয়ান সেখানে পৌঁছে যার সামগ্রিক এক অখণ্ড সময়ের লক্ষ্যে। তাই নৌকাডুবি-দুর্ঘটনাটি বাস্তবে একটি বিচ্ছিন্ন বিপর্যয় কিংবা প্রকৃতির খেয়ালমাত্র। কিন্তু এই ঘটনাই উপন্যাস-বয়ানে রমেশ জীবনের শূন্যতার পরিচয়বাহী। কিন্তু তারপরও উপন্যাস সীমিত নয়। কেননা—

"Things happen in life and things happen in a novel; but whereas chunks of seeming reality appear shapeless, meaningless or confusing, the same chunk when rendered artistically in a novel should acquire beauty, significance, and clarity." [৩৩]

একমুখী দৃষ্টিতে তাই 'নৌকাডুবি'র ঘটনাটি রমেশের দিক দিয়ে দেখবার কিংবা ভাববার উপায় আর নেই। এখানেই পরিসরকে বদল ঘটিয়ে আরেকটি ফ্রেমে অন্য আরেকটি খণ্ডিত সময়ে গিয়ে উপনীত হতে হয়। যেখানে নলিনাক্ষ ওই একই বিপর্যয়ের শিকার। নিজের বিবাহিত স্ত্রী কমলাকে যে কারণে তাকে হারাতে হল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদে কমলা যে রমেশের বিবাহিত স্ত্রী নয়, তা রমেশ জানতে পারে প্রথম। এক্ষেত্রে সত্য আবিষ্কারে রমেশের প্রশ্ন এবং কমলার উত্তরের মধ্যে সামাজিক পরিসর আর নলিনাক্ষের অস্পষ্ট ভূমিকাও লক্ষণীয়। কমলার পিতৃমাতৃহীন জীবনে মামাবাড়ির অনাদর ও উপেক্ষা 'চোখের বালি'র আশার পরিস্থিতিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এই পরিস্থিতিতে কোথা থেকে নলিনাক্ষ এসে তাকে পছন্দ করে এবং দুদিনেই বিবাহকার্য সম্পন্ন হয়। বৃহত্তর সামাজিক জীবনকে ছুঁয়ে গ্রাম্যজীবন তখনও সম্পর্ক বন্ধনে আসে না। কমলা বৃহত্তর সেই পৃথিবীকে যে অবলম্বন করবে, তার সুযোগও তখন নেই। নলিনাক্ষের মুখশ্রী তাই সে আবিষ্কার করে না, মনের কোণে শুধু

প্রতিমাই নির্মিত হয়।

ব্যাপক দৃষ্টিতে গ্রামের সঙ্গে শহরের যে একটি পারস্পরিক ভারসাম্য এককালে ছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে তাকেই আবিষ্কার করেন। কিন্তু আধুনিক সমাজজীবনে গ্রামকে যে বিচ্ছিন্ন করে তোলা হয়, তার মূলে অর্থনৈতিক ধারা বৈষম্য রূপে কাজ করে। শহর সেক্ষেত্রে গ্রামকে করে সম্পদ লুণ্ঠনের কেন্দ্রস্থল। ঔপনিবেশিক সামাজিক প্রেক্ষাপটে কাঁচা সম্পদের রত্নভাণ্ডার হয়ে পড়ে গ্রাম, অথচ সেই সঙ্গে ক্রম অগ্রসরমান সমাজজীবনে এর কোনো সম্পর্ক রচিত হতে পারে না। বৃহত্তর সমাজ জীবন যে সেক্ষেত্রে কখনোই সম্পূর্ণ হতে পারে না, রবীন্দ্রনাথ তা অনুধাবন করেন। ইতিহাস তাঁর কাছে কখনোই বিচ্ছিন্ন কতগুলো ঘটনা নয়, রাজাদের যুদ্ধবিগ্রহ সম্পর্কিত নগর সভ্যতার আকরণও নয়। যারা শোষিত, যারা আধুনিক জ্ঞান-বঞ্চিত, তাদেরকে ছাড়িয়ে সময়ের কথা পূর্ণ হতে পারে না। দীর্ঘদিন তাই গ্রামের পরিব্যাপ্ত দারিদ্র্য, আর শহরের ঐশ্বর্যপূর্ণ প্রভাব প্রকট করে তুলে অসাম্যকে। এই অসাম্যের ছবি খণ্ড সময়কেই উপহার দেয়। গোরা এই খণ্ডকেই নিদারুণভাবে উপলব্ধি করে। 'চোখের বালি'তে সেই সত্য আবিষ্কারের পূর্ণাঙ্গ রূপ আসে না। 'নৌকাডুবি'তে বলা যায়, তার স্বীকৃতির পাঠ রূপায়িত হতে শুরু করে। রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে যে বিচ্ছিন্নতাকে উপলব্ধি করেন, সেখান থেকেই তাঁর দৃষ্টিতে ভারতবর্ষের দুটো রূপ ওঠে আসে।[৩৪] একটি ভদ্রলোকের ভারতবর্ষ, অপরটি অবহেলিত গ্রাম্য ভারতবর্ষ। এই বিচ্ছিন্ন করে দেখা বর্তমান কালেরই ইতিহাস। অতএব 'নৌকাডুবি'তে নলিনাক্ষের সঙ্গে বিবাহে গ্রাম্য মেয়ে বলেই কমলা স্বামীর মুখশ্রীকে দেখতে পারে না, সময় সংস্কারের বিচ্ছিন্নতা কাটে না। যে জীবন কমলার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আছে অথচ তার সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ সম্পর্ক তখনও রচিত হয় নি, তাকে স্পষ্টভাবে তাই চেনা যেতে পারে না।

এর জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হয়। নানা ঘাত-প্রতিঘাতেই তাকে স্পষ্ট হতে দেখি। যে আশাবাদকে নিয়ে সমাজ তাত্ত্বিক শেষ পর্যন্ত বলেন—

"গ্রামীণ সমাজের ত্রুটি যাই থাকুক না কেন, তার মূলে আছে পারিবারিক আদর্শ, সহজ প্রীতির আদর্শ। অপরপক্ষে নাগরিক সমাজে স্বাধীন ব্যক্তিমানুষ বৈচিত্র্যের মধ্যে মুক্তি খুঁজেছে। এ দু'য়ের কোনোটিকেই কি মানুষ ছাড়তে পারবে?[৩৫]

কমলার সঙ্গে তাই নলিনাক্ষের বিচ্ছেদ খণ্ড সময়েরই বিবৃতি, তাদের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় নয়। নৌকাডুবি সেই বিচ্ছিন্ন করে দেবার, মানুষকে মানুষের থেকে আরো বেশি আলাদা করার বর্তমান একটি দুঃস্বপ্ন মাত্র। কিন্তু সেই দুঃস্বপ্নকে ছিন্ন করে জেগে ওঠাই তার উদ্দিষ্ট। দুঃস্বপ্ন কাল সময়ের ইতিহাস বটে, তবে তার থেকে

বেরিয়ে আসা আরো বড় ইতিহাস।

কমলা স্বাভাবিক কারণেই শুরুতে নলিনাক্ষ সম্পর্কে স্পষ্ট কথা কিছু জানতে পারে না। তাছাড়া সে কোন্ অবস্থানে দাঁড়িয়ে, তাও তার কাছে পরিষ্কার নয়। কেননা তার অভিজ্ঞতায় রমেশই তখন স্বামী। যে আত্মসচেতনতা দ্বারা সে বিচার বিশ্লেষণ করবে, তার তখন সে সুযোগই নেই।

ইতিপূর্বে আমরা দেখি শহর পল্লীকে আত্মনির্ভর হবার সুযোগ দেয় না। তার সম্পদকে শোষণ করেও তার প্রতি দেখায় তীব্র উন্নাসিকতা। রমেশ যে গ্রামের মেয়ে বিবাহ করতে আসে, তাতে থাকে দায়ে পড়ার ভার। কি গ্রাম, কি শহর আধিপত্যের কোনো শ্রেণী বিভাজন হয় না। তাই সেই আধিপত্য গ্রাম থেকে শহরে এসে রমেশকে হরণ করে নিয়ে যায়। রমেশের পক্ষে এই বিবাহ তাই চরম লাঞ্ছনা, অথচ নলিনাক্ষের কাছে ব্যাপারটি তা নয়। সে কোনো দ্বিতীয় ব্যক্তির আধিপত্যের কাছে মাথা নত করে গ্রামের সঙ্গে যুক্ত হয় না। কিংবা এই সংযুক্তিতে তার কোনো বাধ্যবাধকতাও থাকে না। স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার এই মিশে যাওয়া, পল্লী ও শহরের এই সম্মিলন প্রয়াসে রবীন্দ্র উপন্যাসের প্রথম নিদর্শন। 'চোখের বালি'তে বৃহত্তর কর্মকাণ্ডের প্রতিমা নির্মাণ হয় অনেক সংশয় আর দ্বিধাকে ছাড়িয়ে। 'নৌকাডুবি'র নলিনাক্ষ সে-ই দ্বিধাকে ছাড়িয়ে ওঠে আসে আরো আন্তরিকতার প্রশ্নে।

কিন্তু গ্রামের মেয়ে কমলাকে গ্রহণের পেছনেও আছে আরেক সামাজিক প্রতিবেদন। নলিনাক্ষ-ই যখন সময় মুক্তির এক একটি পথকে খুলে দেয়, অতএব তার মধ্যে শুধু একটি পথই তো তখন আলোকিত হতে পারে না, তাকে যুগের সবকথাই বলতে হয়। ফলে যেখানে সে তার অপমানিতা মাকে সকল্প দিক দিয়ে আশ্রয় দেবার উদ্দেশ্যেই গ্রামে এসে একটি হিন্দু মেয়েকে বিবাহ করতে অনুপ্রাণিত; 'চোখের বালি'তে সেখানে প্রধানতঃ ব্যক্তির মাধ্যমে সংঘাত ঘনীভূত হয়ে ওঠে। 'চোখের বালি' তাই টুকরো-মহেন্দ্র, টুকরো-বিনোদিনী, টুকরো-বিহারী দিয়ে শুরু হয়। আবার উপন্যাস মহামিলনের ভেতর দিয়ে শেষ হয় বটে, বিনোদিনীর দ্বারা সৃষ্ট সামাজিক পৃথিবীতে মহেন্দ্র ও বিহারীকে উদ্দীপ্ত করে ব্যাপক আরো কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত হয়। কিন্তু যে সমকালের সমস্যা এবং সমাধান সময়ের ধারাস্রোতে ওঠে আসে, তাকে আরো নির্দিষ্ট, সূচিভেদ্য করে তোলাই হল প্রতিমা থেকে মুখশ্রী আবিষ্কারের আদর্শ। বিনোদিনী তাই যে সামাজিক দ্বিচারীবৃত্তির ছবিকে পারিবারিক কাঠামোয় ভূলুণ্ঠিত করে জীবনের প্রতিষ্ঠা করে যায়, 'নৌকাডুবি'তে তার থেকেও গণ্ডী হয় আরো স্পষ্টতর এবং বৃহত্তর। অতএব এখানেই 'উনিশ শতকের দ্বন্দ্বময়

শিক্ষিত সমাজ তাদের সৃজ্যমান জীবনধারা ও সংস্কৃতিকে চাক্ষুষ করা যায়।"[৩৬] — সমালোচকের এই বক্তব্য সত্য বটে।

কিন্তু কি সেই সামাজিক বৃত্তান্ত!

উনবিংশ শতকে মধ্যযুগীয় বাঙালি সমাজের অচলায়তন ইংরেজদের আগমনের পর ভাঙতে শুরু করে। ইংরেজি শিক্ষা এবং সেই সূত্রে পাশ্চাত্য চিন্তাধারার আগমন প্রচলিত অনেক বিশ্বাসকে বর্জন করে। সংশয়ের জন্ম দিয়ে তাকে করে আলোড়িত। রামমোহন প্রমুখের দ্বারা যে নূতন চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটে, তাতে নূতন ধর্মচেতনা এসে শহুরে শিক্ষিত সম্প্রদায়কে আপ্লুত করে নেয়। তবু সেই কর্মকান্ড বাংলার জনজীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত হতে পারে না। তাঁরা যে ব্রাহ্মধর্মের মাধ্যমে জীবনে ঔদার্য ও স্বাধীনতা গ্রহণ করতে এগিয়ে আসেন, তাদের সঙ্গে তৎকালীন ডিরোজিও ও তাঁর সম্প্রদায়ের ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীরা মিলেও ব্রিটিশ অধিকারকে কিন্তু বিধাতার আশীর্বাদ বলে মনে করেন।[৩৭] তাঁরা হিন্দুধর্মের অনেক আচার আচরণের সামাজিক প্রথাকে দূর করে জীবনকে উন্মুক্ত করেন। কিন্তু সেইসঙ্গে বহু বিভ্রান্তি প্রগতির পথে তাঁরা প্রদানও করেন। হিন্দুধর্ম বিরোধী মাধব চন্দ্র মল্লিক ১৮৩১ সালে নিষ্ঠার সঙ্গে বাড়িতে দুর্গাপূজা করেন।[৩৮] রামতনু লাহিড়ী পিতৃ-অনুরোধ উড়িয়ে দিয়ে উপবিত ত্যাগ করেন, কিন্তু সেইসঙ্গে গৃহিণীর অনুরোধে ব্রাহ্মণ পাচকেরও সন্ধান করেন। বড় মেয়েকেও তিনি হিসেব করে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ পরিবারেই বিবাহ দেন।[৩৯] শিবচন্দ্র দেব যুগের প্রভাবে হিন্দুধর্মে বিশ্বাস হারিয়ে একেশ্বরবাদী হন, অথচ সাংসারিক অবস্থায় প্রচলিত হিন্দু ক্রিয়া-বিধিকে ছাড়েন না।[৪০] বাঙালি সমাজ তখন বিভক্ত হয়ে পড়ে তিন ভাগে— একদিকে উগ্রপন্থী সংস্কারক, অন্যদিকে রক্ষণশীল প্রাচীনপন্থী এবং তাদের মাঝখানটিতে মধ্যপন্থী সম্প্রদায়। যারা খন্ড সময়ের অসংলগ্নতাকে বিচ্ছিন্নতার সূত্রে দেখিয়ে দেয়। একজন ব্রাহ্ম হয়েও প্রসন্ন কুমার ঠাকুর বাড়িতে তাই ঘটা করে দুর্গাপূজা করতে ছাড়েন না। কৌলীন্যপ্রথার প্রবল বিরোধী হয়েও রাধাকান্ত দেব বিধবা বিবাহ ও প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে স্ত্রী শিক্ষার ঘোর বিরোধী হয়ে পড়েন।[৪১] আর এই যে পরস্পর সম্পর্ক-বিযুক্তি এবং প্রাচীন প্রথা ও নবচেতনার মধ্যে দ্বন্দ্ব, তা মূলত হয়ে ওঠে সময়ের কথা। শুধু ইতিহাস কাল নয়, এই দ্বন্দ্বের অন্তর্নিহিত ধারা হল ব্যক্তিকাল। দীর্ঘ দিনের প্রবলভাবে বয়ে যাওয়া সংস্কার, নূতন মানবিক ভাবনার সহযোগে সংস্করণ উদ্যোগী, অথচ সংযোজক নয়। তারই বিপুল ছবি 'গোরা' উপন্যাস। 'নৌকাডুবি'তে রমেশ হিন্দুর ছেলে, কিন্তু শহরে অবস্থান করে নূতন আলোকে ব্রাহ্ম পরিবারের সঙ্গে যুক্ত হতে গিয়েও রক্ষণশীল পিতার কথাকে অমান্য করতে পারে না। অথচ

নলিনাক্ষ যে ব্রাহ্ম হয়ে হিন্দু মেয়েকে বিবাহে এগিয়ে আসে, সেখানে থাকে সমন্বয়তার প্রশ্ন, আর থাকে ছোট্ট একটি ইতিহাস।

নলিনাক্ষের বাবা রাজবল্লভ ফরিদপুর অঞ্চলের একটি ছোটখাট জমিদার এবং তিরিশ বছর বয়সে তিনি যুগের হাতছানিতে তাঁর প্রগতিশীল মনের ঔদার্য প্রদর্শনকল্পে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেন। কিন্তু এই দীক্ষা গ্রহণের মধ্যে যে বিশ্বাস, সেটা নেহাতই তার ব্যক্তিগত। তার স্ত্রী কোনোমতেই স্বামীর ধর্মমতকে গ্রহণ করেননি। কিংবা করতে পারেন নি। হতে পারে এ ক্ষেত্রে রাজবল্লভ নিজে প্রগতিশীল আধুনিক সময়ের আরো কাছাকাছি যাবার লক্ষ্যে মানবধর্মকে ব্রাহ্মধর্মের অন্তরালে স্থাপন করেন। অন্যদিকে তার স্ত্রী পড়ে থাকেন পুরোনো সংস্কারের ধারায়। সে ক্ষেত্রে একটি পরিবারেই যেখানে সমন্বয় ঘটে না, সেখানে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সঙ্গে তার সম্পর্ক কতটুকু হতে পারে, সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, মনের গহনে কামনা আর প্রথার সংস্কারকে ধরে মধ্যযুগ যে বিচ্ছিন্নতাকে ব্যক্তিমানুষের মানব হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে প্রশ্নের দ্বারা চিহ্নিত করে, তার পরিচয় মেলে রাজবল্লভের জীবনাচরণে। বৃদ্ধ বয়সে একজন বিধবাকে বিবাহের জন্য তিনি উন্মাদ হয়ে ওঠেন এবং সেক্ষেত্রে তার বর্তমান স্ত্রীকে ব্যক্তিগত ধর্মপালনে অনুপযুক্তরূপে দেখান। প্রগতিবাদীর ধ্বজা উড়িয়ে তিনি হয়তো বৃহত্তর কালের কাছে এ কথাই প্রমাণ করতে চান— একদিকে প্রথাকে বলি দিয়ে ক্রম মানবিক হবার লক্ষ্যে স্ত্রীর প্রাচীন সংস্কার তাঁর বাধা, অন্যদিকে একটি বিধবাকে বিবাহ করে তিনি সেই বাঁধাকে অতিক্রম করার প্রয়াসী ও 'বিধবা বিবাহ' নামক কার্যটি সম্পন্ন করে তিনি প্রগতিশীল। কিন্তু তার এই দুর্বলতার ছবিটি প্রয়াস সত্ত্বেও ঢাকা পড়ে যায় না। কারণ স্ত্রী থাকা অবস্থায় আরেকটি বিবাহ করে বিধবা বিবাহের আড়ালে বহু বিবাহ মানসিকতাই এখানে প্রকাশিত। অন্যদিকে বিধবা বিবাহকে প্রগতিশীল মানসিকতার স্তরে তুলেও নিজে ব্রাহ্ম হয়ে বিধবাটিকে হিন্দু মতানুসারে বিবাহে তার ছদ্মবেশধারী উন্নতশীল মানসিকতাকেও উচ্চকিত করে না। অতএব তার একদিক এবং অন্যদিকের কুল রক্ষা, তৎকালীন আত্মিক দ্বন্দ্বকে প্রকটিত করে। সেইসঙ্গে প্রগতিশীলতার মোহ ছাড়িয়ে তার স্বৈরাচারী ব্যক্তি ইচ্ছার নগ্ন প্রকাশও ঘটে যায়। সামাজিক স্তরের এই অসংলগ্ন চিত্র আসলে ক্ষমতালোভী ব্যক্তির ক্ষমতার অপপ্রয়োগ জনিত এক আত্মতুষ্টিরই রূপান্তর। পক্ষান্তরে তাই রাজবল্লভ অপমান করেন তার স্ত্রীকে, তার ধর্মকে, সর্বোপরি মানবকালকে।

নলিনাক্ষ নিজে ব্যক্তিগতভাবে ধর্মকে অর্জন করে। তাই ব্রাহ্ম হয়ে ওঠলেও বাবার এই বিরোধ ও অসংগতিকে সমর্থন করে যেতে পারে না। মায়ের ধর্মমতকেই

সে সামাজিক সম্মান দেয় মানবিক মূল্যবোধে মায়ের মুখ চেয়েই। এই ধর্মপালন বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ের আচার পালন নয়, মানবিকতার লক্ষ্যে পরিমার্জনশীল। তাই 'নৌকাডুবি'র বর্তমান গল্পে রমেশ আর কমলাকে কেন্দ্র করে যে ঘটনা ঘনীভূত হতে থাকে, তার নেপথ্যে আগেই ঘটে যায় ক্রিয়াশীল এই কাহিনী। যে কাহিনীতে পিতার আধিপত্যের অপশাসনকে দূর করে মানবধর্মের দীক্ষায় নলিনাক্ষ গতির জন্ম দেয়। মাকে সুখী করার লক্ষ্যে হিন্দু মতে হিন্দু মেয়ে সে বিবাহ করে এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে মায়ের আচার আচরণকে গ্রহণ করে।

অতএব নলিনাক্ষ যে অবস্থান থেকে কমলাকে বিবাহ করে, তার মধ্যে সততা ও দৃঢ়তা কত প্রবল, অনুভব করা যায়। সততা— মানুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে। দৃঢ়তা— নিজের ধর্মমতের সংস্কারকে ছাড়িয়ে তোলার সামর্থ্যে। রমেশ যেখানে গুরুজনের প্রতি সম্মানের লক্ষ্যে নিরুপায়, নলিনাক্ষ সেখানে মায়ের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে সংকল্পবদ্ধ। মায়ের হিন্দুধর্ম এখানে কোনো টুকরো ধর্মমত নয়, স্বামী প্রবঞ্চিতা নারীর মানসিক আশ্রয়। তার সম্মানের অবস্থান বিন্দু। সেই বিন্দুকে নলিনাক্ষ অবহেলা করতে পারে না। সে তার প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে এভাবেই আত্মভূমি উদ্ধার করে সমাজের দুষ্টব্রণকে সমূলে উৎখাত করতে এগোয়। সে নিজে একজন ডাক্তার, রোগ নির্ণয় এবং প্রতিবিধান হয় তার মূল কাজ। এক্ষেত্রে যুগের গণ্ডীবদ্ধতাকে সে প্রতিহত করতে প্রয়াসী। জীবিকার সঙ্গে জীবনের এখানে কী অপূর্ব মেলবন্ধন!

নলিনাক্ষকে এতকাল এক বৃহত্তর সমালোচক গোষ্ঠী যথার্থ মূল্যায়ণ করেননি। রমেশকে নায়ক করে.তোলার যে একটি যুগ সঞ্চিত সংস্কার, তাকে ছাড়তে পারা যায় না বলেই নলিনাক্ষ উদ্ভাসিত হতে পারেনি। কোনো সমালোচক হয়তো তার জন্য দ্বন্দ্বেও উপনীত হন। অতএব নলিনাক্ষকে স্বনির্ভর ব্যক্তিত্ব ছাড়িয়ে সহায়ক ভূমিকা রূপেই দেখেন, আবার পরক্ষণেই সহায়ক চরিত্র গুণকে ধরে তার ভূমিকা সহনায়কের নয় বলেও ঘোষণা করেন।[৪২] সাময়িক উজ্জ্বল আলো নানা বিরোধী খণ্ডতাকে নিয়ে এখানে আমাদের বিশ্বাসকে অটুট রেখে দিতে চায়। রমেশ ও কমলা বৃত্তকে ধরে তার কাঠামোর ইচ্ছাকৃত জোড়াতালি গল্পের ভিত্তিকেই আমরা মূল স্রোত ভেবে এগিয়ে যাই। তারপর রমেশের শূন্যতা আর বিচ্ছিন্নতার মাঝখানে পড়ে উপন্যাসের যোগসূত্রকে খুঁজে পাই না। খণ্ড বিচ্ছিন্ন সময়ের প্ররোচনায় আকাঙ্ক্ষা জন্মায়— হেম নলিনীর সঙ্গে রমেশের বিবাহ হোক। সেই বিবাহ প্রত্যক্ষ না করে বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় উপন্যাসটি সম্পর্কে আমাদের ভ্রান্তি আসে। রবীন্দ্রনাথ হয়তো জেনে শুনেই এই ভ্রান্তিকে সামনে এনে আমাদের দায়িত্বটাকে আরো বেশি

উস্‌কে দেন। সেই সম্ভাবনার সূত্র হয়তো একটু একটু করে খুলে। তাই আধুনিক একজন সমালোচক 'নৌকাডুবি'কে প্রাচীন পন্থীদের মত রবীন্দ্রনাথের পশ্চাদপরসরণ না বলে যদিও প্রথার অনুবৃত্তি করে বলেন, পদস্খলন। তবু নলিনাক্ষ প্রসঙ্গে ধরাবাঁধা সংস্কারমুক্তির কিছু পথও খুঁজে পান। সেজন্যই তাঁকে বলতে হয়—

"অনাত্মীয় পুরুষকে স্বামী জেনে, কিছুকাল তার সঙ্গে একত্রে থেকেও শেষ পর্যন্ত কমলা তার অপরিচিত স্বামীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে, স্বামী তাকে অকুণ্ঠিত চিত্তে গ্রহণ করেছে। এই পরিণাম সংস্কারমুক্ত আধুনিক জীবনবোধ ছাড়া সম্ভব ছিল কি? সীতাকে নানা পরীক্ষায় যাচাই করেও রামচন্দ্র তাঁকে বনে নির্বাসন দিয়েছিলেন। পটভূমি ভিন্ন হলেও এক মহাকবির রচনায় আধুনিক মতে যে অবিচার ঘটেছিল, আর এক মহাকবি যুগধর্মের প্রভাবেই তা ঘটতে দেন নি। নলিনাক্ষ যে রামের দেশের লোক হয়েও কমলা সম্বন্ধে কোনো তদন্ত পর্যন্ত করেনি, পরীক্ষা তো দূরের কথা— সে কি রবীন্দ্রনাথের পিছুহটা, রক্ষণশীলতা? আমাদের মনে হয়েছে সেটা আধুনিকতা.............।"[৪৩]

অনেক সময় দেখা যায় সমসাময়িক কালের প্রচলিত একাধিপত্য লেখকরা অহরহ ব্যক্তিজীবনে বহন করেন। সেক্ষেত্রে তাঁর জীবন যদিও বা খন্ড কালের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। তবু তাঁর সাহিত্য-সত্তাটি, বিশেষত ঔপন্যাসিক ভূমিকা তাকে ছিন্ন করতেই ব্যাপক শক্তিকে সঞ্চয় করে। যদি তা না হয়, যদি জীবনের দ্বন্দ্বের সঙ্গে উপন্যাস-বিশ্ব জড়িয়ে পড়ে— তবে সমস্ত সম্ভাবনাই ধ্বসে যায়। বঙ্কিমচন্দ্রকে তাই যে নীতিতত্ত্বের সাগরে সমকালটিকে ধরে ভাসতে হয়, সেখানে তাকে আশ্রয় করেই কোনো কোনো ক্ষেত্রে খন্ডিত দৃষ্টিকোণে ঘটনার মূল্যাঙ্কন ঘটে। কুন্দ তাই অবহেলিত, রোহিনী ভৎর্সিত— যেহেতু তারা বিধবা। অন্যদিকে সধবা নারীর জগৎটাও কি বিকশিত! তাহলে সাধ্বী সূর্যমুখীকে আমরা মানবিক কোন্ জগৎটি ধরে বিচার করব! স্বামীর সঙ্গে তার যে মানসিক বিচ্ছেদ, তা কি আর কখনও সংশোধনযোগ্য! ভালবাসার তার ছিঁড়ে গেলে আর কখনোই আগের মত জোড়া লাগে না। নগেন্দ্র দত্তের সঙ্গে তার পুনর্মিলন তাই সংশয় সৃষ্টি করে। কিন্তু বঙ্কিমের শিল্পী মন কোথাও কোথাও আবার সেই সাময়িককে ছাড়াতে উৎসুক বলেই ভ্রমরের মত চরিত্রও সৃষ্টি হয়। রবীন্দ্রনাথ 'চোখের বালি'তে বিধবা বিনোদিনীকে শুধু বিহারীর সঙ্গে নয়, অন্য কারো সঙ্গেও বিবাহ দেন না। এক অর্থে বলা যায় সমকালটির আদেশ এক্ষেত্রে হয়তো তিনি অমান্য করতে পারেন না। কিন্তু পূর্বে আমরা আলোচনার মধ্য দিয়ে দেখি বিবাহ যদি আন্তরিক না হয়, তবে তা মুক্তির বদলে বন্ধনকেই আহ্বান করে। বিনোদিনী সেই বন্ধনে জড়িয়ে পড়ে কোনো ভুল করতে চায় না। অতএব এ কথাতেই লক্ষ্য করি, সমকালের শাসনটিকে উপেক্ষা করা

হল। কিন্তু তারপরও উপন্যাসের ভেতরে ভেতরে এমন কোনো শক্তি কাজ করতে থাকে, যেখানে তা ঔপন্যাসিকের বৃত্তকেও ছাড়িয়ে যায়।

আর্ন্তজাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ঔপন্যাসিক মিলান কুন্ডেরা তাই তাঁর একটি ভাষণে উল্লেখ করেন— "Every ture novelist listens for that suprapersonal wisdom, which explains why great novels are always a little more intelligent than their authors."[৪৪]

অতএব এই দৃষ্টিতেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসের উপর বিচারের আলো ফেলেন। কিন্তু বিচক্ষণ দৃষ্টিকেই উপন্যাসে ছাড়িয়ে তোলেন না। উপন্যাসের দেশ-কাল সম্পৃক্ত এবং দেশকাল-নিরপেক্ষ স্বভূমিতেই পরিচর্যা করেন।

নারী প্রেমকে ধরে স্ব-কালের যে বাসনা প্রকাশিত, তাতে সধবা কিংবা বিধবার প্রসঙ্গই বারবার আসে। 'করুণা' উপন্যাস ধরে করুণার প্রতিচিত্রে কিংবা 'বউঠাকুরানীর হাটে'র বিভার মধ্যে তার কোনো সুযোগ সন্ধান করা হয় না। 'নষ্টনীড়' উপন্যাস-প্রতিম গল্পে পরকীয়া প্রেমের সূক্ষ্মতা ধরা পড়ে, কিন্তু সেক্ষেত্রেও প্রেমিকাটি বিবাহিতা। 'চোখের বালি'র মত একটি সময়ের কথনবিশ্বের অনবদ্য প্রতিমাও জীবনের এই স্তরটিকে আলাদা করেই রাখে। 'নৌকাডুবি'তে রবীন্দ্রনাথ দেখাতে চান বিবাহিতা নারীর স্বামী সংস্কার; আর এ পথ ধরে তিনি একটি লক্ষ্যেও পৌঁছাতে চান। কিন্তু এখানেই তিনি অতর্কিতে আবিষ্কার করেন, উপন্যাসের সুরটি ধরে হেমনলিনী চরিত্রে কুমারী প্রেমের মান্যতা। উপন্যাসের মূল স্রোতটি তাই যদি লেখকের কোনো পরিকল্পনাও হয়, তবু তার পার্শ্বস্বরগুলো সব সময় কেবল মূল সুরের পোষকতা করতেই ব্যস্ত থাকে না। তারাও আলাদা স্বাতন্ত্র্য নিয়ে সম্মিলিত হতে থাকে। মহৎ উপন্যাস এভাবেই নিজেকে গড়ে নিতে পারে সময়ের তাগিদে। হেমনলিনীকে তাই কমলার মধ্যে খুঁজতে যাওয়া বিড়ম্বনা। 'কমলা নামক মূল সুরের সহায়ক সে, তবু তার একটি আভিজাত্যও আছে।

সামাজিক দর্পণে কুমারীর প্রেম তখন সহজলভ্য নয়।[৪৫] তার কারণ, যৌবনের প্রেমচেতনার আবেগ প্রবাহিত হবার আগেই বিবাহ নামক শাস্ত্রাচারের ব্যাপার তখন সম্পন্ন হত। ফলে প্রাক্-বিবাহ পর্যায়ে অন্য কোনো পুরুষের প্রতি প্রেমের অবকাশ থাকে না। হেমনলিনী অবশ্য হিন্দুঘরের মেয়ে নয় বলেই সেকালের হিসেবে অধিক বয়স পর্যন্ত বিবাহ না করে পড়াশুনা চালিয়ে যায় এবং আরো বড় কথা, প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রিও লাভ করে। আর এই পড়াশুনার মধ্যেই রমেশের প্রতি সে প্রেমাসক্ত হয়। বিনোদিনীর পক্ষে যেখানে পড়াশুনা এবং প্রেম— এতদূর পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না, এক্ষেত্রে আরো এগিয়ে একটি হিন্দুঘরের ছেলেকে যোগ্যতার বিচারে সে ভালোবাসে এবং বিবাহের জন্য প্রস্তুত হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর

পারিবারিক জীবনে নিজের কন্যাদের প্রেমবিবাহের প্রতি কোনো অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন বলে জানা নেই। কিন্তু উপন্যাস তাকে সৃষ্টির সূত্রেই আদায় করে নেয়।

হেমনলিনী তাই কোনো ব্যক্তি, কোনো সমাজের নির্ভরযোগ্যতায় টিকে থাকে না। ঔপন্যাসিকের অনন্ত সৃষ্টিলোক থেকে তার জন্ম। কিন্তু উপন্যাস-বিশ্বে সে সময়ের স্থপতি। 'শেষের কবিতা'র লাবণ্যের পথকে যে আগাম খুলে রাখে।

'চোখের বালি'র পর তাই 'নৌকাডুবি' সমকালের আরেকটি প্রতিবিম্ব হয়ে উঠলেও প্রতিমা নির্মাণের পর প্রাণ সঞ্চারের তরঙ্গ বেজে ওঠে। কোন্‌টা ইতিহাস, আর কোন্‌টা আবিষ্কার— স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শিল্পীমন তাই এ কথাই বলে—

"...... the spirit of an age cannot be judged exclusively by its ideas, its theoretical concepts, without considering its art and particularly the novel. The nineteenth century invented the locomotive, and Hegel was convinced he had grasped the very spirit of universal history. But Flaubert discovered stupidity."[৪৬]

কিন্তু ওই একই সঙ্গে আলোচক এ কথাটিও যুক্ত করে দেন— "I dare say that is the greatest discovery of a century so proud of its scientific thought."[৪৭]

'নৌকাডুবি'তে সময়ের প্রবহমানতা ধীর— যে সত্যটি ঘুরে ফিরে আমাদের বুঝে নিতে হয়। আর তার কারণ রমেশ পর্বের সাময়িকতাকে ছেড়ে নলিনাক্ষ পর্বের বিশ্বায়ন পটভূমিকায় পৌঁছানোর প্রবণতা। গল্পটি তাই যে জগতের কথা দিয়ে শুরু হয়, সেখানেই সীমিত হয় না, বরং তা সম্পূর্ণ খসে পড়ে যায়। 'চোখের বালি'তে মহেন্দ্রের পরিবারের (মহেন্দ্র-বিহারী-আশা-রাজলক্ষ্মী যেখানে যুক্ত) পটভূমিকাই মুখ্য। তাতে বিনোদিনীর মাধ্যমে সময়ের পরিবর্তন নিয়ে এসে স্পষ্টত দুটো আলাদা মাত্রা প্রদান করে। ফলে 'গন্ডীবদ্ধ মহেন্দ্র-পরিবার' এবং 'মুক্ত মহেন্দ্র পরিবার' পর্যায় দুটোকে পেয়ে যাই বটে, তবে মহেন্দ্র-পরিবারও অন্তত বজায় থাকে। 'নৌকাডুবি'তে তার কৌশলই আলাদা। এখানেও স্পষ্টত দুটো আলাদা মাত্রা সময় প্রবাহ ধরেই আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু যে দুটো পর্ব থাকে, তাতে পরিসর যেমন পাল্টায় (কলকাতা থেকে কাশী), চরিত্রের ভূমিকা শুধু নয়, অন্য চরিত্র ধরে আপাত প্রধান চরিত্রেরও বিদায় অনিবার্য হয়ে ওঠে (রমেশ থেকে নলিনাক্ষ)। অথচ উপন্যাসের বক্তব্যকালটিকে একটি নির্দিষ্ট সীমানায় রেখে তাতে বৃহত্তর অংশ জুড়ে বিন্যাস প্রক্রিয়া চলতে থাকে গৌণ অংশটির সূত্রেই। 'চোখের বালি' থেকে 'নৌকাডুবি'র জটিলতা তাই বেশি এবং উপতল ও তলের দ্বারা নির্ধারিত। পরিসর এবং চরিত্র— সময় প্রকাশের এই দুটো প্রধান মাধ্যম যে এখানে খন্ডকাল

থেকে বৃহত্তর কালে সম্পূর্ণ বদলে যায়, এ কথাটাই প্রথমে বোঝা যায় না। আর অবশ্যই তার জন্য প্রবহমানতার ধীর প্রয়োগ শিল্পের কৌশল হয়ে ওঠে।

দেখা যায়, প্রধান চরিত্রগুলোতে প্রত্যেকেরই এক একটি ব্যক্তিগত স্তর নির্দিষ্ট। রমেশের এই ব্যক্তিস্তরই অযথা যে কারণে সমস্যার সূত্রপাত ঘটায়। ধীরতাই সেখানে তার মূল কারণ। কমলার ব্যক্তিগত স্তর যথার্থ স্বাধীনভাবে রমেশ সম্পর্কে সত্য আবিষ্কারের পরই দেখা দেয়। অথচ তার চরিত্রের যে ধীরতা, এক্ষেত্রে তা মীমাংসা সন্ধানী। ধীরতা এখানে গুণ অর্থে চলে আসতে বাধ্য। তার কারণ, একান্ন সংখ্যক পরিচ্ছেদে তার যেখানে রমেশকে নিয়ে প্রবল বর্তমানের সমস্ত সত্য ভূলুণ্ঠিত হয়, সেখানে একটা ভীষণ শূন্যকাল এসে আক্রমণ চালানোটা স্বাভাবিক। কেননা—

"জীবনের এই শেষ মুহূর্তে জীবনেশ্বরকে স্মরণ করিবার সম্বল তাহার কিছুমাত্র নাই। সেদিকে একেবারে অন্ধকার— কোনো মূর্তি নাই, কোনো বাক্য নাই, কোনো চিহ্ন নাই।"[৪৮]

লক্ষ্য করতে হয় বর্তমান এখানে সত্য আবিষ্কারে লুপ্ত। অথচ অতীতের গর্ভে ফেলে আসা আরেক সত্যের কোনো অভিজ্ঞানই তার হাতে নেই। ভূত-বর্তমানশূন্য কমলার জীবনে তাই 'নাই' শব্দ প্রতিধ্বনিত। কিন্তু 'নাই' শব্দই তার জীবনে অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। কমলার অতীত তো নলিনাক্ষকে নিয়ে অসত্য নয়— বিচ্ছিন্ন। তাই 'নাই' শব্দ প্রবল বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত হলেও প্রচ্ছন্ন ভবিষ্যতে সে 'আছে'। অতএব এই শূন্যকাল সাময়িক, বিচ্ছিন্ন অতীতকে জুড়ে দেবার আকুল প্রচেষ্টা,— ধীরগতিতে প্রবাহিত হয়ে লক্ষ্যভূমিতে যা এগিয়ে চলে। কলকাতা-রমেশ-নবীনকালী, সব মুছে দিয়ে ঘন অন্ধকারে মনের প্রদীপ জ্বালিয়ে তার অন্তঃকরণ থেকে বারবার উচ্চারিত হয়, 'এ তো শূন্যতা নয়, এ তো অন্ধকার নয়—'।[৪৯] প্রাচীন ঋষিবাক্য এককালে যে সময়ের সন্নিধানে ধ্বনিত হয়, কমলাও তারই প্রার্থনা জানায়। তাই তার সমস্যাসঙ্কুল জীবন-পট ধীর বটে, কিন্তু তার জন্য সহযোগী-অসহযোগী নানা সত্তার সংস্পর্শের বিপুলতাও উচ্চকিত। প্রতিমার মধ্যে মুখশ্রী আবিষ্কার তাই দ্বন্দ্বহীন, সমস্যাহীন, প্রলম্বিত সময়ের বিচিত্র ঘটনাবলীর সাহায্য ছাড়া কখনোই ঘটতে পারে না। তাই যে সত্তা নানা বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়ে ছুটে আসে, দীর্ঘ জটিলতার স্তর পেরিয়ে তাকে আহ্বান করে নেবার জন্য অপর সত্তাটি উদগ্রীব হয়ে ওঠে। নলিনাক্ষ তাই মায়ের সম্মান রক্ষায় গ্রামের মেয়ে কমলাকে বিবাহ করে সত্য, কিন্তু নৌকাডুবির ফলে সে মেয়েটির সত্যিই কি মৃত্যু হল, এ ব্যাপারে তার সংশয় থাকে। এক্ষেত্রে মা তাকে বিবাহ করাতে চাইলেও সে রাজি হতে পারে না। বরং তার জন্য পুরো এক বছর অপেক্ষার সিদ্ধান্ত নেয়। হয়তো মনের কোণে সেই বিচ্ছিন্ন অতীতকে

অন্ধকারের মধ্যে সে জ্বলতে দেখে। অতএব সেই বিচ্ছিন্ন অতীতের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে তার অপেক্ষার ইতিবৃত্ত গুরুত্ব অর্জন করে। প্রতিক্রিয়াশীল ছবিটি স্পষ্ট হয় মুহূর্তে, কমলার মিলনবিন্দুকে ধরে।

সময়ের পরিবর্তন কিভাবে একজন হিন্দু মহিলাকেও প্রাচীন সংস্কারের বন্ধন থেকে টেনে নিয়ে আসতে পারে। তার পরিচয় পাওয়া যায় নলিনাক্ষের মা ক্ষেমঙ্করীর মধ্যে। নলিনাক্ষের সংকীর্ণতাহীন চরিত্রের চার পাশ ঘিরে যেখানে এমন একটি সত্তার প্রয়োজন। ধর্ম এখানে মানবমুখী। রাজবল্লভের মিথ্যা দৃষ্টিতে যে ক্ষেমঙ্করীকে আমরা গোঁড়া হিন্দুবাদীরূপে দেখি, তাকে বিচার করার সুযোগ এখানে থেকে যায়। ফলে সময় দিয়ে উপলব্ধি ঘটে তিনি হিন্দু, কিন্তু কখনোই তার সীমানায় নিবদ্ধ নন। বরং তার থেকে অনেক বেশি প্রগতিবাদী এবং বাস্তব জ্ঞানসম্পন্ন। ঊনপঞ্চাশ সংখ্যক পরিচ্ছেদে নলিনাক্ষের বিবাহের ব্যাপারে তাই প্রাপ্ত বয়স্ক কন্যাই তিনি চান। তাঁর ছেলের ঘাড়ে কোনো নাবালিকাকে ফেললে কি সমস্যা হতে পারে, বাস্তব দৃষ্টিতে তাকে অনুসন্ধান করে বাল্যবিবাহ যে অনুমোদনযোগ্য নয়— এ কথাও উপলব্ধি করেন। যদিও এ অনুমোদন তিনি পান হেমনলিনীকে পুত্রবধূ করার লক্ষ্যে। তবু আমাদের ভাবতে হয়, এই নারীই কিন্তু একদিন হিন্দুর শাস্ত্রাচার ছেড়ে স্বামীর ব্রাহ্ম সংস্কারকে স্বীকার করে নিতে পারেননি। অথচ এখানে ব্রাহ্ম মেয়ের সঙ্গে বিবাহে তিনি আন্তরিক হয়ে উঠতে চাইছেন। আচার পালনের রূঢ়তা তাঁর আছে। কিন্তু সে কেবল নিজের পরিসীমায়। অন্যেরাও তাঁর মতন আচার পালন করুক, এ অভিপ্রায় তিনি কখনো প্রদান করেন না। এর থেকেই বোঝা যায় হিন্দুধর্ম পালন তাঁর নিষ্ঠার একটি বর্ম মাত্র। অতএব সংস্কারের কঠোরতাকে তিনি শাস্ত্রাচারে নিবদ্ধ রাখেন, কিন্তু ধর্ম রক্ষা অর্থে অন্য কথা বোঝেন। নলিনাক্ষ এই মায়েরই সন্তান, অতএব সে ব্রাহ্মের আচারকে ছাড়িয়েও মায়ের মতই ধর্মকে বৃহত্তর সমাজ জীবনে মানুষের মাঝখানে খুঁজে বেড়াতে পারে। 'নৌকাডুবি'র প্রায় দশ বছর আগে প্রকাশিত 'অনধিকার প্রবেশ' গল্পেও সংস্কারান্ধ খণ্ডিত সময়ের সত্তাটি ধর্ম পালনে শাশ্বত হয়ে উঠতে দেখা যায়। মন্দির হয়ে ওঠে মানবতার আধার। নলিনাক্ষের জন্যও এই মানবিক নেপথ্য-দৃশ্যপটের যে প্রয়োজন ছিল ক্ষেমঙ্করীই তার উৎসভূমি। উপন্যাসের শেষেও তাই কমলার সত্য পরিচয়, এবং তার স্বীকৃতি ক্ষেমঙ্করীর ভবিষ্যৎ সন্নিধান যাত্রায় শেষ হয়। কিন্তু নলিনাক্ষ আগাম জানিয়ে রাখে—

"মা তাহার জীবনে অনেক অপরাধকে ক্ষমা করিয়া আসিয়াছেন, যাহা অপরাধ নহে তাহাকে তিনি ক্ষমা করিতে পারিবেন।"[৫০]

যদি সময়ের কথা আমাদের বলতেই হয়, তবে একটি উপন্যাসে যেখানে নানা অবতলের ইঙ্গিত থাকে, সেখানে শুধু চরিত্র নয়; স্থানেরও সমান গুরুত্ব আছে। তাছাড়া সময়ের সঙ্গে পরিসর তো অঙ্গাঙ্গী জড়িত। 'নৌকাডুবি'তে সেদিক দিয়ে কলকাতা, গাজীপুর, রংপুর, জব্বলপুর, এলাহাবাদ এবং কাশীর কথা আসে। বিশেষত কাশী শহরটি উপন্যাস-বয়ানের ক্ষেত্রে তো বটেই, আবার সময় প্রকাশক পরিসরও হয়। কিন্তু এছাড়াও বৃহত্তর সময়কে উপস্থাপন করতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। 'চোখের বালি'তে কলকাতা সময় বন্ধন এবং সময়-মুক্তি— উভয় ধারার পরিসর। কাশী যেখানে বর্তমান নয়, বিনির্মানের পথ। কেবল বিনোদিনীর একক পথটি ধরে কাশী-লোকের অদৃশ্য উপস্থাপনা। 'নৌকাডুবি'তে কাশী কেবল প্রত্যক্ষ নয়, সমস্ত বিচ্ছিন্নতার সংযোগবিন্দু। আমাদের প্রশ্ন জাগে, 'চোখের বালি'র পর 'নৌকাডুবি'তে 'কাশী' ভাবনার পেছনে, তাকে বড় করে তোলার ক্ষেত্রে কোনো ব্যঞ্জনা কি আছে।

আমাদের প্রচলিত ধারণায় কাশী শহরের প্রসঙ্গ লৌকিক জগতকে ছেড়ে পারলৌকিক জগতের মসৃণ পথ সৃষ্টির একটি প্রচেষ্টা। মৃত্যুর সঙ্গেই যার গভীর যোগ। সেখানে মৃত্যুর পর মোক্ষপ্রাপ্তির সংস্কার কাজ করে। মানুষকে আর পুনর্জন্ম নিয়ে সুখ-দুঃখের ভাগীদার হতে হয় না। বিশেষ সম্প্রদায়ের পৌরাণিক এবং প্রচলিত বিশ্বাসের সূত্রেই এই কাশীতে এসে মৃত্যু এক পরম নিরাপত্তার অনুভব। কাশী তাই পূণ্যভূমিরূপে যুগ যুগ ধরে মানুষের সংস্কারে পরম মৃত্যুর বিশ্বাসকে নিয়ে আসে। যে বিশ্বাসে মৃত্যুর সৌন্দর্য জীবনের আলোকে নয়, জীবন থেকে মুক্ত হবার অভিপ্রায়ে ধাবিত। জীবন এখানে খাঁচা মাত্র। তার জীর্ণতা কাশীর গঙ্গার পবিত্র জলে, আর চিতাগ্নির লেলিহান শিখায় ধুয়ে যায়। কাশী তাই বৃদ্ধ, অবহেলিত, জীবন সম্বন্ধে বিতৃষ্ণ মানুষেরই পূণ্যভূমি হয়ে ওঠে। বাংলা উপন্যাসে তাই এ দৃষ্টান্ত প্রচুর, যেখানে সমস্ত কর্তব্যকে দূরে ঠেলে মা ছেলেকে জানান, তাঁকে কাশী পাঠিয়ে দিতে। এই কাশীযাত্রা কখনো আধ্যাত্মিক, কখনো বিতাড়িত জীবনের অভিমানপ্রসূত। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই সংসার, জীবন ও মানবলোকর বিযুক্তিই এর মূল লক্ষ্য। 'নৌকাডুবি'তে কিন্তু এই বিযুক্তির ক্ষেত্রে যুক্ত হবার উল্টোপথই অনুসৃত হয়।

তবে কি প্রচলিত কাশীভাবনার সংস্কারকে আঘাত করেন রবীন্দ্রনাথ। আমরা বলবো, তাঁকে তা করতে হয়। সময়কে খুঁজে পেতে তার যুগ সঞ্চিত বিশ্বাসের সংস্কারকে ভেঙে আধুনিক উপস্থাপনার খাতিরেই। কাশীর সঙ্গে তাই যেখানে মৃত্যুর যোগ, রবীন্দ্রনাথ দেখান তাতে সময়ের স্থবিরায়ণই মুখ্য। যিনি অনন্ত সময় প্রবাহের সঙ্গে মিলিত হতে চান, তাঁকে তো সেইসঙ্গে অনন্ত পরিসরেও যুক্ত হতে হবে।

অতএব কাশীকে তিনি আর বাইরে রাখতে পারেন না। জীবনের সংযোগে কমলা আর নলিনাক্ষের নবরাগ রঞ্জিত মূল পর্বটির সূত্রপাত হয় এই মৃত্যুর দেশেই। মৃত্যুর সঙ্গে তার যোগ রইলো সাময়িক বিচ্ছিন্ন বর্তমানকে বিদায় দেবার মধ্যে। আর তারই পরিপূরক হয়ে জীবন হল সেই একটু বিচ্ছিন্নতাকে কাটিয়ে তোলার সামর্থ্যে।

জনৈক একজন সমালোচক স্বীকার করেন —

"নৌকাডুবি উপন্যাসের কাহিনী বিন্যাসে বিচ্ছিন্ন করা যায় এমন কোন উপাখ্যান সংযোজন করা হয়নি। উপন্যাসটি সেজন্য দৃঢ়সংবদ্ধ। সব কটি চরিত্রই কাহিনীটিকে অগ্রসর হতে সাহায্য করে।"[৫১]

অর্থাৎ মূল প্রবাহ ধারার সঙ্গে সহযোগী প্রবাহধারার সংযোগ কোথাও ঢিলে হয় না। তার যে সংশয় স্বাভাবিকভাবে এতকাল দেখা যায়, তার মূলে থাকে এক রৈখিক স্বরের পাশাপাশি ভিন্ন রৈখিক স্বরের অবস্থান। ভিন্ন ভিন্ন সংস্কারকে ভাঙার কাজে যেখানে সময় ধারার পথকে রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেন। অথচ সমস্ত সংস্কার ভঙ্গের মাঝখানটিতে একটি বড় সংস্কারকে মধ্যমণি করে তোলেন। কমলার স্বামী সংস্কারই তাই বেশি করে আমাদের চোখে রূঢ়ভাবে দেখা দেয়। এর নেপথ্যে হেমনলিনী, ক্ষেমঙ্করী, নলিনাক্ষের সংস্কার ভাঙার প্রচ্ছন্ন উচ্চারণগুলো নজরেই আসে না।

হয়তো লেখকের উদ্দেশ্য— নিঃশব্দে পদসঞ্চারি চতুর্থ কোটির এই অস্তিত্বকে আমরা আজ নয়, কিন্তু একদিন চিনে নেব। নানান ছদ্মবেশে জীবনের মধ্য দিয়ে যা ক্রিয়াশীল, হয়তো তাকে যেভাবে তিনি আবিষ্কার করেন, আমাদেরকেও তার জন্য সাময়িকতার বাধাকে পেরিয়ে আবিষ্কারের শক্তি যোগান। রামায়ণে অপুত্রক রাজা দশরথকে পুত্রশোকের ব্যথা অনুভব করতে অন্ধমুনির আশীর্বাদ তুল্য অভিশাপ বহন করতে হয়। রবীন্দ্রনাথও রঘুপতির মধ্যে দেখান ব্যাপক ক্ষমতা লিপ্সার আড়ালে তার পুত্রপ্রীতিকে; 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে বিমলা সন্দীপের মধ্যে জ্বলে উঠবার স্বাদেশিকতায় মত্ত হয়ে নিখিলেশকে চেনে। লাবণ্য খুঁজে পায় অমিত রায়ের মাঝখানটিতে নেপথ্য হয়ে থাকা তার সুপ্ত প্রেম। অতএব 'নৌকাডুবি'তে রমেশ-কমলা পর্ব তাদের ব্যর্থ ও দুর্বলভাবে গড়ে তোলা চিত্র আমাদের ভুল পথের সন্ধান দেয় সত্য, কিন্তু ক্রমশ সেই ভুল পথই সময়ের পথ ধরে বারবার বলতে থাকে — ভুল পথেই আমরা হাঁটছি। সাময়িককে চিনে নেবার জন্যই এই সাময়িক দৌরাত্ম্য।

আমরা জানি, আমাদের যে নিকট বর্তমান, তা অনেকটা সীমার দ্বারা চিহ্নিত। অথচ এই বর্তমানটি পেতে তার রূপান্তরের পেছনে যে ইতিহাস, তা কোনো সীমানার দ্বারা বন্দি নয়। সেই ইতিহাস অসংখ্য মানুষের বিচিত্র উচ্চারণের সামগ্রিক

ফল। ইউরোপ ও বিশেষভাবে জার্মানীতে আধিপত্য স্পৃহা যে নূতন ব্যাখ্যান বের করে, তাতে আধিপত্য শক্তির প্রতিষ্ঠার মূল কারণ আবিষ্কার করতে গিয়ে কিছু পন্ডিত 'race superiority' মতবাদ খাড়া করেন।[৫২] ফলে মানুষে মানুষে ভেদ তখন একটি স্বতঃসিদ্ধ ঘটনারূপেই স্বীকৃত হয়। তাতে যে সম্মিলিত ধারার অবস্থান দেখানো হয়, একাধিপত্যের আবেদনে বিচিত্রকে বিলোপ করেই এগোয়। বলাবাহুল্য এই কৃত্রিম একত্রীকরণ সময়ের প্রগতিশীল ধর্মকেই করে আড়ালে আড়লে ব্যাহত। তাই সর্বাঙ্গীন সম্মিলনের পেছনে যে চিরকালীন সমকাল বিরাজিত বলে বিশ্বাস করি তা ব্যক্তির পেছনে পরিবার, পরিবারের পেছনে সমাজ, সমাজের পেছনে সভ্যতা — এই বিচিত্র সৃষ্টি তত্ত্বে, বহু পরিসর ও সময়ের সংযুক্তিতেই স্বীকৃতি মেলে।আর যথার্থ উপন্যাস তাকে একটি 'distinguishable whole'[৫৩] রূপেই দেখতে চায়।

একটি উপন্যাসে বর্ণিত কোনো রাজ্য-দেশ-মহাদেশ মানুষকে বহন করে না বলেই তা প্রধানত উপন্যাস-প্রাণ নয়, উপকরণ রূপে থাকে।আবার সভ্যতাও অসংখ্য সভ্যতার কাছে ঋণ গ্রহণ করে চলে বলেই অগ্রসরমান হয়। অতএব বিশ্ব ইতিহাসে ইজিপ্ট , ব্যবিলন, সিরিয়া, ইরান, ইজরায়েল, পশ্চিম এশিয়া এবং দক্ষিণ এশিয়ার মধ্য দিয়ে মানুষের বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক পরিসরই তৈরি হয়। উপন্যাসের জগত তাই যখন অনিবার্যভাবে কোনো একটি খণ্ডিত পরিসরে তার জড়িয়ে থাকা অতিক্ষুদ্র সময়টিকে অবলম্বন করে ছবি আঁকতে চায়, তখন সেই আংশিক ছবিতেই পূর্ণ একটি রূপ বাহিত হয়। ইতিহাস তাই কেবল বর্ণনা দেয়, তার সম্পূর্ণতাকে দেখাতে পারে না। অতএব বিভাজিত সম্পূর্ণতার মধ্যেই থেকে যায় অসংখ্য প্রতিমার সমাহার-সমৃদ্ধি এবং বিপুল সমন্বয়ের মধ্যে মুখশ্রী আবিষ্কার।

যখন বলা হয় —

"Human history is not a series of secular happenings without any shape or pattern; it is a meaningful process, a significant development."[৫৪] তখন তার রূপায়ণের দায়িত্ব থাকে উপন্যাসে। কোনো একটি সমকালে সীমানার আবেষ্টনে যে ভ্রান্তির জন্ম হয়, সেখানে মুখে বলা হয়তো সহজ — বিশ্ব ইতিহাসকে কোনো একজন মানুষ বা তার বর্গ ধারণ করে চলছে। কিন্তু ক্রমাগত সময়ের প্রলেপ এই বিশ্বাসের ভিত্তিকে নাড়িয়ে ঘোষণা করে— সীমানার দ্বারা চিহ্নিত হয়ে সীমানা হরণের ব্যর্থ অভিনয় চলতে পারে না। তাকে সীমানার মধ্যে চিহ্নিত হতে হবে সত্য, কিন্তু সেই চিহ্নকে সে আরো বড় সভ্যতার অংশরূপে দেখবে। হয়তো তখনই উপন্যাসের কোনো যুগপ্রতিনিধির পক্ষে একথা বলা শোভা পাবে —

'We are in a new age, an age of the emerging world society - one society, that is what is beckoning to us on the horizon.'[৫৫]

আমরা বর্তমান কালেও দেখি প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে, বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের সুফল হিসেবে দূরের ব্যবধানকে উৎপাটন করে মানুষের সঙ্গে মানষের সংযুক্তি ঘটে। মানুষ নেমে আসে একটি পরিসরে, একটি সময়ের ধারায়। তাই বিশ্বের যে কোনো অংশই আজ সভ্য মানুষের চোখে কল্পনার দৃষ্টিতে নয়, বাস্তব অর্থেই ফুটে উঠতে পারে। কিন্তু মানুষ কতটুকু জানে, কতটুকু পায় তার আত্মপরিচয়! তাই সভ্যতার সামাজিক বৃত্তান্তে দেখা যায়, মানুষ তার পরিচয়কে শুধু অন্যদের থেকে যে ভিন্ন করে দেখে, তাই নয় - বিশেষ বর্গের সভ্যদের থেকেও আলাদা রাখে। ভারতবর্ষে তাই আমার পরিচয় একজন পুরুষ কিংবা নারী বা ভারতীয় হিসেবে নয়, একজন 'বাঙালি ভারতীয়' হিসেবেও। সেইসঙ্গে যুক্ত আমার ধর্মের প্রসঙ্গটিও[৫৬]। অর্থাৎ হিন্দু, না মুসলমান, না খৃষ্টান ইত্যাদি। তার উপরও আছে 'সংখ্যালঘু', 'দলিত', — এরকম শব্দ দ্বারা বিভাজন। এই বিভাজন চলে বলেই, পরস্পরের মধ্যে সীমানা টানা হয়, বৃদ্ধি পায় সন্দেহ-সংশয়-সংস্কার। যারা দলিত কিংবা সংখ্যালঘু বলে চিহ্নিত, তারা সেই সীমানা চিহ্নায়নের সুযোগটুকু গ্রহণ করে সেই বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। সম্মিলন প্রয়াস এখানে একেবারেই নেই বলেই নিজেকে এককরূপে প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই লাভের অংশটুকু নিয়ে তাকে ফেলে দেবার প্রচেষ্টা চলে।

বর্তমান বিশ্বায়ন প্রতিষ্ঠার অন্তর্বিভাগে এই যে পরস্পরের বৈষম্য, তার পরিচয় সেই সময়ের পিঞ্জরেই তো বাঁধা। কালে কালে উপন্যাস তার বিভেদকে নিয়ে ভবিষ্যৎ বাণী করে। শোষণের দ্বারা সামাজিক, আর্থিক স্তরে বঞ্চনার রাজনৈতিক খেলায় জনজাতিকে খণ্ড খণ্ড করে প্রান্তীয় অভিধায় ভূষিত করা হয়। নেতার জনসমর্থন আদায়ের সুবাদে তাদের কেউ কেউ হয়তো বিশেষ সুবিধাটুকু পেয়ে সমাজের মুখ্যস্তরে ওঠে আসে। কিন্তু এক পাশে সরিয়ে রাখা বিভেদের টুকরো করে দেখার স্মৃতিকে তারা ভুলবে কি করে!

এই মানুষে-মানুষে, দেশে-দেশে বিভেদ, টুকরো করে তাদের বঞ্চনা, কিংবা সুবিধাটুকু প্রদান করলেও কখনো দুই বর্গের ব্যবধান কমে যেতে পারে না। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রজাতন্ত্রে, নামিবিয়া, জিম্বাবোয়ে সাদাকালো মানুষের দ্বন্দ্ব ঘোচে না। যুগোস্লাভিয়ার সার্ব, ক্রোয়াট, বস্‌নীয় মুসলমানদের বিভেদের সমস্যা চলতে থাকে। মানুষ তাই বহু বিভাজিত - একথা বর্তমান ইতিহাসই বলে। কিন্তু তাকে আবিষ্কার করে উপন্যাস। তার সঙ্গে মিলে মিশে গিয়ে একটা আলাদা উচ্চতায় শুধু প্রশান্ত হাসি দিয়েই তাকে ব্যাখ্যা করে না, তাকে বহুস্বরিকরূপে দেখায়। মানবসভ্যতাকে

ধরে রাখার জন্য পথের নির্দেশ দেয়।

অতএব সময়ের কথা তো আর এই বর্তমান চিত্রপটেরই একমাত্র প্রতিবেদন নয়, তার ভবিষ্যৎ সংকল্প গ্রহণেরও বিচরণ ক্ষেত্র। তাব যা কিছু দ্বন্দ্ব, যা কিছু অব্যবস্থা— রূপায়ণ সহযোগে প্রস্তুত করে তোলা। মিলান কুণ্ডেরা ইউরোপের প্রথম মহৎ ঔপন্যাসিক চরিত্রকে একটি প্রশ্নের দ্বারা বিদ্ধ হতে দেখান। চরিত্রটির সেখানে দ্বিধা, সে বিবাহ করবে কিনা। ডাক্তার, জ্যোতিষী, অধ্যাপক, কবি ও দার্শনিকের পরামর্শ তাকে নিতে হয়। তাঁরা তাকে হিপোক্রেটস, অ্যারিস্টটল, হোমার, হ্যারাক্লিটাস ও প্ল্যাটো থেকে নানা উদ্ধৃতি শোনান। কিন্তু এত বড় বিশাল বিবেচনা, বিশ্লেষণ থেকে এ কথাটি বোঝা যায় না চরিত্রটির বিবাহ করা উচিত, কি উচিত নয়।[৫৭] উপন্যাস শুধু এই সংশয়ের দোলায় আমাদের বিচ্ছিন্ন সত্তাটিকে ঝুলিয়ে রাখে। আর তার প্রচ্ছন্ন বিভেদের বিন্দু থেকে এ কথাটিই প্রকাশিত হয়, যে সময়ের কথা আমরা জানতে চাই, বুঝতে চাই, পেতে চাই— পারিপার্শ্বিক আরেকটি সময়ের সংস্পর্শ তাকে কেবল আবিল করে তোলে। নির্দিষ্ট সত্য অনাবিষ্কৃত থেকে যায়।

রবীন্দ্রনাথ এই অভিজ্ঞতার ছবিটি কেবল সমাজ ইতিহাস থেকে পান না, উপন্যাসের বীক্ষণভূমি থেকেও জোগাড় করেন। সেজন্যই তাঁর সমকালটিতে এসে থেমে যাওয়ার উপায় থাকে না। ইতিহাস চলে, উপন্যাসের ইতিহাস তার আগেও আলো ফেলে ফেলে চলে। তবু 'নৌকাডুবি' পর্যন্ত এসে রবীন্দ্রনাথকে কিছুটা ভাবতে হয়। সময়ের এবং নানা সময়ের ছবি একের পর এক তো আঁকা হল, কিন্তু সেই সামাজিক বৃত্ত কতটুকুই বা প্রতিমার মুখশ্রীকে আবিষ্কার করে। পারিবারিক ইতিবৃত্তে তাই যে প্রচ্ছন্ন সমাজকে টেনে আনে 'চোখের বালি', যেখানে তার সামাজিক বৈষম্য এবং তার দ্বন্দ্ব ঘনীভূত হয় 'নৌকাডুবি'তে। কিন্তু বৃহত্তর সমাজ এবং সমাজকে ছাড়িয়ে সভ্যতা — সময়ের এত বিশাল স্বর কি উচ্চকিত। না হবারই কথা। 'গোরা'উপন্যাস সেই শূন্যস্থান পূরণেরই প্রতিকল্প।

'গোরা' উপন্যাসটির একটি ভিন্ন মাত্রা আছে। আমরা বলব এই মাত্রা 'গোরা'র পর আর কোনো উপন্যাসেই রবীন্দ্রনাথ আনেন না। বরং 'গোরা'র সময় বার্তাকে নানা আদলে ভেঙে, নানা শিল্প কৌশলে তাতে নবরাগ সঞ্চার করেন। কিন্তু 'গোরা'র এতবড় একটি প্রত্যক্ষ বিশ্ব গড়েন না। অতএব কোনো সমালোচক যখন গোরাকে মহাকাব্যিক উপন্যাস বলতে চান,[৫৮] তখন যুগপৎ তার বিস্তৃতি প্রকরণগত ও ভাবগত রূপেই দেখতে হয়। 'গোরা' তাই নানাভাবের সমারোহে নানা সময়ের দৃষ্টিতে পরীক্ষিত হয়ে সার্থকতা অর্জন করে। শুধু আংশিক দৃশ্যপট উন্মোচন করে পাঠকের বিচারশক্তির উপর রবীন্দ্রনাথ তাকে ছেড়ে দিতে পারেন না। তাতে হয়তো তার

কিছুটা শিল্পহানি হলেও হতে পারে। কিন্তু এই উপন্যাসটিকে কেন্দ্রে রেখেই সময় ভাবনা নানা শিল্পবিভাসে তৈরি হয়ে উঠতে পারে। রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস রচনায় যে বিচিত্র কৌশলের অবতারনা করেন, তার সমস্তই 'গোরা' উপন্যাসের সময়ের রঙে রাঙিয়েই সম্ভব হয়।

উল্লেখ্য যে, এতবড় একটি সামাজিক দৃষ্টিকোণ নিয়ে এই উপন্যাসটি রচিত, অথচ গোরার কর্মভূমিকে ধরে আখ্যান-বর্ণিতকাল অতি সামান্যই;মাত্র ছ'মাস।[৫৯] 'রাজর্ষি'র তুলনায় তো বটেই, এমনকি 'চোখের বালি' ও 'নৌকাডুবি'র তুলনাতেও কম। কিন্তু সে হল গোরাকে নিয়ে বড় বেশি 'বর্তমান'। এই বড় বেশি সম্পৃক্ত হয়ে পড়া 'বর্তমান' আমাদের প্রসারণশীল-অক্ষমতা। তার পেছনে যে বড় বৃত্ত ধাত্রী রূপ ধারণ করে আছে তাকে আমরা দেখি না, অথচ সেই দেখা না হলে আত্মপরিচয় কতটুকু আমরা লাভ করি? আমরা জানি, 'স্বাধীন' শব্দটিকে রবীন্দ্রনাথ অপরতার সন্নিধানে সত্তার সময়গত উপলব্ধি হিসেবেই ভাবতে চান। আত্মপরিচয় সেক্ষেত্রে জরুরী কথা। তাই স্বাধীনতা শব্দটি ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ বিতাড়ন প্রক্রিয়াতেই একমাত্র আসতে পারে না। স্বাধীনতার সর্বপ্রথম মৌলিক সম্বন্ধটিই জড়িত আত্মগতস্তরে। ব্যক্তির মানসিক বিস্তৃতি না ঘটলে তাই সে বুঝতে পারে না, সে কোন সময় পরিসরে দাঁড়িয়ে। আর সেই সময় পরিসর আরো কোন বৃহত্তম সময় পরিসর থেকে যুক্ত অথবা বিযুক্ত। অতএব নিজেকে স্বতন্ত্র করে তুলতে যে স্বাধীনবোধ কাজ করে, সেখানে আত্মদর্শনে স্বদেশ এবং বিদেশের দ্বৈত সত্তা সম্পর্কে সচেতন হতে হয়। স্বাধীনতা শব্দটি তাই সত্তা-অপরতার সম্পর্কে বিশেষ কালবিন্দু থেকেই স্থিরীকৃত হতে থাকে।

স্বাধীনতা শব্দটি তাই মুক্তির প্রেক্ষাপটকে সময়ের সূত্রে পরিবর্তন করতে চায়। বিশেষ বর্গ থেকে বিচার করে নানা-বিচারের আলোকে স্বাধীন শব্দটি ওঠে আসে। অতএব ভারতবর্ষের স্বাধীনতার লক্ষ্যে ব্রিটিশ বিরোধী যে আন্দোলন একদিন জোরদার হয়ে ওঠে, রাজা রামমোহনের আমলে ব্রিটিশতন্ত্র শাসনই হয় স্বাধীনতার ক্ষেত্র। কারণ, দীর্ঘদিনের মধ্যযুগীয় অন্ধকারকে দূর করে প্রকৃতই ব্রিটিশ শক্তি আমাদের দেশে পাশ্চাত্যের আলো নিয়ে আসে। আবার ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম ঘনীভূত হয়, সেখানেও স্বাধীনতার লক্ষ্য বর্গ অনুসারে বিভিন্ন। তাই অনেকের কাছে স্বাধীনতার মানে হয় শুধু ব্রিটিশ শাসনের অন্ত নয়, প্রাক-মুঘল-পাঠান যুগের হিন্দু গৌরবের পুনরুদ্ধার।[৬০] আমাদের আজকের পৃথিবীও স্বাধীনতার প্রশ্নে নূতন করে আত্মজিজ্ঞাসার মুখোমুখি। অথচ আজ যে বিভেদের ভারতবর্ষ চারদিকে সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করে, স্বাধীনতার জন্য তার বিচিত্র লড়াই তো বিচিত্র প্রবাহে এগিয়ে চলে।

তবু একথা বলতেই হয়, নানা বর্গ থেকে স্বাধীনতা প্রশ্নটি নানা স্বরিক হয়ে উঠলেও, কালে কালেও যে তা স্বরবৈচিত্র্য আনতে থাকে, অস্বীকার করা যায় না। মধ্যযুগে তাই যে স্বাধীনতা ব্যক্তির নির্ভীক চিত্তে কথা বলার আকাঙ্ক্ষা, আজ গণতন্ত্রের কাছে চিহ্নিত হয়ে ওঠে মানুষের অর্থনৈতির মুক্তির প্রশ্নে,— ভ্রষ্টাচার থেকে পরিত্রাণের সন্ধানে। আমরা একটি যুগের স্বাধীনতাকে পেয়ে যে খুশি হয়ে উঠি, তার দাম নিঃশেষে চুকিয়ে দিতে হয় সময়ের প্রবাহ ধারায়। বিশ্বায়নের ফলে মানবিক স্বাধীনতা আমাদের আজকের পৃথিবীতে প্রবল, কিন্তু তার জন্য উল্লসিত হতে পারি না। তার কারণ, যে স্বাধীনতাকে আমরা পেতে চাই, তা আজও ভবিষ্যতের অপেক্ষায়। কেননা, আড়ালে আড়ালে আমরা আজও পরাধীন।

গোরার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ এখানে সময়ের দ্বিধাকে দেখাতে চান। ফলে বারেবারেই তার দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টাতে থাকে। গোরা তাই যে অর্থে প্রবল হিন্দুয়ানীর দ্বারা স্বদেশের সন্ধান করে, নিকটের বর্তমান বারবারই তাকে বিশেষ একটি স্বাধীনতার প্রশ্নে দাঁড় করিয়ে দেয়। অথচ গোরার ছ'মাসের কর্মজীবনটার পেছনে যে সিপাহী বিদ্রোহের কাল নির্মমভাবে অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে থাকে, হতভাগ্য গোরা তাকে অস্বীকার করবে কি দিয়ে? সময়ের এই প্রসারণশীলতা ধরেই গোরার উপলব্ধিকে প্রাঞ্জলতা প্রদানে মুক্ত করা হয়। গোরা যে খণ্ডিত হিন্দুর দেশ হিসেবে ভারতবর্ষকে লক্ষ্যস্থল ভাবে, ছ'মাস কাল নিরন্তর তর্কবিতর্কে এই সত্যকেই তার অস্তিত্বের জোরে সে প্রমাণ করতে চায়। কিন্তু ছ'মাস কালটাকে নিতান্তই বৃহৎ মনে করে যে বোঝে— আরো বড় সময়ের কাছে তা কত ক্ষুদ্র! গোরার জন্মরহস্য তাই বর্তমান থেকে অতীতে টেনে নিয়ে গোরাকে মানুষ হিসেবে জিজ্ঞাসার পথ তৈরি করে নিতে হয়। স্বদেশের বোধকে স্বাধীনতার ক্ষেত্রে আত্মদর্শনে মানুষের দৃশ্যপট দেখার কথাই ঘোষিত হয়।

গোরা 'চোখের বালি','নৌকাডুবি'র জগৎ থেকে পেরিয়ে আসা। মহেন্দ্রের সমকালীনতার নির্বোধ অবস্থান, আর রমেশের হারিয়ে যাওয়া বিড়ম্বিত জীবনের অভিজ্ঞতা সে শিরে ধারণ করেই এগোয়। তাই তার স্বদেশপ্রীতি কোনো দেশমাতৃকার সন্নিধান নয়, কোনো নিষ্প্রাণ ভৌগোলিক পরিসরও নয়। সে যে ভারতবর্ষ নামে কোনো একটি দেশকে ধরে, যে হিন্দু সম্প্রদায়ের নামে কোনো একটি ধর্মকে অবলম্বন করে, তা মানুষকে আত্মজিজ্ঞাসার পথে টেনে নিয়ে যাবার প্রারম্ভিক বৃত্ত। মানুষের মর্যাদার লক্ষ্যেই তার এই জোরালো পরিসর বৃত্তি। তার সীমানা বন্ধন। কিন্তু সমকালীনতার আধিপত্যকে ছাড়িয়ে তার পক্ষে কিছু করে ওঠা তাৎক্ষনিকভাবে সম্ভবপর নয় বলেই, সে যা খোঁজে, উক্ত ছ'মাসের কর্মজীবনে নানান প্রতীকেও

তাকে পায় না। অতএব যুগের সংকট তার ব্যক্তিরাজ্যেও কালো ছায়া ফেলে তাকে সংশয়ের নিগড়ে বেঁধে রাখে। কেননা গোরা তো আর আটপৌরে বাঙালি নয়, তাই তার সংশয় আরো বড় বৃহত্তর মানবিকতার প্রশ্নে। প্রতিমা তাই সে নির্মাণ করে, কিন্তু তার মুখশ্রীকে আবিষ্কার করা জরুরী হয়ে পড়ে আরো। অথচ শক্তির আধারটিকে নিয়ে তার মনের সংশয়কে কিভাবে সাধারণের মত প্রকাশ করবে সে। গোরা তাই স্বদেশ উদ্ধারে হিন্দুয়ানার প্রবল আধিপত্য জোরের সঙ্গেই প্রচার করতে ব্যস্ত। কিন্তু এই জোরের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে তার গুপ্ত দুর্বলতা, সময়ের ক্ষণিক সংশয়। তা না হলে তার সমকালীন বিপ্লবীদের মত দেশ উদ্ধারের বাসনায় জাগ্রত হত শুধু দেশমাতৃকার বন্দনা এবং হিন্দুত্বের আধিপত্যের শাস্ত্রাচার। সেক্ষেত্রে অন্ত্যজ শ্রেণীর সন্ধান সে করতো না।

অতএব গোরার ক্ষেত্রে যে সমস্যা দেখা দেয়, তা সমকালীনভাবে দৌরাত্ম্য থেকে নয়, সমকালটিকে আরো বড়কালটির মাঝখানে দেখার লক্ষ্যে। সেই স্বতন্ত্রভাবে সমকাল এবং বৃহত্তর কালটিকে দেখতে না পারলে কখনো সম্পর্ক-সন্ধান সম্ভব নয়। গোরার ক্ষেত্রে এই সম্পর্কই সম্পন্ন হতে পারছিল না। তাই সমকালের মাঝখানে তার ক্ষেত্রে এ কথাটি পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন— নির্দিষ্ট ছ'মাস কালের পরিচয় তার একমাত্র নয়, সিপাহী বিদ্রোহের কালও তার সঙ্গে জড়িত। যে কাল খণ্ডিতভাবে ঘোষণা করে— গোরা এক আইরিশ সন্তান। ভারতবর্ষের প্রচলিত উত্তরাধিকারের শর্তে যেখানে কোনোভাবেই তার অধিকার নেই। অতএব গোরার কর্মক্ষেত্রের কাল যেমন খণ্ডিত, গোরার আইরিশ সন্তান হিসেবে পরিচিতি-সূত্রে সিপাহী বিদ্রোহের কালও খণ্ডিত। এই খণ্ডিত দুই সত্তা সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে আরো বিভ্রান্তিতে টেনে নিয়ে যাবার উৎস। কিন্তু গোরার এই খণ্ডিত দৃষ্টিকেই বোঝার প্রয়োজন। তাই যে মুহূর্তে আইরিশ সন্তান হিসেবে সে নিজেকে চেনে, সে মুহূর্তে তার কাছে স্পষ্ট হয় হিন্দুত্বের আচারের দাসত্ব, স্বদেশপ্রীতি বোধের সীমানা-নির্দিষ্ট স্বাধীনতা-প্রয়াস। ভারতবর্ষকে সে আবিষ্কার করে বহু সভ্যতা, জনতার ভীড়ে। যেখানে অজস্র অনৈক্য মিলে ঐক্যের সন্ধান করা হয়। গোরা এভাবেই পৌঁছায় অসংখ্য খণ্ডকালের বিচ্ছিন্নতা থেকে প্রবহমান কালের ঐক্যে।

সিপাহী বিদ্রোহ ঘটনাটিও আজকের যুগে বিতর্কের উর্ধ্বে নয়[৬১]। অতএব কোনো কোনো দৃষ্টিতে তা স্বাধীনতা আন্দোলন হিসেবে নমস্য, আবার অরাজকতা এবং লুণ্ঠন প্রয়াসী প্রচেষ্টা হিসেবে বিদ্রোহের অপ ইতিহাসরূপেও বিবেচ্য। স্বাধীনতা হোক, লুণ্ঠন হোক— ইতিহাসের এই প্রতিক্রিয়াশীল বিতর্ক থেকেই গোরা ওঠে আসে। আর সেই প্রতিক্রিয়ার ফসল হিসেবে নিজের আসল পিতামাতাকে হারিয়ে

সে আনন্দময়ীর অবলম্বন হয়। যে আনন্দময়ী গোরাকে অন্যজাতির সন্তান হিসেবে জেনেও কোলে টেনে নিয়ে সমস্ত বাহ্যিক আচারকে ভাসিয়ে দেন। গোরা হয়ে ওঠে মায়ের সন্তান, মানুষ যার গোত্র পরিচয়। অতএব সমস্ত বিতর্কের অবসান ঘটে। এই উদ্‌ভ্রান্ত বিতর্ক যতই সুচিন্তিত হোক, সুনিয়ন্ত্রিত হোক, কোনো স্বাভাবিক স্থিরতা তাকে দিতে পারে না। অথচ প্রবহমান কাল অসংখ্য ঢেউ-উপঢেউকে ধারণ করে সমুদ্রে মিশে যাবার কালে শান্ত হয়ে আসে। এই শান্ত দ্বন্দ্বহীন নয়, দ্বন্দ্বকে বহন করেই মৌনমুখর।

'গোরা' উপন্যাসে তাই গোরার কর্মভূমির বিবৃতকাল তর্কবিতর্কে ভরা। অসংখ্য তর্ক এমনভাবে সারা উপন্যাসে ছড়িয়ে, যা তর্কবিতর্কের প্রবন্ধ সংকলনও হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'আত্মশক্তি', 'ভারতবর্ষ', রাজাপ্রজা', 'সমূহ', 'স্বদেশ', 'সমাজ' ইত্যাদি প্রবন্ধে 'গোরা' উপন্যাসের তর্কবিতর্কের কণ্ঠস্বর শুনিয়েছেন। কিন্তু মনে রাখতে হয় 'গোরা' উল্লেখিত প্রবন্ধের বিকল্প নয়। প্রবন্ধ যতটুকু বলতে পারে তা কেবল সমকালের ইতিহাস সন্দর্শন। 'গোরা'র কাছে এই ইতিহাস কেবল পরিকাঠামোগত উপাদানমাত্র। তাই প্রবন্ধে যে তর্কবির্তকের গতি-প্রকৃতিগুলো আমরা অনুসন্ধান করি, 'গোরা' উপন্যাসে সেক্ষেত্রে মনে জিজ্ঞাসা জাগায়। বিতর্কগুলো কতটুকু যৌক্তিক-অযৌক্তিক তা নিয়ে নয়; বরং তার উপস্থাপনাটিকে ঘিরেই। গোরা কি তর্ক করছে, — তার থেকেও বড়, গোরা কেন তর্ক করছে।

এবার এই আলোচনায় প্রবেশের আগে তর্কবিতর্কের সমকালটির কিছুটা বাহ্যিক পরিচয় নেওয়া যেতে পারে। বাংলাদেশের ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে তখন স্বদেশি আন্দোলন দেখা দিয়েছে, এবং তার বাঁধ ভাঙা স্রোতধারা সারা ভারতে ছড়িয়ে একটি আর্ত পরিণামকে তৈরি করে তুলছে। সূচনালগ্নের এই স্বদেশি আন্দোলন হিন্দু-মুসলমানের সমবেত প্রয়াস। কিন্তু কিছুদিন পরেই ধর্মীয় স্তরে সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতা প্রকট হয়ে ওঠে। যে বিপ্লব সমবেত প্রচেষ্টার পরিচয় সূত্র, তার ইতিহাস হয় খণ্ডিত। হিন্দু-মুসলমানের যৌথ 'মিশন' টুকরো হয়ে ১৯০৬ সালের ডিসেম্বরে ঢাকা শহরে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে মুসলীম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। মানুষ কোন্ স্বাধীনতা পেতে চায়, এই দৃষ্টি সাম্প্রদায়িক হানাহানিতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। একথা ঐতিহাসিক সত্য যে, বাঙালির নবজাগরণ স্পৃহার অন্তরালে সে যুগে হিন্দু মৌলবাদ জাগ্রত হয়ে ওঠে। বাঙালির জাতীয়তা তখন হিন্দুর জাতীয়তা। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন যে জাতীয়মেলার আয়োজন করেন, তাও সাম্প্রদায়িক নামকরণে 'হিন্দুমেলা' রূপে সীমিত ভূমি অধিগ্রহণ করে। এমন কি বঙ্কিমের 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত যে স্বদেশপ্রীতিকে একসূত্রে জাগ্রত করার শক্তি জোগায়,

তাও হিন্দু পৌত্তলিক বিশ্বাসের আধারে দেশমাতৃকার আরাধনা হয়ে দেখা দেয়। মুসলমান সম্প্রদায় এই আগ্রাসী হিন্দু প্রতিপত্তি সরলভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। জাতীয় কংগ্রেস তাই তাদের কাছে হয়ে ওঠে হিন্দু সম্প্রদায়ের কুটির। অতএব বিকল্প পথ সন্ধানে তারা নিজেদের আরেকটি বৃত্ত গড়তে উদ্যোগী হয়।

রবীন্দ্রনাথ এই বৃত্ত গঠনের প্রক্রিয়াকে দেখেই আলোড়িত হন। অনুভব করেন, মানুষ কত আত্মনাশে তৎপর হতে পারে। হয়তো এই বিন্দু থেকেই তিনি অতীতের গর্ভে খনন চালিয়ে অনুভব করেন রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের প্রতিপত্তি। রবীন্দ্রনাথ যখন আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকরূপে নিযুক্ত হন, তখন হিন্দুত্বের ধ্বজাবাহী 'নবজীবন' এবং 'প্রচার'পত্রিকার উদ্ভব ঘটে। আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রবল শক্তিতে তখন হিন্দু-ব্রাহ্মের দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ সমকালটিকে প্রলাপের গারদে রূপান্তরিত করে। যেখানে তরুণ রবীন্দ্রনাথ তখন বিচলিত না হয়ে পারেননি। যে বর্গ নির্ধারণ করে মানুষ আজ সর্বনাশের পথ সুগম করতে ব্যস্ত, সেই বর্গ গঠনই রবীন্দ্রনাথ দেখেন। স্বদেশি আন্দোলনে এই বর্গবিভেদকে অবহেলা করার উপায় ছিল না। সবাই স্বাধীনতার কথা বলেন, ব্রিটিশদের ভারত থেকে হঠাবার কথা বলেন। কিন্তু নিজেদের মধ্যে বর্গ রচনা করে শাসক এবং শোষকের পরিচয় নিয়ে যে স্বাধীনতা নিত্য নিষ্প্রভ হয়ে ওঠে, তাকে দেখেন না।

'গোরা'র বয়ান-পরিধি এই ভঙ্গুর স্বদেশপ্রীতিবোধকে ঘিরেই রচিত। যে প্রীতিবোধ শুধু হিন্দু-মুসলমান, হিন্দু-ব্রাহ্ম বিভেদের উপর মিথ্যার আবরণ রচনা করে না। তার থেকেও বড় কথা, আচার বিচারের দাসত্ব মেনে উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গ চেতনাকেও বিকশিত করে। স্বদেশ উদ্ধার মানে অন্ধ পরিচয়হীন সমকালীনতার ঊর্ধ্বে যে বৃহত্তর দেশ সন্ধানের স্বাধীনতা-প্রয়াস— এই মৌলিক দিকটা অলক্ষ্যেই থেকে যায়।

অতএব যে সংকোচহীন ঔদ্ধত্যের প্রলয়নাচন, তার আগে-পরের দৃশ্যপট থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মনলোকের দ্বন্দ্বময় চিত্রটি দিয়ে গোরা চরিত্রের পরিকল্পনা করেন। হতে পারে, এই চরিত্র সৃষ্টির নির্মাণের স্তরে বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্ব চিহ্নিত আসন নির্দিষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু সেটা কোনো প্রধান কথা নয়। গোরাকে নিয়ে বর্তমানটি তাঁর চিন্তার মনিমুকুরে স্বাধীনতার মুখকে ধরে যথার্থ স্বদেশ আবিষ্কারের প্রয়াস উপন্যাসের ক্ষেত্রেই নিয়োজিত হয়। গোরাচরিত্র তাই অতিরিক্ত সমকালের ধারা বহন করে হিন্দুত্বের যুগপ্রতিনিধি হয়ে ওঠে। আবার সেই স্বদেশ আবিষ্কারের মৌলিক দিকটি ধরে উপন্যাস-প্রবাহ হয়েও ওঠে। গোরা তাই একটি চরিত্রও বটে, আবার উপন্যাস-বিবৃতিও বটে। অতএব একইসঙ্গে সে সমকাল এবং সমকাল উত্তীর্ণ।

রবীন্দ্রনাথ তাই ইতিহাস রচনা করেন, আবার তার পাশে উপন্যাসের আর্তিকেও সংযুক্ত করেন। 'গোরা' উপন্যাস তাই সমকালটিকে জানে, বৃহৎ কালটিকেও জানে - আর সব মিলিয়ে জানে সমগ্রকে। সভ্যতা-সমাজ-ব্যক্তি এসে ধরা দেয় ইতিহাসের চরিত্রে, উপন্যাসের অন্তর্লোকে।

ফলে 'গোরা' উপন্যাসে খণ্ড ধর্মীয় চেতনার সামাজিক ইতিহাসের তর্কবিতর্কের স্তরগুলো কিভাবে ওঠে এলো তার বিচার এসে পড়ে। আমরা দেখি, গোরা সমকালীন, ঐতিহাসিক সময়ের স্পর্শকে চেতনালোকে ধারণ করে প্রবল ভাবে হিন্দু হয়ে ওঠে। কিন্তু উপন্যাসের সৃষ্টিশীল সময় প্রবাহ ধারায় সেই হিন্দুবৃত্তে সে সন্তুষ্ট হতে পারে না। ইতিপূর্বে দেখা যায় নব্যচেতনার দ্বারা যে ব্রাহ্মসমাজ কেশব চন্দ্রকে মধ্যমণি করে এগিয়ে আসে, সেখানে কেশবের অপূর্ব বাগ্মীতা, আধুনিক যুক্তি প্রদর্শন গোরাকে মুগ্ধ করে। আর নিশ্চয়ই এই মুগ্ধতার পেছনে আচারের দাসত্বকে ছেড়ে মানববোধই হয়ে ওঠে বড়। কিন্তু আমরা সামাজিক ইতিহাস পড়ে দেখি কেশব চন্দ্র অনেকক্ষেত্রে উদারশীলতা প্রদর্শন করেও আত্ম প্রতিপত্তি অধিকারের আদায়ে আরেকটি বৃত্ত তৈরী করে তোলেন। 'নববিধান' নাম দিয়ে তাতে নূতন বিধি, নূতন সাধন, নূতন লক্ষণ, নূতন প্রণালী সৃষ্টি করতে প্রবৃত্ত হন।[৬২] কিন্তু এই নূতনত্ব কোনো অনাগতকে খোঁজে না। বরং বর্তমানের মত্ থেকে নিজেকে বিশেষ করে তুলবার অভিপ্রায় কার্যকর হয়ে ওঠে। অতএব নূতনত্বের লক্ষ্য এখানে স্বতন্ত্র হওয়া — মানুষ লক্ষ্যস্থল নয়। তা না হলে আপন দলে শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনের জন্য যারা আপন দলের নয়, তাদের প্রতি কটুক্তি বর্ষিত হত না। অতএব এই চিত্রে মোহভঙ্গ অনেকের মত হয়তো অসচেতনভাবে গোরার মধ্যেও ঘটতে শুরু করে।

তাছাড়াও আচারের দাসত্বকে নিয়ে যে হিন্দুধর্ম তার চোখে তীব্র উৎকট হয়ে ওঠে, তাকে সে সজোরে প্রত্যাখ্যান করতে গিয়ে হরচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের অপূর্ব জ্ঞানের আলোকে আবার মুগ্ধ না হয়ে পারে না। আবার সে সময় হিন্দু শাস্ত্রকে কটাক্ষ করে ইংরেজ মিশনারীদের তর্কযুদ্ধও গোরাকে আরো উদ্দীপ্ত করে। অতএব দেখা যায়, গোরার ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তি আসলে খুব সুদৃঢ় নয়, বরং ব্যক্তিত্বের স্পর্শই তাকে বেশি প্রাণিত করে। তাই একদা কেশবচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব তাকে যেমন একটি ধর্মের পথে টানে, তেমনি এর যথার্থ সত্য আবিষ্কারে গোরাকে সরে আসতেও হয়। উল্টোদিকে বিদ্যাবাগীশের ব্যক্তিত্ব তাকে আরেক ধর্মমতে প্রাণিত করে ও মিশনারীদের উগ্র মৌলবাদ বিরোধী - গোত্রভুক্ত হয়ে গোরাকে উদ্দীপনা যোগায়।

গোরা নিজেও বুঝতে পারে না ধর্মের সনাতন বোধকে আয়ত্ত না করে সেও যে আচারের দাসত্বে আরেক মৌলবাদযুক্ত ধর্মযন্ত্রে রূপান্তরিত হচ্ছে। কিন্তু তার মনের প্রবল অনুসন্ধান বৃত্তি যে মাধ্যমকে আশ্রয় করে প্রকাশের পথ খোঁজে, তা আপাত হিন্দুত্বে অবরুদ্ধ হয় সত্য, কিন্তু দশম পরিচ্ছেদে বর্ণিত গ্রহণের স্নান উপলক্ষে স্টিমার যাত্রায় যাত্রীদের দুর্ভোগকে নিয়ে ইংরেজিয়ানা বাঙালিবাবুর তামাসা প্রদর্শন গোরাকে আঘাত করে। বলা যেতে পারে, গোরার মধ্যে এই সামান্য উপলক্ষ্যকে নিয়ে স্বদেশ সন্ধান মানব প্রীতির লক্ষ্যে যাত্রা করে।

গোরা বিরোধী সমস্ত পরিবেশের মাঝখানে চূড়ান্ত বিরোধী। আর মানুষ সন্ধানে যে পথকে সে খুঁজে পাচ্ছে না, তার দুর্বলতা ঢাকতে হিন্দুত্বের ফোঁটা তিলক আর টিকি হয় বর্ম এবং যুদ্ধাস্ত্র। আনন্দময়ী তার সেই অদৃশ্য দুর্বলতার অনুসন্ধানবৃত্ত। কিন্তু নির্দ্বন্দ্বরূপে সে বৃত্তকে গোরা তখনও ধারণ করতে পারে না। পারে না, সময়ের নির্দিষ্ট পরিধিটি অনুকূল নয় বলে। আনন্দময়ী তো সেক্ষেত্রে অনেক আগেই পারতেন তার জন্মরহস্যের আবরণ উন্মোচন করতে। কিন্তু পুত্রকে হারবার ভীতি তাঁকে তা করতে দেয় না। আমরা বলব, এহ বাহ্য। তা না হলে উপন্যাসের অন্তে যে বিপুলভাবে গোরার সময়োপলব্ধিকে গঠন করে তোলা হয়, সেক্ষেত্রে তাতো অসম্পূর্ণই থাকতো। সাময়িকের সঙ্গে মিশে থেকে অনর্গল দহন তাকে মুখশ্রী আবিষ্কারে প্রাণিত করতো না। দহনের প্রতিক্রিয়ায় বিপুল শক্তি নিয়ে সভ্যতালোককে তার দেখাও হত না।

সেক্ষেত্রে তর্কবিতর্ক ধরে তার দহন কত তীব্র, গোরাকে সেই আলোকে দেখতে হয়। সময়ের বৃহত্তর স্তর স্পর্শ করার জন্য তাই খণ্ড সময়ের মালা রচনা করে প্রবাহের স্থিতি নির্দিষ্ট করতে হয়। আর এই গোটা নির্মাণ প্রক্রিয়াটি একক সংলাপে কখনো সঞ্চারিত হতে পারে না। তর্কবিতর্ক তাই গোরার ব্যক্তিলোকের নিঃসঙ্গ সীমা থেকে ওঠে এসে অপরতার দ্বৈতালাপে লক্ষ্য সম্পর্কে সুনিশ্চিত হতে চায়। অতএব সত্তার সঙ্গে অপরতার সন্নিধান করতেই যোগ্য মাধ্যম হিসেবে 'গোরা' উপন্যাসে বিনয়ের অবস্থানবিন্দু রচিত হয়। সময়টা কেমন বয়ে চলে, এবং তার মূল্যমান কতটুকু, তার জন্য সংলাপ বিবৃতি প্রয়োজন। শুধু বিবরণে তার প্রতিকৃতি আবিষ্কৃত হতে পারে না। গোরা তাই নিরলস এবং অনর্গল তর্ক করে বিভিন্ন অপরতার সঙ্গে। আর সেই অপরতার একটি বিশেষ স্তম্ভই হয় বিনয়। গোরার মতামত সে গ্রহণ করে তার প্রচারের দায়িত্ব নেয় বটে, তবু সর্বত্র তার মিল হয় না। আর হয় না বলেই গোরার তর্কপ্রবৃত্তি সমকালটিকে আরো বিস্তারিত আকারে তুলে ধরতে পারে। অনেক সময় সমালোচকরা বলেন, গোরার ব্যক্তিত্বই প্রবল

বিনয় সেই ব্যক্তিত্বের অংশমাত্র।[৬৩] কিন্তু তা যদি হয়, তবে সংলাপের মূল্য থাকে কি? তর্কের কথা যখন ওঠে; তখন একটি সত্তাই কথক হয় না, অপর সত্তাটিও বিরোধী কথক হয়ে ওঠে। এভাবেই সংলাপের পরিধি বাড়তে বাড়তে একটা উপসংহারে পৌছায়, আর তখন দেখে— পথ ভিন্ন, ভাব ভিন্ন। কিন্তু ওই ভিন্নতাই সংযোজক। তাই বিনয় যে কেবল গোরার বাহক হয়ে গোরার ভাষা দিয়েই পরেশবাবুর বাড়িতে নিজের ভাষা বলে, সেখানে স্পষ্টভাবে নারীপ্রেমের কথা প্রসঙ্গে স্বয়ং গোরা তার বিরুদ্ধে তর্ক করেও অনুসন্ধানে দেখে বিনয়ের মতের সঙ্গে আপাত ভিন্নতায় তার মতও যুক্ত হয়ে আছে। পনের সংখ্যক পরিচ্ছেদে গোরাকে তাই বিনযের সংলাপের সত্যতা বিচাবে বলতেই হয় —

"তুমি এতদিন বই পড়া প্রেমের পরিচয়েই পরিতৃপ্ত ছিলে— আমিও বই পড়া স্বদেশপ্রেমকেই জানি — প্রেম আজ তোমার কাছে যখনই প্রত্যক্ষ হল তখনই বুঝতে পেরেছ বইয়ের জিনিসের চেয়ে এ কত সত্য— এ তোমার সমস্ত জগৎ চরাচর অধিকার করে বসেছে, কোথাও তুমি এর কাছ থেকে নিষ্কৃতি পাচ্ছ না— স্বদেশপ্রেম যেদিন আমার সম্মুখে এমনি সর্বাঙ্গীনভাবে প্রত্যক্ষগোচর হবে সেদিন আমারও আর রক্ষা নেই। ...... তোমার জীবনের এই অভিজ্ঞতা আমার জীবনকে আজ আঘাত করেছে— তুমি যা পেয়েছ তা আমি কোনোদিন বুঝতে পারব কিনা জানি না— কিন্তু আমি যা পেতে চাই তার আস্বাদ যেন তোমার ভিতর দিয়েই আমি অনুভব করছি।"[৬৪]

সময়কে এভাবেই ধরিয়ে দেবার জন্য জেমস্ জয়েস্ তাঁর 'ইউলিসিস' উপন্যাসেও অনর্গল সংলাপের আশ্রয় নেন। স্টিফেন ডিড্‌লাস ও লিয়োপগু ব্লুম ব্যক্তি হিসেবে সম্পূর্ণ হতেই পারে না। তাদের সম্পূর্ণ করে তোলে অসংখ্য সংলাপের দ্বৈতালাপ। আর এই সম্পূর্ণতা শুধু তাদের নয়,— তাদেরও বটে, সময়েরও বটে। ফলে এই সকলকে নিয়েই রচিত হয় উপন্যাস-বৃত্ত। টমাস্ মানের 'যাদুপাহাড়ে' -ও হ্যানস ক্যাস্টর্প আর জুয়াসিম জিয়েনসেনের সংলাপ ধরেই সময়-পরিসর ফুটে ওঠে। সমকালের ব্যক্তি-মানুষ কি বলে, আর সমকালের নিগড় ভেদ করে মানুষ কি ভাবে— সংলাপই তাকে পৌছে দেয়।

'গোরা' উপন্যাসে তর্ক বিতর্ক তাই গোরা, বিনয় এবং অন্য অপরতাকে চিনতে সাহায্য করে। কাছের বর্তমানটিকে পরিচিত করে। সেইসঙ্গে বর্তমানের অসংলগ্নতাকেও প্রকটিত করে। গোরার জন্মরহস্য আবিষ্কারের পর গোরা কি করতে পারে, এই বিবরণের স্তরে পৌছাবার অনেক আগেই তার সংলাপ ধরে পথ পরিক্রমাটি বোঝা যায়। 'ইউলিসিস' উপন্যাসে মুখোশরূপী ভাঙা সময়ের চিত্রটাই বিস্তীর্ণ ইতিহাস ছুঁয়ে সংলাপে সংহত হতে পারে চব্বিশ ঘন্টায়। আর 'গোরা'

উপন্যাসে এই সংলাপধর্মিতার পথ পরিক্রমা ঘটে মাত্র ছ'মাসের স্বল্পসময়ে। এত ব্যাপক পরিধি, এত ব্যাপক দৃষ্টি, এত ব্যাপক মুখোশধারী সমকালের বিস্তৃতি মাত্র ছ'মাসের মধ্যে কি করে ভরে দেওয়া যায়— তার উত্তর অনেকটা তর্কের সংলাপ ধরেই ওঠে আসতে পারে।

'গোরা' উপন্যাসের কথনভূমি নিয়ে প্রত্যক্ষ যে ফ্রেম্ রচিত হয়, সেক্ষেত্রে শ্রাবণ মাসের একটি সকালে গল্পের আরম্ভ আর মাঘ মাসের মধ্যেই তার সমাপ্তি। এর মধ্যে আবার একমাস গোরা প্রত্যক্ষভাবেও উপস্থিত নয়। এই অতিপরিমিত সময়খণ্ড অজস্র তর্কের দ্বারা প্রত্যক্ষকালের প্রতিটি মুহূর্তকে ব্যয়িত করে। উপন্যাসের অসংখ্য পাত্রপাত্রীর জীবন বৃত্তান্তের ক্ষেত্রে অতীতের কোনো একটি প্রেক্ষাপট এই ছ'মাসের অন্তর্লীন কালে প্রবেশ করে না। শুধুমাত্র আনন্দময়ীর সূত্রে গোরার জন্মকালটিকে এই ছ'মাসের কালখণ্ডে নিবিষ্ট করা হয়। আর ওই একটি মাত্র পথই 'গোরা' উপন্যাসের ছ'মাসের নির্দিষ্ট খাঁচায় বাইরের দিক থেকে সময়ের (অতীত) প্রবেশ এবং বেরিয়ে আসা (ভবিষ্যৎ)। যা একমাত্র আনন্দময়ীর মধ্যে এই পথ পরিক্রমার ইতিবৃত্তকে জুড়ে দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে ছ'মাস কালটিতে যে অফুরন্ত তর্কের ভেতর দিয়ে নানা সময়খণ্ড উড়ে আসে তার সকল নিয়ন্ত্রণ আমরা আনন্দময়ীর মধ্যেই পাই। গোরা তাই কখনোই তাঁকে অবহেলা করতে পারে না। কারণ যে বিশ্বের প্রেক্ষাপটে গোরা চরিত্রটি অঙ্কিত, সেই বিশ্বদেবতাই উপন্যাস-ভাষ্যে প্রকাশিত হন আনন্দময়ীতে। এই আনন্দময়ীর বৃহত্তর কাল থেকে গোরার যাত্রা এবং কর্মভূমি, আর সেই ক্ষণিক কর্মভূমি থেকে সেই বৃহত্তরেই ফিরে যাওয়া।

রবীন্দ্র উপন্যাসে সময়ের বৃহত্তর পরিধি কখনোই প্রবলভাবে আন্দোলিত নয়। অসংখ্য কলরোলকে ছাপিয়ে তা নির্জন শান্ত রসেরই প্রকাশ ঘটায়। বহু জনতার ধারা এসে মিশতে থাকে বলে খণ্ড সময়ের সীমায়িত কোলাহল তাতে বিলুপ্ত হতে থাকে। জীবনের নানা মাত্রা নানা বিপরীত স্পর্শে এসে তাকে আঘাত করে বলেই, কোনো একটি বিশেষ আলো এখানে উজ্জ্বল হতে পারে না। বরং বিপুল ভাবগভীরতা — নানা অসংলগ্নতা এবং অসত্যকে সংলগ্ন ও সত্য করতে চায়।

'গোরা' উপন্যাসে গোরার-ব্যক্তি যন্ত্রণা, গোরার কালেরও যন্ত্রণা। লক্ষ্য করতে হয়, রবীন্দ্র উপন্যাসে একমাত্র 'করুণা'র মতন আভাস পর্যায়ের একটি উপন্যাসকে বাদ দিলে, প্রতিষ্ঠিত কাল পর্বে কোনো চরিত্রের নামে উপন্যাসের নামকরণ হয় না। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম কেবল 'গোরা'। আমাদের মনে রাখতে হয়,প্রতিমার আবির্ভাবের পর মুখশ্রী আবিষ্কারে সময়ের যে নানামুখী ব্যঞ্জনা নিয়ে আসে, 'গোরা' তারই প্রতিভাস। অতএব নায়কের নামে নাম— এই সরল ব্যাখ্যায় আমাদের মন ভরাতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথ একটি যন্ত্রণার ছবি আঁকতে চান। এই যন্ত্রণাটি আসলে কি, এই বোধটুকু 'চোখের বালি'র মহেন্দ্র-বিহারীর নেই, বিনোদিনীতে যাও বা আছে তা সীমিত কিছু পটভূমিকা ছুঁয়েই বিকশিত। অন্যদিকে 'নৌকাডুবি'র ক্ষেত্রেও রমেশের যন্ত্রণা কোথায় সেটাও তাকে গভীরতার স্তরে টেনে নিতে পারে না। নলিনাক্ষের সুযোগ ছিল; কিন্তু সে ছিল আড়ালে। তার দীর্ণতার ইতিহাস কতটুকু সুস্পষ্ট, বোঝার আগেই কর্তব্যকর্ম শেষ হয়। অতএব প্রতিমার অনেক নিদর্শন পেয়েও আমরা আমাদের সময়ের অবস্থানটি বুঝে নিতে পারিনা। অথচ মুখশ্রী আবিষ্কারে আমাদের বুঝে নিতে হয় যন্ত্রণার আঘাতকে — সময়ই যার ধারক। 'গোরা' উপন্যাসে তাই প্রথম সার্থকভাবে দেখানো হয়— একাধারে একটি চরিত্রে সম্প্রদায় এবং ব্যক্তির অবস্থান। অতএব গোরা একটি যুগও বটে, আবার একজন মানুষও বটে। সময়ের প্রতিমা হয়তো কোনো একটি বা দুটি ঘটনার দ্বারা সৃষ্টি হয়ে ওঠে ইতিহাসে। কিন্তু সেই ইতিহাসটিকে দেখবে নিশ্চয়ই একজন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ। 'চোখের বালি'র বিনোদিনী মহেন্দ্রের পরিবারে অসংখ্য ঘটনার কর্মজালে ইতিহাসকে আবিষ্কার করে। আবার শুধু মহেন্দ্রের পরিবারেই নয়, বারাসতের গ্রামের বাড়ির সমাজ থেকে কিংবা আশার দুর্বলতা এবং বিহারীর সঙ্গে সম্পর্ক সন্ধানে নানাদিক হতে তাকে আবিষ্কার করে নিয়েই সে কাশীর পথে আরো অন্য জগৎ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। 'নৌকাডুবি'তে কমলা নানা অভিজ্ঞতায় সমর্পণ চিত্তে স্বামী দেবতাটির মধ্যে খুঁজে ফেরে তার সমকালটিকে, — নলিনাক্ষও নিজের সমকাল গড়ে কমলা-আহ্বানে। কিন্তু এই প্রতিমার মুখশ্রী আবিষ্কারে কোনো এক সহৃদয়বান ব্যক্তিরই আকাঙ্ক্ষা জড়িত হয়। গোরা সমকালটিকে চেনে, অর্থাৎ প্রতিমাটির চেহারা কি তাকে জানে। আর সেক্ষেত্রে নিঃশেষে উজাড় করে দেয় নিজেকে। কেবল একটি ব্যাপারই তার জানবার বাকি থাকে,— এই সমকালটির সীমানাই শেষ সীমা নয়। অতএব মুখ আবিষ্কারেই ব্যক্তির অনুসন্ধান শেষ হয়ে যেতে পারে না, তার মুখশ্রীটিকেও ধরতে হয়। গোরা যে অতিরিক্ত উগ্রতা নিয়ে সমাজ গঠন করে, সেটা বিশেষ একজন ব্যক্তির সামান্য কিছু সময়ের ব্যবহারে সম্ভব হয় না। এই অতিরিক্ত উগ্রতা দীর্ঘদিনের ইতিহাস। মানুষের মধ্যে আদিকাল থেকেই যে কিছু কিছু প্রবৃত্তি থেকে যায়, একাধিপত্যের বাসনা তার মধ্যে একটি। 'রাজর্ষি'তে রঘুপতির মধ্যে সেই একাধিপত্যের বাসনা ধর্মের খোলসে ধরা দেয় গল্পের সেই ঐতিহাসিক কালেই। সে একাধিপত্য বহু জনতা-সভ্যতা-ভৌগোলিক পরিবেশ পেরিয়ে এসেও নানা আকারে সময়কে নিজের সম্পত্তি করতে চায়। আজকের যুগেও আমরা দেখতে পাই সেই একাধিপত্যের প্রবৃত্তিতে কখনো ধর্ম, কখনো গণতন্ত্র, কখনো সার্বভৌমত্বের

নামে মুখোশের কথা বলে। অপরতাকে পরাধীন রেখে সত্তার স্বাধীনতা পিপাসা আজ সন্ত্রাসের নামে শুধু একটি যুগ নয়, আরও অসংখ্য যুগকে কিনে নিতে চায়। 'রাজর্ষি'র রঘুপতির মধ্যে এই যুগ অধিগ্রহণের পিপাসা তার নিভৃত লালসাকে দেবীর করলা গ্রাসে পরিবর্তিত করে। অথচ আমরা জানি, ব্যক্তি যেমন প্রবৃত্তির ঝোঁকে সমাজ এবং মানুষকে কিনতে চায়, তেমনি আবার ব্যক্তিই তার স্বাধীনতার পথ খুলে দিতে পারে। ব্যক্তি যেমন সমরাস্ত্র বা কূটনীতির দ্বারা একটি জাতি কিংবা সভ্যতাকে গুড়িয়ে দেবার ক্ষমতা রাখে, আবার ব্যক্তিই সভ্যতা এবং জাতিকে গঠন করতে পারে। গোরা তাই একাধারে একজন ব্যক্তি, একজন বর্গ। যখন সে বর্গের মধ্যে ছড়িয়ে থাকে, তখন তীব্র বাক্‌বিতণ্ডায় শত্রুকে ধরাশায়ী করতে চায়। শত্রু নিধন যজ্ঞই তখন তার তপস্যা। যখন ব্যক্তির মধ্যে সে নেমে আসে, বিষণ্ন হয়ে ওঠে মন-প্রাণ একটা কিছু না পাবার বেদনায়। গোরা তাই আধিপত্যের ঝোঁকে তর্ক করে। কিন্তু তার অনেক কর্মই তর্ক অনুসারে ঘটে না। কেশবচন্দ্রের প্রতি তার শ্রদ্ধাবোধ তাকে ব্রাহ্মধর্মের কাছে টানে। সেখানকার বেষ্টনী থেকে ওঠে এসে হিন্দুধর্মের অতিরিক্ত বিচ্ছিন্নতাকে সে আবার কৃষ্ণদয়ালের মধ্যে দেখে বিতৃষ্ণ হয়। অন্যদিকে বিদ্যাবাগীশের প্রতি ভক্তি সঞ্চয়ে হিন্দু ধর্মে আবার তার প্রীতি সঞ্চারিত হতে থাকে। গোরা যখন ব্রাহ্মবিদ্বেষী হয়ে ওঠে, তখন বিনয়কে পর্যন্ত ব্রাহ্ম পরেশবাবুর গৃহে যেতে নিষেধ করে। কিন্তু সেই পরেশবাবুর ব্যবহারের শালীনতা এবং মান্যতা তাকে চমৎকৃত না করে পারে না। দাম্ভিক রক্ষণশীল ব্যক্তি গোরার হাতে বিকিয়ে যাওয়া 'গোরা-সম্প্রদায়' সর্বদা রণংদেহি মূর্তি; অথচ নির্জনলোকে মুখশ্রী আবিষ্কারের লক্ষ্যে 'ব্যক্তি-গোরা' 'বিশ্ব-গোরা' সভ্যতাকে খুঁজে নেবার প্রয়াসী। 'গোরা' নামকরণ তাই সময়ের নানা মুখ; পরিশেষে মুখশ্রী আবিষ্কারের ব্যঞ্জনা। আর এই সমস্ত ঘটনার পেছনটিতে দাঁড়িয়ে আনন্দময়ী।

সময়ের ছবি তাই যদি হয় গোরা এবং গোরাই যদি হয় এর শিল্প, তবে তার সৃষ্টিতত্ত্বের অবলম্বন হয়ে থাকে পেছনের ওই সাদা ক্যানভাস। যে ক্যানভাসে নানা রঙের আঁচড় টেনে বিশেষ একটি মত, বিশেষ একটি বর্ণ, বিশেষ একটি গোষ্ঠীকে প্রতিষ্ঠিত করেও অন্য মত, অন্য বর্ণ, অন্য গোষ্ঠীকে নস্যাৎ করা হয় না। ছবিটা হয় সর্বকালের ছবি। মহাকালের কাছে উচ্চ নিনাদিত স্বল্পকাল শৈশবের কলরোল। আনন্দময়ীকে তাই ব্যক্তি-গোরার মায়ের ভূমিকাতেই অবতীর্ণ হতে হয়। বিশেষ সময়-পরিসরের গোষ্ঠী হিসেবে গোরার কাছে আনন্দময়ী তাই আচারহীন হলেও সংবেদনশীল ব্যক্তি-গোরার কাছে শ্রদ্ধার পাত্র। ফলে একজন আনন্দময়ীর কাছেই দু'জন গোরা সমতালেই বিচরণশীল।

উপন্যাসে গোরা ভর কেন্দ্র। কিন্তু তার প্রতিকৃতিটি ধরতে পট উত্তোলন ঘটে গোরার বন্ধু বিনয়কে নিয়ে। বয়ান সম্প্রসারণের আগে তাই খাঁচা এবং অচীন পাখি— বাউল সঙ্গীতের দেহতত্ত্বকে সময় এবং পরিসরের যুগলবন্দিতে নিয়ে আসা হয়। খণ্ড সময়ের মাঝখানে উঁকি দেওয়া যে প্রবহমান চিরকাল— তাকে বুঝতে চাওয়াই হয় এই উপন্যাস। এই বুঝতে চাওয়ার ক্ষেত্রে বাহ্যিক সময় ও পরিসরে অবস্থান পাল্টাবারো প্রয়োজন নেই। 'চোখের বালি', 'নৌকাডুবি'র ক্ষেত্রে কলকাতা থেকে কাশী— পরিসর এবং সময় বদলের কায়িক প্রয়োজন রয়েছে। 'গোরা'র ক্ষেত্রে কলকাতা এবং শেষ পর্যন্ত কলকাতাই একটি আকাশের নীচে অনন্ত সময়কে খুঁজে পায়। গোরাকে তাই পূর্ণ বিবরণটি খুঁজে পেতে গোটা পৃথিবী পরিভ্রমণ করতে হয় না। কিংবা ফ্যান্টাসী জগতের 'টাইম মেশিন' নিয়ে ব্যাপক অতীত থেকে ব্যাপক ভবিষ্যতেও পাড়ি জমাতে হয় না। অগেই বলা হয়েছে, মাত্র ছ'মাস কাল খণ্ডে গোরার একমাত্র জন্মকালটি ছাড়া আর কোনো দিকেই অতীত-গভীরতার দিকে যাওয়া হয় না। কিংবা গোরা যখন বৃহত্তর অর্থে স্বদেশকে চিনে নেয়, তখন ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি ধরে তার ধারাবাহিক চিনে নেবার প্রক্রিয়াকে আভাসে ছেড়ে দেওয়া হয় না। উপন্যাসের শেষে তাই বর্তমানটি ধরেই গোরা আনন্দময়ীকে জানায়— 'তুমি কল্যাণের প্রতিমা। তুমিই আমার ভারতবর্ষ।'[৬৫]

অতএব বিস্তৃত সভ্যতা এবং তার অনন্ত সীমাকে জানবার জন্য আমাদের নিকট বর্তমানই আশ্রয় হতে পারে। শুধু বর্তমানটিকে সেই ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করা চাই। গোরার পেছনে মায়ের ভূমিকায় বর্তমানের ভূমিসংলগ্ন হয়ে তাই প্রকাণ্ড বিশ্ব স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যতে আনন্দময়ীর মধ্যে প্রকাশিত। গোরা যাকে শেষ পর্যন্ত চিনে নিতে পারে।

কিন্তু আংশিকভাবে দেখার সময়গত অভ্যাস, আর অভ্যাস থেকে স্বাধীন হবার বাসনা— এই দুইয়ের সংযোগে যে উপন্যাস রচিত হয়, তাতে কলকাতা হয় একটি খাঁচা। আবার সেই খাঁচাটিও চিত্রিত হয় বিনয়ের মনোভূমি থেকে। ভবিষ্যতে যে নিজের সামর্থ্যে গোরার সঙ্গে সংলাপ যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে এবং বৃহত্তর সংলাপের অংশী হবে। উপন্যাসটিতে কলকাতা যে এখানে বদ্ধ নগরী— এই বক্তব্যই প্রধান হতে চায় না। বরং তার চলমানতা একজন নীরব দর্শকের চোখে এভাবে পড়ে—

"রাস্তায় গাড়ি ঘোড়ার বিরাম নাই, ফেরিওয়ালা অবিশ্রাম হাঁকিয়া চলিয়াছে, যাহারা আপিসে কালেজে আদালতে যাইবে তাহাদের জন্য বাসায় বাসায় মাছ-তরকারি চুপড়ি আসিয়াছে ও রান্নাঘরে উনান জ্বালাইবার ধোঁয়া উঠিয়াছে।"[৬৬]

এ হল ব্যক্তি জীবনের একটি বিবৃতি। কিন্তু তার প্রাণ সঞ্চার কোথায়! বিনয়

বরং তার মনোলোকে সেই ব্যস্ততার একটি সঙ্গতি ধরে সুর আবিষ্কার করে। তাই গোরার বৃহত্তর দেশপ্রেমের বিমূর্ত এবং বিচ্ছিন্ন ভাবনার আগে চোখে দেখা একটি নারীকে নিয়ে সে সেই আত্মপরিচয়হীন জনসমুদ্রে সংহতি গড়ে। তবু এ কথাটিও লক্ষণীয়, এই চলমান জনজীবন সে-ই দেখতে পারে, যে একটু আলাদা দূরত্বে তাকে বিচার করে, পরিকল্পনা করে। গোরা সেই জনসমুদ্রে মিশে আছে বলেই, সে গতির সঙ্গেই চলে। কিন্তু সেই গতির প্রকৃতি কি, কোথায় তাকে মুঠো করে ধরে সামগ্রিকে লক্ষ্যে পৌঁছান যাবে, তাকে দেখার সুযোগ পায় না।

শিল্প বিপ্লব সভ্যতার গতি পরিবর্তন করে। মানুষ বুঝতে পারে তার জীবনের গতি আরো বর্ধিত হওয়া উচিত। মানুষ তাই উন্নতির ছোঁয়া পেয়ে সময়কে করে দ্রুত। কিন্তু তারপর যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়, তাতে সময়ের গতি থাকে, উদ্দেশ্য থাকে না। আর তার বড় কারণ, আধুনিক সামাজিক প্রেক্ষাপটে প্রকৃতি থেকে মানুষের বিচ্ছিন্নতা। পুঁজিবিশ্বাসী সমাজব্যবস্থা মানুষের লক্ষ্যস্থলকে চূর্ণ করে। শ্রমে-বিশ্রামে, ব্যক্তি-ব্যাষ্টিতে, প্রেম-অভিমানে মানুষ কোনো জবাবী সত্তাকে খুঁজে পায় না। মানুষ জানতেও পারে না সে কোথায় চলেছে, কেন চলেছে। ফলে জনস্রোত আছে, মানুষ নেই। সমবেত সেই ভীড় সামনেই আছে, তবু মানুষ মানুষের থেকে নিঃসঙ্গ। বিনয় তাই দোতালার বারান্দায় একলা দূরত্বে সেই ভীড় থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে। সে মানুষের সন্ধান বাইরে, বইয়ের পাতায় এবং কল্পনালোকে। কিন্তু সুচরিতাকে প্রথম দেখে তার মনের মধ্যে বেজে ওঠে সংযুক্তির প্রয়াস। গোরার সঙ্গে সে যে তার নিজস্ব বিশ্বাস অনুসারে তর্ক করে, প্রেমের দ্বারা এই সংযুক্তির প্রয়াস তার অন্যতম।

গোরা বিনয়ের গ্রন্থলব্ধ ইতিহাস-সমীক্ষাকে ব্যঙ্গ করে। অথচ বিনয়ের এই বিচ্ছিন্নতার সূত্রেই সমকালটির অন্য একটি মাত্রা পায়। যে নবজাগরণ সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকে ভেঙে দেয়, তার মধ্য দিয়ে ঐতিহাসিকভাবে ঘটে ব্যক্তির জাগরণ। আর সেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধে নিহিত থাকে মানুষের উত্তরকালীন নিঃসঙ্গতার বীজ।[৬৭] মানুষ পরিবারকে টুকরোভাবে দেখতে অভ্যস্ত হয়। যারা দেখতে চায় না, তারাও এক সময়ে সাময়িকতার অন্ধমোহে প্রাণিত হয়। গোরা তাই যে জন অরণ্যে মিলিত হয়, সেখানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের বদলে গোষ্ঠীস্বাতন্ত্র্যবোধ মাথা চাড়া দেয় এবং গোরাকে নিঃসঙ্গ করে। বিনয়ও নিঃসঙ্গ— তাই তার মানসিক সম্প্রসারণটি হতে পারে প্রথমত তিনটি লক্ষ্যে— ১) চলমান কলকাতা, ২) বই পড়া এবং ৩) গোরা। কিন্তু এই তিনটি লক্ষ্য বিনয়কে অন্তরে তৃপ্ত করতে পারে না। কলকাতার আত্মপরিচয়হীন জনস্রোতে সেই মুক্তির আনন্দ সে খোঁজে, কিন্তু দূরত্বে। গ্রন্থপাঠে তার কল্পনা বিকশিত হয়, কিন্তু বাস্তবের ভূমিতে লগ্ন হতে পারে না। গোরাকে সে

অনুসন্ধান করে ব্যাপক ব্যক্তিত্বে সান্নিধ্য পেলেও গোরার বর্গচেতনা আনন্দময়ীর স্নেহের আলোকে তাকে কষ্ট দেয়।

অতএব যে আলোক সূত্রকে আবিষ্কার করা প্রয়োজন, নারীপ্রেমের মাধ্যমে বিনযকে দিযেই তা দেখানো হয়। তার কারণ, বিনয়ের সঙ্গে জড়িত গোরারও মুক্তি। গোরা এতবড় একটি যুগ পবিধির সঙ্গে যুক্ত, অথচ গোরার কোন বন্ধু নেই। একমাত্র বিনয়ই তার মাধ্যম— এ কথাটিকে অবহেলা করা যাবে না বলেই, গোরাকে টেনে আনবার আগে বিনয়কে প্রস্তুত করা হয়। উপন্যাসের শেযেও তাই গোরার কাছে বিনয়কে টেনে আনার কথা বলেন আনন্দময়ী। যে সভ্যতার আলোকে গোরা গ্রাম্য ভারতবর্ষ, স্বদেশসন্ধান এবং জন্মরহস্য উদ্‌ঘাটনে আত্মভূমি উদ্ধার করে এবং সুশৃঙ্খল বিভেদহীন জনতার সঙ্গে মিলিত হয়, সেখানে বিনয়ের সঙ্গে তার বিচ্যুতি ঘটতেই পারে না।

উপন্যাসে সময়েব প্রকাশরূপে গ্রামজগতের একটা ভূমিকা আছে। শহর ও গ্রামকে পাশাপাশি স্থাপন করেই যে বৈষম্য আমাদের নজরে পড়ে, তাতে প্রধান বাহনই হয় সময়। শহরের ব্যস্ত জীবনের পাশে গ্রামের ধীর প্রবাহ, কিংবা জ্ঞানের অগ্রগতির পাশে অজ্ঞানের অন্ধকার,— একটা ব্যবধান যেমন তৈরি করে, তেমনি মূল্যবোধ নিয়ে চিন্তারও হেরফের ঘটে যায়। দুটো পরিসর কেবল পারিবারিক ব্যবধান থেকে দু'রকম সময়কে প্রচার করে না, সেই সঙ্গে তার প্রচারের চরিত্রও থাকে আলাদা। আমরা এখানে একবার ভেবে নিতে পারি রবীন্দ্রনাথের 'করুণা' উপন্যাসটিকে— যার মূল প্রাণকেন্দ্রই পল্লী। করুণা যে পবিসরে বর্ধিত হয়, সেখানে কলকাতা তার জীবনে নরেন্দ্রের সর্বনাশটিকে নিয়ে ঢোকে। 'চোখের বালি'তে পল্লীপ্রসঙ্গ আসে বিনোদিনীকে নিয়ে, বারাসতের গ্রামের বাড়িকে ঘিরে। 'নৌকাডুবি'তে পল্লী আসে রমেশের পিতাকে কেন্দ্র করে। কিন্তু এই পর্যন্ত যে পল্লীপ্রসঙ্গ ধরা দেয়, তাতে বারবারই শহরের সঙ্গে তার বৈষম্যই ফোটে বেশি। করুণার কাছে শহরজীবন জ্ঞানের প্রসারতা নিয়ে আসে না, বরং তার পল্লীপ্রাণের সরল বিশ্বাসটিকে পুঁজি করে। 'চোখের বালি'তে মহেন্দ্রের মাতা রাজলক্ষ্মী আব বিনোদিনীর মাতা হরিমতি একই গ্রামের মেয়ে হলেও কলকাতাবাসী রাজলক্ষ্মীর কাছে গ্রাম্যজীবনে অভ্যস্ত হওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। হরিমতির বিধবা কন্যা বিনোদিনীর কাছে এসেও গ্রামের বাঁশবন আর ঘন জঙ্গল সহ্য করতে পারেন না। অবশ্য দমদমে চড়িভাতিকে উপলক্ষ করে বিনোদিনীর গ্রাম্য পরিবেশে এসে যে মুক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটে, সচেতন দৃষ্টিতে বোঝা যায়, এ সাময়িক অবকাশে বিহারীর সঙ্গে সংযুক্তি— পল্লীসংস্কৃতির নিবিড় সান্নিধ্যকে আত্মিক করে তোলার বাসনা নয়। আসল পরিচয়ে বিনোদিনী তাই গ্রামের সঙ্গে যুক্তই নয়। ফলে তার বৈধব্য

জীবন গ্রামে বিচ্ছিন্নতার সূত্রেই কাটে। আটত্রিশ সংখ্যক পরিচ্ছেদেও দেখা যায় বিনোদিনীর সঙ্গে পল্লীর যে বিচ্ছিন্নতা, সেটা পল্লীর তরফ থেকেও ভালমনে স্বীকার করা হয় না। 'নৌকাডুবি'তে গ্রাম থেকে রমেশের পিতা রমেশের ব্যক্তিগত ভাবনার কোনো মূল্য না দিয়েই নিজের বিচারশক্তির দাবিতেই গ্রাম্য মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দেন। রমেশ বাধ্যতার ফাঁসে এই বিবাহ করে। আবার যে বিতর্কিত তিনমাস কাল কমলার সঙ্গে তার কাটে, তাতে সম্পর্ক সন্নিধানে গ্রামের পরিবেশেও যে কমলার সঙ্গে রমেশের সম্পর্কের আসল পরিচয় উদ্ধার হয় না, এর মূলেও থেকে যায় গ্রাম ও শহরের পরস্পর উদাসীনতা। শহর গ্রামকে কাছে টেনে নিতে সাগ্রহে হাত বাড়ায় না বলে, গ্রাম এই সভ্যতালোকেও হাজার বছর পেছনেই পড়ে থাকে। বৈষম্য থেকে এই ব্যবধানে ভরে ওঠে অবিশ্বাস আর সন্দেহের বিষবাষ্প। 'পোস্ট মাস্টার' গল্পে যেখানে বাধ্যতামূলক কিছু সময়ের ব্যবহারের কারণেই গ্রামের ভালবাসাকে শহর অধিগ্রহণ করে, কিন্তু তাকে আপন করে নেয় না— তা প্রকট হয়। তাই প্রয়োজন ফুরোলে কত পোস্টমাস্টারের পক্ষে সম্ভব হয় রতনের ভালবাসাকে ছিন্ন করতে। শহর তার স্বার্থের সীমাটুকু বোঝে, রতন ভালবাসার সীমানা অবুঝের মত লঙঘন করে। পোস্টমাস্টার হয়তো ঔপনিবেশিক শহুরে মধ্যবিত্ততা দিয়ে শ্মশানদর্শনে দার্শনিক চিন্তনে বিবেক ধৌত করেন, কিন্তু রতন তার সভ্যতার আলো বঞ্চিত হৃদয়টি নিয়ে কোনো তত্ত্বের আধারেই মনকে বাঁধতে পারে না। 'পোস্টমাস্টার' গল্পে তাই রতন পুনরায় বঞ্চিত হবার জন্য প্রস্তুত হয় বটে। কিন্তু সময়ের ইতিহাস এভাবেই চলে না, চলতে পারে না বলেই গ্রামের রতনের পরিবর্তন আবশ্যক হয়ে পড়ে। ছোটগল্পটির সীমিত পরিধিতে সেই ইতিবৃত্ত নেই। কিন্তু উপন্যাসে দীর্ঘদিনের দ্বন্দ্ব ক্রমে ক্রমে ঘনিয়ে ওঠার ছবিটি প্রদর্শিত হবার সুযোগ থাকে। রবীন্দ্র উপন্যাসে তাই বলা যায় সর্বপ্রথম 'নৌকাডুবিতে'ই গ্রামকে আন্তরিক করে তোলার প্রচেষ্টা যৎসামান্য হলেও নলিনাক্ষ নিয়ে আসে। যার প্রমাণ তার গ্রামের মেয়েকে বিবাহ করা। অবশ্য এক্ষেত্রে তার উদ্দেশ্য হিসেবে যে লক্ষ্যটি প্রধানত কাজ করে, তাতে মায়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শনই বড়। তাই আন্তরিকতার প্রশ্নটি তখনো বৃহত্তর অর্থে নিবিড় হয় না। অতএব গ্রাম্য পরিধি থেকে কমলা যেমন নলিনাক্ষকে দেখে না, নলিনাক্ষও শহর পরিধি থেকে কমলাকে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারে না।

'গোরা' এদিক দিয়ে যে বৃহত্তর সমাজ এবং সভ্যতার মিলনাকাঙ্ক্ষী; সেখানে তার মানবপ্রীতির আড়ালে স্বদেশবোধ কলকাতার বর্তমান পরিসরকে ছেড়ে যতটুকু বিশ্ব অন্বেষণ করে, গ্রাম হয় তার ক্ষেত্র। শহর কলকাতা যদি হয় তার প্রকাশভূমি,

তবে তার শক্তিকে গ্রহণ করা হয় গ্রাম থেকে। শহরের মাঝখানে আত্মজিজ্ঞাসার অনুসন্ধানে গ্রাম যে অবিচ্ছেদ্য অংশ— এমনটা গোরার আগে আর কেউ ভাবতে পারে না। অবশ্য 'মেঘ ও রৌদ্র' ছোটগল্পে শশিভূষণ সেই বিভেদকে ঘোচাতে এগিয়ে আসে। কিন্তু শশিভূষণ বাংলাদেশের বৃন্তে ধরে থাকা মানবদরদী চিন্তাশীল ব্যক্তিত্ব। গ্রামের মঙ্গলসাধন করতে সে আইনের দ্বারা মুক্তি কামনা করে। অথচ সে আইনের প্রতি বিশ্বাসে ব্রিটিশদের উপর থাকে অতিরিক্ত নির্ভরতা। ব্রিটিশদের আইন যে বিশ্বাসের যোগ্য নয়, কিংবা আইনের সাহায্য নিয়ে উপকার করতে চাইলেই যে করা যায় না— শশিভূষণকে পুঁথির বিদ্যার আবেষ্টনে তা বুঝতে দেয় না। যখন বুঝতে পারে, তখন তাকে ফিরে যেতে হয় একঝাঁক বিষণ্ণতা নিয়ে।

'মেঘ ও রৌদ্র' তাই সবটুকু সময়ের পৃথিবী নয়। সময়ের সবটুকু ধারা ঝর্ণার মত এখানে ঝরে পড়তে পারে না। বরং শশিভূষণ বিশেষ একটি কালের চিহ্ন সমৃদ্ধ ছবি হয়ে ওঠে এবং তার ব্যর্থতা দিয়েই প্রমাণ করে 'দেশ সন্ধান' তার কোনো এক ভৌগোলিক গণ্ডীবদ্ধ পরিসর।

গোরা চরিত্রটি কখনো কোনো একটি বিশেষ যুগের আবেগপ্রবণ বাঙালির নয়। তাকে যে প্রত্যক্ষভাবে আইরিশ সন্তানরূপে দেখানো হয়, তাতে নানামুখী ব্যঞ্জনার মধ্যেও এ কথাটি সত্য— বাঙালি মধ্যবিত্তের সমাজ উদ্ধারের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের যে প্রয়াস, যে ইতিহাস রচনা, সে ইতিহাস গোরার মত এত বৃহত্তর রূপান্তর নয়। ফরাসী বিপ্লব যেমন সমাজের সর্বস্তরের অলিতে গলিতে শাখা প্রশাখা বিস্তার করে, মানুষকে ব্রাত্যলোক থেকে টেনে এনে একটি পরিসরে দাঁড় করে, সেই সর্বাত্মক প্রয়াস বাংলাদেশে ঘটেনি। রবীন্দ্রনাথ তাই যে নবজাগরণ প্রত্যক্ষ করেন, বোঝেন, সে কেবল গুটি কয়েক নব্য শিক্ষিত বাঙালির সীমিত প্রচেষ্টামাত্র। গোরার ক্ষেত্রে সেই বাঙালি পোশাকটাই রবীন্দ্রনাথ খুলে দেন। অতএব গোরা শশিভূষণের মতন গ্রামে গিয়ে ফিরে আসতে পারে না। অথচ দিনের পর দিন শহরের লোভের দ্বারা গ্রামকে যে দোহন করা হয়, সময়ের স্রোতে তিল তিল করে সঞ্চিত হয় ভীতি, গোরা তাকে অবহেলা করবে কি করে! অথচ গ্রাম ও শহরের মধ্যবর্তী অন্তরালকে ঘুচিয়ে না দিলে যে সমাজকে খোঁজা হচ্ছে তাকে পাওয়া যাবে কি করে! গোরা তাই গ্রামের মাটিতে শহর থেকে পরিসর সম্প্রসারিত করে। অন্তজ শ্রেণীর গৃহে আতিথ্য নেয়। মানুষ যে নিম্নবর্গীয় নয়, তাকে নিম্নবর্গীকরন করা হয় এই গ্রাম্যচিত্র থেকেই গোরা জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। সে জানে তার গৌরবর্ণ প্রকাণ্ড দেহখানি গ্রামের চোখে সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়। যেহেতু দীর্ঘদিনের সময়ের ইতিহাস থেকে গ্রামের মানুষ প্রতারিত হবার শিক্ষাই শুধু অর্জন করে। গোরা তাই প্রাথমিক অবহেলা,

সন্দেহ, অপ্রিয় মন্তব্য— কোনোকিছুই গায়ে না মেখে এগোয়। আর এগিয়ে চলার সময়ের পথ ধরেই গোরার পথসন্ধান চলে, গ্রামেকে সে তাই এ পথে মিলিয়ে যোগাযোগের বন্ধন দৃঢ় করতে পারে।

গোরার কর্মকাণ্ড গ্রাম ভিত্তিক নয়। গ্রামকে শহরের সঙ্গে আত্মীয়বন্ধনে যুক্ত করেত তার প্রচেষ্টা। ৬৭-সংখ্যক পরিচ্ছেদে গোরা তাই কলকাতা থেকে গ্রামে গিয়ে আবার রাত্রিতে ফেরে। তাই গোরার গ্রাম্য ভারত অনুসন্ধান মানুষের প্রাণের আবিষ্কার প্রয়াস। অতএব কলকাতা হয় তার বৃত্তের কেন্দ্র। সেই কেন্দ্রকেই ক্রমাগত ছড়ানো হয়। কিন্তু আবার আকর্ষণ করে তোলাও হয় সেই কেন্দ্রের দিকেই। গোরা তাই লক্ষ্যচ্যুত নয় বলেই গ্রাম-অনুসন্ধানে তার শহর-অনুসন্ধান চলে। মানুষের অন্তরালে চলে বহু যুগমানসের বিচার বিশ্লেষণ। কলকাতা তার প্রত্যক্ষ বিচরণক্ষেত্র, ভারতবোধ তার অখণ্ড প্রতীক। আর মানবপ্রেমের অমোঘ আকর্ষণে সময় এখানে কেন্দ্রীভূত এবং নানামুখী। কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষ যে পল্লীজীবনের সঙ্গে প্রকৃতির সূত্রে অন্তর্জগতে মিশে আছে, সেই আবরণ মুছে যেতে পারে যদি বহু যুগ পেরিয়ে সেই অরণ্যজীবনের কালে ফিরে যাওয়া যায়। কিন্তু গোরা সেই কালে ফিরে যেতে চায় না। ফিরে যাওয়া মানেই তো বর্তমান থেকে পালিয়ে বেড়ানো, সমৃদ্ধ করা নয়। আধুনিক যে উন্নত সময়চিত্র মানুষকে এগিয়ে নিয়ে চলে, সে স্রোতকে আর উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া যায় না। ফলে ইচ্ছে হলেও অতীতে ফিরে যেতে পারি না। অগ্রগতির দিক ধরে তাই পরিবর্তন সম্ভব, কিন্তু অগ্রগতিকে পশ্চাদ্‌গতিতে রূপান্তরিত করা অসম্ভব।[৬৮] বরং যারা অবহেলিত, বর্তমান সময় থেকে বিচ্ছিন্ন, মূল স্রোতের সঙ্গে তাদের মিলিয়ে দেখাটাই স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ায়।

আমাদের জানা আছে পরসর যত বড়, সময়টাও তত বড়। 'গোরা' উপন্যাসে তাই প্রথম থেকে যে বৃহত্তর পরিসর ধরা হয়, সে সময়কে বৃহত্তর করার লক্ষ্যে। শহর সে ক্ষেত্রে বৃহত্তরকে নিয়ে আসতে পারে। তার কারণ, বর্তমান সভ্যতায় শহরের ভূমিকাই হল গুরুত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ নিজেই এক জায়গায় লিখেন—

"আধুনিক সভ্যতালক্ষ্মী যে পদ্মের উপর বাস করেন, সেটি ইট-কাঠে তৈরি, সেটি শহর। ..... এই শহরেই মানুষ বিদ্যা শিখছে, বিদ্যা প্রয়োগ করছে, ধন জমাচ্ছে, ধন খরচ করছে, নিজেকে নানাদিক থেকে শক্তি ও সম্পদে পূর্ণ করে তুলছে। ..... যেখানে অনেক মানুষের অনেক প্রকার উদ্যম নানা সৃষ্টিকার্যে সর্বদাই সচেষ্ট হয়ে রয়েছে। সেই ক্ষেত্রই হচ্ছে শহর।"[৬৯]

কিন্তু এই শহরের মানুষে মানুষে ঘনিষ্ঠতার অভাবও তাঁকে আঘাত করে। শহরের সামাজিকতার অভাবকে রবীন্দ্রনাথ পুষিয়ে নিতে চান পল্লীতে। বলেন—

'গ্রামেই মানব সমাজের প্রাণের বাধাহীন বিকাশ হতে পারে।'[৭০] কিন্তু এই দুটো পরিসরের দু'দিক দিয়ে যে গুরুত্ব চিরকালের সমকাল রচনায়, তার মূর্তি তো আজ স্পষ্ট। তবু তাদের দ্বৈত প্রচেষ্টার সম্পর্ক বন্ধন হয় না বলে পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করতে থাকে— যেমনটা ঘটে 'করুণা', 'চোখের বালি', 'নৌকাডুবি'তে (রমেশ এবং রমেশের পিতার প্রসঙ্গে)। ফলে, যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতি ধরে ক্রমান্বয়ে মানুষের দিগন্ত খুলে যায়— শহর হয় তার ক্ষেত্র। কিন্তু মানুষ মানুষের কাছে আসতে পারে না। সামাজিকতা বোধ আন্তরিকতার প্রশ্নে যেখানে আসে, কোনো তত্ত্ব দিয়ে গাণিতিক ফসলরূপে তার প্রকাশ হতে পারে না। সে কারণেই বিশ্ব যে আজ একটি ছাঁদের নীচে আধুনিক বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির দৌলতে এসে দাঁড়ায় সেখানে আন্তরিকতার স্তর হৃদয়গত হয়ে ওঠে না বলে মানুষ পাশাপাশি হয় বটে, কাছাকাছি আসে না। গোরার অন্বেষণ তাই এক মহাজাগতিক সময় সন্নিধান, শহর যার কেন্দ্রস্থল। কিন্তু তার অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে মানবভূমিকে সে অনুসন্ধান করে গ্রামে। বিচার এখানে শহর কিংবা গ্রামের নয়, ভারতবর্ষ কিংবা বিশ্বেরও নয়— ভূগোল দিয়ে কোনো সীমানাই সে নির্দিষ্ট করতে চায় না। গোরা তাই যেমন শহর কলকাতায় দেখে আচারের দাসত্ব, গ্রামেও দেখে আচারের অস্ত্রে মানুষের রক্তক্ষরণ। একদিকে হৃদয়ের সংযোগের অভাবে আত্মবাদী আচারের আধিপত্য, অন্যদিকে জ্ঞানবঞ্চিত কুসংস্কার জর্জরিত আচারের সামাজিক দৈন্য। গোরা এই পরিসর পাল্টাতে পাল্টাতে একাকীত্বকে বুকে ধারণ করে বিপুল সময়ের সমাহারকে প্রত্যক্ষ করে। সম্মিলন হয়ে ওঠে বহুস্বরিক। গোরা যে বারবার মহাজাগতিক সময়ের লক্ষ্যে ভারতবর্ষের ছকটিকে ভাবতে চায়, তার কারণ হিসেবে থাকে সেই সম্মিলন প্রয়াসে সময় গঠনের মূল উপকরণ। যা প্রাচীন ভারতে ছিল। সেই ভারতবর্ষ বিদেশিকে গ্রহণ করে অকাতরে; অতিথিকে দেখে নারায়ণরূপে।

প্রাচীন ভারত সেই দৃষ্টি পায় প্রকৃতি থেকেই। 'মানুষ' ও 'আপাত জড়বস্তু' যে একই পরিসরের অধিবাসী— এই অদ্বয়বোধ ও চেতনার উপলব্ধি ঘটে প্রকৃতিভূমি থেকেই। তার আলাদা আলাদা প্রকাশ আসলে আমাদের খণ্ডিত অভিজ্ঞতারই ফল। বিশ্বের কত রহস্য মানুষের কাছে আজ যে আবিষ্কৃত, বিজ্ঞান সেক্ষেত্রে খণ্ডিত সময় পরিসর ভিত্তিক অভিজ্ঞতারই সোপান। বিজ্ঞান তাই আধুনিক হয়ে চলে, চেতনার সঙ্গেই যার সম্পর্ক। প্রকৃতি সেক্ষেত্রে কিন্তু কোনো বিশেষ কালের নয়। মানুষ যখন ছিল না, তখন বিজ্ঞানও ছিল না, কিন্তু প্রকৃতি ছিল। মানুষ যে একটু একটু করে হয়ে ওঠেই কতগুলো প্রাকৃতিক জগতের ক্রমবিকাশের জৈব অভিব্যক্তি— এই বোধ আমাদের বিজ্ঞানের আবিষ্কার। প্রকৃতিতে এই প্রবণতা

ছিল, এই প্রবণতা এখনও চলছে। কিন্তু সময়ের সংযুক্তিতে এই অভিব্যক্তির প্রক্রিয়া, মানুষের চেতন লোকের স্তর দিয়েও তো সভ্যতার রূপান্তর করে চলেছে। এককোষী প্রজাতির মধ্যে থেকে আজ যে বহুকোষী প্রজাতিরূপে মানুষ এল, তারপরও প্রকৃতির কাজ শেষ হয়ে যায় না। ফলে সময় চলছে। কিন্তু তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মানুষের বোধ— তাকে নিরূপণ করার লক্ষ্য। সে লক্ষ্যও তার অর্জিত-অভিজ্ঞতা থেকে পাল্টায়।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ (২/১৭) যখন বলে—

যো দেবো অগ্নৌ যো অপ্‌সু
যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য্ ওষদীষু যো বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ।

(যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলে, যিনি বিশ্বভুবনে প্রতিষ্ঠ হয়ে আছেন, যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে, সেই দেবতাকে বারবার নমস্কার করি—)[৭১] তখন প্রকৃতির অখণ্ড সত্তাটিকে আবিষ্কার করা হয়ে ওঠে। এই আবিষ্কারই বিজ্ঞানের ফল। প্রকৃতিতে যে আবিষ্কার ছিল না, আমরা আমাদের জ্ঞানালোক থেকে সময় এবং পরিসরের সহযোগে আবিষ্কার করেছি। সময় তাই প্রকৃতির মধ্যে নিবিষ্ট ছিল, কিন্তু তাকে উদ্ধার করে মানুষ। এই জ্ঞানের অভিজ্ঞতাই আমাদের প্রাচীনকে শেখায়, আধুনিককে বোঝায়— তার মেলবন্ধন গড়ে তোলে। 'গোরা' উপন্যাসে বারবারই তাই প্রকৃতির পটে সময়ের ব্যঞ্জনা ধরা দেয় ঋতুর মধ্য দিয়ে, কোনো সময়মাপক যন্ত্রের ভেতর দিয়ে নয়। কেননা, দেশে দেশে মানুষে মানুষে যে বিভেদের সীমানা রচিত, তার ভেতরে ভেতরে প্রাকৃতিক বন্ধনে যে একটি অটুট সত্তা জাগ্রত হয়ে আছে, প্রকৃতি নীরবে তাকে প্রকাশ করে চলে। কিন্তু মানুষ জানে না তার সংযুক্তি। এই জানার জন্য প্রয়োজন প্রকৃতি নয়, প্রকৃতির অনুপ্রেরণা আর মানুষের অভিজ্ঞতা। 'গোরা' উপন্যাসে সময় তাই প্রবাহিত প্রকৃতির মধ্য দিয়ে। কিন্তু তার বিবর্তন গোরার উপলব্ধির ভেতরে। প্রকৃতির দ্বারা সময়কে আর এককভাবে একটি প্রবাহ করে তোলা সম্ভব নয়, মানুষের চিন্তাও তাতে যুক্ত হবার অপেক্ষা রাখে। প্রাচীন ভারত তাই মানবিক দৃষ্টিতে প্রকৃতিকে দেখে, সময় বদলে তার রূপান্তরকে দেখে। আধুনিক কালের ঔপন্যাসিক প্রকৃতিকে দেখার কাজে মানুষের অভিজ্ঞতার ইতিহাসকেও দেখেন। গোরা তাই যে অখণ্ড সত্তাকে আবিষ্কার করে, সেই আবিষ্কারের লক্ষ্যই উপন্যাসের শেষ কথা হয় না। বরং মানুষের মধ্য দিয়ে একটি মানুষের জানার অভিজ্ঞতাই এখানে বড় হয়। গোরাকে তাই নানা কোন্ থেকে,

নানা চোখ নিয়ে ছবিটিকে সুস্পষ্ট করতে হয়। প্রকৃতিকে 'আছে' এবং 'থাকে' সেইসঙ্গে আমি 'দেখি'— সময়ের একটি ক্রমাগত ধাবায় এই যে নানা মাত্রা আনে— উপন্যাস তারই ভাষ্য হতে চায়। হয়তো 'গোরা' উপন্যাসের পর সেজন্যই দৃষ্টিভঙ্গিটাকে মানুষের ব্যক্তিচক্ষুর উপর ছেড়ে দিয়ে 'চতুরঙ্গ' এবং 'ঘরে বাইরে' রবীন্দ্রনাথকে লিখতে প্রাণিত করে।

তবু 'গোরা' উপন্যাস 'চতুরঙ্গে'র মত 'আমি'র আধারে মানুষের চৈতন্য বোধ থেকে সময়ের দর্শক হয়ে ওঠে না। যদিও গোরাব অসংখ্য তর্কের ভেতর দিয়ে তার একটি সময় পরিসর বৃত্ত আত্মপৃথিবীতে সৃষ্টি হয়ে ওঠে । তবু আত্ম আবিষ্কারের লক্ষ্যে সময়কে দেখে নেবার যে বৃহত্তর পরিকল্পনা 'গোরা'তে ওঠে আসে, তা 'চতুরঙ্গে'র মতন কেনো হয় না, তার উত্তর মেলে গোরা এবং শ্রীবিলাসের চরিত্রগত পার্থক্যেই। গোরা যে বিপুল ব্যক্তিত্বে আমাদের দৃষ্টিকে টেনে নিয়ে যায়, সেখানে সে-ই হয়ে ওঠে একটি প্রতিষ্ঠান। তার দেখার ভ্রান্তি কতটুকু খণ্ডিত— সে বিচার তার নেই। তার পরিত্রাণ কেবল নিঃসঙ্গ বিষণ্ণতায়। আর সেই পরিত্রাণের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছানোর জন্য প্রস্তুত আনন্দময়ী, বিনয়, সুচরিতা এবং অদৃশ্য সময়। শ্রীবিলাস সাধারণ বাঙালি, শহুরে ছেলেও নয়। তার 'দেখার' ভেতর দিযেই আমরা দেখি। অথচ ওই সাধারণ গুণ ধর্মটি তার আছে বলেই তার 'দেখা' এবং 'বিচার' সকলের হতে পারে। গোরার মত প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের প্রকাশ থাকলে সেই দেখা-র মধ্যে আমরা অনেককেই তো খুঁজে পেতাম না। গোরা তাই যে মধ্যমণি হয়ে সময়ের আবিষ্কারক হয়ে ওঠে, অথচ তার দৃষ্টিই যে সকল দৃষ্টি নয়— এ কথাটি বোঝাবার জন্যই বিবরণকার রূপে রবীন্দ্রনাথকেই দায়িত্ব নিতে হয়। সময়ের দৃষ্টি যে আজ নানা চোখেব নানা পরিবেশের বিশেষ বিশেষ অভিব্যক্তি— উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথ যোগ্য ব্যক্তির দ্বারাই তা ফোটান। গোরার 'দেশ' আবিষ্কারের মধ্যে যে সাময়িকতার ভ্রান্তি আছে, গোরার বিশ্ববোধ স্বীকৃতিতেই তা স্পষ্ট। আনন্দময়ীর মধ্যে সেই নানা সময়ের বিচ্চুরণ গোরা শেষপর্যন্ত দেখে নেয়। কিন্তু আনন্দময়ীই যে তার দৃষ্টান্ত হয়ে উঠবেন, পাঠক হিসেবে সে কথা তো আমাদের আগেই জানা। শুধু জানার বাকি ছিল, গোরা কিভাবে তা জানবে। শ্রীবিলাসের মত গোরা তো সহজেই যেকোনো মতকে বিশ্বাস করে নিতে পারে না। প্রতিটি ক্ষেত্রে যাচাই করে সে এগোয়। যাকে সত্য ভাবে, তাকে বিশ্বাস করে। কিন্তু যাকে সত্য ভাবে না তাকে বিচার করতে না চাওয়াই গোরার একমাত্র ত্রুটি। তাই যে মানবসত্যের পথে ভুল লক্ষ্যটি তার চোখে সাময়িকভাবে মোহের দ্বারা আবির্ভূত হয়, তাকে বিচার করে চলার ধৈর্য্য গোরার থাকে না। গোরা তাই আনন্দময়ীকে পেয়েও হারায়। জন্মরহস্য

উদ্ধারে সেই ত্রুটিটুকু সংশোধন করেই গোরা মিলিত হতে পারে। সাময়িক কাল শুধু নয়, গোরার আত্মবৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসাটাই হয় যার প্রথম এবং প্রধান কথা।

গোরার নিজের বিশ্বটি যোগ্য সময় পরিসরে তৈরি হয়ে ওঠার লক্ষ্যে একদিকে সে পায় আনন্দময়ীকে, অন্যদিকে বিরোধী শক্তিতে যুক্ত হয় বরদাসুন্দরী-হারানবাবু প্রমুখ চরিত্র। তাই গোরাকে আলাদা করেই এদের চিনে নিতে হয়। আনন্দময়ী অতএব সেকাল এবং একালে অবস্থানরত হয়েও একটি কালগত সহজ সংযুক্তি অনুভব করেন। যার পরিচয় পাওয়া যায় উপন্যাসে। তাঁর যৌবনকালে রেলগাড়ি বেশি দূর ছিল না, অর্থাৎ পরিসর বর্ধিত হবার সুযোগ ছিল কম। স্বামী কৃষ্ণদয়াল নব্য আধুনিকতার প্রগতি চিহ্নকে অক্ষয় করার লক্ষ্যে স্ত্রীর হিন্দু সংস্কারকে একটি একটি করে চূর্ণ করেন। সেই পরিবেশে একজন হিন্দু রমণীর পক্ষে ধীরে ধীরে সবকিছু স্বীকার করে নেবার মধ্যে ছিল তাঁর চরিত্রগত প্রসারণশীলতা। তাই বিজ্ঞানের অগ্রগতি তখনও দূর বিস্তৃত না হয়ে ওঠলেও, আনন্দময়ীর পক্ষে আরো বৃহত্তর পরিসর অধিগ্রহণ অসম্ভব ছিল না। কালক্রমে কৃষ্ণদয়ালবাবুর সংকীর্ণ হিন্দু সংস্কারবাদী হয়ে ওঠা প্রবহমানকালের বিপরীত দিককেই আশ্রয় করে। অথচ আনন্দময়ী যে পথে এগোন সে পথ বিজ্ঞানের নব আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই চলে। পেছন ফেরা সেক্ষেত্রে অকল্পনীয়। আইরিশ সন্তান হলেও গোরাকে যে তিনি কোলে তুলে নেন, সেখানে তাঁর সংস্কারের উদারতা কাজ করে। যে উদারতা তিনি শিক্ষার ভেতর দিয়েই পান। উনিশ শতকে একদিকে নব্য আধুনিকদের মনে যেখানে প্রগতি ও রক্ষণশীলতা কাজ করে, তার মাঝখানে নারী হয়েও আনন্দময়ী যথার্থ শিক্ষিতা। শিক্ষাকে তিনি জীবনের সঙ্গে যুক্ত করেন বলেই কোনো জাতের প্রশ্ন তাঁর কাছে আসে না।

অথচ তার পাশাপাশি বরদাসুন্দরী প্রাচীন ও নবীনের এক শিথিল প্রতিমূর্তি। ফলে ব্রাহ্মসমাজে মেয়েদের আধুনিক শিক্ষা যেখানে প্রবেশ করতে পারে সেখানে সকলেই তাকে সহজরূপে ধারণ করতে পারে না। সময় তাই আলাদা পার্থক্য নিয়ে অতি সতর্কতায় নবীন-প্রাচীনের মধ্যে লড়াই করতে ব্যস্ত হয়। ফলে বরদাসুন্দরীর প্রতিটি ব্যবহার প্রমাণ করে দ্বন্দ্বকে, তার কর্মপদ্ধতি দেখে হাসির উদ্রেক হয়। নবীন-প্রবীণের সম্পর্ক না ঘটার বিড়ম্বনা তাকে সইতে হয়।

লক্ষ্য করলে দেখা যায়, গোরা যেখানে তার পরিবারে সময়ের দ্বন্দ্বকে দেখে কৃষ্ণদয়ালের মধ্যে, সেখানে অন্যদিকে সে অনুভব করে তার বিস্তীর্ণ অবকাশ আনন্দময়ীতে। সুচরিতাও বরদাসুন্দরীর মধ্যে দেখে সেই দ্বন্দ্ব, আশ্রয় পায়

পরেশবাবুর কাছে। উপন্যাসে সুচরিতা তাই গোরার মতই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, কেননা যার সঙ্গে গোরা মিলিত হয়ে বৃহত্তর ভারতকেও উপভোগ করবে বলে সেক্ষেত্রে তাকে গোরার উপযুক্ত করেই তোলেন রবীন্দ্রনাথ। আবার সেইসঙ্গে কতগুলো অদ্ভুত মিলকেও তৈরি করে তোলেন দু'জনের মধ্যে। গোরা কৃষ্ণদয়ালের ঔরসজাত এবং আনন্দময়ীর গর্ভজাত সন্তান নয়; সুচরিতাও পরেশবাবু-বরদাসুন্দরীর নিজ সন্তান নয়। দু'জনেই পালিত, আর দু'জনেই দুটো পরিবারে অন্যদের থেকে ব্যতিক্রমী।

তবে এই দু'জনের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমধর্মীতাকে দেখাবার জন্যই লেখক কি তাদের আত্মজ থেকে দূরে টেনে আনেন! আমাদের মনে হয়, এখানেও একটা সময়ের সূত্রকে ধরতে চাওয়া হয়। সময় সম্পর্কে এ ব্যাপারটি আজ স্পষ্ট, যে টুকরো মুহূর্তগুলোকে আমরা সেই টুকরো পরিসীমায় দেখে নিতে পারি তাতে একটি আরেকটির সম্পর্ক বন্ধনে মুখশ্রী আবিষ্কৃত হতে পারে। কিন্তু সেই সময় অণু দিয়ে পূর্ণাঙ্গ চিত্রটিকে একসঙ্গে বুঝতে হলে তাকে তখন বিশেষ বীক্ষণ কেন্দ্র থেকে কিছুটা দূরত্বে দেখতে হয়। শুধু একটি আরেকটির সংযুক্তি ধরে তাকে বিচার করার অবকাশ নেই। এক একটি ফুলের সূত্র দ্বারা সংযুক্তিতে বড় জোর তাকে পুষ্প সমাহার বলা যেতে পারে, পুষ্পমাল্য হয়না। মাল্য কথাটি এখানে যখনই আসে, তখন একসঙ্গে সমস্ত ফুলের একটি সামগ্রিক মূর্তি এককরূপে চোখে প্রতিভাত হয়। মাল্যকে খুঁজলে তাই বিশেষ ফুলটি হারিয়ে যায়, বিশেষ ফুলটি দেখতে চাইলে মাল্য থাকে না। সময়ের সম্পর্কেও তা বলা যেতে পারে। 'গোরা' উপন্যাসকে তাই বিশেষ করে একরকম ভাবা যায়, নির্বিশেষ করেও আরেকভাবে ভাবা যায়। তাতে একদিকে সময়ের 'Micro' রূপ ধরে যেমন 'বিশেষ গোরা', বিশেষ সুচরিতা'র চিত্র আসে; তেমনি তাদের সুশৃঙ্খল সংযুক্তিতে মূল্যবোধের সামগ্রিক ফলও আসে।

কিন্তু 'গোরা' উপন্যাস এখানেই শেষ নয়। বরং উপন্যাসের যেখানে সমাপ্তি ঘটে, সেখানে ভবিষ্যতের যে উপক্রমণিকা ভেসে ওঠে সে হয় গোরা ও সুচরিতাকে ছাড়িয়ে বিপুল ভারতবর্ষের কথা। সময়ের 'Macro' বোধ তখন যদি আমাদের গোরা-সুচরিতাকে না ভোলাতে পারে, তবে বৃহত্তর পটচিত্রে সভ্যতা সমাজকে আমরা পেতেই পারি না। পৃথিবীকে খুঁজতে গিয়ে বারবারই বাধা হয়ে দাঁড়ায় কলকাতা ও ভৌগোলিক ভারতবর্ষ। তাই 'গোরা' উপন্যাস যে পরিসরকে বিস্তীর্ণ করতে চায়, সেই বিস্তীর্ণ পরিসরে আমাদের নিয়ে যাবার লক্ষ্যে গোরা ও সুচরিতাকে ক্ষণিক ভুলতে হয়। এই লক্ষ্যেই বোঝা যায়, তারা কোথাও যুক্ত হয়ে একটি সময়ের

স্বরকে ধারণ করছে, কোথাও বিযুক্ত হয়ে অন্য সময়টিকে প্রমাণ করছে। গোরা তাই কৃষ্ণদয়াল-আনন্দময়ীর সন্তান, আবার রক্তের সম্পর্কে কেউ নয়। অন্যদিকে সুচরিতা পরেশবাবুর কন্যা, অথচ বন্ধু কন্যা।

উপন্যাস সময়েরই কথা, সময়েরই প্রকাশ। তবু উপন্যাস ইতিহাস দর্পণ নয়। গোরা যে চরম হিন্দুয়ানা দেখায়, সেটা যুগের ইতিহাস। গোরা যে গোটা সভ্যতাকে ধরতে চায়, সেটা ব্যক্তির ইতিহাস। কিন্তু সত্য কিভাবে বারবার পরিবর্তিত হয়, কিভাবে আনন্দময়ী, বিনয়, পরেশবাবু, সুচরিতার মধ্য দিয়ে কৃষ্ণদয়াল, বরদাসুন্দরী, পানুবাবুদের অতিক্রম করে গোরার অস্তিত্ববোধে নূতন নূতন মাত্রা যোগ হয়, তার কোনো ইতিহাসের পুচ্ছ ধরে বিচার চলে না। বরং ইতিহাসই পরিপূর্ণতা পেতে পারে উপন্যাসের সঙ্গে সম্পর্ক বন্ধনে। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সারা ভারতের আন্দোলন আজ ইতিহাসের সুপ্রচলিত বিবৃতি। যারা মুক্ত ভারতবর্ষের জন্য শহীদ হয়েছেন, তাঁরা আমাদের নমস্য। কিন্তু কতকগুলো সাহেবকে মেরে বন্দেমাতরম্ শব্দের যে অপপ্রয়োগ এবং তার দ্বারা যে নেশার সৃষ্টি, তা দলের আত্মতৃপ্তি হতে পারে। কিন্তু সংগ্রামের বৃহত্তর সমাগ্রিকতায় টেনে আনার সুচিন্তিত পরিকল্পনা তাতে থাকতে পারে না। বন্দেমাতরম্ শব্দকে ভাঙিয়ে কেউ তাকে আত্মহত্যার হাতিয়ার করে তোলে, কেউ করে আত্মউদ্ধারের। 'ঘরে বাইরে'র সন্দীপ যার প্রবল নিদর্শন। 'গোরা' তথাকথিত রাজনৈতিক ইতিহাস হতে চায় না, তাই তাঁর ভারতবর্ষের অনুসন্ধান ভারত মাতার অনুসন্ধান নয়। এই সন্ধান নানা অবতলের দ্বারা সাজিয়ে রাখা। নূতন কালের আলো তাই বারবারই আঞ্চলিকতাকে সরিয়ে রাখতে চায়। গোরা তাই সুচরিতার সঙ্গে যুক্ত নয়। উনিশ শতকের ইতিহাস দিয়ে তার বিচার নয় বলে, তারা একালের এবং আমাদের সুখ-দুঃখের প্রতিদিনের নিঃশ্বাস হয়ে ওঠে। তাই গোরা ও সুচরিতা আমাদের মধ্যে মিশে থাকে, ইতিহাসের মধ্যে ইতিহাস গড়ে। আর সেই ইতিহাস গড়তে যে প্রভাবমুক্ত হয়ে পুনর্গঠন চলতে থাকে — সেখানে গোরা ও সুচরিতা কার ঔরসজাত এবং গর্ভজাত— তা বড় হয় না। কাদের দ্বারা পালিত এবং সেই সঙ্গে তাঁদের ছুঁয়ে কতটুকু প্রভাবমুক্ত— নির্দিষ্ট হয়। 'চোখের বালি' থেকেই প্রতিমা নির্মাণে এই সময়ের অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথ সম্প্রসারিত করেন।

নিজ গর্ভজাত-ঔরসজাত সন্তানকে শুধু প্রভাবিত নয় কতটুকু নিয়ন্ত্রণ করার পক্ষপাতি হয়ে ওঠে, তার প্রমাণ হয় মহেন্দ্রের প্রতি রাজলক্ষ্মী (চোখের বালি) এবং রমেশের প্রতি ব্রজমোহনবাবুতে (নৌকাডুবি)। এ ব্যাপারে গোরা ও সুচরিতার ক্ষেত্রে কৃষ্ণদয়াল-বরদাসুন্দরী কোনোভাবেই তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না।

যদিও তাদের অনুপ্রেরণার মাধ্যম হয় আনন্দময়ী এবং পরেশবাবু। কিন্তু গোরা ও সুচরিতা তাদের প্রেরণাকে স্বীকৃতি দেয় নিজের বিচারশক্তির দ্বারাই। পরেশবাবু ব্রাহ্ম হলেও সাময়িক উগ্রতা নিয়ে হারানবাবু গোষ্ঠীর মত কোনোদিনই আত্মবিচারকে সকলের বিচার করে তোলেন না, আনন্দময়ীও তাই। তাঁদের কাছে সব পথই খোলা, অতএব হিন্দু পরিবারের মেয়ে হয়েও মানবতাকে তিনি জাতপাতের উর্ধ্বে তোলেন। পরেশবাবু একদা কৃষ্ণদয়ালের বন্ধু এবং নূতন মূল্যবোধে দীক্ষিত হয়েও গভীরতা দিয়ে আলাদা করেই শেখেন বলে হারানবাবুদের মতন তার পারিবারিক অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে আসার আর্তি ছিল, কিন্তু তাদের মতন সামাজিক অন্তঃপুর তৈরি করার উদ্দেশ্য ছিল না। কাজেই কোনো মতকেই তারা অন্যের উপর চাপান না, বিচার করতে বলেন। গোরা ও সুচরিতা সেই বিচার দিয়েই সম্মিলিত হয়, পুনর্গঠন চলে। কোনো ধর্মের নামে, কোনো মানবতাবাদের নামে, গোরা ও সুচরিতার পূর্বপুরুষদের অনুসন্ধানের নামে তার বিচার আজ হতে পারে না। বরং এগুলো ততধিক গৌণতা নিয়ে উপন্যাসের ফলশ্রুতিতে কতটুকু আমাদের সমকালটির সচেতনতা বাড়ায়— তার ধারাবাহিক বিবর্তন 'চোখের বালি' থেকে 'গোরা'তে পূর্ণতা লাভ করে। সমালোচকও বলেন—

"রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের ধারাবাহিকতার মধ্যে যদি কোনো পর্ববিন্যাসের সুযোগ থাকে তবে 'গোরা' নিঃসন্দেহে তাঁর দ্বিতীয় পর্বের শীর্ষভূমি। প্রথম পর্বে ইতিহাসের পটে ধরা মানুষের স্বরূপ খুঁজেছেন কবি প্রতাপাদিত্যের বিকৃত সত্তা ও গোবিন্দমাণিক্যের প্রকৃত সত্তার বিপরীত তুলনা ভূমিতে। বলা বাহুল্য রবীন্দ্রভাবনা সেখানে চরিতার্থ হয়েছে গোবিন্দমাণিক্যের রাজর্ষি স্বভাব ও সত্তায়। অতঃপর সামাজিক ক্ষেত্রে তাঁর যে অবতরণ ও প্রসারণ, তার চমৎকৃতি ও সমুন্নতি গোরায়।"[৭২]

তাই সময়কে দিয়েই বার বার ঘুরে দেখা আমাদের এই সমকালীন অভিজ্ঞতা— আরো অন্তর্দীপ্ত হবার আবেদন রাখে।...

উল্লেখপঞ্জি

১। অন্তর্বয়ণ ঃ কথা সাহিত্য।। পার্থ প্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়।। প্রথম প্রকাশ।। একুশে।। পৃষ্ঠা - ৬

২। উপন্যাসের সময় ।। তপোধীর ভট্টাচার্য।। প্রথম প্রকাশ।। এবং মুশায়েরা।। পৃষ্ঠা - ১৩

৩। অন্তর্বয়ণ ঃ কথা সাহিত্য।। তদেব।। পৃষ্ঠা - ৭

৪। তদেব।। পৃষ্ঠা - ৭

৫। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস।। রাতের তারা দিনের রবি।। সম্পা ঃ উজ্জ্বল কুমার মজুমদার।। প্রথম সংস্করণ।। আনন্দ পাবলিশার্স।। পৃষ্ঠা - ৭১

৬। রবীন্দ্রসৃষ্টি সমীক্ষা (দ্বিতীয় খণ্ড)।। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।। ওরিয়েন্ট।। পৃষ্ঠা - ৩৫১
৭। শ্রেণীচেতনা, বিভ্রান্তি, রবীন্দ্র উপন্যাস প্রসঙ্গ ঃ যোগাযোগ।। ক্ষেত্র গুপ্ত।। আধুনিক বাংলা সাহিত্য প্রতিভাঃ স্বাতন্ত্র্য বিচার।। প্রথম সংস্করণ। এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ।। পৃষ্ঠা - ৯৭
৮। সময়ের মুখ।। ই.সি.জি. সুদর্শন,। ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০২ 'দেশ' সাপ্তাহিক।। পৃষ্ঠা - ২৩
৯। রবীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড)।। পৃষ্ঠা - ২৮৬
১০। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে নবজাগরণ।। সুশীল জানা। উনিশ শতকের বাংলার জাগরণ।। প্রথম প্রকাশ।। কে. পি. বাগচি। পৃষ্ঠা - ২২০
১১। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর।। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়।। পরিবর্ধিত প্রথম দে'জ সংস্করণ।। পৃষ্ঠা - ২০০
১২। রবীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড)।। পৃষ্ঠা - ২৮৭
১৩। গোরা ঃ চিরকালের সমকাল।। দেবেশ রায়।। দেশ ঃ ২৩ জানুয়ারি ১৯৯৯ সংখ্যা।। আনন্দ।। পৃষ্ঠা -২৮
১৪। উনিশ শতক ঃ নবজাগরণ ও বাঙ্‌লা উপন্যাস। বদরুল হাসান।। জগৎমাতা পাবলিশার্স।। প্রথম প্রকাশ।। পৃষ্ঠা - ১৬৯
১৫। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ঃ নবমূল্যায়ণ।। অমরেশ দাস।। প্রথম প্রকাশ।। মণ্ডল।। পৃষ্ঠা - ১৫৪
১৬। আধুনিকতা, উত্তর আধুনিকতা ও একটি বিকল্পের অনুসন্ধান।। অমল চট্টোপাধ্যায়।। প্রথম পুনর্মুদ্রিত প্রকাশ।। ভারতী।। পৃষ্ঠা - ১৭
১৭। রবীন্দ্রনাথের নারী ও তাদের বাস্তবতা।। মালিনী ভট্টাচার্য।। গল্পগুচ্ছঃ বিশেষ রবীন্দ্রসংকলন, ষষ্ঠ বর্ষ-দ্বিতীয় সংখ্যা।। পৃষ্ঠা - ৮৬
১৮। রবীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড)।। বিশ্বভারতী।। পৃষ্ঠা - ৫০৯
১৯। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ।। শিবনাথ শাস্ত্রী।। তৃতীয় সংস্করণ।। নিউ এজ।। পৃষ্ঠা - ১৯২
২০। ২৩ জানুয়ারি ১৯৯৯ 'দেশ' সাপ্তাহিকে 'চিঠিপত্র' বিভাগে এ ব্যাপারে একটি বিতর্ক ওঠে। তাতে বিধবা কুন্দের সঙ্গে নগেন্দ্রদত্তের বিবাহ সুখের না হবার নিদর্শন দেখানো হয়। অন্যপক্ষে বিধবা পরিচয়টা দায়ী না হয়ে সুখী না হবার মূল কারণ অনুসন্ধান করা হয় বহুবিবাহে। তবু এ কথাটি যিনি বলেন, তাকেও স্বীকার করতে হয় বঙ্কিমের অভিপ্রায় শুভ থাকলেও সমকালীন সমাজের বিধবাবিবাহের আইনসিদ্ধ পথটি ধরে যে কি মন্দ প্রভাব পড়তে পারে, বঙ্কিম তার জন্য ভীত ছিলেন। অতএব মৌলিকভাবে 'বিষবৃক্ষ' বিধবাবিবাহকে সাবলীলভাবে আনছে না— লেখক তাকে সমর্থন করেন কি করেন না, সে অন্য কথা।
২১। রবীন্দ্র উপন্যাস ঃ ইতিহাসের প্রেক্ষিতে।। ভূদেব চৌধুরী।। প্রথম প্রকাশ।। দে'জ। পৃষ্ঠা - ৪০
২২। আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস।। অশ্রুকুমার সিকদার।। প্রথম প্রকাশ।। অরুণা প্রকাশনী।। পৃষ্ঠা - ৫
২৩। রবীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড)।। পৃষ্ঠা - ৫০৯

২৪। তদেব।। পৃষ্ঠা - ৫১০
২৫। উনিশ শতকী বাংলা নবজাগরণের গৌরব ও অপূর্ণতা।। প্রবন্ধ সংগ্রহ।। অম্লান দত্ত।। আনন্দ।। প্রথম সংস্করণ।। পৃষ্ঠা - ২৮৬-৮৭
২৬। সময়ের কাছে।। জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ।। (দ্বিতীয় খণ্ড)।। বেঙ্গল পাবলিশার্স।। পৃষ্ঠা - ৪২
২৭। 'নৌকাডুবি'র সূচনা।। রবীন্দ্ররচনাবলী (পঞ্চম খণ্ড)।। পৃষ্ঠা - ১৬৫
২৮। রবীন্দ্রজীবনী (দ্বিতীয় খণ্ড)।। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়।। বিশ্বভারতী।। পৃষ্ঠা - ৭৭
২৯। রবীন্দ্র উপন্যাসের ভাবনা।। সমরেশ বসু।। রাতের তারা দিনের রবি।। আনন্দ।। প্রথম সংস্করণ।। পৃষ্ঠা - ৫১২
৩০। রবীন্দ্র রচনাবলী (পঞ্চম খণ্ড)।। পৃষ্ঠা - ৩৪৪
৩১। তদেব।। পৃষ্ঠা ৩৮৮
৩২। The Adventure of Criticism।। K. R. Srinivasa Iyengar।। Sterling ।। পৃষ্ঠা ১৩৯
৩৩। তদেব।। পৃষ্ঠা - ১৪০
৩৪। নিভৃত গ্রাম্য ভারতবর্ষ।। বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য।। পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকাঃ রবীন্দ্র সংখ্যা ১৪০৫।। পৃষ্ঠা - ২৮
৩৫। পল্লী ও নগর।। প্রবন্ধ সংগ্রহ।। অম্লান দত্ত।। আনন্দ।। প্রথম সংস্করণ।। পৃষ্ঠা - ২৩৩-২৩৪
৩৬। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ঃ নবমূল্যায়ণ।। অমরেশ দাশ।। মণ্ডল।। প্রথম প্রকাশ।। পৃষ্ঠা - ১৫৪
৩৭। British Empire in India reprinted from the Enquirer, "The India Gazette, 10.2.1832.
৩৮। সমাচার দর্পণ ২৯.১০.১৮৩১।। পৃষ্ঠা - ৩৫৯
৩৯। বাংলার নবচেতনার ইতিহাস।। স্বপন বসু।। পুস্তক বিপণি।। তৃতীয় সংস্করণ।। পৃষ্ঠা - ৪৮
৪০। তদেব।। পৃষ্ঠা - ৪৮
৪১। তদেব।। পৃষ্ঠা - ১০৮
৪২। উপন্যাসে সমাজ দৃষ্টি ঃ বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ।। জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।। ১৯৯০ প্রকাশ।। পৃষ্ঠা - ১৯১
৪৩। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ঃ নবমূল্যায়ণ।। অমরেশ দাশ।। মণ্ডল।। প্রথম প্রকাশ।। পৃষ্ঠা - ৬২-৬৩
৪৪। Jerusalem Address: The Novel and Europe।। The Art of the Novel।। Tr. by Linda Asher।। Rupa।। First Pub.।। পৃষ্ঠা - ১৫৮
৪৫। বঙ্কিম চন্দ্র অবশ্য 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে তিলোত্তমার কুমারী প্রেম লিপিবদ্ধ করেন। এছাড়াও 'রাধারাণী'র রাধারাণী, 'রাজসিংহে'র চঞ্চল কুমারী-র কথাও ধরা যায়। তবে যে অর্থে উনিশ শতকের প্রেক্ষাপট, সেখানে কুমারী প্রেমের অবস্থান স্বাভাবিক ভাবেই আসে না।

৪৬। Jerusalem Address: The Novel and Europe।। The Art of the Novel।। Milan Kundera।। Tr. by Linda Asher।। Rupa।। First Pub.।। পৃষ্ঠা - ১৬২
৪৭। তদেব।। পৃষ্ঠা - ১৬২
৪৮। রবীন্দ্র রচনাবলী (পঞ্চম খণ্ড)।। পৃষ্ঠা - ৩৬২
৪৯। তদেব।। পৃষ্ঠা - ৩৬৩
৫০। তদেব।। পৃষ্ঠা - ৪৩২
৫১। ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ।। রণেন্দ্র নারায়ণ রায়।। দাশগুপ্ত।। পৃষ্ঠা - ৯৩
৫২। রবীন্দ্র জীবনী (দ্বিতীয় খণ্ড)।। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়।। বিশ্বভারতী।। পৃষ্ঠা - ৩৫৫।
৫৩। Time and Social Structure: An Ashanti Case Study।। Social Structure, Studies presented to A. R. Radeliffe-Brown।। 1963।। New York।। পৃষ্ঠা - ৫৬
৫৪। Towards A New World।। S. Radhakrishnan।। First Pub.।। Orient।। পৃষ্ঠা - ১৫
৫৫। তদেব।। পৃষ্ঠা - ৯
৫৬। এ ব্যাপারটি খুবই আশ্চর্যের যে, কি বিজ্ঞান, কি কলা, কি সাহিত্য, কি শিক্ষা, কি বাণিজ্য, কি রাষ্ট্রতন্ত্র— সকল দিক দিয়েই তা বিশেষ একটি দেশকালকে অতিক্রম করে উন্মুক্ত হয়ে আছে। অথচ ব্যক্তিগত ধর্মবোধ যুগের চলমানতায় তাল রক্ষা করতে পারে না। যে বিশ্বজ্ঞানকে সে সত্য বলে মনে করে, বিশ্বমানবের সহজ ধর্মকে বর্ণান্ধ করে দেখে। ফলে মানুষ একদিকে বিজ্ঞান, সমাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ে আধুনিক ও আধুনিক-উত্তরবাদী; আর ধর্মের বেলায় সে প্রাচীন, কিংবা প্রাচীনকে ছাড়িয়েও আরো সুদূর অতীতের প্রাগৈতিহাসিক যুগের পথযাত্রী। এই অদ্ভুত পরস্পর সঙ্গতিহীন বিপরীত যাত্রা কোনো মূল্যমানে গিয়ে পৌছাতে পারে না বলেই মানুষ তার আত্মপরিচয়কে হারায়। চিন্তাবিদদের মধ্যেই প্রশ্ন জাগে, একজন খ্রিস্টান কিংবা একজন হিন্দু হয়ে বিশ্বজনীন হওয়া সম্ভব কিনা।
৫৭। Jerusalem Address: The Novel and Europe।। The Art of the Novel।। Milan Kundera।। Tr. by Linda Asher।। Rupa and co.।। First Pub.।। পৃষ্ঠা - ১৫৯-১৬০
৫৮। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর।। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়।। দে'জ।। পৃষ্ঠা - ১৬৪
৫৯। তদেব।। পৃষ্ঠা - ১৬৩-১৬৪
৬০। সংস্কৃতি, সমাজ ও অর্থনীতি।। অমিয় কুমার বাগচি।। অনুষ্টুপ।। ১৯৯৫ বইমেলা প্রকাশ।। পৃষ্ঠা - xvi
৬১। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (সপ্তম খণ্ড)।। অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।। মডার্ন।। পৃষ্ঠা - ২২-২৩। গ্রন্থটিতে যে আলোচনা আছে, সংক্ষেপে তা এরকম— ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন সিপাহী বিদ্রোহকে ধর্মীয় জেহাদ থেকে ক্রমে স্বাধীনতা যুদ্ধে পরিণত হবার কথা বলেন। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তেরও সেই মত। তিনি মনে করেন এই যুদ্ধে 'mutiny' ও 'rebellion' একসূত্রে মিলিত হয়। অন্যদিকে স্যার জন লরেন্স ও সীলি ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা মনে করেন যে, এই বিশৃঙ্খলা বিদ্রোহ ছাড়া আর কিছুই নয়। রীজ সাহেব আবার একে সংকীর্ণ

সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে বিচার করেন।

৬২। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ।। শিবনাথ শাস্ত্রী।। তৃতীয় সংস্করণ।। নিউ এজ্।। পৃষ্ঠা - ২৪৮
৬৩। নায়কের বিবর্তনঃ বাংলা উপন্যাসে।। শ্যামল সেনগুপ্ত।। সাহিত্য বিহার সংস্করণ।। ওরিয়েন্টাল বুক।। পৃষ্ঠা - ৮৫
৬৪। রবীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড)।। বিশ্বভারতী।। পৃষ্ঠা - ১৯৪
৬৫। তদেব।। পৃষ্ঠা - ৫৭২
৬৬। তদেব।। পৃষ্ঠা - ১১৩
৬৭। যুগলের নিঃসঙ্গতা।। আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস।। অশ্রুকুমার সিকদার।। পৃষ্ঠা - ২১
৬৮। আধুনিক যুগসংকট এবং রবীন্দ্রচিন্তার প্রাসঙ্গিকতা।। রাতের তারা দিনের রবি।। বিমল কৃষ্ণ মতিলাল।। আনন্দ।। পৃষ্ঠা - ৩৫২
৬৯। তপোবন।। রবীন্দ্র রচনাবলী (একাদশ খণ্ড)।। জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ।। পৃষ্ঠা - ৫৮৯
৭০। অভিভাষণ— বিশ্বভারতী সম্মিলনী।। রবীন্দ্র রচনাবলী (ত্রয়োদশ খণ্ড)।। পৃষ্ঠা - ৫৪৭
৭১। রবীন্দ্রনাথ ঃ মানুষ ও প্রকৃতি ঃ অদ্বয়বোধ ও দ্বন্দ্ব।। ভবতোষ চট্টোপাধ্যায়।। রাতের তারা দিনের রবি।। আনন্দ।। পৃষ্ঠা - ৩৩১
৭২। নায়কের বিবর্তন ঃ বাংলা উপন্যাসে।। শ্যামল সেনগুপ্ত।। ওরিয়েন্টাল।। পৃষ্ঠা - ৮৮-৮৯
৭৩। সময়ের সমগ্রতা।। শঙ্খঘোষ।। এই সময় ও জীবনানন্দ।। সাহিত্য অকাদেমি।। ১৯৯৮ সংস্করণ।। পৃষ্ঠা - ১০

চতুর্থ অধ্যায়

চতুরঙ্গ ও ঘরে বাইরে ঃ সময়ের মুখচ্ছবি

মানুষ যখন ক্রমাগত আধুনিক হতে থাকে, বিভেদকে তখন গুড়িয়ে চলাই তার অভ্যাস হয়ে পড়ে। সেই সঙ্গে নৈঃশব্দের পথ পেরিয়ে পাঁজরে অনুভব করে সময়ের দাঁড়ের শব্দ— আমরা বেঁচে আছি, আমরা চলছি। আধুনিককে তাই কাছে পেয়েও আমরা তৃপ্ত নই। সময়ের আরো মহোত্তম উত্তরাধিকারের বাসনায়, আরো কাছাকাছি আধুনিককে পেতে আধুনিককেই ছেড়ে যেতে হয়। উত্তর আধুনিকতা তাই একালের আমাদের চলমান প্রবৃত্তির প্রতিচ্ছায়া।

রবীন্দ্রনাথ একজন উত্তর আধুনিক-ঔপন্যাসিক হতে পারতেন। তার কারণ, আধুনিক বৃত্তকে গুড়িয়ে তিনি বারবারই আরো নিদারুণ আধুনিক। করুণার সঙ্গে বিনোদিনী, গোবিন্দমাণিক্যের সঙ্গে গোরাকে মিলিয়ে দেখলে সেই আধুনিকতার গতিস্পন্দন ধরা পড়ে। শুধু লেখকই যে সময়-প্রবাহধারায় চলেন— তা নয়, উপন্যাসের প্রাণশক্তিও 'আধুনিক সাধারণ্যে'[১] প্রতিষ্ঠার লড়াই চালায়।

তবু উত্তর আধুনিক সবাই হতে চান না। কারণ 'উত্তর আধুনিক' কথার মধ্যে আরেক বৃত্তগত সীমানা টানা রয়েছে। আধুনিকের সঙ্গে সম্পর্ক থাকলেও তা যেন একটু উচ্চতায় নিম্নবর্গ-উচ্চবর্গের শ্রেণীবিভেদকে ধরিয়ে দিতে চায়। যে আধুনিকতা মহাসময়ের আত্মীয় সম্পর্কে ক্রমশ ব্যবধান থেকে সম্মিলনের পথে চলে, তার উর্ধ্বগতি কি কখনো গণ্ডী টেনে নিরাপত্তা আদায় করে!

রবীন্দ্রনাথকে উত্তর আধুনিক হতে হয় না, অথচ তিনিই লেখেন 'গোরা'র মত মহাসময়ের উপাখ্যান। ব্যাস-বাল্মীকিও মহাভারত-রামায়ণ লিখেছেন— সময়ের নানা স্বরকে ছড়িয়ে দিয়েছেন সেই সৃষ্টি বিশ্বে। তাঁদের ক্ষেত্রে উত্তর আধুনিকতার প্রশ্ন তোলা প্রলাপ বলেই বিবেচ্য। অথচ রামায়ণ-মহাভারত আধুনিক, আবার ঔপন্যাসিক রবীন্দ্র-বিশ্বও আধুনিক। দুই আধুনিক কি এক— এই প্রশ্ন এক্ষেত্রে অবান্তর। কেননা, জীবনের সব প্রতিমাই এক নয়, তাদের মুখশ্রী ভিন্ন। আর এই ভিন্নতা বিভেদ নয়, নানা চোখে দেখার আকাঙ্ক্ষা। সাহিত্য, তথা উপন্যাস সেই আকাঙ্ক্ষার মধ্যেই সঞ্জীবিত। বিশ্বকে নূতনভাবে দেখার জন্য নূতন সময়ের

অভিজ্ঞতা নিয়ে আধুনিকের পর আধুনিকের মালা সাজানো। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' রচিত হবার পরও তাই রবীন্দ্রনাথের হাত ছুঁয়েই দেখার অন্বেষণ পাল্টায়— রবীন্দ্রনাথই হন রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী।

পরবর্তীর জন্য পূর্ববর্তীকে পাল্টাতে হয় না। পরবর্তী তাকে নিজের মত নির্মাণ করে— অস্তিত্বের জন্য, সময়ের অব্যাহত শক্তির নিদারুণ ধাক্কায়। রামায়ণ-মহাভারতের নানা চরিত্রের মধ্যে উর্মিলা-একলব্য-শম্বুককে বোঝার জন্য আমাদের সময়ের প্রয়োজন হয়। তাদেরকে আধুনিক করে তোলার জন্য বাসনা জাগে আমাদের সমকালটির। 'আধুনিক' দ্রৌপদীর অনন্ত শাড়ির মত নানা রঙ নিয়ে শিল্পকে বাঁচিয়ে ভাঁজ খুলে খুলে বেরিয়ে আসে। রবীন্দ্রনাথ তাই 'রাজর্ষি'র পর 'চোখের বালি'-'নৌকাডুবি' হয়ে 'গোরা'য় পৌঁছে আধুনিক হন— উত্তর আধুনিক নয়। 'গোরা'কে সৃষ্টি করেও সেই আধুনিকতা নিয়ে তিনি নানা মুখশ্রীর সন্ধানে সোপানের উচ্চশিখর স্পর্শ করেন। তাঁকে যে শেষ পর্যন্ত অতি আধুনিক, কিংবা উত্তর আধুনিক হতে হয় না, তার কারণ, আধুনিকতার মধ্যেই রয়েছে প্রবহমান ধর্ম। প্রবাহের থেকেই প্রবাহের নানা শাখা বিস্তৃত, সেই বিস্তৃত পথেই নানা মুখশ্রীর সন্ধান।

'গোরা' উপন্যাসে পথ প্রতিষ্ঠা হবার পর তাই 'চতুরঙ্গে'র ধ্রুবপদ 'সাধ মিটিল না, জন্মান্তরে আবার যেন তোমাকে পাই'[২]— ব্যক্ত-অব্যক্ত স্বরে নূতনভাবে আভাসিত। এই স্বরতরঙ্গে উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র দামিনীর শেষ এবং সফল উচ্চারণকে ধরে গোরা, সুচরিতা, বিনয়, নলিনাক্ষ, হেমনলিনী, কমলা, বিনোদিনী, বিহারীরা মিশে থাকে; মিশে থাকে সাধারণের মধ্যে, অসাধারণের লক্ষ্যে।

তবু 'চতুরঙ্গ' প্রতিমা থেকে মুখশ্রীর অনুসন্ধান নয়— নানা মুখশ্রীর আলো ধরে আত্মমুখশ্রীর স্বীকৃতি। সময়কে জীবনের মধ্য দিয়ে খুঁজে দেখার একটি অন্য পালাবদল। এই অন্য পালাবদলটি ধরা পড়ে ভূমিকাতেই। ইতিপূর্বে তাই সতর্ক দৃষ্টিতে 'চোখের বালি' এবং 'নৌকাডুবি'তে যে সূচনা অংশ যোগ করা হয়, 'গোরা'তে তা পরিত্যক্ত। উপন্যাসকে বোঝানোর দায়িত্ব ভূমিকার নয়, তবু 'চতুরঙ্গে' যে পুনরায় ভূমিকা যুক্ত— তার একটি অন্য কারণ হিসেবে প্রাথমিকভাবে বলা যায়— যে-অর্থে আগের উপন্যাসগুলোর ভূমিকা উপর থেকে উপাখ্যানে চাপান, উপাখ্যান অন্তর্ভুক্ত নয়; 'চতুরঙ্গে' শ্রীবিলাসের আত্মকথনে এই ভূমিকা ভেতর থেকে ওঠে আসা। শুধু তাও নয়, সরল ভাবে যে দুটো বাক্য রাখা হয়— স্বভাবতই তাতে সব কথা বলতেও চাওয়া হয় না। জীবনের নিঃশব্দ বাণীচিত্রকে আকার দেবার লক্ষ্যে লেখক কিংবা কথক শ্রীবিলাস এখানে বাক্‌কুণ্ঠ।

সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর আলোচনায় 'ভূমিকা'র সরল ভাষ্যকে স্বীকার করতে চান না। বলেন—

"বইখানির এই চারি অংশের জন্যই একে চতুরঙ্গ নাম দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ এ-কথা মেনে নিলে বইটির প্রতি সুবিচার করা হয় না।"[৩]

এই অভিমত সমর্থনযোগ্য। তবে 'চতুরঙ্গ' নামের সার্থকতা প্রতিপন্ন করতে শুধু শচীশ ও দামিনী জীবনের সুস্পষ্ট চারটি পর্যায় ধরে[৪] ব্যাখ্যা চলে না, সেইসঙ্গে তাতে সংযুক্ত করতে হয় কাহিনীর আরো অন্য দুটো চরিত্র— জগমোহন এবং শ্রীবিলাসকে। এদের জীবনেও সুস্পষ্ট চারটি অংশ। 'গোরা'র পর জীবনকে নূতন করে বিন্যস্ত করতে অনেক কথাই যেখানে বলা হয় না, প্রচ্ছন্ন থাকে, সময়ের রঙে রাঙিয়ে তাকে আবিষ্কার করা চাই।

আর এই অনুসন্ধানবৃত্তি থেকে বিশেষ লক্ষণীয় হয়ে ওঠে উপন্যাসের পরিসমাপ্তি। যা ঘটে 'শ্রীবিলাস' পর্ব ধরেই। দেখা যায়, কাহিনীর অন্যান্য পাত্রপাত্রীরা জীবনের যে-ছকে ঘোরে, তার একটি মীমাংসা করা হয়। অতএব সময় সম্পর্কে যে বলা হয়—

"The human experience and observation of time has been variously interpreted."[৫]

তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে কথকরূপী শ্রীবিলাসই হয়ে ওঠে গুরুত্বপূর্ণ। হয়তো শ্রীবিলাস এককভাবে সময়ের সব কথা বলে না, কিন্তু তাকে কেন্দ্রে রেখে— তার সমগ্র অনুভূতিতে নিষিক্ত হয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে বেজে ওঠে সময়ের ঘণ্টা। তখন শুধু একটি মুখের মুখশ্রী আবিষ্কারে আমরা বিব্রত হই, খুঁজে নিতে চাই নানা মুখশ্রীর অবয়ব।

যেহেতু 'চতুরঙ্গ' লেখক কথিত আখ্যান নয়, গল্পবক্তা গল্পেরই চরিত্র। তাই সময়ের অনুসন্ধান পর্ব চরিত্রের মানসজগতের বিন্যাস। নানা মুখশ্রী আবিষ্কারের এ এক অনন্য মাত্রা। যেখানে ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের মধ্যে মানস জগতের নানামুখী সময়ের চিহ্ন পড়ে, আর বহু কৌনিকতা নিয়ে গ্রহণ-বর্জনে মিলিত হয় শ্রীবিলাসের অস্তিত্বমুখী আধারে। প্রতিটি চরিত্রের পথ পরিক্রমার একটি নির্দিষ্ট পথ, আর তারই পাশে সবকিছুকে গ্রহণযোগ্য করে তোলা শ্রীবিলাসের জীবনদর্শন— মুঠোতে রেখেও ভরে ওঠে। তাই উপন্যাস শেষ হতে পারে শ্রীবিলাসের সময় অভিজ্ঞানের মূল্যায়ণে, তার সার্থকতায়। 'গোরা' উপন্যাসে বিস্তৃত সময়-পরিসরে গোরাকে ছাড়াও বিনয়, আনন্দময়ী, সুচরিতা, ললিতার আলাদা মাত্রা যুক্ত। কিন্তু 'চতুরঙ্গে' শ্রীবিলাসকে ছাড়িয়ে অন্য চরিত্রগুলো আলাদা হতে পারে না। কারণ, শ্রীবিলাসের অনুসন্ধানী দৃষ্টি থেকে কোনো কৌনিক বিন্দুই মুক্ত নয়। তবু যে দামিনী, শচীশ, জগমোহন— আলাদাভাবে প্রকাশিত হতে থাকে, তার মূলে শ্রীবিলাসের উদার

অন্তঃদৃষ্টি। শ্রীবিলাসের দৃষ্ট জগৎ কোনো অন্তঃপুর নয়। সময়ের আলো এবং অন্ধকার— প্রতিটি স্তরই তাতে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারে। অতএব দামিনীর সঙ্গে আমাদেরও স্বীকার করতে হয় জন্ম-জন্মান্তরে আবার তাকে ফিরে পাবার বাসনা। স্বীকার করতে হয়, শ্রীবিলাস ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই।

কথকরূপী শ্রীবিলাস যেভাবে নিজেকে এবং অন্য আরো তিনটি প্রধান চরিত্রের সময় পর্যটনের চিত্র কাহিনীভুক্ত করে, তা নিম্নলিখিতভাবে দেখানো যেতে পারে—

।। ১ ।। জ্যাঠামশায় জগমোহন ঃ-

।। ২।। শচীশ ঃ-

স্বামীবিলাসের সংযুক্তি, পর্যবেক্ষণ, উপলব্ধি এবং মীমাংসা

প্রথম পর্ব ঃ বিচ্ছিন্ন এক রৈখিক নির্ভরশীলতার প্রথম ধাপ।
পরিণাম ঃ- জ্যাঠামশায়।

দ্বিতীয় পর্ব ঃ বিচ্ছিন্ন এক রৈখিক নির্ভরশীলতার দ্বিতীয় ধাপ।
পরিণাণ ঃ লীলানন্দ স্বামী।

তৃতীয় পর্ব ঃ ব্যক্তি অস্তিত্বের বহু রৈখিক আলোড়ন এবং বিপন্নতা।
পরিণাম ঃ দামিনী।

চতুর্থ পর্ব ঃ অস্তিত্ব সন্ধানে বহু রৈখিক এবং এক রৈখিকের মধ্যে অমীমাংসা।
পরিণাম ঃ সর্বোত্তীর্ণ অবস্থা।

।।৩।। দামিনী ঃ-

শ্রীবিলাসের সংযুক্তি, পর্যবেক্ষণ, উপলব্ধি এবং মীমাংসা
প্রথম পর্ব ঃ প্রতিকূল সময়ের হাতে বন্দি।
পরিণাম ঃ- লীলানন্দ স্বামী।
দ্বিতীয় পর্ব ঃ সময়ের বন্দি দশা থেকে অস্তিত্বসন্ধানী।
পরিণাম ঃ গুরুবিদ্রোহ।
তৃতীয় পর্ব ঃ অস্তিত্ব প্রকাশের ক্ষেত্র এবং ভ্রান্তি।
পরিণাম ঃ শচীশ।
শ্রীবিলাস ও দামিনীর উভয়ের সংযুক্তিতে পর্যবেক্ষণ, উপলব্ধি এবং মীমাংসা
চতুর্থ পর্ব ঃ আত্মনিষ্ঠ সময়ের দ্বৈতালাপে অস্তিত্ব লাভ।
পরিণাম ঃ শ্রীবিলাস।
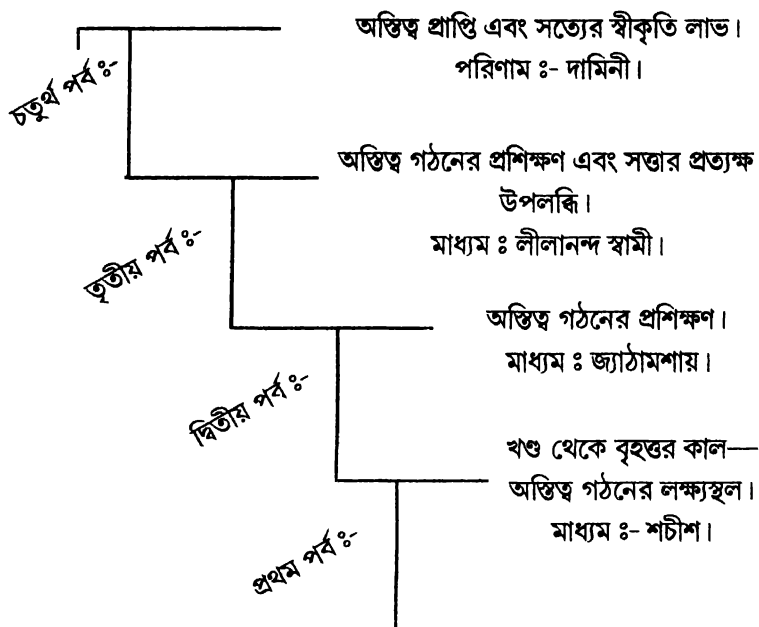
।। ৪ ।। শ্রীবিলাস ঃ-

এখানে প্রথম তিনটি চরিত্রের ক্ষেত্রে শ্রীবিলাস নিজেকে তাদের সঙ্গে যুক্ত রেখে সময়ের নানা চলনকে উপভোগ করে এবং 'পরিণাম' দেখে তার কোনো কোনো ক্ষেত্রে অব্যক্ত, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যক্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। আর সমস্ত কিছুকে জুড়েই তার নিজের চলার পথটুকু সোপানের উচ্চশিখরে পৌঁছায়। আমরা লক্ষ্য করি, শ্রীবিলাসকে বাদ দিয়ে আরো অন্য তিনটি প্রধান চরিত্রের মধ্যে দামিনীর চলন আলাদা হতে চায়। সে কারণেই শ্রীবিলাসের যোগ্য পরিপূরক সে হতে পারে। এ ব্যাপারে জ্যাঠামশায় এবং শচীশ— উভয়ের চতুর্থ পর্ব পরিণামহীন।

সাধনার ক্ষেত্রে হয়তো কেউ দ্বৈতবাদী, কেউ অদ্বৈতবাদী। কিন্তু সময়ের চলন যেহেতু বহুস্বরিক— জীবনকে তার সঙ্গে জড়িয়ে নিতে গিয়ে তাকে কখনো এক সুতোয় বাঁধা চলে না। জীবনের মধ্যে সময়কে খোঁজা একটির সঙ্গে আরেকটির নিরাপদ দূরত্বেও সম্ভব নয়। তাছাড়া সময়ের চলমানতায় মিশে আছে খণ্ড আর অবিচ্ছিন্নের মেলবন্ধন। খণ্ডকে দেখেই আমরা অবিচ্ছিন্নকে অনুভব করি, আর অবিচ্ছিন্নের মাঝখানে খণ্ড তার প্রতিটি আবেগ-আর্তিকে চিহ্নিত করে তোলে। যুগল মিলনের এই যে সৃষ্টি করে তোলা সময় প্রতিমা— মুখশ্রীর অন্তর্দীপ্তি, অদ্বৈতের

সাধনায় তা কিভাবেই বা দেখা দেবে! তাই জগমোহন এবং শচীশ— দুজনের মধ্যে বিপুল শক্তি থাকা সত্ত্বেও শক্তির কোনো সুনিশ্চিত ব্যবহার হয় না। তারা অসম্পূর্ণ— এ কথাই শ্রীবিলাস প্রতিটি পর্বে মিশে গিয়ে অনুভব করে এবং দেখিয়ে দেয় তার ফলাফল।

উপন্যাস পাঠে আমাদের হয়তো কখনো জ্যাঠামশায় জগমোহন এবং শচীশের পরিণামের নঞর্থক যুক্তি গ্রহণযোগ্য না-হতে পারে। তার কারণ, জগমোহন সাহসের সঙ্গে প্লেগের রোগীদের সেবা করতে গিয়ে বীরের মতই মৃত্যুকে ডেকে আনেন; অন্যদিকে শচীশের সাধনা নির্জনে ঈশ্বরের আরাধনায় রূপান্তরিত, ত্যাগের শ্রেষ্ঠ মহিমাই তার বীজমন্ত্র। তবু বলতে হয় সময়ের ঘণ্টা মানুষের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, তার ধ্বনি কেবলই বেজে চলে সাধারণ্যের সংযোগে। গোবিন্দমাণিক্য এত বিশাল মন নিয়েও সেই সাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন বলে তাঁর রাজ্যত্যাগের মহিমা জনগণের কাছে পৌঁছাতে পারে না; গোরা জনগণের সঙ্গেই যুক্ত, তবু একাকীত্বকে ছাড়াতে পারে না। তাই জনগণ ছাড়া তারা কেউ সম্পূর্ণ হয় না, সময়কে সংগঠন করতেও তারা অপারগ। গোবিন্দমাণিক্য প্রথার আধিপত্যকে হটিয়েই প্রতিষ্ঠিত হন, এবং রাজ্যে ফিরে আসেন। গোরার স্বদেশবোধ সম্পূর্ণ হয় জাত-পাতহীন ভারতবর্ষকে দেখার মধ্যে— সাধারণ মানুষ উভয় ক্ষেত্রেই যেখানে জড়িত। অতএব সেই বিচারে জগমোহন একটি বিশেষ বুদ্ধিবাদী বিচার নিয়ে লোকের উপকারে মগ্ন ঠিকই, তবু সাধারণ মানুষের কাছে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু! শচীশ তার সর্বোত্তীর্ণ অবস্থার মধ্য দিয়েই বিশাল জনগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন। দু'জনের ক্ষেত্রে দু'ধরনের মানববিচ্ছিন্নতাই তাদের অসম্পূর্ণতাকে ডেকে আনে— তাদেরকে অসম্পূর্ণ করে তোলে। একদিকে তাই মানবদরদী জগমোহন নাস্তিক্যবুদ্ধি সর্বস্ব হয়ে নিজের একটি শ্রেণী রচনা করেন এবং প্রবাহিত কাল থেকে সরে আসেন। অন্যদিকে যথার্থ বিচারশক্তির অভাব এবং জীবনের অস্বীকৃতিতে শচীশ যুক্ত হয় গভীর শূন্যতায়।

দামিনীর ক্ষেত্রেও সেই প্রতিবন্ধকতা ওঠে। কেননা, শুধু বিদ্রোহ করে প্রতিকূল সময়ের কোনো কোনো বাঁধন কাটানো যায় সত্য, কিন্তু বাঁধন কাটানোই সব নয়। বরং সময়ের বাঁধনে জুড়ে যাওয়া আর বেরিয়ে আসার মধ্যেই আছে সময়ের শিল্প। দামিনী এই সত্যকে আবিষ্কার করে অনেক পরে, তার জীবনের চতুর্থ পর্বে— শ্রীবিলাসের সাহচর্যে— চতুর্থ কোটিতে অবস্থানরত সময়ের অবতল ধরে।

সীমাহীন সমুদ্রে পথ হারিয়ে মানুষ যখন বাঁচার তাগিদে দ্বীপের সন্ধান করে, তখন নীল সমুদ্রের শোভা কিংবা আকাশ আর জলের দিগন্ত চোখে পড়ে না। দ্বীপে উঠে এলেই সমুদ্রের গভীর পরিচয়কে খুঁটিয়ে দেখার অবকাশ মেলে। দামিনী

এককভাবে ক্রমাগত সংসারে প্রতিকূল আবর্তে বাঁচার পথ অন্বেষণ করে— দেখা দেয় বিদ্রোহ। তবু তার এই চলনের মধ্যে পরিকল্পিত কোনো লক্ষ্য নেই। নিজের তিক্ত জীবন আর সহজ প্রত্যয়কে নিয়ে বহু-র মধ্যে নিজেকে মেলে ধরার বাসনা তাকে শেষপর্যন্ত পথের আলো দেখায়। কিন্তু সেইসঙ্গে ভ্রান্তিকেও সে এড়াতে পারে না। শচীশের উজ্জ্বল রূপ তাই তার প্রথম প্রেম।

শ্রীবিলাস এই অসম্পূর্ণতার প্রতিটি কৌনিক বিন্দুতে যুক্ত, সেইসঙ্গে তার নীরব সাক্ষী। কাহিনীতে শুরু থেকেই কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখে সে হয়তো চলতে শুরু করে না। বরং চলতে চলতে ক্রমশ নিজের একটি পথ তৈরি করে নেয়। আদান-প্রদানের সহজ মাধ্যমে সে কোনো একটা আভাসকে সুস্পষ্ট করে। গোরা শহর-কে গ্রামের সঙ্গে যুক্ত করে বিশ্বাসকে আদায় করতে যেখানে মহাসময়ের রূপকে পারে উদ্ধার করতে, 'চতুরঙ্গে' তারই সুফল হিসেবে পাঁড়া গা থেকে শ্রীবিলাস এসে যুক্ত হয় নগর কলকাতায়। চরিত্রের নমনীয়তা থাকলে সময়ের নানা-চিহ্ন তাতে যেভাবে মুদ্রিত হতে পারে, শ্রীবিলাস তাকে অর্জন করে নিয়ে আসে গ্রাম্য সমাজবোধ থেকে। হৃদয়ের নিবিড় সংযুক্তির রসে গোটা উপন্যাসটির জটিল নানামুখী ছড়িয়ে পড়া শেকড়কে একটু একটু করে গুটিয়ে আশ্চর্য শানিত সংহতি দেয়। নির্দিষ্ট করে পরিণাম। সত্তার সঙ্গে অপরতার এই সহজ মেলবন্ধন কোনো শ্রেণীগত, কোনো তত্ত্বগত, কোনো ব্যক্তিবিশেষের সীমায়িত বৃত্তি নয়। জগমোহন, শচীশের থেকে চরিত্রগত স্তরে তাই ততটুকুই আলাদা শ্রীবিলাস। হৃদয়ের এই সহজ প্রত্যয়বোধ তাকে কোথাও অন্ধ করে না বলে গল্পকথক সে-ই হতে পারে। শ্রীবিলাস না হলে—

১) নানা সময়ের খণ্ড খণ্ড ছবিকে নিয়ে অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ গড়ে উঠতো না।

২) চারটি পর্বের একটি আরেকটির সংযোজক অন্তর্বর্তী সময়স্তরগুলো সুশৃঙ্খলরূপে বিন্যস্ত হত না।

৩) জগমোহন-শচীশের এক রৈখিক পথ-পরিক্রমা বদ্ধ সময়কে নিয়ে উপন্যাসকে করে তুলতো উদ্দেশ্যহীন।

৪) দ্বৈতরূপে দামিনীর জীবনে দেখা দিত না সময়মুক্তি।

অতএব শ্রীবিলাস আমাদের রক্ষাকবচ। একটি আপাত সাধারণের আড়ালে সে আছে বলে, তার যোগ্য পরিচয় পাই না। কিন্তু নগণ্যের মধ্যে তার 'বিরাট অবস্থান' প্রমাণিত হয় উপরকার নির্মোককে ভেঙে। সময় যে কাজটি করে। হয়তো এরপর একথা অতিরঞ্জিত শোনায় না— 'চতুরঙ্গে'র রঙ্গময়ী জীবনভাণ্ডারের যে চাবি, সে হল সময়; আর তার এক-একটি পর্দা সরিয়ে চলে শ্রীবিলাস। এক আশ্চর্য কৌতুকে সে প্রমাণ করে—

"The novel is born not of the theoretical spirit but of the spirit of humour."[৭]

কিন্তু সময় নির্মাতা শ্রীবিলাসকে বুঝে নিতে তার আগেও প্রয়োজন জগমোহন-শচীশ-দামিনী চরিত্রের বিশ্লেষণ। পরিচয় নেওয়া আবশ্যক আরো অন্যান্য গৌণ চরিত্রেরও। তার কারণ, শ্রীবিলাসের অন্তঃস্থল থেকে সময়ের নানা চাল্‌কে রবীন্দ্রনাথ ধরতে চান এই চরিত্রাবলীর সন্নিধানেই। নানা উচ্চাবচতায় সমস্যা নিয়ে তারা ভিড় জমায়। স্বতন্ত্র অথচ সফলহীন এক-একটি উচ্চারণ শ্রীবিলাসের আলোকে পুনর্বিন্যস্ত হয়ে এ কথাটি আমাদের বুঝিয়ে দেয়—

"The novel's spririt is the spirit of complexity. Every novel says to the reader: 'Things are not as simple as you think."[৮]

উপন্যাসের প্রথম পর্ব 'জ্যাঠামশায়'। ধরে থাকা একটি নিটোল বৃত্ত। বয়ানের আখ্যান এখানেই জমে ওঠে। শ্রীবিলাস ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যক্ষ হলেও প্রচ্ছন্ন তার অবস্থান। প্রধান চরিত্র জগমোহন, আর তাঁকে কেন্দ্র করে ছোটভাই হরিমোহন, ভ্রাতুষ্পুত্র পুরন্দর ও শচীশও উপস্থিত। এছাড়াও অসহায়া ননিবালাও এ পর্বের বিশেষ একটি চরিত্র।

পর্বের এই বৃত্ত কিন্তু রচিত উনিশ শতকী যুগালোকে। বাংলাদেশে তখন সামাজিক আন্দোলন তীব্র। 'গোরা'তে সেই আন্দোলনের সাফল্য-অসাফল্য দুটো ধারাই দেখা দেয়। আবার ধর্মের নামে সুবিধাভোগী শ্রেণী পরিচয়ও ফুটে ওঠে। সামাজিক আন্দোলনকে যারা মূলত ধারকরূপে বহন করেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম রাজা রামমোহন, পরে বিদ্যাসাগর। নবজাগরণের বুর্জোয়া বিপ্লব এবং উইগ উদারপন্থীদের মতবাদ সার্থক রূপে তখন বাংলাদেশে ফলপ্রসূ করা যায়নি। রামমোহন তাই রুশো, ভলত্যের, মঁতেসক্যু, টম্‌ পেইন, জেফারসনের চিন্তাধারায় সৌভ্রাতৃত্বের আলোকদীপকে বিদেশ থেকে বয়ে আনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেই স্বাধীনতা ও ঔদার্য যে সকলের নয়, সকল পরিবেশের নয়— শ্রেণীস্বার্থের মাধ্যমে বারবারই এই কথা প্রমাণিত হয়েছে। ইংরেজদের বণিকদণ্ড রাজদণ্ডে পরিণত হয়ে মুনাফা অর্জনকেই মুখ্য করে, আর ধর্মকে পুঁজি করে দেশের কিছু লোক হয় সমাজপতি। প্রগতিশীল মানসিকতার ঔদার্যবোধ নিয়ে যে রামমোহন, যে বিদ্যাসাগর সমাজ সংস্কারের প্রয়োজনে হাত মেলাতে পারেন, সেখানে তাঁদের বিরুদ্ধে তাই উত্থিত হয় দেশদ্রোহিতার অভিযোগ। রামমোহন যে সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদ মানবিক দৃষ্টিকোণে কামনা করেন, তা হয়ে ওঠে একক প্রচেষ্টা। অর্থাৎ যে প্রচেষ্টা অনুযায়ী ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম এই প্রথার বিরুদ্ধে বিভিন্ন উপায়ে জনমত গঠনে প্রয়াসী হন।[৯] ব্রিটিশ শক্তি প্রথমত তাতে হস্তক্ষেপ করেনি, তার কারণ—

"Their policy was not to stir the ignorant crowds who might turn against them for interfering in matters of religion."[১০]

পরে বেন্টিঙের যে সহায়তা তিনি পান এবং তাকে যে আইন করে বন্ধ করা যায়, তার মূলে কিন্তু ইংরেজদের উদারশীলতা কাজ করেনি। বেন্টিঙ্ বরং তাকে আইনে রূপান্তরের আগে যাচাই করে নেন— বাংলার সামাজিক অবস্থায় এর ফলে যে প্রভাব পড়বে তা ইংরেজদের রাজ্যপাটের ক্ষেত্রে কোনো ক্ষতিকারক হবে কিনা।[১১]

বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ প্রচলনের মানবিক দিকটাও মানুষ নিতে পারেনি। বরং সেক্ষেত্রেও একদল তাঁর নামে কুৎসা প্রচার করেছে, অন্যদল বিধবাবিবাহের মাধ্যমে বহুবিবাহের সুযোগটুকু গ্রহণ করেছে। জীবন সায়াহ্নে এসে হতাশাগ্রস্ত বিদ্যাসাগরকে তাই ডা. দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্ষেপ করে লিখতে হয়—

"আমাদের দেশের লোক এত অসার ও অপদার্থ বলিয়া পূর্ব্বে জানিলে আমি কখনই বিধবা বিবাহ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতাম না।"[১২]

অতএব একথা আমাদের কাছে স্পষ্ট সমাজ আন্দোলনের কুলপতিরা যে অর্থে বহু মানুষের সেবায় নিজেদেরকে আত্মনিয়োগ করেন, ততধিক তাঁরা আপন উদ্দেশ্যের পথে হন নিঃসঙ্গ। বুদ্ধিসর্বস্ব মন তখন অবিরাম তর্ক করে মনুষ্যত্বের স্বপক্ষে এবং জাতির সর্বস্তরে অন্ধসংস্কার এবং প্রথাসর্বস্ব পুরাতন সময়ের মাঝখানে মানুষের সেবায় উৎসর্গে উন্মুখ থাকে একটি আধুনিক মন। কিন্তু শুধু তাঁরাই নন, তাঁদের মাঝখানে ডিরোজিও এবং ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী প্রচলিত হিন্দুধর্মের অনাচার, বীভৎসতা প্রত্যক্ষ করেন। এই সম্প্রদায় একটু আলাদাভাবে বড় বেশি যুক্তিবাদী হয়ে অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের উদ্দীপ্ত করে তোলেন নিজস্বভাবে চিন্তা করতে, পাপকে ঘৃণা করতে। তার সঙ্গে পাশ্চাত্যের জ্ঞান ভাণ্ডারের দ্বারও তখন খোলা। হিন্দু কলেজের ডিরোজিও পন্থী তরুণরা যুক্ত হতে পারেন অ্যাডাম স্মিথ, বেন্থাম, লক, গিবন, টম্‌পেন প্রমুখ চিন্তাবিদের চিন্তাধারার সঙ্গে। বুদ্ধি দিয়ে তাঁরা জগতের আলোকে দেখতে শেখেন, সেইসঙ্গে সমস্ত সংস্কার, বিশেষত হিন্দু সংস্কারের ঊর্ধ্বে ওঠে তাঁরা মানবতাবাদী হন সত্য, হন যুক্তিবাদীও। যুক্তি দিয়ে তাঁরা ঈশ্বর খোঁজেন, মানুষ খোঁজেন। একদিকে রামমোহনের নিঃসঙ্গ মানবতা বোধ পরবর্তীতে বিদ্যাসাগরে বিবর্তিত হয়। আর সেই একই শতকে ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর মধ্য দিয়ে মানবতাবাদ যুক্তিবুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হতে চায়। বলা বাহুল্য, এই নূতন সূত্রপাতকে সমাজ কখনো সে যুগে ভাল মনে গ্রহণ করেনি, আজও তার অতি সামান্য ভগ্নাংশই কেবল গৃহীত হতে পারে। বাকি বৃহত্তর অংশ থেমে যাওয়া ইতিহাসমাত্র।

জগমোহন এই ইতিহাসেরই ভাঙা চরিত্র। তাই লক, বেন্থামের তত্ত্ব জগতেই তিনি ঘুরে ফেরেন। বিদ্যাসাগরের মানবতা বোধে দীপ্ত হয়েও তাঁর সংগ্রামী সত্তাটির ঐতিহাসিক অপমৃত্যু ঘটে। সমালোচকও তার কারণ নির্দেশ করে লেখেন—

"বিদ্যাসাগর যে আপনার দৃঢ়নিষ্ঠ একাগ্র একক জীবনকে পূর্ণ উন্মুক্ত অপার মনুষ্যত্বের দিকে প্রবাহিত করেছিলেন, জগমোহনও তাই করেছিলেন। এ মনুষ্যত্ব কোনো বাধা মানতে রাজি নয়। 'লোকের ভাল করার' ব্যাপারটা তিনি হয়তো প্রচুর লোকের প্রভূত উন্নতিসাধনের তত্ত্ব থেকেই পান, কিন্তু তার প্রয়োগ মোটেই শতকরা একশ ভাগ উপযোগবাদী আদর্শে নয়।"[১৩]

রবীন্দ্রনাথ সময়ের বলিষ্ঠ এবং ব্যর্থ— যুগপৎ দু'টো দিকই অনুধাবন করেন। আর তারই উপন্যাস-রূপায়ণে প্রমাণিত হয় খণ্ডের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নতার সূত্র।

জগমোহন চরিত্র সম্পর্কে প্রধান যে দুটো কথা বলা হয়, সেগুলো - (১) না-ঈশ্বরে বিশ্বাস (২) প্রচুরতম লোকের প্রভূততম সুখ সাধন— কেবল সরল দুটো পথ রেখা মাত্র। আর, তা দিয়েই মানুষকে বাঁধবার এবং বিচার করবার প্রচেষ্টা। এবার দেখতে হয় উপন্যাস-বৃত্তে জগমোহনের নাস্তিক্যবুদ্ধি সময়ের কোন অভিজ্ঞতা থেকে নেওয়া। উনবিংশ শতকের ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী এবং মানবতাবাদী রামমোহন-বিদ্যাসাগরের বিমিশ্রিত অবদানমূলক প্রেক্ষাপট তো আছেই। এছাড়াও গল্পের বয়ানে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে খুব অল্প কথা যা বলা হয়, তাও গুরুত্বপূর্ণ। বিবৃতিকার শ্রীবিলাস জানায়—

"বালক বয়সে জগমোহনের বিবাহ হইয়াছিল। যৌবনকালে যখন তাঁর স্ত্রী মারা যান তার পূর্বেই তিনি ম্যাল্থস পড়িয়াছিলেন; আর বিবাহ করেন.নাই।"[১৪]

খুব সতর্ক পাঠে এই অল্প কথা নেপথ্য লোকের একটি যুগ ইতিহাসকে বয়ে আনে। বালক বয়সে জগমোহনের বিবাহ, যৌবনকালে স্ত্রীর মৃত্যু এবং ম্যালথস পড়া তত্ত্ববাদী মন নিয়ে আর বিবাহ না করা— এই তিন প্রসঙ্গ জগমোহনের অপরিণত জীবনের ভিত্তি। আমরা দেখব, বাল্যবিবাহে বর-কন্যাই গৌণ, বরং তাদের অভিভাবকদের পুতুল খেলার শখ মেটানোই হয় মুখ্য। 'শেষের কবিতা'র সপ্তম উপাঙ্গে যোগমায়ার সংলাপে তার একটি স্পষ্ট স্বীকৃতি রেখেছেন রবীন্দ্রনাথ—

"আগেকার শতাব্দীর মাসিমারা যাদের বিয়ে দিতেন তারা ছিল খেলার পুতুল।"[১৫] —

অতএব জগমোহনের বিবাহ সে-ধরনেরই একটি দৃষ্টান্ত। আবার বালক বয়সের সময়কালটিকে পেরিয়ে যৌবনের ডাক পৌঁছবার আগেই তত্ত্ব চিন্তায় তিনি নিমগ্ন হন, সেইসঙ্গে যৌবন যখন জাগ্রতদ্বারে, স্ত্রীকেও হারান। সংসার জীবনটা শুধু তত্ত্ব নয়, বাস্তব দিয়েও গড়া— এই বিশ্বাস প্রস্তুত হয়ে উঠতেই পারে না বলে জগমোহন সময়ের প্রসারিত ধারায় ছায়া হয়ে থাকেন, সঞ্জীবিত হতে পারেন না। জীবনের

খণ্ড পরিচয়কে তত্ত্বের যাদুঘরে নিষ্প্রাণ রূপে তিনি দেখেন বলেই স্ত্রীর মৃত্যুর পর আবার বিবাহে উৎসাহ বোধ হয় না। একটি চরিত্রের জীবন সূচনাতেই বিচিত্র আবর্তে জীবনের আংশিক দেখার দৃষ্টি কেমন প্রভাবিত করে চলে, শ্রীবিলাস সুকৌশলে তা জানিয়ে রাখে। তাই জগমোহনের জীবনে খণ্ডকালবৃত্তে প্রতিপক্ষের যে সংঘর্ষ চলতে থাকে, তার সূত্র সন্ধানের মানসিকতা তাঁর নেই। নিজের খণ্ডিত বিশ্বাসের আলোকে তিনি এক ছাঁচে মানুষ এবং মানুষকে কেন্দ্র করে জীবনকে ঋজু রেখায় দেখতে চান। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর সত্তাবৃত্তে আঘাত করে অপরতা, আর এই আঘাতেরই তিক্ত মূল্যায়ণ— না-ঈশ্বরের বিশ্বাস। ডিরোজিও পন্থীদের প্রভাব তো কাজ করেই, সেইসঙ্গে একটি মানুষের পরিবৃত সময়কে না বোঝা, অথচ নিজেকে সেখানে আত্মপ্রকাশ করা চাই— এই দ্বন্দ্বময় পটভূমিতেই জগমোহনের নাস্তিক্যবুদ্ধি উপযুক্ত জলসিঞ্চনে মহীরূহ হয়। অতএব ইতিহাসগত ভাবে শুধু সমকালটির ছায়া নয়, উপন্যাস বিবৃতি ধরে মানুষের মনোজগতের আভাসটুকু সময়েরও বদ্ধতা রচনা করে। যে বদ্ধতা একটি বিশ্বাসরূপে বর্তমান বিচিত্র, অথচ অপরিচিত সময়ের কাছে নিজের অস্তিত্ব সংকটের সামঞ্জস্য রক্ষার আপ্রাণ চেষ্টা হয়ে ওঠে। এই চেষ্টাকে তাঁর সফল করে তুলতেই তর্কজাল সৃষ্টি করে ভিন্ন বিশ্বাসের কাছে চাপিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর। ঈশ্বর বিশ্বাসীদের সঙ্গে তর্কের পদ্ধতি কিংবা 'শ্রীচরণেষু' পাঠের বিরুদ্ধে উপদেশ দান— সমস্তই তাঁর ব্যক্তি সংকটের বহিঃপ্রকাশ। তিনি যে সমস্ত সাম্প্রদায়িকতারও উর্ধ্বে উঠতে পারেন— সেখানেও শুধু উনিশ শতকের ইতিহাসকালকে শুষে তার প্রতিরূপ হন না, নিজের দৃষ্টিতে মানব পৃথিবীতে মিশে যাবার আকাঙ্ক্ষা থাকে। তার কারণ, জগমোহনের আরেকটি মানসিক পরিচয়, লোকের উপকার সাধন। মানুষকে তিনি ব্যক্তি জীবনে পান না— এর ফলে যে শূন্যতা— তাকে ভরিয়ে তুলতে প্রয়োজন তাঁরই পরিবর্দ্ধক কোন এক মাধ্যম। মানুষ হিসেবে বটে, উত্তরসূরী হিসেবেও বটে। শচীশ ঠিক এ জায়গাতেই সমাধানরূপে কাজ করে। কিন্তু সেই সমাধান জগমোহনের সমাজ বিচ্ছিন্ন জীবনেরই ক্রমান্বিত ধারা, তার মুক্তিদাতা নয়।

জগমোহন পারিপার্শ্বিক সময় চক্রের সঙ্গে যে একক-লড়াই চালান, তাতে মানবসত্য একটি প্রধান প্রেরণা। কিন্তু সত্যটিকে জীবনের সন্নিধানে যাচাই না করে এগোলে তার পরিপূর্ণ স্বীকৃতি মেলে না, সময়ের সংঘাত বারবারই প্রবল হয়ে ওঠে। তাই জগমোহনের খণ্ডিত প্রয়োগগত ভাবনার ভগ্নদশার পাশেই বিরোধী শক্তিতে ওঠে আসেন তাঁরই ছোটভাই হরিমোহন। হরিমোহন এখানে ব্যক্তির প্রতিস্পর্ধিরূপেই দেখা দেন, তেমনি সামাজিক কালের বিশেষ একটি পরিচয়ও হয়ে ওঠেন। অথচ হরিমোহন জগমোহনের যোগ্যই নন্। ধর্মকে অস্ত্র করে তার

অন্ধ সংস্কারবাদী মন বরং আমাদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়াই জাগায়। কিন্তু উনিশ শতকে এই সম্প্রদায়ের কোনো অভাব ছিল না, আমাদের একালেও তার অভাব নেই। তবু জগমোহনের মত এত বড় মাপের একটি মানুষের পক্ষে কখনোই শোভন হয় না এদের সঙ্গে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা। তার কারণ, হরিমোহন তাঁর উপযুক্তই নন্। কিন্তু তবুও জগমোহনকে লড়াইতে অবতীর্ণ হতে হয় হরিমোহনের সঙ্গেই। পেট মোটা পুরুত পাণ্ডার পেছনে ছোটভাই যে-পরিমাণ টাকা ঢালেন, মানবসেবায় সে-পর্যন্ত সেই টাকা ঢালার বোঝাপড়া করতে এগোন জগমোহন। তবু শেষ পর্যন্ত যে তিনি হরিমোহনের সঙ্গে লড়াইতে সামাজিক স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত হয়ে নিঃসঙ্গ হন, সন্তান-সম্ভবা ননিবালাকে গৃহে আশ্রয় দিয়ে সামাজিক ঝটিকার সৃষ্টি করেন— সেখানে প্রমাণ হয়ে যায় তাঁর উদারশীল মনোভাবনার সঙ্গে কত দুস্তর ব্যবধান সমকালটির। মানবধর্মকে আবিষ্কার করেও তিনি প্রচলিত দৃষ্টিতে যে বিধর্মী হয়ে ওঠেন এবং দেবত্র সম্পত্তির বসতগৃহও ছাড়তে হয়— তার মূল কারণই থাকে, ধর্মের ভেতর থেকে মানবধর্মকে তাঁর অনুসন্ধান না করা। যে মানুষের জন্য তিনি ব্যস্ত, সেই মানুষের মনোজগতে প্রচলিত ধর্মের প্রবল অভিঘাত কত তীব্র,— মানববিচ্ছিন্ন একাকীত্ব মনটি দিয়ে জগমোহন তা বোঝেন না। মানুষকে তার প্রচলিত বিশ্বাসের জগতে রেখে, ভ্রান্তির মূলচ্ছেদ করে সময় দিয়ে তাকে গড়বার প্রয়োজন আছে। যদি জগমোহন তা করতেন, তবে তাঁর পক্ষে সম্ভব হত একটি নূতন যুগ গঠন। জগমোহনের সামাজিক মঙ্গল ভাবনা সমাজ-সম্পর্ক শূন্য বলেই জেলা কোর্টে তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষীরও তাই অভাব হয় না।

সামাজিক সহযোগিতা ছাড়া কখনোই যুগের পালাবদল আসে না। আর এই সমাজ বলতে বোঝায় অসংখ্য সাধারণ মানুষের সময় ও পরিসরের খণ্ড খণ্ড যোগফল। তাদের ব্যক্তিসময় ও পরিসরকে ততটুকু সম্মান না দিয়ে তাদের মঙ্গলভাবনা বৃথা। বরং তা হয়ে ওঠে ঔদ্ধত্য। সাধারণ মানুষ, যারা বিচারবোধকে প্রকৃত শিক্ষার আলোকে উদ্ভাসিত হতে দেখে না, ধর্মের সংস্কার তাদের অস্তিত্ববোধের প্রথম এবং প্রধান অবলম্বন। যে অবলম্বনকে রঘুপতি কাজে লাগিয়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধি করতে চান। আর গোবিন্দমাণিক্য মানুষকে ভালবেসেও রঘুপতির তুলনায় কাছে যেতে পারেন না। অতএব জগমোহনও সেক্ষেত্রে তাঁর নিজের ব্যক্তিসত্তাকে টুকরো নিরাপত্তার প্রাচীরবন্দি করে সেই আলোকেই জনগণকে দেখতে চান, ভাল করতে চান। অথচ তাঁর বিচ্ছিন্নতা যে কত প্রবল, শ্রীবিলাস তাঁর শিষ্য হয়ে ব্যঙ্গের মাধ্যমে ঘোষণা করতে দ্বিধা করে না। কতগুলো দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায়—

১) 'যুদ্ধজাহাজের কাপ্তেনের যেমন জাহাজ চালানোর চেয়ে জাহাজ ডোবানোই বড়ো ব্যবসা, তেমনি যেখানে সুবিধা সেইখানেই আস্তিক্যধর্মকে

ডুবাইয়া দেওয়াই জগমোহনের ধর্ম ছিল।'[১৬]

২) 'গুরুজনকে ভক্তি করাটা তাঁর মতে একটা ঝুঁটা সংস্কার; ইহাতে মানুষের মনকে গোলামিতে পাকা করিয়া দেয়।'[১৭]

৩)'নাস্তিক জগমোহন মৃত্যুর পূর্বে ভাইপো শচীশকে বলিলেন, যদি শ্রাদ্ধ করিবার শখ থাকে বাপের করিস, জ্যাঠার নয়।'[১৮]

৪) 'আমরা (শচীশ ও শ্রীবিলাস) জ্যাঠামশায়ের চেলা, আমাদের নমস্কার গুণহীন ধনুকের মতো নমো অংশটা ত্যাগ করিয়া বিষম খাড়া হইয়া উঠিয়াছিল।'[১৯]

জগমোহনের বৃত্ত প্রয়াসী সময় ভাবনার দুর্বলতা প্রথম ননিবালাই ধরে দেয়। হয়তো এই ভাঙনের বীজ তাঁর অন্তরে স্নেহের রূপেই আসে। যা কর্তব্যবোধ দিয়ে শেষ হয়ে যেতে পারে না। কিন্তু এখানে আরেক সন্দেহ জাগাটা স্বাভাবিক— শচীশ ও শ্রীবিলাসও তো তাঁর স্নেহের অংশীদার! তবুও ননিবালা থেকে তাদের পার্থক্য আছে। ননিবালা জগমোহনের ব্যক্তি-বৃত্তে বাইরে থেকে আসা নক্ষত্র, অসহায়া নারী বলে তার সামাজিক সমস্যাও বহুবিচিত্র। অন্যদিকে শচীশ জগমোহনের ব্যক্তি-বৃত্তেরই সম্প্রসারণ, নিশ্চিত তার আশ্রয়। আর সমস্ত মিলিয়ে শ্রীবিলাস আলাদা কেউ নয়, শচীশের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন। অতএব জগমোহনের জীবনে সময় বন্ধনের প্রাচীরটিকে মর্মের সঙ্গে ভেতর থেকে আঘাত দেবার একমাত্র মাধ্যম হতে পারে সমাজের হাতে পদদলিত একটি নারী। এরই সূত্রে সমাজের ভাঁজ থেকে ওঠে আসে দুঃশ্চরিত্র পুরন্দর। তার জন্যই হতভাগ্য ননিবালা সন্তানসম্ভবা, তার হাত থেকে বাঁচাতেই মানবতাবোধে দীপ্ত শচীশের পক্ষে পরম আশ্রয়ের উপায়রূপে জ্যাঠামশায়ের কাছে নিয়ে আসা।

লক্ষ্য করবো, যে নির্যাতনের শিকার ননিবালা, তা মূলত একজন নারীর ক্ষেত্রেই দেখা দিতে পারে। জগমোহনের অভিজ্ঞতায় এই অত্যাচারের প্রতিরূপ অভূতপূর্ব। তাই আপন বুদ্ধিবাদী শুষ্ক ক্ষেত্রটিকে এই অভিজ্ঞতার আলো দিয়ে ধীরে ধীরে নির্মোককে চূর্ণ করে, ননিবালার মধ্য দিয়ে সময়ের নানা ছবি তাঁর চোখে ফুটে উঠতে শুরু করে। ননিবালার অপমানকে নিজের অপমান, তার লজ্জাকে নিজের লজ্জারূপে তিনি ভাবতে শুরু করেন। নিজের স্ব-সৃষ্ট অভিজ্ঞতার মুখোশকে চিনতে পারেন বলেই, তাঁকে ননিবালার মুখ চেয়ে বলতে হয়—

"মা, আমি স্পষ্টই দেখিতেছি বুড়ো বয়সে তুমি এই নাস্তিককে আস্তিক করিয়া তুলিবে। আমি আশীর্বাদে সিকি-পয়সা বিশ্বাস করি না; কিন্তু তোমার ঐ মুখখানি দেখিলে আমার আশীর্বাদ করিতে ইচ্ছা করে।"[২০]

সময়ের সতর্ক ব্যবহারে 'বুড়ো বয়স' কথাটির সঙ্গে আস্তিক্য, এবং সেই সঙ্গে ভিন্ন সময়ের 'মুখখানি' শব্দের পর 'ইচ্ছা করে' কথাটি তাৎপর্যরূপে যুক্ত হয়। জগমোহনের যা কিছু প্রতিবন্ধকতা এই অপরতার সন্নিধানে ভেতর থেকেই তিনি মুক্ত হতে পারেন। তবু ননিবালা জগমোহনের একটা ইচ্ছারূপ হয়েই মিলিয়ে যায়, ইচ্ছার পূর্ণতাকে দিয়ে যেতে পারে না। ননিবালা যে সেই দুঃশ্চরিত্র পুরন্দরকে কিভাবে ভালবাসতে পারে, এবং তার জন্য মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করে নেয়— মানবমনের এই রহস্য জগমোহন বুঝতে পারেন না। উপকার করতে চাইলেই উপকার করা যায় না, সম্ভবত এত জনহিতকর কাজ করে জগমোহন বোঝেন না, বোঝেন ননিবালার মৃত্যুকে দেখে। তাই দীর্ঘ সময়ের মধ্য দিয়ে সহস্র সংগ্রাম জর্জরিত মানবতাবাদী জগমোহন তাঁর কর্মের নিঃসঙ্গতা নিয়েই বড় নীরবে চলে যান। রোগের কাছে আত্মসমর্পণ করে সেবার কর্মক্ষেত্র থেকে মৃত্যুকেই বেছে নেন সময়ের একমাত্র সত্যরূপে।

জগমোহন যেখানে মৃত্যুর মাধ্যমে সময় জগত থেকে বিদায় গ্রহণ করেন, সেখানে তাঁর উত্তরাধিকারীরূপে শচীশের স্বাবলম্বী যাত্রা কাঙ্ক্ষিত। কিন্তু বাস্তবে তার বিপরীত ঘটনাই স্বাভাবিক। কারণ অবিচ্ছিন্নকাল-প্রবাহে শচীশ যুক্তই হতে পারে না। জ্যাঠামশায়ের শিক্ষা এবং তাঁর পরিণামও তো সেই কথাই বলে। অতএব সেই অসমাপ্ত জগমোহনের উত্তরপুরুষ হয়ে কতটুকু সাবালকত্ব বা সে অর্জন করবে। বরং যতদিন জ্যাঠামশায় জগমোহন ছিলেন ততদিন তাঁকে ঘিরে, তাঁর আশ্রয়ে, 'প্রাচীরবদ্ধ সময়' শচীশের বিশ্বাসের জগৎ জুড়ে থাকে। শুধু তার সঙ্গে অভ্যস্ত হওয়া নয়, আত্মবৃত্তও বটে। যে বিচ্ছিন্নতার সূত্রপাত পূর্বপুরুষরা করে যান, তাঁদের ভাবধারায় অভিসিঞ্চিত হয়ে আরো বড় অভিশাপকে তো বহন করতে হয় উত্তর-প্রজন্মকে। সমালোচককে তাই এ কথাটি ভাবিয়ে তোলে—

"জগমোহনেই উপন্যাসের সমস্যার আরম্ভ। জগমোহনের নীরস নাস্তিক্যবুদ্ধির মধ্যে যে-মানুষের সমস্ত শৈশব কৈশোর যৌবনের প্রথমাংশ অতিবাহিত, সে সেখানে থেকে কী আহরণ করল এটা লক্ষণীয়।"[২১]

আমরা দেখি, শচীশ জগমোহনের মধ্য থেকে নির্দিষ্ট কোনো বিকল্প পথ আবিষ্কার করে জীবনকে সময়ের গতিতে সমাদৃত করে না। জ্যাঠামশায়ের প্রতি অন্ধ অনুসরণের নির্বুদ্ধিতা তাকে নির্ভরশীল হতে শেখায় না, বরং তা আরো বিপদজ্জনক করে তোলে। জগমোহন তবু যে এক নাস্তিক্যবাদে নিজের সকল যুক্তিকে দাঁড়া করাতে সচেষ্ট হন, শচীশের ক্ষেত্রে অনিবার্য গতিতে তাতে দেখা দেয় শূন্যকাল। কথক তাই জগমোহনের মৃত্যুর পর শচীশের মানসিক জগৎ ব্যাখ্যা করে, শূন্যের ভয়ঙ্কর অসহায় রূপকে দেখায়—

"সেই অসহ্য যন্ত্রণার দায়ে শচীশ কেবলই বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছিল যে, শূন্য এত শূন্য কখনোই হইতে পারে না; সত্য নাই এমন ভয়ংকর ফাঁকা কোথাও নাই; একভাবে যাহা 'না' আর-একভাবে তাহা যদি 'হাঁ' না হয় তবে সেই ছিদ্র দিয়া সমস্ত জগৎ যে গলিয়া ফুরাইয়া যাইবে।"[২২]

ব্যক্তিজীবন সময়ের ফাঁক (empty duration of time) সহ্য করতে পারে না। অতএব হঠাৎ জগমোহনের ব্যক্তিকাল-আশ্রয়ী প্রদীপ নিভে গেলে ঘন অন্ধকারে শচীশ নিক্ষিপ্ত হয়। তারপর দু'বৎসর তার খোঁজ পাওয়া যায় না। এই দু'বৎসর ঘড়ির কাঁটা ধরে বয়ান-অতিক্রান্তির আভাস, আরো গভীর অর্থে প্রতীকী।

আমরা বুঝি, কথক শ্রীবিলাসের দৃষ্টি প্রতিটি ঘটনার সঙ্গে ছুঁয়ে থাকা সময়ের কেবল পর্যবেক্ষক নয়, নিজেও তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। শচীশকে মাধ্যম করে যেকোনো সময়তলকে নিজের মধ্যে গ্রহণে ইচ্ছুক। তবু একাধারে সে মিলিত এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে কোন একটি খণ্ড সময় থেকে মুক্ত। তাই বিশেষ কাল পরিধির প্রতি শ্রীবিলাস আসক্ত হয়েও নিরাসক্ত। গ্রামের প্রকৃতি আর হৃদয়লোকের স্বীকৃতি দিয়ে তার সহজ বিশ্বাস খণ্ড সময়ের অন্তরালে অবিচ্ছিন্নতার যুগল চলনের ধর্মকে আবিষ্কার করে। তাই শূন্যকালের যন্ত্রণা শ্রীবিলাসকে পেতে হয় না, কিংবা সে অভিজ্ঞতারও তার বিস্তৃত প্রয়োজন নেই। অন্যদিকে শচীশের কোনো শিক্ষা অর্জিত নয়। জ্যাঠামশায় যতদিন ছিলেন, ততদিন সে তাঁর অংশরূপে ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর শূন্যকালের নিদারুণ যন্ত্রণা দু'বছর ধরে বইতে হয়। শ্রীবিলাসের সুনিয়ন্ত্রিত জীবনে এই দু'বছর কোথাও নেই, যেহেতু তার কোন শূন্যকালই নেই। অতএব শচীশকে অন্তর্জগতে রেখে সে কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দু'বছরের আগে আর শচীশের খোঁজ পায় না।

শূন্যকালের অবস্থান কোনো দিনই স্থায়ী নয়, মানুষ তাঁর ফাঁকা আধার ভরাট করার লক্ষ্যে তখন যে-কোনো আধেয় শুষে নেয়। আর বিচারহীন এই গ্রহণ নিয়ে আসে বিপদের বার্তা। অবলম্বনহীন শচীশ ঠিক এখানেই জড়িয়ে পড়ে লীলানন্দস্বামী-বৃত্তে। সময়ের এক আবর্ত থেকে বিচ্যুত হয়ে ভ্রান্তি, আবার সেই ভ্রান্তি ধরে অন্য আবর্তে পতন। শচীশের এই সময় পরিক্রমা নিয়ন্ত্রণহীন। সংবেদনশীল শ্রীবিলাস এ দুর্বলতাকে স্বীকার করতে পারে না, কেননা, শচীশকে নিয়ে আরো অনেক অভিজ্ঞতার পথ তখনও তার অতিক্রম করা বাকি। আরো আত্মজিজ্ঞাসা, আরো সংশয়— এ নিয়েই তো মানুষ সময়ের পথ কাটে, তাকে ঘিরে ভিড় করে আসে নূতন উপলব্ধি। তাই শচীশকে নিয়ে অতীত ও বর্তমানের সময় আততি শ্রীবিলাসের আত্মজিজ্ঞাসাই জাগিয়ে তোলে। শচীশ অবশ্য তার দুর্বলতাকে চাপা দিতে লীলানন্দস্বামীর কর্মপদ্ধতিকে জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেখায়। কিন্তু শ্রীবিলাসের

চোখে তার ফাঁকিটা ধরা পড়ে। অনুধাবন করে জ্যাঠামশায়ের সময় বন্ধনের এ আরেক পোষাক পরিবর্তন।

শচীশের কাছে জীবনের কোনো বিবর্তন নেই, আছে কেবল বাধ্যতা অনুসারে পরিবর্তন। তবু শচীশ অনুভূতি শূন্য মানুষ নয়। বরং অনুভূতিপূর্ণ মানুষ বলেই শূন্যকালের যন্ত্রণা তাকে পেতে হয়। অতএব লীলানন্দ স্বামীর আশ্রমে তার সমতলীয় জীবনেও বিধবা দামিনী নিয়ে আসে বিষমতলীয় সংঘাত। জগমোহনের জীবন একদিন যেমন ননিবালার মধ্যে জেগে উঠতে চায়, এখানেও তেমনি শচীশের বিলম্বিত জীবনে দ্রুত তরঙ্গ তোলে দামিনী। তার স্বাবলম্বী সময়বোধ সমান্তরাল পথ ছেড়ে সম্মিলিত হতে চায় অন্য স্রোতে। তবু যে অভিশাপ নিয়ে শচীশ জীবনে যাত্রা শুরু করে, দীর্ঘ দু'বৎসর জ্যাঠামশায়ের ছত্রছায়ার বাইরে থেকেও নিয়ন্ত্রণবোধের দক্ষতা তার আসে না। সমতালে দামিনীর সুরে তাই সে আত্মস্বাতন্ত্র্যে বেজে ওঠে না, বরং স্বাভাবিক ভাবেই গুটিয়ে নেয় নিজেকে। ফলে সংকেতগর্ভ গুহাদৃশ্যে শ্রীবিলাসের মন্তব্যহীন শচীশের ডাইরী থেকে সরাসরি তুলে দেওয়া স্বগত ভাষণ একটি অন্য সময়ের স্রোতে জেগে ওঠবার এবং তার নিজের আত্মবাসনা জাগরণের তীব্র অবদমিত ভীতি— যুগপৎ প্রকাশমান হয়ে পড়ে। শচীশ মানুষ বলেই বহুকালের অতৃপ্ত বাসনাকে অনুভব করে। আবার পরক্ষণেই অন্ধসংস্কারের চোখে তার অস্তিত্ব হয় বিপন্ন। সত্তার জগতে অপরতার প্রবেশ ঘটছে না বলেই, অনন্তকে তার বীভৎস মনে হয়। অসুস্থ চোখ নিয়ে দেখা এই মুহূর্ত শ্রীবিলাসের কথনে সম্ভব নয়। তাই মানুষ-শচীশের পরাভব এবং নিঃসঙ্গতা তার ডাইরি ধরে দেখা অনিবার্য হয়ে পড়ে।

জগমোহনের মধ্যে প্রতিমুহূর্তে অস্তিত্ব হারাবার ভীতি আছে বলেই হরিমোহন ও পুরন্দর— এদের থেকে বিপদ বেশি আসবে বিবেচনা করে তিনি নিরন্তর জোরের সঙ্গে লড়াই করেন। লীলানন্দস্বামীর আশ্রমে ওই একই মানসিকতা থেকে শচীশের লড়াই শুরু হয় দামিনীর বিপরীতে। জগমোহন তাঁর ব্যক্তিসময়ের নিরাপত্তার জন্য হরিমোহন-পুরন্দরদের বাদ দিতে চান, শচীশও অনুরূপ দামিনীকে বাদ দিয়ে ভাবতে চায়। আর এই দুইকালের একই অসত্যের ভিন্ন ভিন্ন পুনরাবৃত্তি ধরা পড়ে শ্রীবিলাসের চোখে। জীবনের বড় বৃত্ত থেকে কোনো সময়কে তো পরিহার করা চলে না। জগমোহন তাই ঠেকিয়ে রাখতে পারেন না হরিমোহনকে, বরং তিনি নিজেই সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হন। আর পুরন্দর তাঁর জীবনে নিয়ে আসে ননিবালা-সংকট। এই সংকটকে অবহেলা কিংবা এড়িয়ে যাওয়া সাধ্যের বাইরে। শচীশ তাই যে সময় বৃত্ত রচনা করে, সংসারের সঙ্গে মিলিয়ে কোনো মুহূর্তকেই সেখানে ব্যর্থ নমস্কারে ফেরানো যায় না। তবু লীলানন্দস্বামীর অপরিণাম পথকেই সে-যে নিজের লক্ষ্য

করে, তাতে কতটুকু সত্য, আর কতটুকু অসত্য— অনুসন্ধান করবে কি করে। ফলে লীলানন্দ স্বামীর আশ্রম-পরিসরে দামিনী যখন তার অভিজ্ঞতা থেকে মুছে যায়, তখন অবস্থা হয় আরো দুঃসহ। স্বাতন্ত্র্যের শিক্ষা তার আসে না, আসে স্বাতন্ত্র্য রক্ষার তাগিদ। দামিনী তাই যখন দুর্বলতাকে ধরিয়ে দেয়, তখন বর্তমান অবস্থানের দৈন্যতা সে উপলব্ধি করে। ফলে স্বামীজির আশ্রম ছেড়ে তাকে বেরিয়ে আসতে হয়। তবু জীবনে তার ব্যাপক পূর্ণতা নেই বলেই উজ্জীবন ঘটে না। পরিসর তার পাল্টায়, সময়ও পাল্টায়, কিন্তু নিজের স্ব-সৃষ্ট সময়বৃত্ত সকল জীবন অভিজ্ঞতাকে শুষে কি লাভ করে— বোঝা যায় না। তার নীরবে শান্ত হয়ে বসা প্রবহমান সময়ের সঙ্গে জুড়ে যাওয়া নয়, সোপানের উচ্চ শিখরে ওঠে জীবনের উষ্ণতাকে ছুঁয়ে থাকা নয়, বরং জীবনকে বিচ্ছিন্ন করে বেরিয়ে যাওয়া। শচীশ তার এই সর্বোত্তীর্ণ অবস্থা ধরে যে পরিণতির স্তরে এগোয়, সমস্ত কিছুকেই বাদ দিয়ে চলে। আর ক্রমাগত এই প্রবৃত্তি তার অভ্যাসে পরিণত হয়। সর্বোত্তীর্ণ অবস্থায় তার নিজের অস্তিত্বকেও ছাড়িয়ে আসা। শ্রীবিলাসের চোখে তাই ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে আসে শচীশ। আর এই বিশেষ বিন্দুতে এসে পুনরায় অনুভব করা যায় জগমোহনের পরিণামহীন সময় ভাবনা।

রবীন্দ্র সাহিত্যে নারী চরিত্রের ক্ষেত্রে দেখা যায় খণ্ডকাল গঠনে তারা পুরুষের সহযোগী। আর সহযোগী সে-ই হতে পারে, যার মধ্যে আছে স্বাতন্ত্র্যের শিক্ষা। শুধু তাই নয়, সেই শিক্ষার গুণেই সে নির্মাণ করতে পারে মানুষকেও। 'রক্তকরবী' নাটকে নন্দিনী তাই নিয়ে আসে আলোকিত মাটির পৃথিবীর খবর, প্রবহমান সময়ের স্রোতে ভেসে চলা 'ডাকঘর' নাটকের মৌলিক সুরের সঙ্গে যুক্ত হয় সুধার অনুভূতি, গোরার বৃহত্তর দেশভাবনা সুচরিতাকে ছাড়িয়ে কখনোই পূর্ণতা পেতে পারে না। অতএব প্রতিটি ক্ষেত্রেই মুহূর্ত চিহ্নিত হয় অবিচ্ছিন্নকালে।

এই মুহূর্ত চিহ্নিত অবিচ্ছিন্নকালই হল সময়ের মাত্রা। শচীশের সর্বোত্তীর্ণ অবস্থার মতন তা কেবল আত্মবঞ্চিত নয়— সত্তা-অপরতার যুগল সেতুবন্ধন। অতএব 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে তিনটি নারী চরিত্রের অবস্থান দেখিয়ে দেয় তাদের মুহূর্ত খচিত স্বাতন্ত্র্যের গুরুত্ব। এই স্বাতন্ত্র্য বিচ্ছিন্নতা নয়। বিচ্ছিন্নতা ঘিরে থাকা অপরতাকে বাদ দিয়ে চলে, প্রাণিত করে না। স্বাতন্ত্র্য সত্তই পারে সত্তাকে অক্ষুণ্ণ রেখে সংযোগ ঘটাতে। ননিবালা একটি খণ্ডকালকে নিয়ে বেশি দূর এগোয় না। কিন্তু তার সামান্য অবস্থান বিশাল-জগমোহনকে ভেঙে দিতে থাকে। শুধুমাত্র নীরস কর্তব্যবুদ্ধিতে যে মানুষের কতগুলো ব্যক্তিকাল জুড়ে যেতে পারে না, ননিবালা আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে নীরবে তা জানিয়ে যেতে পারে। তার প্রত্যক্ষ প্রভাব শচীশের জীবনে কতটুকু প্রচ্ছন্ন, তারও পরিচয় মেলে অনেক পরে, শচীশের ডাইরিতে।—

"ননিবালার মধ্যে আমি নারীর এক বিশ্বরূপ দেখিয়াছি— অপবিত্রের কলঙ্ক যে নারী আপনাতে গ্রহণ করিয়াছে, পাপিষ্ঠের জন্য যে নারী জীবন দিয়া ফেলিল, যে নারী মরিয়া জীবনের সুধাপাত্র পূর্ণতর করিল।"[২৩]

উপন্যাসে নবীনের স্ত্রীর একটি সামান্য প্রসঙ্গের অপ্রত্যক্ষ উল্লেখ আছে। পরিণাম হিসেবে সেখানেও একটি আত্মহত্যা; যার গুরুত্ব কোনো অংশেই কম নয়। ভালোবাসায় যে নানা সময় বৃত্ত একটি পরিসরে আদান-প্রদানে গড়ে ওঠতে চায়, তা বিরোধী সময়-সংঘাতে ভেঙে গেলেই তার জন্য মানুষ জীবনের অন্ত পর্যন্ত কেন ঘটায়— বুদ্ধির গাণিতিক নিয়মে এর কোনো জবাব নেই। কারণ বুদ্ধি আমাদের সকল রহস্য দেখাতে পারে না; জীবন যেখানে শুধু প্রহসনমাত্র। অতএব সেই প্রহসনকে মুছে দিয়ে প্রেরণারূপে সে আবির্ভূত হয়। লীলানন্দ স্বামীর আশ্রমের রসবুদ্ধি শাসিত সময় বৃত্তে এ বিপর্যয়ের কোনো আঁচড় নেই। তবু উপন্যাসের মূল পাত্রপাত্রীর জীবনে এর ফল সুদূরপ্রসারী। শচীশের নির্ভরশীল এবং নির্জন প্রবণতাকে দামিনী প্রতিমুহূর্তে দূর করে দিতে চায়। আর এই বুদ্ধি-অনুগৃহীত নির্মোকের আবরণ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য নবীনের স্ত্রীর মৃত্যু একটি নানা অবতলে গড়া বহুস্বরিকতায় ধাক্কা দিয়ে চলে। অত্যন্ত সামান্য এই ঘটনা, কিন্তু সামান্যই শচীশকে লীলানন্দ স্বামীর আবর্ত থেকে বেরিয়ে যাবার পথ দেখায়। অবশ্য শচীশের জীবনে এই বেরিয়ে আসার বৃহত্তর কোনো উত্তরণ নেই। কিন্তু দৃষ্টান্তরূপে উত্তরণের পদচিহ্ন ধরে শ্রীবিলাসের জীবনে এ-ঘটনা 'ব্যাপক সঞ্চয়' রূপে ভরে ওঠে।

দামিনী 'চতুরঙ্গে' শ্রীবিলাসকে ছেড়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। শ্রীবিলাস যেমন করে সময়ের নানা পরিচয়কে বুঝে নিতে থাকে, দামিনীও তার আলাদা জীবন অভিজ্ঞতা দিয়ে লক্ষ্যে এসে ধরা দেয়। দামিনী সে কারণেই হতে পারে শ্রীবিলাসের পরিপূরক। অন্যান্য নারী চরিত্রের সঙ্গে দামিনীর পার্থক্য এখানেই যে, সে একটি সময়-পরিসরে কেবলমাত্র একটি সামান্য চিহ্নই আঁকে না, গোটা সময়ের চিত্রকে পরিপূর্ণ করে তোলে।

দামিনী তার বিবাহিত জীবনে যে সমাজের সংস্পর্শে আসে, সেখানে তার একটু একটু করে সাজিয়ে তোলা জগৎ সকলের জন্যই থাকে খোলা। কিন্তু স্বামী শিবতোষ তার নিজের আত্মক্ষয়ী খণ্ডকালের ধারণা নিয়ে দামিনীকে করতে চায় সম্পত্তি। কথক শ্রীবিলাস উপন্যাসে দামিনীর বর্তমানটিকে স্পষ্ট করার জন্য অতীতের জগতে আলো ফেলে তাকে সাজিয়ে তোলে। অতএব সেই অতীতের মধ্যে আরো বড় অতীতের ছবি ভেসে ওঠে, যেখানে স্বামী তার স্ত্রীকে বস্তুসর্বস্ব চোখে দেখে। শিবতোষ তার উদ্দেশ্যহীন স্থবির জীবন লীলানন্দ স্বামীকে অবলম্বন করে সেই স্বামীত্বের

অধিকারী হয়ে অর্দ্ধাঙ্গিনীকে বিশেষভাবে চালিত করতে চায়। কিন্তু দামিনী নির্ভরশীল সত্তা নয়। জীবনের সহজাত কামনা-বাসনা সহযোগেই তার ব্যক্তিজগৎ। অতএব স্বামীজির উপদেশ দামিনীর কর্ণগোচর করতে স্বামী শিবতোষ যতই চেষ্টা করুক, তাকে সে-ক্ষেত্রে স্পষ্ট ভাষায় বলতে হয়— "এখন আমি যাইতে পারিব না। আমার সময় নাই।" ২৪ এই 'সময় নাই' শব্দদ্বয় দামিনীর ব্যক্তিত্ব চিহ্নিত সত্তা। তার লীলানন্দ স্বামীর উপদেশের চাইতে গয়নার বাক্সে গয়না গোছানোই পরম তৃপ্তিকর। আর এই গয়নার বাক্স গোছানোর মধ্যে শুধু তার পরম আসক্তির ছবিটাই বড় নয়, বরং চিত্রটিকে আরো বৃহত্তর করে যদি ভাবা যায়; তবে দেখা যাবে, এ এক আত্মতন্ত্রকে ছাড়িয়ে পরিবারমুখী হয়ে ওঠা। যে পরিবার মিলিয়েই সমাজ এবং সভ্যতার ছবিকে পাওয়া সম্ভব। পরিবারকে গঠনের জন্য যে সহজাত আকর্ষণ প্রবৃত্তি প্রয়োজন, তার সূত্রপাত তো গয়নার বাক্স দিয়েও হতে পারে। দামিনীর গয়নার বাক্স হয় সেই পরিবার গঠনের স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন বিচ্ছিন্ন হতে চায় না নিষ্প্রাণ উপদেশের হাতে। কিন্তু শিবতোষের চোখে পরিবার-সম্পৃক্ত সময় ভাবনার কোনো মূল্য নেই। পৃথিবীর চলমান জীবন্ত সময় পরিসীমায় থেকেও সে প্রবাসী। আর অর্ধাঙ্গিনীরূপে স্ত্রী যেহেতু তার সাধন সম্পত্তি, অতএব দামিনীর গয়নার বাক্সকে গুরুর হাতে সমর্পণ করে সকল দিক দিয়ে সে তাকে নিজের মতন গড়ে তুলতে চায়। অপরিণত সময় ভ্রান্তির একচোঁখা দৃষ্টি শিবতোষের কত নির্মম হতে পারে, ধর্ম কতটুকু সংকীর্ণ হতে পারে, তার প্রমাণ পাওয়া যায়— যে সময়ে দামিনীর বাবা এবং ছোটো ছোটো ভাইরা না খেতে পেয়ে উপবাসে মরে, ঠিক সেই একই সময়ে তার বাড়িতে রোজ ষাট-সত্তরজন ভক্তের সেবার অন্ন প্রস্তুত হয়। আবার যে অন্ন প্রস্তুতের দায়িত্ব স্বয়ং গ্রহণ করতে হয় দামিনীকেই। অতএব সমান্তরাল দুটো সময়ের ঘটনা দুটো পরিসর থেকে তুলে এনে ধর্ম রক্ষার্থে যেখানে সামঞ্জস্য বড় কথা, সেখানে ব্যবধান রচনাই প্রমাণ করে এ কোনো সৃষ্টি প্রক্রিয়াই নয়। এই বিচ্ছিন্নতা কখনোই শ্রদ্ধার যোগ্য নয়। কিন্তু তখনও দামিনীর সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তটি আসে না বলেই সে কেন্দ্রবিন্দু থেকে প্রতিবাদ করে বেরিয়ে আসতে পারে না। তার জন্য আরো প্রবল আঘাত, আরো প্রবল প্রেরণা বাকি। অতীতের বর্ণনা তাই দামিনীকে নিগড়মুক্ত করে না ঠিকই, কিন্তু বর্তমানকে প্রস্তুত করে তোলে। দামিনী শচীশের মধ্যে তারই অনুপ্রেরণা খোঁজে। আর যখন সেই অনুপ্রেরণারই কণ্ঠ থেকে পুরনো শিবতোষের স্বর সে শুনতে পায়, তখন তীব্রভাবে তাকে প্রতিহত করতে জ্বলে ওঠে। লক্ষণীয়, এই জ্বালা শুধু শচীশের বিরুদ্ধে নয়, শচীশকে জুড়ে থাকা লীলানন্দ স্বামী-সম্প্রদায়, তথা গোটা তত্ত্ববাগীশ আত্মগ্রাসী সময়ের বিরুদ্ধে। অতএব এ পর্যায়ে সম্বোধনে

দামিনী বারে বারে শচীশকে একবচনে 'তুমি' উদ্দেশ্য করে না, বহুবচনে 'তোমরা' উদ্দেশ্য করে।

অবশ্য সময় প্রেরণার অনুসন্ধান তার পরেও শচীশের মধ্যে সে অব্যাহত রাখে, তাকে আরো বাজিয়ে নিতে সহজাত মানবিক ঈর্ষার আঘাতের দ্বারা জাগিয়ে দিতে চায়। আর এখানেই সে অবলম্বন করে শ্রীবিলাসকে। আমরা বুঝতে পারি, শ্রীবিলাস এখানে দামিনীর চোখে যতই গৌণ হোক, সময়ের নিয়ন্ত্রণে তারপর যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তারা তাদের মধ্যে, সুপ্ত ও অবচেতনে পরস্পর কাছে আসতে পারে। স্বাভাবিক হয় তাদেব সম্ভাবনাময় সম্পর্ক। দামিনী তার অন্তরজগতের পরিপূর্ণ আত্মবিকশিত-রূপ একাল আর সেকালের কথা নিয়ে তার কাছেই তবে সম্পূর্ণ মুখোমুখি হয়।

মানুষ তো কেবল তার নিজের পরিচয় প্রথম থেকে পায় না, সময়ের নানা স্বর তাকে সহযোগিতা করলে, তারই প্রতিচ্ছায়ায় নানা অবস্থান থেকে আত্মপ্রতিকৃতি স্পষ্ট হয়। প্রথমে শিবতোষের সংসার এবং তারপর লীলানন্দস্বামীর আশ্রম— অসংখ্য অস্বচ্ছ সময়খণ্ড দিয়ে ঘেরা অভিজ্ঞতায় দামিনী নিজেকে খুঁজে পায় না। আর সেজন্য তার নিজের ক্ষেত্রটি সম্পূর্ণ নয় বলেই তার মনের ব্যাকুল আর্তি সংযোগকেই অন্বেষণ করে ফেরে, সংযুক্ত হতে পারে না। হয়তো সে কারণেই তার জীবনের আসল মানুষটিকে প্রথমে সে ভুল করে মাধ্যম করে, উদ্দেশ্য করে না। কিন্তু তার চোখে আসল সত্য ধরা দেবার জন্য দরকার এই সময়-অভিজ্ঞতার প্রতিফলন। আরো দরকার শচীশের অবলম্বনহীন বন্দি সময়ের বহির্বৃত্ত থেকে প্রত্যাখাত হয়ে ফিরে আসা। এ সমস্ত আলোড়নই তার মনে সময়ের চলমান ধারণাকে পরিষ্কার করে, কেননা, তাকে তো শেষ অবধি শ্রীবিলাসের উপযুক্ত হওয়া চাই— দ্বৈতমিলনে নানা মুখশ্রী যেখানে সৃষ্টি হবে। সমালোচকের মতে —

"We are aware of continuity through time not merely in our own lives, but in the life of the human race as a whole. We could not have such a concept of continuity without imagination; for without imagination we could have no idea of past, present and future."[২৫]

শ্রীবিলাসের মধ্য দিয়ে দামিনীর এই গোটা মানবজাতির ছবি নিশ্চয়ই একসময় আবিষ্কৃত হয় বলেই ভূত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ মিলিয়ে তৈরি করতে পারে তার বলয়টিকে।

কিন্তু শচীশ যে তার মাধুর্য্যকে দেখে, তার মধ্যে মধুরকে পায় না— এ আংশিক অনুভব দামিনী বুঝেও কেনো তাকে ছাড়তে পারে না, তার উত্তর মেলে ভালোবাসার

সূত্রেই। ভালোবাসা তো কেবল একটি লয়ে প্রাপ্তিযোগের মাধ্যমে আত্মোন্নতি চায় না, বরং সেইসঙ্গে অপরকে নিজের অস্তিত্ব দিয়ে বাঁচিয়ে তুলতেও চায়। এখানেই "the life of the human race as a whole" কথাটির গুরুত্ব। কাজেই দামিনী হয়তো যে সময় কারাগারে এতকাল বন্দি, তার থেকে বেরিয়ে আসতে শচীশের অসহায়তাও সমমাপে নিজের সঙ্গে মিলিয়ে অনুভব করে এবং পাশাপাশি সচেষ্ট হয় তাকে স্বাবলম্বী করে তুলতে। যার কারণে শচীশ যখন অতীত-বর্তমান, দর্শন-বিজ্ঞান, রস-তত্ত্ব নিয়ে বৌদ্ধিক শাস্ত্রাচারে মেতে ওঠে, তখন নবীনের স্ত্রীর আত্মহত্যার খবর দামিনীই নিয়ে আসে। জীবনের সমস্ত ছক ভেঙে দিয়ে সামগ্রিক মানবজাতির ছবি পুঁথির পাতা থেকে মুক্তি পায়। পুতুলের ধর্মকে ছাড়িয়ে মানুষ-শচীশকে দামিনী বোঝাতে চায়—

"তোমার গুরু যে-পথে সবাইকে চালাইতেছেন সে পথে ধৈর্য নাই, বীর্য নাই, শান্তি নাই। ঐ যে মেয়েটা মরিল, রসের পথে রসের রাক্ষসীই তো তার বুকের রক্ত খাইয়া তাকে মারিল। কী তার কুৎসিত চেহারা সে তো দেখিলে। প্রভু, জোড় হাত করিয়া বলি, ঐ রাক্ষসীর কাছে আমাকে বলি দিয়ো না। আমাকে বাঁচাও। যদি কেউ আমাকে বাঁচাইতে পারে তো সে তুমি।"[২৬]

দামিনীর এই সত্য উচ্চারণ একদিনের উপলব্ধি নয়। সময়ের নানা সংঘাত বুকে ধারণ করে, বর্তমানের প্রেক্ষাপটে, শ্রীবিলাসের সাহচর্যে, গোটা অতীতের উপর পর্যবেক্ষণের আলো ফেলে তবেই এ ধারণা দৃঢ় হয়।

কিন্তু দামিনী যেখানে ব্যক্তিত্বের ভাস্কর্য গড়ে নেয় সহজাত প্রবৃত্তির সংস্করণে, সেখানে শচীশের বিচ্ছিন্ন সত্তা প্রবৃত্তির অবদমনেই নিশ্চিহ্ন হতে থাকে। অতএব দু'দিক দিয়ে অনুপ্রেরণা যদি সমধর্মী না হয়, সেখানে পরস্পর মিলন তো অসম্ভব। তাই দামিনী এগিয়ে আসে, আর শচীশ গুটিয়ে যায় বলেই দামিনী ক্ষণিক শূন্যকালে নিক্ষিপ্ত হয়। শ্রীবিলাস ঠিক এখানেই তার ছিন্ন সুতোকে ধরে দেয়। এখানে দামিনীর সঙ্গে শ্রীবিলাস অন্তরঙ্গ হয়ে আছে বলেই শূন্যকালের নিঃসঙ্গতা সেও কিছুটা অনুভব করে।

দামিনীর আত্ম আবিষ্কারের জন্য প্রয়োজন একটি বিকল্প পথ, আর শ্রীবিলাসের জন্য প্রয়োজন তার অনুভূতিপ্রবণ সত্তা নিয়ে শূন্যকালের সামান্য অভিজ্ঞতা অর্জন— দু'য়ে মিলে সকল সত্যের উপলব্ধিতে ঘটে তাদের সম্পূর্ণতা। অতএব 'জ্যাঠামশায়' পর্বের পর 'শচীশ' পর্বে যেখানে দু'বছর শচীশের শূন্যকাল পর্যবসিত— সেখানে পরিসরের কোনো ছবি কথক-শ্রীবিলাসের চোখে পড়ে না, এবং দামিনীর শূন্যকালের অবস্থান সেখানে তার দামিনীর মধ্যে অন্তরিত হয়ে প্রকাশিত হতে পারে। অন্যদিকে

যে বুকের ব্যথা নিয়ে দামিনী শ্রীবিলাসের সংসারে আসে এবং মৃত্যুর মাধ্যমে বিদায় নেয়— তার মধ্যেও থাকে সময়ের দ্বিবিধ সংকেত। একদিকে তার বুকের আঘাত ভ্রান্তির অভিজ্ঞতার সঞ্চয়— যার প্রত্যাঘাতে শ্রীবিলাসকে সামগ্রিক সময়-সত্যে সে চিনে নেয়। অন্যদিকে এই ব্যথা তার শচীশের প্রতি ভালবাসারই নিদর্শন, যাকে ভোলা যায় না। শ্রীবিলাসের স্পর্শেই জীবনের সকল ধনকেই গ্রহণে উৎসুক হয়ে ওঠে।

কবি ও সমালোচক শঙ্খ ঘোষ খুব চমৎকার করে বলেন—

"এক আশ্চর্য বিরোধ আমাদের জীবনেঃ প্রাত্যহিকের মধ্যে অত্যন্ত অভ্যস্ত বলেই প্রত্যহকে আমরা দেখতে পাই না আর। কেন পাই না? আমরা ভুলে যাই যে ভালবাসার মধ্যে আছে একই সঙ্গে একটা লিপ্ততা আর ঔদাসীন্য, আসক্তি আর নিরাসক্তি। আমরা ভুলভাবে লিপ্ত, ভুলভাবে আসক্ত। নিরাসক্তির ঈষৎ দূরত্ব নিয়ে জীবনের দিকে তাকালে তবেই তাকে পাওয়া যায় একেবারে নিজের মতো করে।"[২৭]

শ্রীবিলাসকে আমরা এখানেই আবিষ্কার করে নিতে পারি। সময়ের নানা বিভঙ্গ যে আসক্তি আর নিরাসক্তি নিয়ে দেখে। এবার এই দেখার ছবিটি কেমন, মোটামুটি নিম্নলিখিত একটি তালিকা প্রস্তুত করে শ্রীবিলাস আলোচনার সূত্রপাত করা যেতে পারে।

১) জীবনের চলার পথের সূত্রটিকে তুলে নেওয়া।

২) বুদ্ধিবাদী মানব-বিচ্ছিন্ন খণ্ডকালের অভিজ্ঞতা।

৩) নাস্তিক্যবুদ্ধিকে পরাজিত করতে প্রতিদ্বন্দ্বী সুযোগ সন্ধানী কালের সংঘর্ষ অবলোকন।

৪) সংঘর্ষে লিপ্ত দুই বিচ্ছিন্নকালের মধ্য দিয়ে অসাম্প্রদায়িক কালের আবির্ভাব এবং ফলাফল হিসেবে যুগদ্বন্দ্বের ব্যর্থতার চিহ্নায়ককে আবিষ্কার।

৫) রসতত্ত্ব সর্বস্ব আরেক বুদ্ধিবাদী কালের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়।

৬) বুদ্ধিবাদী কালের হাতে বন্দি অন্য আরেক জীবন অনুসন্ধানী দৃষ্টির পরিচয়।

৭) নিজের মধ্যে সেই পরিচয়ের প্রভাবকে আত্মস্থ করা এবং স্বীকৃতি দান।

৮) অসংস্কৃত সহজাত প্রবৃত্তির অনভিজ্ঞ চোখে ক্ষণিক বিভ্রমকে পর্যবেক্ষণ করা।

৯) বিচ্ছিন্ন সময়খণ্ডের দ্বারা অনভিজ্ঞ প্রবৃত্তির প্রত্যাখ্যান এবং পরিণাম হিসেবে শূন্যকালের আবির্ভাবকে অনভিজ্ঞের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলে উপলব্ধি।

১০) নিজের আত্মোপলব্ধির অনুপ্রেরণায় অপরের বিভ্রম মুক্তি এবং সম্পর্ক বন্ধন।

১১) সম্পর্কের ভবিষ্যৎমুখী প্রবহমান যাত্রার স্বীকৃতিপ্রাপ্তি।

১২) খণ্ড এবং অবিচ্ছিন্ন কালের সংযোজক অস্তিত্বমুখী পর্যবেক্ষক সত্তার অপরতার মধ্য দিয়ে অসাধারণত্বের সম্মতি লাভ।

এই সাজানো তালিকা উপন্যাস-বিবৃতির কম-বেশি ক্রমান্বিত ধারা অনুসারেই আসে। কিন্তু আসলে শ্রীবিলাস যখন বাস্তব অর্থে এদের সঙ্গে যুক্ত, তখন পরপর এত সরলভাবে সময় পরিক্রমা ঘটে না। আসলে এর প্রত্যেকটি ঘটনাই অতীতে সংঘটিত। সবকিছু ঘটে যাবার পর আগাগোড়া বিশৃঙ্খল অবস্থানকে অতীতের পৃষ্ঠা থেকে চয়ন করে সুশৃঙ্খল উপায়ে সাজানো হয়। সে কারণেই শ্রীবিলাস উপন্যাসের শুরুতেই জানিয়ে রাখে—

"মত এবং আচরণ সম্বন্ধে শচীশের জীবনে নিন্দার কারণ যাহা যাহা আছে তাহা সংগ্রহ করিয়া আমি লিখিলাম। ইহার কিছু আমার সঙ্গে তার পরিচয়ের পূর্বেকার অংশ, কিছু অংশ পরের।[২৮]

অনুমান করা যায়, গোটা অবস্থানটি শচীশের সঙ্গে যুক্ত থেকে তার পরিচয়ের পূর্বেকার অংশ— তালিকার ২ নং থেকে ৮ নং পর্যন্ত, এবং পরের অংশ তালিকার ৯ নং থেকে ১২ নং পর্যন্ত। কিন্তু উত্তম পুরুষে রচিত বলে এ ধরনের উপন্যাসের ক্ষেত্রে সময়ের অব্যবহিতভাব অনেকটাই নষ্ট হয়, তা সত্ত্বেও 'চতুরঙ্গে' সময়ের "illusion of immediacy" হয়ে উঠতে বাঁধা পায় না শ্রীবিলাসের অভিনব প্রচ্ছন্ন সংযুক্তি ও বিযুক্তির কারণে। গোটা 'জ্যাঠামশায়' পর্বে কোথাও সোচ্চারভাবে তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না, অথচ এর প্রতিটি 'বর্তমান' অতীত থেকে তুলে এনে বিশেষ পরিকল্পিত দৃষ্টিকোণে সাজানো। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে যেখানে শ্রীবিলাসের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি স্পষ্ট, সেখানেও ঘটনার সঙ্গে সংযুক্ত-শ্রীবিলাস সময়ের অভিজ্ঞতা নিয়ে চলে, ঘটনার সংকলক-শ্রীবিলাস কোথাও ওঠে আসে না। অতএব শ্রীবিলাস চরিত্রের এই মহৎ গুণটি সম্পর্কে সাহিত্য সমালোচক যথার্থই বলেন—

"উপন্যাসের 'আমি' (বা কথক) শচীশ ও দামিনীকে স্পষ্ট করে তুলতে গিয়ে নিজেকে প্রায় একেবারে মুছে ফেলেছে অনেক ক্ষেত্রে— ফলে ওই সময়ের অব্যবহিত ভাবটা (immediacy) বেশ ফুটে উঠতে পেরেছে সেসব জায়গায়— যেটা প্রথম পুরুষে অর্থাৎ সর্বজ্ঞ লেখকের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবৃত 'অবজেকটিভ্' কাহিনীতে সর্বদাই দেখতে পাওয়া যায়।"[২৯]

ব্যক্তি-শ্রীবিলাস যে প্রথমে শচীশকে গ্রহণ করে এগোয়, সেখানে ভালবাসাই আসল। এ ভালবাসাই নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে ধরে সময়ের পথ হাটে। উপন্যাসের শুরুতে

জগমোহন-আখ্যানই প্রধান, অথচ তাঁর অস্তিত্ব শ্রীবিলাসের জগতে শচীশের সঙ্গে বন্ধুত্বের সূত্রেই আসে। শচীশকে যে শ্রীবিলাস অসাধাবণ করে দেখে, সে তার অসাধারণ গ্রহণ ক্ষমতার গুণেই। শ্রীবিলাস পাড়া গাঁ থেকে কলকাতায় এল— এই সূচনা ভাষ্য গ্রাম্যজীবনের পাশাপাশি শহর জীবনের পরিচয় বন্ধন। দুই সামাজিক স্তরের মধ্যে শ্রীবিলাসের ঔদার্যগুণে মিলন সেতু গড়ে ওঠা। কিন্তু তার ফলে কোনো সংশয় কি দেখা দেয় না! অতএব গ্রাম্য সামাজিক জীবনের সংস্কার থেকে শ্রীবিলাসকে শচীশ সম্পর্কে দুটো আঘাত দেয়— (১) শচীশ নাস্তিক (২) শচীশের বংশ সোনার বেনে। এই দুটো শ্রেণী চেতনার বিদ্বেষকেও শ্রীবিলাস দূর করতে পারে বলেই এগুলোকে ছাড়িয়ে শচীশকে নিয়ে অন্তরের মধ্যে তার পূজার প্রদীপকে জ্বলতে দেখে।

প্রতিটি অভিজ্ঞতার মধ্যে সময়ের সহজাত নিয়মে কোনা বাঁধাই বাঁধা নয়। তাই জীবনের সম্পূর্ণ ছবি যাচাই করে নিতে নিজের সীমাটি আগে নমনীয় করা চাই। শচীশ কিংবা জগমোহন— এদের ক্ষেত্রে যার কোনো পূর্ব প্রস্তুতি ছিল না।

শচীশ শহরে আবাল্য লালিত। সকল সাধারণের স্তর ছাড়িয়ে সে উজ্জ্বল একাকীত্ব নিয়ে বিচ্ছিন্ন। কিন্তু তার নানা খণ্ড সময়ের চিত্রায়ণে যে ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ পায়, তাব মূলেও থাকে সাধাবণ শ্রীবিলাসের অসাধারণ দৃষ্টি। আমরা ইতিহাসের পাতায় কিছু মানুষকে বড় করে দেখি। তাদের রাজ্যপাট, তাদের কীর্তি, ঘটনা হয়ে ওঠে। তবু সেটাই সময়ের একমাত্র স্বর নয়। বরং তাদেব অন্তরালে সহজ প্রবৃত্তির জোরে যুগ গঠনের কাজ করে যায় অতি সাধারণ মানুষের দল। ইতিহাসে যাদের কথা লেখা হয় না, তারাই আসলে ইতিহাসকে গতিশীল রাখে। ফলে যুগের আভিজাত্যের পার্থক্য নিয়ে কোনো কোনো ঘটনা মাথা তুলে দাঁড়ায় এবং তার কীর্তিস্তম্ভ স্থাপনে সাধারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষারই সম্মিলিত-রূপ ব্যক্ত হয়। তার সৌন্দর্যের গ্রহণযোগ্যতা টিকে থাকে বর্তমান পর্যন্ত। ফলে উজ্জ্বল শচীশের সবটুকু রূপ শ্রীবিলাস তার আকাঙ্ক্ষা দিয়ে গড়ে নেয় বলেই, উপন্যাসের পূর্বভাগে সে-ই হয় প্রধান। কিন্তু পরবর্তীতে শচীশ তার বিচ্ছিন্নতা নিয়ে যখন আত্ম উচ্ছেদের পথে এগিয়ে চলে, তখন শ্রীবিলাসের আকাঙ্ক্ষার বৃত্ত থেকে সে ধীরে ধীরে অপসারিত হয়।

প্রকৃতির মধ্যে যে একটি সম্মিলনের ছন্দকে রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করেন, তাকে তিনি সারাজীবনে বিশ্বাস করে অনুভব করেন— যেকোনো সৃষ্টির মূলেই আছে আনন্দ। 'শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধমালায় এ প্রসঙ্গে উল্লেখিত হয়—

'উপনিষৎ বলছেন, আনন্দ হতেই সমস্ত জীবের জন্ম, আমাদের মধ্যেই সকলের জীবন-যাত্রা এবং সেই আনন্দের মধ্যেই আবার সকলের প্রত্যাবর্তন। বিশ্বজগতে

এই যে আনন্দ সমুদ্রে কেবলই তরঙ্গলীলা চলছে, প্রত্যেক মানুষের জীবনটিকে এরই ছন্দে মিলিয়ে নেওয়া হচ্ছে জীবনের সার্থকতা।”[৩০]

অতএব এ সার্থকতার বীজমন্ত্র সাহিত্যে নিবেশিত করতে গিয়ে তিনি এও উপলব্ধি করেন আনন্দ কোনো তত্ত্ব, কোনো বাধ্যতা, কোনো আপস মনোবৃত্তি থেকে আসে না। শুরুতে হয়তো কোনো-কোনো ধর্ম প্রচ্ছন্ন থাকে, কিন্তু মনের ভেতরের তীব্র আর্তি নিদারুণ চাপেই বেরিয়ে আসে। সে কারণে কোনো সৃষ্টির পেছনে প্রচ্ছন্ন থাকে নির্মাণের বিশিষ্টতা আর প্রকাশের ব্যাকুলতা। মানুষ তখন হতে চায় শুধু আপন সমগ্রতার অভিমুখী। যে সমগ্রতায় বাইরের পৃথিবীকেও তার চাই।[৩১] ফলে পাড়াগাঁ থেকে আসা শ্রীবিলাসের উপর পারিপার্শ্বিক পরিবেশের চাপ যতই থাক, শেষ পর্যন্ত নানা অবতলকে সে একত্র করে নিতে পারে। তাই তার চোখের ব্যক্তি-প্রসারী বিশ্লেষণ-দক্ষ মূল্যাঙ্কণে 'জ্যাঠামশায়' শীর্ষক আদি পর্বে শচীশ যেখানে জ্যোতিষ্ক এবং আগুনের শিখা হয়ে ওঠে, সেখানে সময়ের পথ বেয়ে অন্তিম পর্বে দেখায় তার আত্মদগ্ধরূপ। শচীশের চোখের ঔজ্জ্বল্য এবং তার আগুনের শিখার মত আঙুলের উপমার সঙ্গে গায়ের রঙের আভা পথ চলতে সাহায্য করে বটে, কিন্তু তারই বীক্ষণ দৃষ্টিতে শেষ পর্যন্ত বোঝা যায়, এ আগুনের মধ্যে দাহটাই বড়।

শ্রীবিলাসের সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা ভালবাসার মাধ্যমে পূর্ণতার অভিলাষী। আর এ পূর্ণতার অর্থ— “Sufficiently adopted to express the faculty of being continually made better.”[৩২]

অতএব শচীশকে ভালবেসেই সে জগমোহনের নাস্তিক্যবুদ্ধি এবং পরবর্তীতে লীলানন্দ স্বামীর রসবুদ্ধির কাছেও দীক্ষা গ্রহণ করে। একদিকে নাস্তিক্যবুদ্ধির ছত্রছায়ায় বসে সে নাস্তিক্য-আস্তিক্যের সংঘাতপূর্ণ চিত্রটির ঊর্ধ্বে একটি সহজ সত্যের প্রকাশকে ননিবালার মধ্যে দেখে। অন্যদিকে রসতত্ত্বের আসরে মানুষের বাসনালোক দামিনীর মাধ্যমে কিভাবে উচ্চকিত হয়, তারও পরিচয় পায়। দুটো ক্ষেত্রেই বৃত্তকে চূর্ণ করে সময় এগিয়ে চলে। সহজ সত্যের প্রচ্ছন্ন আঘাতকে সে বোঝে বলেই কথক হিসেবে সাজাবারও দায়িত্ব পায়।

নাস্তিক শচীশকে দেখে শ্রীবিলাস অন্তরে আঘাত পায়। আবার সেই নাস্তিক-শচীশ যখন চরমতম আস্তিক্যবাদ শিরে ধারণ করে লীলানন্দ স্বামীর আশ্রমে লীলারসে বিভোর হয়, তখনও ব্যক্তি-শ্রীবিলাস মানসিক আঘাতকে এড়িয়ে যেতে পারে না। কিন্তু এই পরিস্থিতির পরিবর্তনে সে রাগ করতেও পারে না ভালবাসার জোরেই। আর এখানেই জগমোহনের নাস্তিক্যবুদ্ধি-সর্বস্ব দলের অন্যান্য লোকদের থেকে শ্রীবিলাসের পার্থক্য। এই ভালবাসার জোর নেই বলেই শচীশের মত্-

পরিবর্তনের জন্য দলের লোক ভয়ংকর চটে যায়, কিন্তু শ্রীবিলাস বলে— 'রাগ করিতে পারিলাম না'।[৩৩] কোনো দল, কোনো সম্প্রদায়, কোনো শ্রেণী সংগঠন নিয়ে শ্রীবিলাস অন্ধ সংস্কারবাদী নয়। নানা দলের সঙ্গে সে যুক্ত, কিন্তু প্রতিটি দলের সঙ্গে তার যোগাযোগের সম্পর্কটুকুও মসৃণ। নিজেকে অভিজ্ঞতার এই সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে দিতে গিয়ে কোনো অভিজ্ঞতাই নগন্য নয়। তাই উজ্জ্বল-শচীশকে কেন্দ্রে রেখে জগমোহনের কাছে তার ছুটে আসা, আবার তাকেই কেন্দ্র করে লীলানন্দ স্বামীর খোঁজে ছুটে যাওয়া।

কিন্তু দুটো সময়-ভাবনার দূরত্ব কি অল্প কথা। যেখানে বিরোধী অভিজ্ঞতা নানা সময়কে তুলে আনে, সেখানে বিশেষ তত্ত্ব বিশ্বাসী লোকেরা সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে দূরত্বের পথকে ব্যবধান বলে মানে। শ্রীবিলাসের কাছে সে সমস্যা নেই বলেই দুটি স্থান-কালের ভিন্ন পরিস্থিতি একটি অবয়বে একটি মিথস্ক্রিয়ায় ধৃত হয়। তার জন্য হয়তো অনেক সময়ের পথ পেরিয়ে লীলানন্দ স্বামীর আশ্রমে তাকে পৌঁছাতে হয়। কিন্তু অন্তর্বর্তী প্রবহমান সময়ের বিস্তৃত বর্ণনা দেবার প্রয়োজন সে বোধ করে না। কেবল বয়ানের সংযোগ রক্ষায় তাকে দ্রুতলয়ে বলতে হয়—

"গেলাম লীলানন্দ স্বামীর খোঁজে। কত নদী পার হইলাম, মাঠ ভাঙিলাম, মুদির দোকানে রাত কাটাইলাম, অবশেষে এক গ্রামে গিয়া শচীশকে ধরিলাম। তখন বেলা দুটো হইবে।"[৩৪]

হয়তো এ কারণেই ঔপন্যাসিকের কৌশলটি নির্দিষ্ট করে সমালোচক বলেন—

"The novelist .... passes over years in a few sentences but gives two long chapters to a dance or tea-party."[৩৫]

শ্রীবিলাস তত্ত্বসন্ধানী নয়। অভিজ্ঞতার ধুলোকে গায়ে মেখে শচীশ তার ভালবাসার লক্ষ্যস্থল। আবার এ ভালবাসা অন্ধ ভাবাবেগ দ্বারা আক্রান্ত নয়। তাই শচীশকে নিয়ে লীলানন্দ স্বামীর ভাবসাগরে ডুব মেরেও কঠিন কলকাতার পরিসর ধাক্কা দিয়ে তার অতীতের দিনগুলো মনে করিয়ে দেয়। 'বর্তমান' তার পেছনের পূর্বসূরীকে সূত্রবদ্ধ করে কলকাতা হয়ে ওঠে একটি সংকেত। আর এখানেই বোঝা যায় শচীশের মধ্যে সময়ের স্বাভাবিক সম্পর্কহীনতা।

তবু শচীশ একজন ব্যক্তি বলে সংশয়ের দ্বারা আক্রান্ত হবে, এটা স্বাভাবিক। তা না হলে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে তার প্রয়োজন হত না লীলানন্দ স্বামীর আশ্রমের দাসত্ব থেকে বেরিয়ে আসা। শ্রীবিলাস কথক হিসেবে এ কারণেই শচীশকে তার দ্বিধা-সংশয় নিয়ে ডাইরীর পাতা থেকে তুলে ধরতে চায়। আর বলাবাহুল্য সেই ডাইরীর পাতা শচীশের নিজস্ব সংলাপ। মনে হতে পারে শচীশকে বোঝাবার জন্য শচীশের ভাষা ব্যবহারের যুক্তি কোথায়। তার উত্তরে আমাদের

মীমাংসা হল—

১) যেহেতু শ্রীবিলাস শচীশকে ভালবাসে। তাই তারই ব্যক্তিসময়ের অনুভূতি দিয়ে বলিয়ে নিতে চায়।

২) যেহেতু শ্রীবিলাস বোঝে, শচীশ আবদ্ধকালের মধ্যে ডুবে আছে। অথচ তার পরিত্রাণ একমাত্র হতে পারে সময়ের ক্রমধারায় সংশয়ের মধ্য দিয়ে। অতএব প্রমাণ হিসেবে সেই চিহ্নটি সে অক্ষয় করে রাখে।

দামিনীর জীবনেও সময়স্তরে যে বন্দিদশা দেখা দেয়, পূর্বেই তার আলোচনা হয়েছে। কিন্তু কথক-শ্রীবিলাস দামিনীর বন্দিদশার ছবিকে কেমনভাবে পর্যায়ক্রমিক দেখিয়ে সময় সূত্রকে উচ্চকিত করে, তারও সংক্ষেপে বিচার হতে পারে—

১) দামিনীর প্রথম সময় বিপর্যয় = শিবতোষ।

২) দামিনীর দ্বিতীয় সময় বিপর্যয় = লীলানন্দ স্বামী।

৩) দামিনীর তৃতীয় সময় বিপর্যয় = শচীশ।

এখানে শ্রীবিলাস তার বীক্ষণ-দৃষ্টিতে দেখিয়ে দেয়, তালিকার প্রথম দুই সময় বিপর্যয়ের জন্য দামিনী নিজে দায়ী নয়। কেননা, তার নিজস্ব কোনো নিয়ন্ত্রণের সুযোগ সেখানে ছিল না। কিন্তু তৃতীয় সময় বিপর্যয় দামিনীর নিজের সৃষ্টি। অতএব যে- শচীশ সঙ্গতিহীন উদ্দেশ্য নিয়ে কোনো ভবিষ্যৎ গড়তে সমর্থ হয় না, সেখানে দামিনীর ছুটে যাবার আপাত কোনো অর্থ নেই। কিন্তু আপাত এই অর্থহীনতার মধ্যে কথক-শ্রীবিলাস মানুষের সময়ের সত্য অনুধাবনের নানা স্বভাব বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে। ব্যক্তি-শ্রীবিলাসও সেই একই পথে যেখানে শচীশের প্রতি আকর্ষিত হয়, আমারও উপন্যাসের শুরুতে শচীশের প্রতি প্রবল আসক্তিকে ত্যাগ করে উঠতে পারি না।

আসলে দামিনী যেমন শচীশকে দেখে শ্রীবিলাসকে লক্ষ্য করে না, তেমনি শ্রীবিলাসও শচীশের মধ্যে নিজেকে আড়াল করে। আর সেই সঙ্গে উপন্যাস পাঠক ও সমালোচকের চোখকেও করে ভ্রান্ত। দামিনীর মতই আমাদের সকলের অনভিজ্ঞ চোখে যত জোরালো আলোকচ্ছটা বড় হয়ে ধরা দেয়, ততই তার ভেতরের বস্তুটিকে আবিষ্কার করে নিতে দেরি হয়। কেবলমাত্র সময়ের দ্বারা নিরন্তর মূল্যায়ণই দেখিয়ে দিতে পারে তুচ্ছের মধ্যে প্রচ্ছন্ন সত্যকে। শ্রীবিলাস প্রথম নিজের মধ্যে শক্তির প্রকাশকে উপলব্ধি করে না। সেজন্য শচীশের পাশে নিজের অস্তিত্ব বিলোপ করে। দামিনীও প্রথমে সেভাবেই শ্রীবিলাসকে খেয়াল না করে শচীশকে তার সময় মুক্তির উৎস রূপে ভুল-অনুসন্ধানে এগোতে থাকে। কিন্তু ভুলের মাশুল গুণে সময় অতিক্রান্তির সংস্পর্শেই ধীরে ধীরে ফুটে উঠে যথার্থ কাঙ্ক্ষিত পথ। রবীন্দ্রনাথও

এ প্রসঙ্গে সমর্থনসূচক ইঙ্গিত অন্যত্র এভাবে দেন—

"রস বিচারে ব্যক্তিগত এবং কালগত ভুল সংশোধন করিয়া লইবার জন্য বহু ব্যক্তি ও দীর্ঘ সময়ের ভিতর দিয়া বিচার্য পদার্থটিকে বহিয়া লইতে গেলে তবে সন্দেহ মেটে।"[৩৬]

অতএব যে শ্রীবিলাস নিজেকে সাধারণ জ্ঞান করে উপন্যাসের জ্যাঠামশায়-পর্ব থেকে অগ্রসর হতে থাকে এবং টুকরো টুকরো নানামুখী জীবনের ধারাকে গতিশীল করে তোলে, তাতে বিশেষ দৃষ্টি দেবার প্রয়োজন বোধ করে না। কিংবা অনেক নদী-পর্বত-সমুদ্রতীর ঘুরেও সময়ের অনেক অতিক্রান্তির মধ্য দিয়ে দামিনীর সঙ্গে শ্রীবিলাসের পাশাপাশি অবস্থানে দামিনীর চোখে শ্রীবিলাস স্পষ্ট হয় না। কিন্তু কলকাতার যান্ত্রিক জীবনে সামান্য কয়েকটি খণ্ড সময়ের সংস্পর্শে তারা যে দু'জনেই একটি হৃদয়ে এককরূপে ব্যক্ত হতে পারে— তার সময়-অতিক্রান্তির বিশাল পটচিত্রকে স্মরণ রাখতে হয়। আবার দামিনীর সঙ্গে শ্রীবিলাসের বিবাহেই গল্প থেমে যায় না। কারণ এ বিবাহ খণ্ডের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন কালের নিরন্তর সম্পর্ক-বন্ধনে নিত্যদিনের বাঁধা সমতলীয় অভ্যাসে রিক্ত নয়।

উপন্যাসের শ্রীবিলাস-পর্ব শুরু হয় তাদের বিবাহোত্তর জীবন দিয়ে। কিন্তু শুরুতেই পেছনের ঘটনাকে এগিয়ে নিয়ে এসে দেখানো হয় দামিনীর মৃত্যু। উপন্যাসে সময়ের এই আঙ্গিকগত বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা আছে। কেননা—

"The modern fiction writer's concern with time goes further than the making of a series of scenes and deciding the relative emphasis to be placed upon each of them. The novelist has frequently found it desirable to alter the chronological arrangement of events, sometimes describing an earlier event after portraying a later event, and he has some times attempted to achieve an effect of simultaneity of events."[৩৭]

অতএব 'চতুরঙ্গ' যদি কাহিনীর 'chronological arrangement of events'– হিসেবে বিচার্য হয়, তবে দামিনীর মৃত্যুই শেষ বাক্য হওয়া উচিত। কিন্তু সময়ের শিল্পরূপ সন্ধানে এ উপন্যাস কোনোভাবেই মৃত্যুকে পরিণাম করে তোলে না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থে এক জায়গায় উল্লেখ করেন—

"জীবনকে সত্য বলে জানতে গেলে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তার পরিচয় পাই। যে, মানুষ ভয় পেয়ে মৃত্যুকে এড়িয়ে জীবনকে আঁকড়ে রয়েছে, জীবনের পরে তার যথার্থ শ্রদ্ধা নেই বলে জীবনকে সে পায় নি। তাই সে জীবনের মধ্যে বাস করেও মৃত্যুর বিভীষিকায় প্রতিদিন মরে। যে লোক নিজে এগিয়ে গিয়ে মৃত্যুকে বন্দি

করতে ছুটেছে, সে দেখতে পায়, যাকে সে ধরেছে সে মৃত্যুই নয়, সে জীবন।" ৩৮

মৃত্যুকে তাই এখানে উদ্দেশ্যের মাধ্যম করে বরং সময়ের বহুমুখী চেতনাই উদ্দিষ্ট হয়। যে কারণে উপন্যাসের শৈল্পিক বিন্যাসে ক্রমান্বিত ধারা ভেঙে পরের কথাকে আগে নিয়ে আসা হয়, এবং তারপর আগের কথাকে পরে সাজিয়ে নানা খণ্ড সময়ের পারস্পরিক সম্পর্কের মূল্যায়ণ ঘটে। দামিনীর মৃতদেহ দাহ করে তাই শ্রীবিলাস পর্বের সূচনা। তারপর দামিনীর সঙ্গে তার সম্পর্ক, শচীশের বিচ্ছিন্ন অন্ধকার প্রয়াসী জীবনের বর্ণনা ইত্যাদি অসংখ্য ঘটনামালার অতীত চিত্র শ্রীবিলাসের সংসার জীবনের স্বল্পকালের ছবিটিতে অক্ষয়ভাবে যুক্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু মৃত্যুর বিচ্ছেদ আছে বলেই বারবার সেখানে একটি আক্ষেপ অদৃশ্যভাবে ধ্বনিত হয়— দামিনী থাকবে না। যে কারণে তাদের সংসার জীবন 'সময়ের ভার' হয়ে ওঠে না। শ্রীবিলাসও বলে— 'দিনগুলি যে গেল সে হাঁটিয়াও নয়, ছুটিয়াও নয়, একেবারে নাচিয়া চলিয়া গেল।' ৩৯ অর্থাৎ হেঁটে চলা ও ছুটে চলার মধ্যে যে ক্রমান্বয়ে প্রলম্বিত ধীরতা এবং পীড়নের দ্রুততা আছে, তার সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে কাটিয়ে নেচে চলার মধ্যে রয়েছে স্বাচ্ছন্দ্য। মৃত্যু যেন তার উপর একটি প্রচ্ছন্ন সময়-বন্ধন এবং সময়-মুক্তির প্রলেপ দিয়ে রাখে। মৃত্যুর বিচ্ছেদ আছে বলেই ফাল্গুন মাস এখানে বিশিষ্ট। তাই তার প্রতিটি সময়-ছন্দ সমীক্ষিত হয়। জীবনের ছোটো ছোটো সময়ের আক্ষেপ ধরেই বিশেষ মুহূর্ত নির্বিশেষ মাত্রা পায়। অতএব আখ্যানের একক স্বরের বিবেচনায় সংকলক শ্রীবিলাস বয়ান সাজাতে পারে না, তাকে আরো গভীর দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে হয়। সেই সূত্রে দামিনী ফাল্গুন মাসের বিশেষ মাঘী পূর্ণিমার খণ্ডকালে পরিব্যপ্ত ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে শ্রীবিলাসকে আত্মপ্রকাশের অভিজ্ঞান পরিয়ে দিলে, তা আর সময়ের মৃত্যুরূপ নিয়ে চলে যাওয়া বোঝায় না। জন্মান্তরে আবার ফিরে পাবার ব্যাকুলতা হয়ে ওঠে।

ঔপন্যাসিকের কাছে জীবনটাই কাঙ্ক্ষিত। অতএব সেই জীবনটাকে নানা কোন্ থেকে উল্টে পাল্টে না দেখে তাঁর শান্তি নেই। ঔপন্যাসিক যে কারণে তাঁর উপন্যাসের কাছে দায়বদ্ধ, সেখানে তিনি সমকালীন সংগঠনেও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। জীবনের মূল্যবোধ আবিষ্কার তাঁর লক্ষ্য, কিন্তু তাকে সময়বোধের ভেতর দিয়ে ৪০ পরিচালিত না করে উপায়ও নেই। অথচ যে সময়বোধ, তার নানা মাত্রা ধরে চলারও কি শেষ আছে! লেখক প্রতি মুহূর্তে তার সঙ্গে যুক্ত আছেন, অথচ আড়াল থেকে অবিরত গড়ে চলেছেন প্রতিমা। সে প্রতিমা কেমন, আদৌ কি প্রতিমা, এ রকম হাজার প্রশ্ন উপন্যাসে বৃত্ত-সময় অন্বেষণে লেখকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘনিষ্ঠতর অথচ জটিলতর করে তোলে। আর শুধু কি তাই, উপন্যাসের শেষে

একজন লেখক কেবল মূল্যবোধ নিয়ে আমাদের কাছে এসে দাঁড়ান না, সেইসঙ্গে মুখশ্রী আবিষ্কারকে সময়ের পথ পরিক্রমায় পরিণাম করে তোলেন। উপন্যাস-শেষে যা অন্তিম উন্মোচন রূপে ঘুরে আসে। আর তার কারণ—

"The author is responsible for the narration, the description and the reflection and loses his identity only in the dialogue."[৪১]

উপন্যাসের অসংখ্য সংলাপ, আর সমস্ত সংলাপকে মিলিয়ে একটি অখণ্ড সংলাপ— লেখক 'চরিত্রের সমগ্রতা' ধরে সৃষ্টি করেন। আর 'চরিত্রের সমগ্রতা সৃষ্টির জন্যে অতীত জীবনের সূত্রগুলিকে চরিত্রের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবন যাপনের সঙ্গে যুক্ত করা বিশেষ প্রয়োজন।'[৪২] হয়তো এই প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখেই রবীন্দ্রনাথ গোরার বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে যেখানে দেশ ও কালকে লেখকের বক্তব্য থেকে চরিত্রের আত্মানুসন্ধান করেন, 'চতুরঙ্গে' এসে একটি চরিত্রের অন্তর্সংলাপ দিয়ে বীক্ষণ বিন্দুটিকে আরো অন্য মাত্রায় যাচাই করে নেন। তবু শ্রীবিলাসের আমি-র চোখে সময় আরো সুতীব্র মাত্রা পেলেও তার আবরণটাও রবীন্দ্রনাথের নজর এড়ায় না। কারণ 'চতুরঙ্গে' সময়ের ভেতর দিয়ে দেখা একটি আশ্চর্য সম্মিলনের জগৎ ওঠে এলেও শ্রীবিলাসের পর্যাপ্ত 'আমি'-কে দেখার জন্যও আরো উত্তারণ প্রয়োজন। কারণ, শ্রীবিলাসের সংলাপ নানা সংলাপের ভিড়ে মিশে মুখশ্রী আবিষ্কার করে সত্য এবং এই নির্মাণধারায় যদিও বহুস্বর যুক্ত হয়ে স্বীকৃতি নিয়ে আসে, তবু শ্রীবিলাসের এত বড় মহৎ সময় অভিযাত্রার একমাত্র কথক সে-ই। অতএব শ্রীবিলাসকে গড়তে গড়তেই সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেন, যে চরিত্র সংলাপে দেশ-কাল সহস্র দেশ-কালে সম্মিলিত হয়ে একটি সামগ্রিক সংলাপে সার্থক রূপান্তর ঘটাবে, সেখানে শুধু একজনের কথন-বিশ্বের উপর তার প্রকাশের মাত্রাকে ছেড়ে রাখলে সীমাবদ্ধতা দেখা দিতে পারে।

মোট কথা, মুখশ্রী আবিষ্কারের ভিন্ন পন্থা অবলম্বনের তখন প্রয়োজন। আর তার জন্য আত্মকথার মধ্য দিয়ে বিচিত্র চরিত্রের দ্বন্দ্ব, সংকল্প, বিতর্ক ও মতভেদ নানা দৃষ্টিকোণে আকারপ্রাপ্ত হয়ে উঠতে চাইল। বাংলা উপন্যাসে এর আগে অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র 'রজনী'তে এই প্রচেষ্টা করে গিয়েছেন। কিন্তু এই প্রচেষ্টাতেই কেবল আঙ্গিক বৈচিত্র্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর দক্ষতাকে প্রসারণ করলেন না। অতএব অব্‌জেক্ট হিসেবে একটি ঘটনা বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের রঙে স্বতন্ত্ররূপ নিয়ে দাঁড়াতে পারে বলেই 'চতুরঙ্গে' সেই নানা টুকরো অভিজ্ঞতা বিভিন্ন ব্যক্তির অভিজ্ঞতায় প্রকাশের সূত্রে যুক্ত হতে পারে না। ফলে কথক শ্রীবিলাসকে ধরে প্রয়োজন অনুভূত হয় 'ঘরে বাইরে' রচনার তাগিদ। সাময়িক পত্রে প্রকাশের কাল হিসেবে দুটো উপন্যাসের ব্যবধান সেজন্য খুবই কম। 'চতুরঙ্গ' সবুজপত্রে ১৩২১ বঙ্গাব্দের

অগ্রহায়ণ থেকে ফাল্গুন পর্যন্ত চারটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়, অন্যদিকে 'ঘরে বাইরে' ওই একই পত্রিকায় ১৩২২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে ফাল্গুন পর্যন্ত ধারাবাহিক চলে। কাজেই যে পরীক্ষার সূত্রপাত 'চতুরঙ্গে', 'ঘরে বাইরে'তে তার পুনরাবৃত্তি না ঘটিয়ে আরো অন্যভাবে সন্ধান অব্যাহত থাকে।

'ঘরে বাইরে' উপন্যাস স্রষ্টার সর্বজনভেদী দৃষ্টিতে ধরা নয়, আবার 'চতুরঙ্গে'র মত একজন কথকের কৌনিক মাধ্যমে সৃষ্টি হয়ে ওঠাও নয়। বরং মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণরীতিতে একজন যেমন করে ভাবে, তাকে অন্য রকম ভাবে ভাবনা;— তাকে বাজিয়ে নেবার প্রচেষ্টাও ধরা পড়ে। অতএব এর আখ্যান-আবেদন একাধিক। তাতে নানা দৃষ্টিতে বিচারের আলো এসে পড়ে বলে সকলেই সেখানে নিজের স্থানটিকে বড় করে গড়ে তুলতে চায়। তাই নানান টুকরো সময়ের অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হয় বিভিন্ন সীমায়িত ব্যক্তিকালের বৃত্ত। টুকরো অভিজ্ঞতাই সঞ্চারিত হয় সেই ব্যক্তি রাজ্যে। তাই সময়ের নানা মাত্রা তাতে এত প্রবল, এত জটিল হয়ে পড়ে বলেই অনেকভাবেই তার আলোচনা সম্ভব।

এক্ষেত্রে প্রথম অভিজ্ঞতা যে স্থান-কালটিকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে, তার গভীরতার স্তরে পৌঁছানোর আগে অব্জেক্ট হিসেবে সময়ের মাত্রা ধরে আলোচনা শুরু করা যায়। আর তাতে দাঁড়িয়ে থাকা ভূমিটি সংযুক্ত হয় রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে। যেখানে আসে 'বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সূত্র ধরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বিরোধী স্বদেশি আন্দোলন। যা ছিল মূলত ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের বৃহত্তর স্বাধীনতা আন্দোলনেরই অঙ্গ।'[৪৩]

বিদেশি শাসকের বিরুদ্ধে তখন বঙ্গ বিচ্ছেদের সূত্র ধরে যে বয়কট নীতির আন্দোলন জোরদার হয়, তার অনেক আগে থেকেই কিন্তু স্বদেশি আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে যায়। এই স্বদেশি আন্দোলনের সদর্থক দিকটিকে অস্বীকার করার উপায় ছিল না। তার কারণ, এর আর্থিক এবং দেশীয় শিল্পায়ণ গঠনের প্রবণতা। যার জন্য বিদেশি পণ্য বর্জন করে নিজেদের ওঠে দাঁড়াবার সামর্থ্যে সেই শূন্যস্থান পূরণের জন্য স্বদেশি জিনিষ উৎপাদনের প্রচেষ্টা দেখা দেয়। তবু স্বদেশি আন্দোলনে আরেকটি উদ্দেশ্যও কাজ করে এবং তা দেখা যায় বঙ্গ বিভাজনের দৃষ্টান্তে। তখন তা হয়ে ওঠে—

"It was to attract the attention of the British Government to the partition of Bengal. And to make it effective, the boycott of foreign goods was started almost simultaneously."[৪৪]

অতএব বিদেশি পণ্য বর্জনে আলাদা একটি মাত্রা যুক্ত হতে পারে।

স্বদেশি আন্দোলন এ জায়গা থেকে নানা ভিন্নতার ছবি নিয়ে দেখা দিতে থাকে।

একদিকে তা প্রতিশ্রুতিময়, উদ্দীপনাময়, সাংস্কৃতিক নানা দিকের উজ্জীবনে সমৃদ্ধ। তেমনি অন্য আরেকটা দিকে তার হতাশাব্যঞ্জক[৪৫] প্রকাশের সূত্রটিও অলক্ষ্যে নয়।

স্বদেশি আন্দোলনের তখন মূল উদ্দেশ্য, বিদেশি শক্তির দ্বারা আক্রান্ত ভারতের মৃতপ্রায় শিল্পগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলা। আর সেই লক্ষ্যে ছাত্ররা বিদেশি কাগজের ব্যবহার পরিত্যাগ করে, ময়রা বিদেশ থেকে আগত চিনি ব্যবহার করবে না বলে সিদ্ধান্ত নেয়; পাশাপাশি স্বদেশি তাঁতের কারখানা, লবণ, চিনি, সাবান, দেশলাই, চামড়াজাত জিনিষ উৎপাদনের জন্য নানা কুটিরশিল্প ও বড় বড় কারখানা তৈরি হয়। এছাড়া সম্পদের সঞ্চয় ভাণ্ডার গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে দেশীয় ব্যাঙ্ক এবং জীবনবীমা কোম্পানিও খোলা হয়। আর বাংলাদেশের এই বঙ্গবিচ্ছেদের সূত্রে স্বদেশি আন্দোলন একটি পরিণত রূপ পেয়ে ক্রমশ সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। যে বয়কট, যে স্বদেশি, যে জাতীয় শিক্ষা ইত্যাদি টুকরো টুকরো দৃষ্টান্তগুলো এর আগে বঙ্গে পরিচিত ধারণারূপেই আসে, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে তার আত্মপ্রকাশ বিপুল আকার পেয়ে যায় এবং 'এই আন্দোলনের উৎস ধরে পরবর্তীকালের বৃহত্তর স্বাধীনতা প্রয়াসী আন্দোলনেরও প্রবণতা দেখা দেয়।'[৪৬] বিদেশি কাপড় পোড়ানোরও তখন যে একটি ধারা চালু হয়, তার মূলেও থাকে বাংলার সূতি বস্ত্রের প্রধান বাজারকে ধরে ইংলন্ডের অর্থনৈতিক ক্ষতিসাধন।

তবুও এই গঠনমূলক প্রতিক্রিয়ায় সীমিত প্রতিবাদ বৃহত্তর ক্ষেত্রে গর্জে ওঠলেও তাতে অনেক ফাঁক থাকে। আর সেই ফাঁক যে-সকল কারণের দ্বারা সৃষ্টি হয়, তার একটি অন্যতম উৎস মানবধর্মের বাইরে মানুষের ব্যক্তিধর্মের দুর্বার প্রবৃত্তিগত মোহ। ফলে স্বদেশি আন্দোলন মৌলিকভাবে ভেতরে ভেতরে গতি পরিবর্তন করে হিন্দুত্বের সংস্কারে। ইতিহাসকার যার বিবরণে বলেন—

"Kali the Goddess was to be a symbol for the Motherland and after the religious ceremony, the swadeshi vow was administered by the priests."[৪৭]

স্বভাবতই মানুষের ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস যখন জাতীয়স্তরে প্রসারিত হয়, পরিণাম হিসেবে মুসলমান সম্প্রদায় তখন বৃহত্তর যৌথ উদ্দেশ্য থেকে সরে আসে। যদিও স্বদেশি আন্দোলনে পরাধীনতা থেকে মুক্তির লক্ষ্যে প্রচলিত ধর্ম বিশ্বাসের উর্দ্ধে জাতপাতহীন অখণ্ড মানবধর্ম রক্ষার আবেগ কাজ করতে চায়। তবু শেষ পর্যন্ত সেই মানবধর্মই তখন কখনো কখনো খণ্ডিত হয়। সময়ের সেই সামাজিক দৃশ্য রবীন্দ্রনাথ নানা প্রবন্ধেই চিত্রিত করেন। তেমনি যার একটি উল্লেখ আছে এই ভাষ্যে—

"যতদিন আমাদের মধ্যে ধর্মবোধ সহজ ছিল ততদিন গোঁড়ামি থাকা সত্ত্বেও কোনো হাঙ্গামা বাধেনি। কিন্তু একসময়ে যে কারণেই হোক ধর্মের অভিমান যখন

উগ্র হয়ে উঠল তখন থেকে সম্প্রদায়ের কাঁটার বেড়া পরস্পরকে ঠেকাতে ও খোঁচাতে শুরু করলে। আমরাও মসজিদের সামনে দিয়ে প্রতিমা নিয়ে যাবার সময় কিছু অতিরিক্ত জিদের সঙ্গে ঢাকে কাঠি দিলুম, অপরপক্ষেও কোরবানির উৎসাহ পূর্বের চেয়ে কোমর বেঁধে বাড়িয়ে তুললে, সেটা আপন ধর্মের দাবি মেটাবার খাতির নিয়ে নয়, পরস্পরের ধর্মের অভিমানকে আঘাত দেবার স্পর্ধা নিয়ে। এই সমস্ত উৎপাতের শুরু হয়েছে শহরে, যেখানে মানুষে মানুষে প্রকৃত মেলামেশা নেই বলেই পরস্পরের প্রতি দরদ থাকে না।"[৪৮]

স্পষ্টতই সাম্প্রদায়িক বিভেদটাই কুলপতিদের সামগ্রিক আন্দোলনকে বারবার অজান্তে প্রতিহত করে, এবং অবশ্যই এই বিদ্বেষ বিষবাষ্প মূলত সূচনা করে মানব ধর্মের অবলুপ্তিকরণের পথ— অপরতার শূন্যতাই যার শেষ লক্ষ্যস্থল। শহরের আন্তরিকতাহীন পরিসর ধরেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর সময়টিকেই অনুসন্ধান করেন। অতএব যে সংগঠনের মৌলিক প্রচেষ্টায় শহর যেখানে যুগসংগঠক হয়ে উঠবে, পরিণামে তা ধ্বংসের প্রতিরূপ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ ব্যক্তিগত ধর্মের চাপানো প্রবৃত্তি আসলে সংস্কারান্ধ হয়ে ওঠে শিক্ষার অভাববোধ থেকেই। যে শিক্ষার আলো শহরকে ধরে গ্রামে সম্প্রসারিত হয় না।

তবু সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতা কেবল ধর্মীয় নয়। সময়ের ইতিহাসে তা একটি আবরণ মাত্র। আসল কথা, মানুষের আধিপত্য স্পৃহা। অতএব স্বদেশি এবং বয়কট-আন্দোলনের সঙ্গে যারা উৎসাহ সহকারে জড়িত, তাদের লক্ষ্যস্থল ব্রিটিশের অন্যায় ক্ষমতা প্রয়োগকে বাঁধা দেওয়া, পরিণামে ক্ষমতা অধিগ্রহণ করে পরাধীনতার জ্বালা মেটানো। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তার বিরোধী নিশ্চয়ই নন। কিন্তু তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ভবিষ্যৎ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে এ কথাটা বোঝে, অন্যায়ের এবং শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে ক্ষুদ্রতম থেকে বৃহত্তর সময়-পরিসরে জীবনকে খুঁজে বেড়াতে গিয়ে মানুষকে আগে যথেষ্ট স্বনির্ভরশীল করা চাই। শুধু প্রচলিত ধর্মের বিভেদই নয়, বরং এই বিভেদকেই মুখোশ করে তার মুখটিকে খুলে দেওয়া হয়, ধরা পড়ে বহু যুগের সেই পরিচিত রূপ— বৃহত্তর স্বার্থকে ছাড়িয়ে নীচ ব্যক্তিস্বার্থ।

স্বাধীনতার প্রশ্নে ব্রিটিশ নামক একটি অব্‌জেক্ট সেদিন যেখানে কেবল মুখ্য ছিল, নিজেকে স্বাধীন করে তোলার মৌল দিকটি সেক্ষেত্রে মান্যতা পায়নি। ফলে সামগ্রিক ব্যাপারটিতে একটি মহৎ উদ্দেশ্য কাজ করলেও তার কোনো কোনো চোরাস্রোত ধরে দেখা দিতে শুরু করে আত্মক্ষমতা অধিগ্রহণ এবং তার সম্প্রসারণের প্রবৃত্তি। সেখানে কোনো একটি বড় শক্তির কাছ থেকে ক্ষমতার শক্তিকে ছিনিয়ে এনে দেশের মানুষকে করতে চাওয়া হয় উপায়। তখন মানুষের ব্যক্তি-সময়কে

ধরে তাব মানবিক বিশ্বসময়ে পৌছাবার ভবিষ্যদ্‌মুখী পথ লুপ্ত হতে চায় বলেই সংগ্রামের ইতিহাসে নরমপন্থী-চবমপন্থী— দুই দলের ভাগ এসে পড়ে। ইতিহাসের পুনর্মূল্যায়ণ ঘটিয়ে এই ব্যক্তি এবং সামাজিক ছবিটি একজন আলোচকের মন্তব্যেও ওঠে আসে—

"ভারতবর্ষেব ইতিহাস পরিবর্তবাদ বা substitutionism- এর একটি উদাহরণ— সামাজিক শক্তি নিষ্ক্রিয় থাকার ফলে, তার পরিবর্তে এখানে বুদ্ধিজীবী বা ইন্টেলিজেন্টসিয়া নেতৃত্ব দেয়। শ্রেণী বা বর্ণচেতনা নয়, শিক্ষাগত জাতীয়তাবাদী ভাবাদর্শই এখানে মূল কথা। অথচ যে সামাজিক শক্তির মুখপাত্র তারা, তার সঙ্গে কোন অঙ্গাঙ্গী যোগ তাদের ছিল না, উৎপাদন সম্পর্কগত কৃষি সংযোগও নয়। অথচ এই এলিট্‌রা ভূমিস্বার্থের সঙ্গে জড়িত। বড় জমিদারদের হাত থেকে নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় এই শ্রেণী যেমন উৎসাহী, কৃষকের দাবি সম্পর্কেও তেমনি শঙ্কিত; কৃষক জনসাধারণের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক রচনা করতে না পারাই স্বদেশী আন্দোলনের মূল ব্যর্থতা আর এই ব্যর্থতাই স্বদেশী যুগকে, বাংলাদেশের সন্ত্রাসবাদের বীরত্ব পূর্ণ কিন্তু সংকীর্ণ কানাগলিতে ঠেলে দেয়।"[৪৯]

স্পষ্টত বিপ্লবী বা সন্ত্রাসবাদী চরমপন্থীদের মধ্যে তাদের ত্যাগ, নিষ্ঠা এবং সাহস রবীন্দ্রনাথকে আকর্ষণ করলেও তাদের রাজনৈতিক পথ এবং উদ্দেশ্যকে তিনি সমর্থন করেন না। শুধু তাই নয় 'বন্দেমাতরম্' উপাসকদের স্বাদেশিকতা, এমনকি বন্দেমাতরম্ শ্লোগানকেও তিনি মান্যতা দিতে পারেন না।[৫০] তাদের ত্যাগব্রতে যে বহু সম্ভাবনা, সময়ের ইতিহাসে তা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। কিন্তু তাদের লক্ষ্যে পৌছাবার ক্ষেত্রে যে-রক্তপাতকে বহন করে, স্বভাবতই বৃহত্তর কাল সেখানে নীরব। বরং এই হিংসার পথে মানুষকে গড়ে তোলার বৃত্তটি নষ্ট হয় এবং ছোঁয়াচে রোগের মত তা আত্মপরতন্ত্রে দীক্ষা দিতে থাকে। যে কারণে আধিপত্যের আদিম প্রবৃত্তি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

এছাড়াও সামাজিক কোনো বড় আন্দোলনের পেছনে যেখানে ব্যক্তির ভূমিকা দেখা দিতে থাকে, সেখানে তাকে সুনিয়ন্ত্রিত উপায়ে গড়ে তুলতে সময়ের দীর্ঘ সহযোগিতার প্রসঙ্গটিও এড়িয়ে যাবার নয়। স্বদেশি এবং বয়কট আন্দোলন প্রথম থেকেই একটা তাড়াহুড়োর ব্যাপার। ফলে এই আন্দোলন নানা মাত্রায় ছড়িয়ে পড়লেও রবীন্দ্রনাথকে কখনো তা আশ্বস্ত করতে পারে না। বরং তিনি উল্লেখ করেন—

"স্বদেশি আন্দোলনে সকলেরই মন কিছু না কিছু উত্তেজিত হইয়াছিল। আমিও

এ উত্তেজনার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারি নাই, এ কথা অস্বীকার করিবার কোন কারণ দেখি না। প্রথমে আমারও আশা খুব বড় ছিল। কিন্তু আমি ধীরভাবে চিন্তা করিয়া এই বুঝিতে পারিয়াছি যে আমরা হুড়মুড় করিয়া জড় জিনিসকে পাইতে পারি বটে, কিন্তু দেশের স্থায়ী কোন প্রতিষ্ঠান (Institution) স্থাপন করা এত তাড়াতাড়িতে হয় না।"[৫১]

'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের যে ঐতিহাসিক সামাজিক কাল দানা বাঁধে তার সদর্থক এবং নঞর্থক— দুটো ধারাই কার্যকর। অতএব স্বদেশি আন্দোলনে একদিকে যে তার একটি ব্যক্তি ও সমাজ গঠনের প্রেরণা, তার অভিজ্ঞতাটি সঞ্চিত হয় নিখিলেশের মধ্যে। অন্যদিকে তার দুর্বলতার নানা সূত্রে যেখানে ফাঁকগুলো দেখা দেয়, তার অবস্থানভূমিটি প্রকাশ করে সন্দীপ। আর সেই ব্যক্তিমুক্তি থেকে সামাজিক মুক্তির পথে এগিয়ে যেতে মানুষের মধ্যে ধরা দেয় বিভ্রান্তি। স্পষ্টত ইতিহাসকে রবীন্দ্রনাথ এখানে তিনটি কৌনিক বিন্দুতে ধরেন— যার একদিকে নিখিলেশ, অন্যদিকে সন্দীপ এবং এই বৈপরীত্যের টানাটানিতে মাঝখানে অবস্থানরত হয়ে বিমলা।

এই তিনটি বিন্দুর মূল প্রেক্ষণ-ভূমিটি অবশ্যই বিমলা। তার কারণ শুধু এই নয় যে, তার আত্মকথনের সূচনা এবং সমাপ্তির চিহ্নটুকু ধরা পড়ছে। তার চেয়েও বড়, স্বদেশি এবং বয়কট-আন্দোলনে সদর্থক-নঞর্থক আবেদন যাই থাক, নিয়ন্ত্রিত সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে তার অভিজ্ঞতাকে ধরার প্রয়োজন আছে। সময়ের ইতিহাসে এই মানুষগুলোর সুনির্দিষ্ট অবদানকে অবহেলার সঙ্গে হয়তো সরিয়ে রাখা হয়। কিন্তু সময় কখনো এই মানুষগুলো ছাড়া মুখশ্রীর সন্ধান পেতে পারে না। 'গোরা' উপন্যাসে গোরার বিশাল ব্যক্তিত্ব তার গোষ্ঠীচেতনা, তার সংগঠন— সমস্তই বৃহত্তর সময়ের রূপকাররূপে নির্দেশ করে। কিন্তু সেইসঙ্গে গোরার অসামান্যতার পাশাপাশি সাধারণ দেশের মানুষের অবদান কি অল্প। বরং, গোরা সম্পূর্ণ হতে পারে তাদের সমবায়েই। অতএব 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে নিখিলেশ এবং সন্দীপের সংঘর্ষ যদি একটি বিশেষ কালের ছবিও হয়, তবে তাকে চিরকালের বর্তমান করে তোলার দায়িত্ব নিতে পারে সাধারণ বিমলা তার অসামান্য ভূমিকায়।

নিখিলেশ এবং সন্দীপ— দু'পক্ষকেই অতএব শক্তির আধাররূপে দেখানো হয়। সেজন্য দু'পক্ষেরই শিবির নির্দ্বিধায় আসে, অথচ দুটো শিবিরের মাঝখানটিতে থাকে বিমলা— যার নিজের কোনো গোষ্ঠীরূপ নেই। নিচের এই বিন্যাসটি লক্ষ্য করা যেতে পারে—
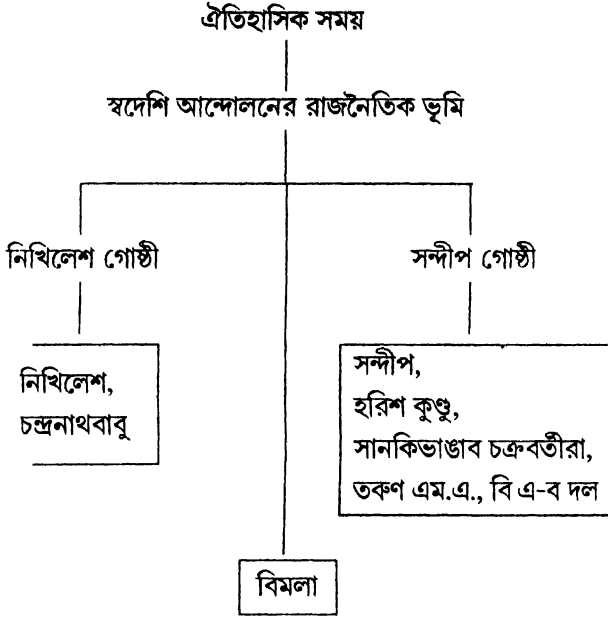
অতএব বিমলার মধ্য দিয়ে নিখিলেশ ও সন্দীপ তাদের দ্বৈত সম্প্রদায় কিভাবে ধবা পড়ে, সেই ইতিহাস-চিত্র উপন্যাসটির একটি বিশেষ দিক। সেজন্য নিখিলেশ ও সন্দীপের আত্মকথন বিমলার আত্মকথন থেকে একেবারেই আলাদা। কাহিনীর প্রধান দুই পুরুষ চরিত্র তাদের আত্মকথনে ঘটনার সমকালিনতার অন্তর্গত হয়ে প্রকাশ পায়। সেজন্য সাময়িকতার সমকালটি তাদের রচনায় প্রবল ক্ষিপ্রতা নিয়ে ধরা দিয়ে যায়। অন্যদিকে বিমলার আত্মকথন মূলত স্মৃতিচারণ বলেই অন্তর্গত স্তরটিকে পেরিয়ে আসে। অতএব তাব আত্মকথা পরবর্তী সুস্থির নব-উপলব্ধি দ্বারা সূক্ষ্মভাবে পরিস্রুত।[৫২]

ঘটনার সমকাল সচেতনতা এবং যুগসচেতনতা দুটোই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। স্বদেশি আন্দোলনের বৃহত্তর এবং ক্ষুদ্রতম রূপটি কি এবং কোথায়, তার বিচার সমকালের মধ্যে হবে কি করে। অতএব নিখিলেশ যে পথ সন্ধান করে এবং সন্দীপ যে অন্য আরেক ভিন্ন পথ অবলম্বন করে— তার গ্রহণ এবং বর্জনযোগ্যতা প্রধানত নির্ভর করে সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়ায়। সেজন্য— "Awareness of the contemporary situation is not quite the same awareness of the present."[৫৩] কথাটি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। এক্ষেত্রে নিখিলেশ এবং সন্দীপকে সাময়িকতার সঙ্গে জুড়ে বিমলা একটু উচ্চতায় বর্তমানটির সমীক্ষা চালাতে পারে, প্রতিষ্ঠা ঘটাতে পারে।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক আবর্ত আমাদের কাছে আজ তাই ইতিহাস, কিন্তু সেই ইতিহাস থেকে প্রদীপ জ্বালিয়ে যে অংশটি সাধারণ্যে প্রবলভাবে নূতন যুগ সঙ্কটের সমস্যা এবং সমাধানটিকে বহন করে— আজকের যুগচিত্ত ততটুকুই তার মান্যতা দেবে। নিখিলেশ ও সন্দীপ প্রচুর ক্ষমতা এবং দল নিয়েও যেখানে তাদের কথাগুলোকে বৃত্তের সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়ে সাজাতে পারে না, সেখানে একমাত্র বিমলার অন্তর্দৃষ্টিতেই তা সম্ভবপর হয়ে ওঠে।

'ঘরে বাইরে' উপন্যাস রচনা ও প্রকাশের কালের দিক দিয়েও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রেক্ষাপট থেকে কিছুটা পেরিয়ে আসা। সেক্ষেত্রে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সমকালীন 'গোরা' উপন্যাস।[৫৪] অবশ্য বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ-আন্দোলনকালে উক্ত উপন্যাসটি লেখা (১৯০৭-০৯) শুরু হলেও, তার কাহিনীকাল ঊনবিংশ শতকের আশির দশক— হিন্দু ব্রাহ্মসমাজের বিরোধ যখন তুঙ্গে (১৮৮০-৮২)। রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাতকুমার এই সম্পর্কে উল্লেখ করেন—

> "গোরা গল্পের পটভূমি হইতেছে ঊনবিংশ শতকের শেষ সিক্কা।.... গল্পাংশ যেখানে আরম্ভ হইয়াছে, সেটি বাস্তবের দিক হইতে হিসাব করিতে গেলে, লেখকের গ্রন্থ রচনার পঁচিশ বৎসর পূর্বের ঘটনা, কারণ গোরা রচনা শুরু হয় ১৯০৭ সালে।"[৫৫]

অর্থাৎ, দেখা যায়, যথেষ্ট সোজাসুজি উপায়ে 'গোরা'তেও লেখকের প্রকৃত রচনার সমকাল স্বচ্ছতা নিয়ে প্রকাশিত নয়। অতএব 'ঘরে বাইরে'তে 'গোরা' উপন্যাস রচনা-যুগের প্রকৃত সমকালের উপস্থিতি আমাদের কাছে উপযুক্ত হয় তার সংগঠিত-বর্তমান থেকে প্রতিক্রিয়াশীল-বর্তমানে পৌঁছাতে উপযুক্ত সময়ের অবকাশকে ধরে প্রতীক্ষার প্রয়োজনে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে ঘিরে স্বদেশি ভাবনা তাই রবীন্দ্র উপন্যাস বিশ্বে বিষয় হয়ে ওঠে বাস্তবে এবং তার কালটির উত্তরণের সূত্রে।

তবু এতক্ষণ যে স্বদেশি এবং বয়কট আন্দোলন নিয়ে সময়ের বিশেষ দিকটি আসে, 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে তা অত্যন্ত মোটা দাগের বিষয়। স্বদেশিয়ানার মধ্যে তার বয়ানটি বাঁধা সত্য, কিন্তু ওই কালের অন্তর্বাহিত সম্ভাবনার অবক্ষয়ের অনুভব শিল্পীমনের ভাব পরিধিতে বিচরণ করে ফেরে।[৫৬] যেখানে মানুষের মন এবং মানুষের সভ্যতা— উভয়কে বিশ্লেষণ করতে চাওয়া হয় সময়ের নানা আলোকে। 'ঘরে বাইরে'তে তাই অনেক প্রসঙ্গ আসে, যা স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত নয়। যেমন মেজোরাণী প্রসঙ্গ। আবার অনেক কথা উচ্চারিত হয়, যেখানে আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে সংযোগ থাকলেও তার ভাববিশ্ব আরো গভীর ভাবনার সঙ্গে যুক্ত। যেমন পঞ্চু প্রসঙ্গ।

চিন্তাবিদ মিখাইল বাখতিনের নন্দন বিশ্বে উপন্যাসের বহুস্বর সঙ্গতি খোঁজার মধ্যে তার বিরুদ্ধেও বহুস্বর সঙ্গতি তৈরি হয়ে ওঠার কথা বলা হয়।[৫৭] এছাড়াও উপন্যাস যেখানে সংলাপ পদ্ধতিতে তৈরি হয়ে ওঠে তাতেও থাকে তিন ধরনের আলাপ; প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ এবং দ্বৈত কণ্ঠস্বর মিলনে গড়ে ওঠা আরেক স্বর। এই তৃতীয় 'ডিসকোর্স' বা বাচনের মধ্য দিয়ে একজনের কথা আরেকজনকে জানানো হয়। কথা এবং তার বিরুদ্ধে কথা, সেইসঙ্গে কথার ভেতর মিশে থাকা কথক এবং কথা— এভাবে কথার সমাহার বহুস্বরিকতায় উপন্যাসকে করে তুলতে পারে সবচেয়ে বেশি সক্রিয় অন্তর্ঘাতী শক্তি। বস্তুতঃ একটা পরিসর থেকে বহু পরিসরে বহু সময়ের অনুপ্রবেশ তখন সম্ভবপর হয়ে ওঠে। তখন বহুসময়ের সমকালীনতাও যেমন থাকে, তেমনি অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের ত্রিস্তরীয় সময়ের অবলোকনও ঘটে যেতে পারে। চিরকালের সমকালটিকে দিয়ে উপন্যাসের সংলাপ বিশ্বটি ক্রমাগত তা বিচারের আলোকে যাচাই করতে করতে পূর্ণায়ত হতে পারে।

এমনিতে উপন্যাস মাত্রেই অনেকগুলো সংলাপ মিলে একটি বড় সংলাপ। তবু যে অর্থে আলাপচারিতার মধ্য দিয়ে কোনো একটি বৃহত্তর বয়ান তৈরি হয়ে ওঠার অবকাশ পায়, সেখানে বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে অনেককিছু অনুচ্চারিত থাকে, আবার অনেককিছু অতিরিক্ত কথাও এসে পড়ে। অতএব উপন্যাসের ধর্ম হয় আলাপচারিতা'র এই বৈশিষ্ট্যকে কাজে লাগানো, কিন্তু নিজে আলাপচারিতা না হয়ে ওঠা। কেননা, বহু পরিসর এবং সময়ের সন্ধানী হয়ে উপন্যাস যখন তার কোনো একটি লক্ষ্যের কেন্দ্রবিন্দুকে ঘুরে ফিরে সম্মিলন এবং প্রসারণ ঘটাতে থাকে, তখন তার নানা শাখা-প্রশাখা বিস্তারের মধ্যেও কেন্দ্রটি অস্পষ্ট-লক্ষ্যচ্যুত হতে পারে না। উপন্যাস তাই আলাপচারিতার ভেতর দিয়ে সফল একটি নিবন্ধ,— জীবনের নানাদিক এবং গড়ে ওঠারও দিক।

'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে আত্মকথন রীতিতে সংলাপধর্মিতা এবং বিপরীত সংলাপধর্মিতা দিয়ে আলাপচারিতাকে অনেক বেশি স্পষ্ট করা হয়। এরকম সংলাপের ভেতর থেকে সংলাপ সৃষ্টির একটি সুবিধে, একটি প্রত্যক্ষ সময় ও পরিসর বৃত্তে বহু পরিসর ও সময়ের রূপায়ণকে সম্ভব করে তোলা। তার জন্য বাইরের দিক থেকে ঘটনাকে সাজাতে হয় না, বিপুল ধারাবাহিক ইতিহাসকে মসৃণভাবে তুলে আনাও যায়। আবার তার যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই ব্যবহার সম্ভব হয়ে ওঠে। উপন্যাসে তার কোনো একটি লক্ষ্যকে পূর্ণতা দিতে বহু চরিত্রের ব্যক্তিকালের সমাবেশ প্রয়োজন। সেইসঙ্গে একটি ব্যক্তির বৃত্তে প্রবেশ মানেই তাকে যোগ্যতার সঙ্গে আগাগোড়া ব্যবহারে লেখকের দায় থেকে যায়। অর্থাৎ যতগুলো চরিত্রের প্রবেশ প্রত্যক্ষভাবে হতে থাকে, সুশৃঙ্খলভাবে তার পরিণামকে সম্পূর্ণ

করে নিতে হয়। এক্ষেত্রে সংলাপের ভেতর দিয়ে চরিত্রের আবির্ভাবে ঔপন্যাসিকের দায়িত্ব ভার অনেক কম। আলাপচারিতায় বহু চরিত্রই তাদের সময়ের ছবিটি নিয়ে স্পষ্ট-অস্পষ্ট রূপে ধরা দেয়— তাদের পরিণাম এবং পরিণামহীনতা কথোপকথনের ধর্ম অনুসারে এলোমেলো হয়ে ওঠাকেই মহৎ বৈশিষ্ট্য করে তোলে।

'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে তাই প্রত্যক্ষ চরিত্র মাত্র তিনটি— নিখিলেশ, সন্দীপ এবং বিমলা। তাদের আত্মকথনে নানা সংলাপ ধরে বহু চরিত্রের ভিড় হয়, আবার তারা কে কখন হারিয়েও যায়। আরো সূক্ষ্ম অর্থেও যদি ভাবা যায়, তবে প্রত্যক্ষ চরিত্র হিসেবে থাকে কেবল একজন— বিমলা। নিখিলেশ এবং সন্দীপ বিমলার বৃহত্তর সংলাপের অন্তর্গত। অতএব মূল 'আত্মকথন' বিমলার, তারপর তা থেকে বেরিয়ে আসে নিখিলেশ-সন্দীপ। আর এই ত্রয়ী চরিত্র ধরে তৈরি হয় সামাজিক, রাজনৈতিক বহু ঘটনা— বহু চরিত্র। 'ঘরে বাইরে'র অভিজ্ঞতা তাই বিমলার। তবু বিমলা একা তাকে সাজাতে পারে না। কোনো সিদ্ধান্তই যেহেতু অধিকতর যোগ্য হতে পারে সাক্ষীর সংখ্যা বৃদ্ধিতে, তেমনি অসংখ্য পরিসরের সম্মিলন ক্রিয়ায়। এছাড়াও পরিসর ও সময় বদলে আবার সেই সঙ্গে সময়ের প্রলম্বিতকরণে অভিজ্ঞতাকে পৌঁছে দিতে পারে তার সফল লক্ষ্যে। উপন্যাসে তাই যাচাইকরণ যত বেশি, ততই তার প্রতিষ্ঠা।

সেই প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই 'বিমলার কথা' নানা স্বরান্তরকে অন্বেষণ করে ফেরে। স্বদেশি আন্দোলনের প্রেক্ষাপট তাই যার একটি ক্ষীণ উপলক্ষ মাত্র।

কিন্তু বিমলার মূল অন্বেষণটি কি? ..... এই আলোচনার সূত্রপাতে রবীন্দ্রনাথ প্রথমে নিখিলেশকে দেখান, তারপর সন্দীপকে। নিখিলেশের পরিবার অতীতে বৃহত্তর জনজীবন থেকে পৃথক ছিল; নারী সেখানে অবদমিত। নিখিলেশই প্রথম তাকে মুক্ত করে তুলতে চায়। তবু যুগ যুগ ধরে যে অভিজ্ঞতার সংস্কার জমা হয়, হঠাৎ করে তা তো ভেঙে যেতে পারে না। তাছাড়াও ঊনবিংশ শতকের নারীকে যে আবরণের অন্তরাল থেকে বাইরে নিয়ে আসার চেষ্টা চলে, তাতে সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদোত্তর বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ পর্বগুলোকে দূরীকরণে শিক্ষার সংযোগও ঘটে। তবু পরিব্যাপ্ত মহলে সামগ্রিকভাবে এ আবরণের উন্মোচন্ হয় না। হয়তো যিনি স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতি বাল্যবিবাহের উচ্ছেদ তিনি আন্তরিকভাবে করতে চান না। বহুবিবাহকে অপরাধ রূপে গণ্য করেও বিধবা বিবাহকে মান্যতা দিতেও বাঁধে। আবার বিধবা বিবাহের সুবিধে নিয়ে কেউ কেউ বহু বিবাহের সুযোগটুকুও গ্রহণ করেন। তাছাড়াও প্রকৃত আন্দোলন যতগুলো হয় তার সীমাবদ্ধতাও থাকে শহরে, গ্রামের সঙ্গে তার সম্মিলন হতে পারে না।

'ঘরে বাইরে' উপন্যাস যে প্রত্যক্ষ পরিসরের উপর দাঁড়িয়ে, গ্রামবাংলাই হয় তার প্রধান। সমালোচক জানান—

''কলকাতা'র বাইরে ভূমিনির্ভর জীবন-পরিবেশে; রাজারাজড়ার মত জমিদার-অধ্যুষিত অঞ্চলে, কবির চেনা উত্তরবঙ্গেও হতে পারে; সন্দীপের রংপুর যাবার আহ্বান উপন্যাসের প্রথমাবধি মুলতুবি হয়ে রয়েছে।''[৫৮]

ফলে বিংশ শতকে এসে দেখা যায় নিখিলেশ-সম্প্রদায়ের মাধ্যমে তার জাগরণ গ্রামবাংলাতেও ধরা পড়ে। আর এই জাগরণের চিত্রে নারীকে শুধু সুযোগটুকু পাইয়ে দেওয়া নয়, তাকে সেইসঙ্গে সকল দিক দিয়ে সামাজিক বহুস্বরে যুক্ত করে হয়ে ওঠার অনুপ্রেরণাও দান করে।

'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে এই ক্রম উন্নতবান চিত্রটি স্পষ্ট। নারীকে সমাজ যে পৃথক করে রাখছে এই সত্য স্বীকৃতিও সতীদাহপ্রথার পুরুষতান্ত্রিক ঔদ্ধত্যের কালেও উচ্চারিত হতে বাঁধা পায়। বরং তার বঞ্চনাটিকে সম্মোহনের দ্বারা ঢেকে দিয়ে স্বামীর সাধনসঙ্গী রূপে অখণ্ড স্বর্গসুখের ধূসর স্বাধীনতার কথাই বলে। যার মধ্যে লুকিয়ে থাকে মৃতের অধিকার মূঢ়তা, আর জীবিতদের দ্বারা বিধবার সম্পত্তি হরণের লোভ। পরবর্তীতে এই কালধর্ম পাল্টায় বটে, তবে বিধবাদের কোনো সামাজিক মূল্যই থাকে না, কেবল প্রাণটুকু ছাড়া। তাছাড়া কি সধবা, কি বিধবা সর্বক্ষেত্রেই সামাজিক যত উদারশীলতা দেখা দেয়, নারীর দিক দিয়ে তাঁর স্বাধীনতা লাভ পুরুষের প্রদানের মধ্য দিয়েই ঘটে। নারী তাকে অর্জন করতে পারে না। সেক্ষেত্রে পুরুষ তাকে বাইরে হাত ধরে টেনে আনলে কি হবে, দীর্ঘ সংস্কার তাকে যে ঘরবন্দি করে। হাত পেতে নেওয়াটাই হয় তার অভ্যাস। নিজের থেকে গড়ে নেবার স্বাবলম্বিতা তার তখনও হয় না।

অতএব শুধুমাত্র ছোটবৃত্ত থেকে বড়বৃত্তে পা ফেলা নয়। তার সময়োচিত সামর্থ্যেরও প্রয়োজন আছে। দীর্ঘদিনের অবদমিত সম্প্রদায়ের চোখ নিয়ে ঘরের আবদ্ধ বৃত্ত তাই তার প্রগাঢ়। ফলে বাইরের পৃথিবীতে প্রবেশ করে নূতন সংলাপ-সংস্পর্শে তার সচেতনতা সজাগ হয়ে উঠলেও বিপদের স্বাভাবিক সম্ভাবনা দেখা দেয়।

'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে বিমলার বড়'জা এবং মেজো'জা-এর অবদমিত চিত্র তাই স্পষ্ট। তাদের সংকীর্ণতা শুধু তাদের নয়, সেই সঙ্গে সমাজের। নিখিলেশ এই সময়ের ইতিহাস পাঠ করে বলেই বৌঠানদের উপর সে কোনোভাবে রাগ করতে পারে না। আর বর্তমানের কালটি যেখানে আর্থিক অবলম্বনকে স্বাবলম্বিতার একটি প্রধান মাধ্যম বলে মনে করে, মেয়েদেরও তার থেকে দূরে রাখতে চায় না বলে নিখিলেশ বৌঠানদের ভবিষ্যৎনিধিরূপে অর্থের সঞ্চয়কেও গুরুত্ব দেয়।

কিন্তু লক্ষণীয়, নিখিলেশের এই কর্মযজ্ঞে বিমলা সহযোগী হতে পারে না। নিখিলেশের স্বাধীনতা-প্রদান তার চোখে দুর্বলতা রূপেই আত্মঘাতী হয়ে ওঠে। আর তখনই নিখিলেশ বিমলার চোখে পুরুষ হিসেবে একটু খাঁটো হয়ে পড়ে। উপন্যাসের অখণ্ড বিমলা-সংলাপে এ জায়গাতে নিখিলেশের মুক্ত করে তোলার দিকটি অবদমনের চাপ থেকে বেরিয়ে এসে স্বস্তির লক্ষ্যে বিশেষ মূল্যমানে তাকে চিহ্নিত করে সত্য, কিন্তু সেই সঙ্গে স্বাধীনতাটি এককভাবে উপভোগ করার প্রবণতাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নিখিলেশ তাই বিমলার শ্রদ্ধার আসনটিতে অনড় হয়ে থাকতে পারে না। বরং তার অতিরিক্ত ভাল মানুষ হবার সুযোগটুকু যারা গ্রহণ করে তাদের প্রতি বিমলার ঈর্ষায় সে রূপান্তরিত হয় প্রচলিত পৌরুষহীনতায়। বিমলার এই চিন্তাসূত্র ধরে আমাদের ইঙ্গিত করে 'নারীত্ব', 'পৌরুষ'-এ শব্দগুলো সঠিক মূল্যায়ণে তখনও ব্যবহৃত নয়।

বিমলার তাই বাইরে চলে আসাটা সীমাবদ্ধ। স্ত্রী থেকে বিশ্ব নারী— সাধারণীকরণে এই যে রূপান্তর, তার সামগ্রিক রূপটি ধরে বিমলা তখনও নিজেকে নিখিলেশের চোখে ভাবতে প্রস্তুত নয়। আর সে ভাবনারই বা অবকাশ কোথায়!

নিখিলেশ পুরুষ এবং জমিদার বলেই দীর্ঘদিন ধরে তার মূর্তিটুকু সভ্যতার উত্থান পতনের অভিজ্ঞতাকে অর্জন করে। শিক্ষার সংস্পর্শে সত্তা-অপরতার আলাদা মাত্রা এবং সম্মিলন মাত্রা সংযুক্ত হতে পারে। অবদমনের দীর্ঘ শাসনের অক্ষর তাই তার পক্ষে যত সহজে পড়ে নেওয়া সম্ভব,— যারা দমিত, তারা হঠাৎ স্বাধীনতার মুক্তিতে স্বাধীন হবার যোগ্যতা পাবে কি করে! নিখিলেশ তাই ঘর থেকে বাইরে বিমলাকে টেনে আনতে চাইলেও আপত্তি আসে বিমলার দিক থেকেই। বিমলা তার ঘরের পরিসরটিতেই স্বামীর মুক্তি-আকাঙ্ক্ষাকে সাজিয়ে সন্তুষ্ট, আবার তার সঙ্গে মিশ্রিত হয় গর্ব এবং ঈর্ষা।

উনবিংশ শতক থেকে নারীকে, কিংবা আরো বৃহত্তর অর্থে সভ্যতার এগিয়ে যাওয়ার গোষ্ঠীর সহযোগিতায় পিছিয়ে পড়া জাতিকে বহুস্বরিকতায় নানা স্থান-কালে যুক্ত করতে চাওয়া নিয়েই বয়ান শেষ হতে পারে না। সেই সঙ্গে তাদের যুক্ত হবার প্রক্রিয়াটিও ধৈর্য্য নিয়ে দেখার প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে অনেকে ধৈর্য্যের প্রয়োজন অনুভব করেন না, অনেকে ধৈর্য্য ধরেন না। নিখিলেশ যে আধুনিক মানসিকতায় বিমলাকে ঘর থেকে বাইরে নিয়ে আসতে চায়, সেখানে তার বিশেষ সমস্যার বাঁধাকে অতিক্রম করে যাওয়াই হয় মুখ্য। বিমলা যে কৌনিক বিন্দু থেকে তার জা'দের সমালোচনা করে, নিখিলেশ বারেবারেই তাকে মুক্তি দিয়ে কখনও সরব সংলাপে বোঝায়, কখনও নীরব সংলাপে বোঝার অবকাশ দেয়। সংলাপ

যখন সোচ্চার হয়, তখন বর্তমান প্রতিক্রিয়ার পেছনে আসে সামাজিক অতীত ইতিহাস; সংলাপ যখন নীরব, তখন বুঝে নেবার অবকাশটি ধরে সময়ের প্রতীক্ষা কাজ করে। তবু বিমলা যেদিন সন্দীপের ফাঁদে অবধারিতরূপে পা দেয়, নিখিলেশ তাতে বাঁধা না দিলেও দুঃখিত হয়। বিমলা যে সন্দীপকে মাধ্যম করে ঘরের রেখাটিকে অতিক্রম করে এবং সন্দীপের মতন মোহ-ই যে অবদমিত ব্যক্তিত্বের প্রথম মুক্তির আলো রূপে ধরা দেয়, সেই সর্বনাশটি বাস্তব সত্য হয়ে ওঠে। কেননা এই সর্বনাশের পথেই তো বিমলা নিখিলেশের আবরণ থেকে সরে আসবে, আর সন্দীপের প্রচণ্ড পেশনে দীর্ণ হতে হতে খুঁজে নেবে নিজের মুক্তির পথ— নিখিলেশকে সেই পথেই সে পুনরাবিষ্কার করবে। আর এই নূতন নিখিলেশের সংগ্রামের পথে বিমলা হবে উপযুক্ত সমরসঙ্গী।

বিমলা যে অন্বেষণটি নিয়ে উপন্যাসে উপস্থিত হয়, সেখানে তার অভিজ্ঞতার চারটি স্তর ধরা দেয়। প্রথম অভিজ্ঞতায় সে অবদমিত শ্রেণী। নারী পুরুষের সমান অধিকার— এই শব্দগুচ্ছ তখন তার মনে সঞ্চয়ের ভাণ্ডার হয়ে ওঠে না। বরং তার কাছে পুরুষ রূঢ় হবে, নানা বিচিত্র শখ নিয়ে সে হবে খেয়ালী। পুরুষ যে সংগঠন কর্মী হতে পারে— এই বোধটুকুই তখন কার্যকর নয়। অবশ্য তারও আগে কুমারী মনে পুরুষের মূর্তি সামাজিক সীমা ছাড়িয়ে রূপকথার রাজপুত্র-ভাবনার কল্পনালোকে। তবু সমস্তটা মিলে সেবা করার প্রবণতাই এখানে ব্যাকুল। কিন্তু স্বামী যখন সম অধিকারের কথা তোলেন এবং তার ক্ষমতাকে প্রয়োগ করে উচ্চ থেকে সেবা গ্রহণে এগিয়ে আসেন না, বিমলার অভিজ্ঞতায় তখন সঞ্চিত হয় অপার শূন্যতা। ফল হিসেবে স্বামী এখানে পুরুষ মানুষের ধর্মচ্যুত হন। অভিজ্ঞতার এই স্তরটি পেরিয়ে আধিপত্যের শাসন-রূপ ধরে ঠিক এখানেই স্বদেশি আন্দোলনের বৃহত্তর পটভূমির খুবই সংকীর্ণ অনুপ্রবেশ ঘটে সন্দীপের প্রচণ্ড সাময়িকতাকে আশ্রয় করে। স্বদেশিয়ানার যে মৌলিক গঠনমূলক দিকটি আছে, নিখিলেশ বরাবর তাকে আহ্বান করে, কিন্তু বিমলা একে কর্মের প্রচেষ্টা হিসেবে দেখে না। বিমলা চায় প্রচণ্ড তীব্রতা। কারণ নূতন যুগের যে আলো বিমলা দেখতে শুরু করে, নিখিলেশ তাকে সে তাড়নার দ্বারা খেলিয়ে বেড়ানোতে নয়, সঞ্চারিত করতে চায়। স্বদেশি আন্দোলন তাই তার কাছে জীবনের পরিব্যাপ্ত বহু পারিসরিক বৃত্ত। সন্দীপও সেই বহু পরিসরকে দেখে, তাই সেও অনুভব করে জীবনকে। কিন্তু এই জীবন-উপলব্ধি সঞ্চারণধর্মী নয়। ফলে সাময়িকতার প্রলেপ ছড়িয়ে, ক্ষিপ্রতার রঙ মাখিয়ে সে আধিপত্যের শাসন চালিয়ে যায়। বিমলার কাছে স্বদেশি আন্দোলনের বৃহত্তর পটভূমিকা নিয়ে সে হাজির হয় এবং বারবারই সেই পটভূমিকা থেকে নিজেকে আলাদা করে নারী

সান্নিধ্যের জৈবিক ভোগবৃত্তিকে সে তৃপ্ত করে। নারীর শক্তিকে সে পুরুষের স্থূল চোখে আঁচড় কেটে কেটে দাগিয়ে দিতে দিতে ক্রমশ বৃহত্তর রঙ্গমঞ্চ থেকে তাকে করে তুলতে চায় দাসী। আপাতভাবে বিমলার এই অভিজ্ঞতার স্তর পর্যন্ত মনে হতে পারে নারীর প্রবৃত্তি একটি বিশেষ দিক নির্দেশক। কিন্তু এই প্রবৃত্তিগত দিকটি শুধু নারীর একক বৈশিষ্ট্য নয়, পুরুষেরও বটে। রবীন্দ্রনাথ তো আর সময়ের পটচিত্রে নারী-পুরুষের আলাদা আলাদা রূপকেই একমাত্র করে তুলতে চানা না, বরং এই প্রবৃত্তিকে সময়ের মান্যতায় সময়ের দ্বারাই শোধন করান মানুষের মুখশ্রী সন্ধানে। আর এই চতুর্থ অভিজ্ঞতার সূত্রপাত দেখা দিতেই সন্দীপ এবং স্বদেশি আন্দোলন— দুটোই লুপ্ত হয়। ধরা দিতে থাকে নিজের গড়ে ওঠার পথটি, যে পথটি প্রবৃত্তিগত ধ্বংসের প্রতিক্রিয়ায় অস্তমান সূর্য দর্শনের নেপথ্যে নূতন প্রভাতের বন্দনায় এগিয়ে যায়।

বিমলার সাময়িকতার অভিজ্ঞানগুলো হল একটি বৃত্ত থেকে আরো বড় বৃহত্তর বৃত্তের আলোকদীপ্ত পথটিকে খুঁজে পাওয়া। আর এই চতুর্থ অভিজ্ঞতার সূত্র ধরেই এক এক করে পরপর চিত্রগুলো ওঠে আসে। ভয়ংকর এক সঙ্কটমুহূর্তে দাঁড়িয়ে নিখিলেশকে আবিষ্কার করে সে, তার বর্তমানটিকে ভবিষ্যতের জন্য তৈরি করে নিতে থাকে স্মৃতির অনুষঙ্গে। উপন্যাস তাই যেখানে শেষ, সেখান থেকেই তার প্রকৃত আরেক আরম্ভ।

বিমলা যেহেতু উপন্যাসের বৃহত্তর সংলাপের ধারক। অতএব বিমলার টুকরো সংলাপ (বিমলার আত্মকথা) এবং অপ্রত্যক্ষ টুকরো সংলাপে (নিখিলেশ-সন্দীপের আত্মকথা) অসংখ্য ডায়লজিক ডিস্‌কোর্সের সৃষ্টি করে নিখিলেশ এবং সন্দীপের মধ্যে। এই ডিস্‌কোর্সে বিমলা ঘন ঘন সোচ্চার ভাবে অংশ নেয় না, কখনো কখনো নেয়। ফলে নিখিলেশ ও সন্দীপ দুটো আলাদা মাত্রা দুটো আলাদা সাময়িক স্তর থেকে ধরা দিতে পারে। তাতে উভয় দিকেই যে যুক্তি এবং বিরোধী যুক্তির আদান প্রদান ঘটে, তাকে অস্বীকার করা যায় না। নিখিলেশের পথটাই সত্য, আর সন্দীপের পথটা অসত্য— এই সিদ্ধান্ত শুধু তর্কে হয় না। বরং তর্কের দ্বারা তার নানা জটিলতার ছবি ওঠে আসে। আর তার ফলে নানা সময়ের অবভাস ধরে বিচারের আলো এসে পড়ে কেন্দ্রবিন্দুতে। নিখিলেশের চোখে জগতটা সহজ-সরল। এমনকি প্রকৃতি বর্ণনাতেও তার নানান স্বরান্তরের উচ্চাবচতা অনেকটাই প্রলম্বিত সময় নির্ভর। সে তুলনায় সন্দীপের বর্ণনা অযৌক্তিক হলেও যৌক্তিক পারম্পর্যের সূক্ষ্ম শিল্পবোধ তাতে কার্যকর। সন্দীপ যদি পুরোপুরি খল এবং বর্বর চরিত্র হত, তবে এত মৌল গুণ তার থাকত না। সন্দীপ তার নিজের প্রতারণার দিকটি সম্পর্কে

সচেতন, এবং প্রতারণাকে সুবিবেচনায় পরিচালিত করার সাহস তাকে শিল্প গুণান্বিত পুরুষেই রূপান্তর ঘটায়। সময়ের অভিজ্ঞতায় লক্ষ্যবস্তুটি মূল প্রবাহে সম্মিলিত হতে যে তর্ক গড়ে ওঠে, সেখানে বাদী পক্ষের সঙ্গে বিবাদী পক্ষের ডিস্‌কোর্সে দৈবক্রমে সন্দীপ বিরোধী পক্ষেই অবতরণ করে। তাই নিখিলেশ যে পরিস্রুত হতে পারে, সন্দীপের অবদান তাতে কোনোভাবেই কি অস্বীকারের যোগ্য! এত বড় মহাকাব্য যে যুধিষ্ঠীরের স্বর্গারোহণের পথে তার প্রবহমান ধারাকে খুঁজে পায়, সেই মহাভারতের অমৃতময় চিরনবীন কাহিনী কি শুধু পাণ্ডবকুল নিয়ে পর্যাপ্ত, যদি তার সঙ্গে কৌরব কুলের বিরোধী শক্তির গৌরব মিশে না থাকে! অতএব সন্দীপ প্রচুর সম্ভাবনা নিয়ে ওঠে আসার মর্যাদায় প্রস্তুত। প্রতারণাকে সে বোঝে, কিন্তু বিশ্বাস করে না। সন্দীপের কথা শুনতে শুনতে তাই আমরা তাকে বিশ্বাস করতে শুরু করি। কারণ সন্দীপ জীবনটাকে আইডিয়ার মধ্য থেকে দেখে না। জীবনের মানে তার চোখে স্কুলের নীতি শিক্ষার ছাঁচ নয়, সততারও নয়। নীতি ও সততা একটি আপেক্ষিক সমাজকে ধরে রেখে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা— এ শিক্ষা আন্তরিক নয়। কারণ এই শব্দগুলোও এক একটি তত্ত্বমাত্র। এই তত্ত্ব বিসর্জিত হয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত না বিরোধী অভিজ্ঞতায় তা যুক্ত হয়, ততদিন তাকে আত্মগত করে নেওয়া সাধারণ্যে সম্ভব নয়। কারণ নিখিলেশ যে সিদ্ধান্ত ধরে জীবনে পৌঁছাতে চায়, প্রত্যক্ষ ফল তাতে নেই বলে অনুমান নির্ভরতা অধিক। অন্যদিকে সন্দীপ প্রত্যক্ষ ফলকেই জোরদার করে। তাই সাধারণের চোখে নিখিলেশের থেকে আবেদন-যোগ্যতায় সন্দীপ বেশি করে এগিয়ে থাকে।

দরিদ্র পঞ্চুর কাছ থেকে বিদেশী কাপড়গুলো কেড়ে নিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে যে দেশচেতনার সময়বৃত্ত অঙ্কিত হয়। সেখানে পঞ্চুর দারিদ্র্য ধর্তব্যের বিষয়ই নয়। বরং তার ক্ষীণ প্রতিবাদ ঔদ্ধত্যের শাস্তিরূপে একশো টাকা জরিমানায় গিয়ে ঠেকে। আর এই দাহযজ্ঞে সন্দীপের 'বন্দেমাতরম্' অনেক বেশি প্রাইম্ ফ্যাক্‌টার হয়ে ওঠে। অন্যদিকে নিখিলেশ এই বৃত্তের মধ্যে দেশ মাতৃকার মাঝখানে দরিদ্র পঞ্চুকেই উপলব্ধি করে বেশি। বন্দেমাতরম থেকে পঞ্চু যে দেশের জন্য অনেক বাস্তব, সে তো সাময়িকের মধ্যে কোনো প্রমাণ নেই। স্বাধীনতা যে ভূগোল নির্ভর দেশ নয়, জাতি নির্ভর মানুষের মর্যাদার পরিসর হয়ে উঠবে, সে কথা তো দীর্ঘ সময় অভিজ্ঞতায় সঞ্চিত হয়েই তবে বোঝা যায়। অতএব নিখিলেশ যে মুখশ্রীর সন্ধানে চলে, সেটাই যে সত্যপথ, সন্দীপ যে তার অন্তর্গত ক্ষণিকতা মাত্র— সেই লক্ষ্যে উপন্যাসের ঘটনা পেরিয়ে প্রতিক্রিয়ায় পৌঁছাতে হয়। যেখানে সাম্প্রদায়িক হানাহানির মানব হনন যজ্ঞে ঘৃতাহুতি দিয়ে সন্দীপ পালিয়ে বাঁচে, নিখিলেশ নিজে

স্বয়ং সেখানে ছুটে গিয়ে নিজের জীবনকে মরণের জন্য প্রস্তুত করে। আর এই শেষোক্ত কর্মপদ্ধতি ধরে বেঁচে থাকা এবং বেঁচে যাওয়ার পার্থক্য নিরূপিত হয়।

গোরার সঙ্গে সন্দীপের নিশ্চয়ই কোনো তুলনা চলে না। কিন্তু উভয়ের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে পাশাপাশি প্রশ্ন তোলা যায়। গোরার মধ্যে দেশ সন্ধানে এত প্রবল বিরোধী শক্তির সঙ্গে বাইরের দিক থেকে কোনো বিরোধ ঘটে না, বিরোধ ঘটে তার অন্তরের সঙ্গে অন্তরের। নিখিলেশ এক্ষেত্রে সন্দীপের সংস্পর্শ পায় বলেই তার শক্তিকে সে উপলব্ধি করতে পারে। সন্দীপের সঙ্গে তর্কে তাই সে মৌন নয়, কারণ সন্দীপ যে পথে চলে, সেই পথেই সে কোনো ভ্রান্তি নিয়ে চলছে না। অতএব নীরব উচ্চারণ এখানে তাকে প্রতিহত করবে না বলেই সন্দীপের প্রতিটি কথার যুক্তিযুক্ত উত্তর নিখিলেশ দিয়ে যায়। তবু নিখিলেশের সিদ্ধান্তের সঙ্গে তার উপন্যাসের শেষতম আচরণের মিল ঘটাতে যেহেতু বিস্তৃত ভাবনার অবকাশ রাখে। অতএব মোটা দাগের কথার ভেতর দিয়ে সূক্ষ্ম সন্দীপের মন বারবারই আমাদের চোখে জিতিয়ে দিয়ে যায়। সেজন্য সন্দীপ আমাদের সমকালটিকে আবৃত করে বসে বলে নিখিলেশ তার বিরুদ্ধে তর্কে প্রবৃত্ত হলে বিমলার তা পছন্দ হয় না। এমন কি 'ঘরে বাইরে' উপন্যাস প্রকাশিত হবার পর পাঠক মহল থেকে যে সকল প্রতিবাদ বেরোয়, তাতে রবীন্দ্রনাথকে ধরে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয় এই বলে যে তিনি কেনো সন্দীপের মুখ দিয়ে রামায়ণের সীতাকে অপমান করান। 'সন্দীপ যত বড়ো মন্দ লোকই হউক তাহাকে দিয়া সীতাকে অপমান কেন?'[৫৯] এই প্রশ্নের মুখোমুখি ঔপন্যাসিককে হতে হয় এবং তাঁকে বোঝাতে হয়, সন্দীপ যে প্রকৃতির, তার মুখেই সে নিন্দা শোভা পায়। কিন্তু আজ আমরা বুঝতে পারি, স্বাভাবিকভাবে সেই যুগচিত্ত সন্দীপকে বেশি করে ভালবাসে বলেই সন্দীপের মুখে সীতার রূপান্তরকে তারা সন্দীপের ভাষ্য হিসেবে মেনে নিতে পারে না, রবীন্দ্রনাথের চাপানো মন্তব্য বলে ধরে নেয়। অতএব সন্দীপ কত জনচিত্ত বিজয়ী, সে তার চরিত্র লক্ষণের মধ্যেই শুধু নয়, সমকালের তর্ক-বিতর্কের মধ্যেও ধরা পড়ে। এক্ষেত্রে সন্দীপের সাময়িকতাকে ছাড়িয়ে নিখিলেশের যোগ্যতা আরো দূর সময়ে এগিয়ে তবেই দেখা সম্ভব।

তাছাড়াও সময় যেখানে ব্যক্তি এবং সমাজের মেলবন্ধনে প্রবহমান গতিতে যুক্ত, সন্দীপ সেখানে তার শিবির পরিবর্তন বার বারই করে। তাই দেশমাতৃকার পূজার আড়ালে নারী বন্দনায় সে মুখর হয়ে ওঠে, আর নারী বন্দনার আড়ালে কাঞ্চন প্রীতি তাকে তীব্র ব্যক্তিস্বার্থে চালিত করে। আন্দোলনের বিরাট কর্মযজ্ঞ থেকে সে যে পালিয়ে বাঁচে, সেখানে তার সমকালীন আন্দোলনের হুজোগের বিস্ফুটি ব্যর্থতায় প্রকটিত হয়। আর যার বলি হিসেবে প্রায়শ্চিত্ত করে হতভাগ্য অমূল্যেরা।

অমূল্য এবং পঞ্চু— দুজনেই গৌণ চরিত্র। কিন্তু গুরুত্বের দিক দিয়ে তারা ততটাই উপন্যাসে প্রয়োজনীয়। প্রধান বাচনিক সত্তায় তারা ধরা দেয় না বটে, তবে ডিস্‌কোর্সের মধ্যে তারা নূতন সংলাপের যোগান দেয়। উপন্যাসে ত্রয়ী প্রধান চরিত্রে নিখিলেশ ও বিমলাই মূল স্রোত। অভিজ্ঞতা এবং অভিজ্ঞতা-উত্তরকাল পরিধিতে যেখানে দুজন দুজনকে চিনে নেবার প্রয়াস করে সেখানে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে কোনো ব্যক্তির ভূমিকা তার সাময়িকতাকে ধরিয়ে দিতে সাহায্য করে। সন্দীপ এখানে দু'জনের প্রবহমান ধারার অন্তরায়। সেজন্য নিখিলেশ তাকে অনুমান করেও উপলব্ধিতে পৌঁছাতে পারে না, পৌঁছায় পঞ্চুর দারিদ্র্য জর্জরিত জীবনের পরিচয়টিকে মেনে। বৃহত্তর অভিজ্ঞতা ধরে নিখিলেশ যেখানে স্বদেশি আন্দোলনকে মানুষের ব্যক্তিমুক্তির পথ হিসেবে ভাবে, সেখানে বারবার সন্দীপের সঙ্গে তার তর্ক বাঁধে। কারণ সন্দীপ শুধু নিজের ব্যক্তিস্বার্থকে বড় করে তুলতে মানুষের ব্যক্তিমুক্তির ঠিক উল্টো কথাটাই বলতে চায়। এক্ষেত্রে পঞ্চুব উপর সামাজিক অত্যাচারের উদাহরণ কিভাবে দেশমাতৃকার ছদ্মবেশে সন্দীপের আধিপত্য ভাবনাকে প্রকটিত করে, তার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত পেয়ে যায় নিখিলেশ। আবার এই পঞ্চুকেই টাকা দিয়ে সাহায্য করে উপকার করতে চাওয়ার মধ্যে যতটুকু নিখিলেশের উদারতা এবং মানবপ্রীতি কাজ করে, ততটুকু মানবজগত গড়ে তোলার সহায়ক হয় না। অতএব চন্দ্রনাথবাবু ঠিক এখানেও সেই উপকারে বাধা দিয়ে নিখিলেশকে ভ্রান্ত পথ থেকে উদ্ধার করে দেন।[৬০] পঞ্চু এভাবে নিখিলেশের পথকে অপ্রত্যক্ষ উপায়ে খুলে রাখে।

অন্যদিকে সন্দীপের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে ধীরে ধীরে বিমলা যা অনুমান করে নিতে থাকে, তাতে তার ভ্রান্তি 'সময়ের প্রলেপে' কাটতে শুরু করলেও উপযুক্ত আধারের অভাবে তা সিদ্ধান্ত-স্তরে পৌঁছায় না। অমূল্য ঠিক এখানেই বিমলার সহায়ক হয়। রবীন্দ্র উপন্যাস জগতে এখান থেকে এক অভিনব ব্যাপার হিসেবে নারীকে মায়ের রূপান্তর ভূমিকায় মুক্তির পথ খুলে দেয়। অমূল্য যে বিমলার কাছে এত বড় হয়ে ওঠে, তার মূলে তার সেই মাতৃত্ববোধ। এই মাতৃত্ববোধ তাকে সুদৃঢ় বর্মের মত সর্বনাশ থেকে রক্ষা করে। কিন্তু কথাটি এখানেই শেষ নয়। আসলে এই মাতৃত্ববোধকে রবীন্দ্রনাথ জেনেশুনেই প্রয়োগে পক্ষপাতী হন এ কারণে যে, বিমলা মূলত দেশের কাজে যেখানে বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে বৃহত্তর সময়ে নিজেকে সেবার মাধ্যমে উৎসর্গ করে, মাতৃবন্দনায় তাতে মানুষের সংস্পর্শ নেই। সংস্পর্শ আছে সন্দীপের তৈরি করে তোলা একটি ঐন্দ্রজালিক জগতের। বৃহত্তর স্বদেশি আন্দোলনে তাই যা কিছু সদর্থক, 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে প্রধানত তার নঞর্থক প্রকাশটিই যে ঘটে, তার মূলেই থাকে বিমলার মনে সন্দীপের তৈরি করে তোলা জগৎ। সেই

জগতের ভেতরে এবং বাইরের রূপটাকে অভিজ্ঞতা দিয়ে বিমলা দেখে বলেই দেশমাতৃকা বন্দনা শেষপর্যন্ত অবলম্বন-শূন্য হয়ে নিজের মধ্যে মাতৃত্ববোধে জাগরিত হয়। অমূল্যের প্রতি তার বাৎসল্যের আকাঙ্ক্ষা এখানে গৃহবন্দি নারী-শ্রেণীর প্রবৃত্তির স্বাভাবিক উৎসার নয়। বৃহত্তর দেশকালকে ভুলভাবে অনুধাবন থেকে তার বাস্তব মুক্তির পথকে প্রশস্ততর করে তোলা। সন্দীপ যে আকাঙ্ক্ষাটুকু জাগিয়ে দেয়, নূতন বৃত্তে তাতে সম্পর্কিত হতে হতে ব্যক্তি সমাজকে চিনে নিতে পারে না। কাজেই বিমলা সেখানে অমূল্যের মধ্যে তার নিজের অন্বেষণের ছবিটিকে খুঁজে নিতে থাকে। প্রথাগত দেশমাতৃকা রূপান্তরিত হয় প্রাণময় মাতৃত্বে। অমূল্য সন্দীপকে স্পষ্ট করে বিমলার চোখে। আর সেই নূতন অভিজ্ঞ-চোখ নিয়ে সন্দীপের সংকীর্ণভাবে দেখানো বিশ্বভাবনার অন্তরাল ঘুচে যায়।

রবীন্দ্রনাথ এখানে তাই স্বাধীনতা আন্দোলনের চরমপন্থীদের সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করেন, কি করেন না— সে কথাটি গৌণ হয়ে পড়ে। তার কারণ, এই দেখা তো বিমলার চোখ নিয়ে দেখা। গোটা ইতিহাসের যে অংশে জমাট অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে কিছু সংখ্যক স্বার্থ সর্বস্ব লোকের আবির্ভাব ঘটে, দেশকে তারাও তো কাজে লাগায়। আর এই কাজে লাগাবার ব্যাপারে যুক্ত করে তরুণ গোষ্ঠীকে, অমূল্য যার একজন। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে বিপ্লবীদের চিত্তশুদ্ধি ও চরিত্র গঠনে যে গীতার বিশেষ ভূমিকা এবং বন্দেমাতরম ধ্বনির স্বাধীনতা স্পৃহাও দেশপ্রেমের সমুদ্রমন্থনের ঋক্‌মন্ত্র হয়ে ওঠা— তাতে যুদ্ধের ঢাল তলোয়ার তৈরি থাকলেও যথার্থ উদ্দেশ্যকে অস্পষ্ট রাখা হয়। ফলে গীতাভাষ্যের রূপান্তর এখানে গঠনমূলক কর্মযোগের বদলে, অলীকতায় ধাবিত হয়ে আত্মাহুতিকেই কাঙ্ক্ষিত করে। সন্দীপ নিজের জন্য আহুতির দ্বার খোলা রাখে না, বরং নিজের বাঁচার প্রচেষ্টাটুকু সে তাদের উপর চাপিয়ে রেখে খ্যাতি অর্জন করতে চায়। অমূল্যকে তাই মরতেই হয়। আর এই অমূল্যকে দিয়েই বিমলার চোখে স্পষ্ট হয় স্বদেশিয়ানার বৃহত্তর প্রেক্ষাপট। যে প্রেক্ষাপটে, একদিকে নিখিলেশ— অন্যদিকে সন্দীপ। উপন্যাসের বয়ান বিন্যাস তাই আপাতভাবে এসে থেমে যায় অমূল্য-মৃত্যুতে। তারপর বিমলার অন্য সংলাপ দিয়ে যাত্রা, অন্য সময়ের পথে। যে সময়টি তার আত্মদহন থেকে খুঁজে নিতে থাকে স্মৃতি। সাময়িকতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকা একটি বর্তমান, আর সাময়িকতাকে চিনে নেবার পর আরেকটি বর্তমান— উভয়ে একইসঙ্গে বিমলার মধ্য দিয়ে মুখশ্রীর সন্ধান করে ফেরে।

সময়ের জগতে পরিসর সমভাবেই গুরুত্বপূর্ণ। উপন্যাসের নামকরণে সেই পরিসরই প্রধান। বিমলা ঘরের ভেতর থেকে নিখিলেশকে তার মতন করে চেনে,

সন্দীপকে বাইরে। আবার এই চেনার মধ্যে প্রেমতন্ময়তা যত সুউচ্চ উচ্চারণ নিয়ে আসুক না কেন, তার ভেতর দিয়ে আত্মীয়তাবোধের সামাজিক সংহতি রক্ষা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তার কারণ, প্রেম একেবারে খাঁটি হলেও তাতে কল্যাণবুদ্ধি যুক্ত না থাকলে প্রতিষ্ঠা ঘটে না। বিমলা যে দেশপ্রেমকে নিয়ে সন্দীপপ্রেমে আবদ্ধ হয়, সেখানে সেই প্রেম ভাবনা নিরপেক্ষতা অর্জন করিয়ে বিচারকে স্পষ্ট করে না। আমরা অনুমান করতে পারি নিখিলেশ যদি বিমলার প্রেমের মান্যতায় কেবলমাত্র সহযোগী হয়ে থাকে, তবে তাতে যুক্ত হয় না কল্যাণবোধ। এই কল্যাণবোধ বৃহত্তর প্রেমকে দৃঢ় করে বলেই ঘরে এবং বাইরে আলাদা আলাদা মর্যাদায় সামগ্রিক হতে পারে। বিমলার চোখে নিখিলেশ এই পর্যায়ে শুধু ঘরের নয়, শুধু বাইরেও নয়। ঘর যখন বাইরে এসে তার কল্যাণবোধের দ্বারা আত্মীয়তা গড়ে, তখন একাধারে বাইরেকেও ঘরে সে অতিথিরূপে অভ্যর্থনা জানায়। আর এভাবে অসংখ্য পরিসর বৃহত্তর পরিসরে রূপান্তরিত হয়। তার শৃঙ্খলাবোধ অটুট হয়ে ওঠে।

সময়ের গঠনমূলক ধর্মে অনুরাগ-বিরাগের নিশ্চয়ই অবদান আছে। সেজন্য ছোট গোষ্ঠীর জীবনে যদি বা আত্মীয়তাবোধ প্রধান, বৃহৎ সমাজে প্রেমের পরিপূরক হিসেবে নিয়ম অপরিহার্য,[৬১] অর্থাৎ কল্যাণবোধ। সেজন্য আমরা বলতে পারি ব্যক্তিত্ব গড়তে প্রেম যদি সঞ্জীবনী মন্ত্র হয়, তবে সমাজ এবং সভ্যতা গড়তে কল্যাণবোধের নিয়মকে মান্যতা প্রদান অপরিহার্য। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে নিখিলেশ যে প্রেমের সূত্রে বিমলার সঙ্গে জড়িত, সেখানে কল্যাণের সূত্রেও সে মানুষের সঙ্গে যুক্ত। ঘরের সীমানায় বৌঠানদের বৈধব্যজীবনের নিদারুণ অবদমনকে তাই নিখিলেশ দূর করতে চায়। আর এই শোষণমুক্ত স্বদেশকে সে উদ্ধার করতে পারে বাইরে। বিমলার প্রথম অভিজ্ঞতায় সেই প্রেমের সূত্রে কল্যাণবোধ জড়িত ছিল না বলেই, নিজের বৃত্ত থেকে স্বামীকে ছাড়িয়ে যখনই সে দেখে, তখনই তার মনে হয় জগতের সবাই যেনো তার ভালমানুষ স্বামীটিকে ঠকিয়ে নিচ্ছে। প্রেম এখানে পক্ষপাতদুষ্ট বলেই নিজের ব্যক্তিস্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন। তারপর বাইরের হাওয়ায় যখন দেশমাতা সন্দীপের ফ্রেমে বিমলার মধ্যে ধরা দেন, তখন সেই কল্যাণবোধের অভাব থেকেই দেশকে সে জানে একটি উল্লাসের উৎপীড়ন রূপে। যে দেশ জুড়ে আগাগোড়া থাকে দেশের জনগণ নয়, সন্দীপের অনর্গল তোষণ-বুলি। বিমলা নিজের সম্পর্কে এতদিন যা জানতো না, তার প্রেমের শক্তিরূপ সম্পর্কে এতদিন যা অজ্ঞাত ছিল— এক এক করে তা খুলে যায় সত্য। কিন্তু তার ফলে অতিরিক্ত নিজের সম্পর্কে সচেতনতা তাকে বলয়িত করে নিজের চারদিকেই। প্রেমের একচক্ষু দৃষ্টিতে সে বারবারই প্রতারিত হয়। এতবড় সন্দীপ, যে বিচার করার সূক্ষ্ম ক্ষমতা রাখে, সেও

সেই প্রেমের ফাঁদে অনুভব করে, বিমলার সঙ্গে তার জীবনটা জড়িয়ে পড়ছে। এই জড়তা থেকে তার পালিয়ে যাওয়াই চাই। 'সন্দীপের আত্মকথায়' তাই এক সময়ে ওঠে আসে—

"আমার ভাবনা এই যে, আমি জড়িয়ে পড়ছি, মনে হচ্ছে আমার জীবনে বিমলা বিষম একটা দায় হয়ে উঠবে।"[৬২]

আমরা অনুমান করতে পারি, মানুষের সভ্যতার একেবারে প্রাচীন স্তরে নারী পুরুষের লিঙ্গ পার্থক্য সামাজিক পরিসরের পার্থক্যে ততটুকু ব্যবধান নিয়ে ছিল না। নারী সেখানে পুরুষের সঙ্গে যেমন গৃহগত ছিল, তেমনি বাইরেও সমানভাবে সহকর্মী ছিল। কিন্তু সমাজে যত নূতন নূতন সময়ের গ্রন্থি পড়তে লাগলো, সমাজ ততই কর্মের শ্রেণীকে চিহ্নিত করতে শুরু করল। নারীকে যে গৃহের লক্ষ্মী বলে অভিহিত করা হয় এবং প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়, সেখানে তাকে ততধিক বিশ্বস্ত হয়ে উঠতে হয় পুরুষের কাছে। আর এভাবেই পরিসর ধীরে ধীরে সংকুচিত হয়ে ওঠে উভয় গোত্রে। নারী যেহেতু গৃহমুখী হয়, অতএব সংকোচন নীতি জোরদার হয় তাদের উপরেই। পুরুষের নিরাপত্তার খাতিরেই নারী হয় কখনো অবলা, কখনো শক্তিময়ী। ঊনবিংশ শতকের নবজাগরণে ঘরে বাইরের এই বিভেদটা কাটাতে চাওয়া হয়। কিন্তু তাকে অবলা হিসেবে করুনা আর শক্তিময়ীরূপে আরাধনাই মৌলিকতা অর্জন করে বেশি। সন্দীপ যে বিমলাকে ভোলায়, একাধারে উল্লেখিত বিভেদরেখাটি সে কখনো তুলে দিতে চায় না। অতএব যে অর্থে সন্দীপ গৃহকে বাইরে টেনে আনতে চায়, আধিপত্যের শাসন দিয়ে তাকে করুণা ও আরাধনায় বেঁধে রাখতেও চায়।

বিমলা যে অমূল্যকে ধরে নূতন সম্ভাবনাকে খুঁজে নেয়, তাতে তার মাতৃ আকাঙ্ক্ষার মধ্য থেকেই পরিত্রাণ পায়। সামাজিক দর্পণে নারী নামক কোন এক গোষ্ঠীকে যেখানে অবরুদ্ধরূপে প্রতিষ্ঠা ঘটায়, সেখানে তার নিজের শক্তির ভেতর থেকেই উত্তরণ ঘটে। মাতৃত্ববোধ তাই পুরুষের প্রবৃত্তি নয়— নারীর সামগ্রিক উপলব্ধি। আর এখান থেকেই তার সময় নামক অতিবাহিত ক্ষেত্রটি সন্দীপপর্বে নিঃশেষিত হতে চায় না, অমূল্যকে ধরে ততধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। উপন্যাসে 'বিমলার আত্মকথন' থেকে এই স্থানটি তাই আমরা স্মরণ করতে পারি—

"সন্দীপ বাঁকা সুরে জিজ্ঞাসা করলে, অমূল্যর সঙ্গে তোমার বিশেষ কথার পালা এখনো ফুরোয় নি বুঝি?

অমূল্য একটু লজ্জিত হয়ে বললে, না, আমাদের কথা হয়ে গেছে। বিশেষ কিছু না।

আমি বললুম, না অমূল্য, এখনো হয় নি।

সন্দীপ বললে, তাহলে দ্বিতীয়বার সন্দীপের প্রস্থান?

আমি বললুম, হাঁ।

তাহলে সন্দীপ কুমারের পুনঃপ্রবেশ—

সে আজ নয়, আমার সময় হবে না।

সন্দীপের চোখ দুটো জ্বলে উঠল; বললে, কেবল বিশেষ কাজেরই সময় আছে, আর সময় নষ্ট করবার সময় নেই!

ঈর্ষা! প্রবল যেখানে দুর্বল সেখানে অবলা আপনার জয়ডঙ্কা না বাজিয়ে থাকতে পারেকি? আমি তাই খুব দৃঢ়স্বরেই বললুম, না, আমার সময় নেই।"[৬৩]

উপন্যাসে যে অর্থে বহু স্বরসঙ্গতি কথাটি প্রযুক্ত হয়, তাতে অন্তর্বর্তী এবং বহিরাগত দুটো আলাদা সময় মাত্রা পাশাপাশি চলে আসে। আবার সেইসঙ্গে উপন্যাসের লক্ষ্যস্থলকে কোথাও নেতিবাচক, কোথাও ইতিবাচক করে তোলে। 'ঘরে বাইরে'তে একদিকে রাষ্ট্রিক ব্যাপক পরিসরকে বারবার ওঠে আসতে দেখা যায়। অথচ সেই কোলাহল ছাপিয়ে ব্যক্তি মানুষের অভিজ্ঞতার স্তরটিও অন্তর্বৃত্ত আরেকটি বৃহত্তর পরিসর সৃষ্টি করে। সময়ের সঙ্গে পরিসর অঙ্গাঙ্গী যুক্ত বলে, কোথাও তা বৃহত্তর থেকে সংকীর্ণ স্তরে আবদ্ধ হয়। আর কোথাও আবদ্ধ থেকে বৃহত্তরের দিকে যাত্রা করে। পরিসংখ্যানে ব্যাপারটি এভাবে দেখা যায়—

(ক) উপন্যাসটির বহিরাগত সময়-পরিসরের বিবর্তন-[৬৪]

১) ১৮৮৩ সালে ন্যাশনাল কন্‌ফারেন্স।

২) ১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের জন্ম।

৩) ভবানী পূজা, শিবাজী উৎসব, হিন্দুমেলা প্রভৃতির দ্বারা জাতীয় আকাঙ্ক্ষায় ধর্মের সংকীর্ণতা।

৪) বাঙালির ইচ্ছার বিরুদ্ধে ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের দ্বারা বঙ্গভঙ্গ কার্যকরী।

৫) বয়কট আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণ। কাশী কংগ্রেসে গোখলের সভাপতিত্বে বয়কট প্রস্তাব অনুমোদনে মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজে তার ব্যাপক কার্যকরী আন্দোলন।

৬) ছাত্রদের রাজনীতিতে যোগদানের নিষিদ্ধকরণে সার্কুলার প্রকাশ এবং তার পরিণাম হিসেবে বিপ্লবী সহিংস আন্দোলন।

৭) বয়কট আন্দোলনের ব্যর্থতা। সংগঠনের অভাব ও দরিদ্র জনগণ সম্বন্ধে নেতৃবৃন্দের অজ্ঞতা।

৮) অর্থনৈতিক নিপীড়ণ এবং যথার্থ শিক্ষার অভাবে ধর্মীয় কারণে মুসলমানদের অসহযোগিতা ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা।

খ) অন্তর্বৃত্ত সময় পরিসরের বিবর্তন—

১) সংস্কারের বন্ধন থেকে অবদমিত বিমলার স্বপ্ন।

২) নিখিলেশের চোখে বিমলা স্ত্রী থেকে বিশ্বনারী।

৩) সংকীর্ণ গন্ডী থেকে নিখিলেশের বৃহত্তর পরিসরকে ভুল বোঝা।

৪) সন্দীপের মত শক্তিশালী যুগপ্রতিনিধির সংস্পর্শে আসা।

৫) দেশ গঠনে নিখিলেশ-বিমলার অন্তরীণ মৌল উদ্দেশ্য। বিমলা এখন শুধু বিশ্বনারী নয়, অনন্ত প্রেয়সী।

৬) সন্দীপের সূক্ষ্ম সংকীর্ণতাকে যথার্থ উপায়ে পঞ্চুর মাধ্যমে নিখিলেশের উপলব্ধি— অমূল্যের মাধ্যমে বিমলার।

৭) নিখিলেশের যোগ্য জীবন সঙ্গিনী রূপে বিমলার উপলব্ধি। দেশ গঠনে বিরতি দিয়ে সন্দীপের প্রস্থান, নিখিলেশের ছুটে যাওয়া।

স্বভাবতই আমরা বুঝে নিতে পারি বাইরের কাল পরিসর যেখানে ক্রমশ বৃহত্তর থেকে সংকীর্ণ হয়, উল্টোদিকে ভেতরের কাল পরিসর সংকীর্ণ থেকে বৃহতের পথে উত্তরণ ঘটায়। অথচ এই বিপরীত যাত্রা পাশাপাশি নিখিলেশ-সন্দীপের ডিস্‌কোর্সে বিমলার পূর্ণাঙ্গ স্মৃতির বয়ানটিতে কখনো নিখিলেশের, কখনো সন্দীপের কিংবা কখনো বিমলার আত্মকথনে ধরা দেয়। দু'একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায়—

১) প্রথম সংখ্যক বিমলার আত্মকথনে সন্দীপ এবং নিখিলেশের উক্তি-প্রত্যুক্তি—[৬৫]

(সন্দীপ)— "তুমি যাকে মায়ামন্ত্র বলছ আমি তাকেই বলি সত্য। আমি দেশকে সত্যই দেবতা বলে মানি। আমি নরনারায়ণের উপাসক— মানুষের মধ্যেই ভগবানের সত্যকার প্রকাশ, তেমনি দেশের মধ্যে"।

(নিখিলেশ)—"এ কথা যদি সত্যিই বিশ্বাস কর তবে তোমার পক্ষে এক মানুষের সঙ্গে অন্য মানুষের সুতরাং এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের ভেদ নেই।"

(সন্দীপ)— "সে কথা সত্য কিন্তু আমার শক্তি অল্প, অতএব নিজের দেশের পূজার দ্বারাই আমি দেশনারায়ণের পূজা করি।"

(নিখিলেশ) —"পূজা করতে নিষেধ করিনে, কিন্তু অন্য দেশে যে নারায়ণ আছেন তাঁর প্রতি বিদ্বেষ করে সে পূজা কেমন করে সমাধা হবে?"

২) চার সংখ্যক সন্দীপের আত্মকথনে সন্দীপ এবং নিখিলেশের উক্তি-প্রত্যুক্তি—[৬৬]

"নিখিল বলে, ভারতবর্ষ যদি সত্যকার জিনিস হয় তাহলে ওর মধ্যে মুসলমান আছে।

(সন্দীপ)— আমি বলি, তা হতে পারে, কিন্তু কোন্‌খানটাতেই আছে তা জানা চাই এবং সেইখানটাতে জোর করে ওদের বসিয়ে দিতে হবে, নইলে ওরা বিরোধ করবেই।

নিখিল বলে, বিরোধ বাড়িয়ে দিয়ে বুঝি তুমি বিরোধ মেটাতে চাও?''

কিংবা-[৬৭]

(সন্দীপ)— ''আজ দেশ যা ভাবছে আমি তাকে রূপ দেব। আমি ঘরে ঘরে বলে বেড়াব, দেবী আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়েছেন, তিনি পূজো চান। আমরা ব্রাহ্মণদের গিয়ে বলব, দেবীর পূজারি তোমরাই, সেই পূজো বন্ধ আছে বলেই তোমরা নাবতে বসেছ।.... যদি আমার বাণী আমি প্রচার করতে পারি তাহলে তুমিই দেখতে পাবে এর আশ্চর্য ফল।

নিখিল বললে, আমার আয়ু কতদিনই বা? তুমি যে ফল দেশের হাতে তুলে দেবে তারও পরের ফল আছে, সেটা হয়তো এখন দেখা যাবে না।

(সন্দীপ)— আমি বললুম, আমি আজকের দিনের ফলটা চাই, সেই ফলটাই আমার। নিখিল বললে, আমি কালকের দিনের ফলটা চাই, সেই ফলটাই সকলের।''

উদাহরণগুলোতে একটি বৃত্ত সরল-গহন-ঐক্যময়, অন্যটি বর্তমান-প্রাসঙ্গিকহীন-অনৈশ্চিত্য ভবিষ্যৎ। আর এভাবে দুটো গোত্রের তাদাত্ম্য চিহ্নিত করে তোলে পরিসরকে খুব বড় করে সময়কে সম্পূর্ণ করে দেখার একটি যোগ্যতার দূরত্বে। যে যোগ্যতা অর্জিত হয় এবং অর্জিত হল বিমলার বৃত্তে, কাহিনীর অতি কাছের বর্তমান বিবৃতির পরিমণ্ডলে মিশে এবং সেই বর্তমানকে দূরে নিয়ে গিয়ে।

সমালোচক শঙ্খ ঘোষ 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের সঙ্গে 'রাজা' নাটকের আন্তরধর্মের একটি সম্মিলন লক্ষ্য করেন।[৬৮] আবার 'রাজা' যেহেতু নাটক এবং 'ঘরে বাইরে' যেহেতু উপন্যাস, অতএব তাদের প্রকাশধর্ম আলাদা বলেও স্বীকার করেন। তবু যে অর্থে সুদর্শনার মধ্য দিয়ে বিমলার স্বধর্মকে তিনি মেলাতে চান, তাতে তাঁর প্রশংসিত উচ্চ আলোচনাকে সম্মান জানিয়েও বলা যায়— সুদর্শনা যেখানে তার সঠিক পথ নির্ণয়ে বাইরে থেকে দু'জন ব্যক্তির (সুরঙ্গমা ও ঠাকুরদা) সহযোগিতা পায়, বিমলার ভাগ্যে কিন্তু তেমন সহযোগিতা জোটে না। তাছাড়া কেউ সহযোগী হোক— না হোক, সময়ের অভিজ্ঞতা দু'জনকেই নিতে হয়। সেক্ষেত্রে সাত রাজার ইঙ্গিত লালসা থেকে বাঁচাতে সুদর্শনাকে অভিজ্ঞতা ছাড়াও রাজার প্রতিনিধিরূপে সেনাপতি ঠাকুরদার হস্তক্ষেপও জরুরি। কিন্তু বিমলা শুধুমাত্র ব্যক্তি অভিজ্ঞতা দিয়েই নিজেকে সর্বনাশের স্তূপ থেকে মেদ ঝরিয়ে আবিষ্কার

করে। তাছাড়াও 'রাজা' নাটকে সুদর্শনার রূপান্তরকরণটাই মুখ্য, তাকে ঘিরে থাকা অন্যান্য চরিত্রগুলো সবাই আগে থেকে লক্ষ্যে পৌঁছে যাওয়া। রাজার মধ্যে সুদর্শনার জন্য করুণা, কর্তব্য শুধু নয়, ভালবাসার বেদনাও থাকে। তবু তাঁর সমস্ত প্রতিক্রিয়াই সুদর্শনার ক্রম অগ্রসরমানের পথটি ধরে ঘটে। একটি বর্তমানের আইডেনটিটিকে খুঁজে নিতে আরেকটি বর্তমানের আইডেনটিটি খোঁজাটা সেখানে নেপথ্যলোক ছাড়িয়ে আসে না। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাস শুধু একা বিমলার উত্তরণেরই কাহিনী নয়, সেইসঙ্গে নিখিলেশেরও কিছুটা নিজের সমগ্রতার অভিমুখী হওয়া, সেইসঙ্গে অন্যমাত্রায় সন্দীপেরও। তা না হলে নিখিলেশ তার ভালবাসার একান্ত ভরসাকে প্রতিবন্ধক রূপে দেখাবে কেনো! কারণ ভালবাসা একটি নিশ্চিত দাবি রাখবার আশা রাখে। তাই বৃহত্তর বৃত্তের পথে বিমলার সঙ্গে সঙ্গে নিখিলেশও পরীক্ষা দিয়ে চলে। শুধু তাই নয়, নিখিলেশের পরীক্ষা এখানে বিমলা সংলগ্ন হয়েই একমাত্র হয় না। সেইসঙ্গে তার অভিজ্ঞতার ঝুলিতে পঞ্চুর উদাহরণ পরিধিকে আরো বড় করে ভাবতেও শেখায়—

"একজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে মিলন-বিচ্ছেদের সুখ-দুঃখ ছাড়িয়ে এ পৃথিবী অনেক দূর বিস্তৃত। বিপুল মানুষের জীবন; তারই মাঝখানে দাঁড়িয়ে তবেই যেন নিজের হাসিকান্নার পরিমাপ করি।"[৬৯]

অন্যদিকে সন্দীপ যদি তার আত্মকথনে এক সময়ে কালীর সাধনার সঙ্গে বিমলাকে নির্লজ্জের মতন মিলিয়ে দিয়ে একদিকে ধর্মীয় উগ্রতার একটি সমকাল প্রকটিত করে, অন্যদিকে কালকে হরণ করার অর্থে কালীর যোগ অর্থকে সে আধিপত্যে রূপান্তর ঘটায়; তবু নিখিলেশ ও বিমলার সংস্পর্শে তারও কি কোনো পরীক্ষা দিতে হয় না। তাই তাকে স্বীকার করতে হয়—

"বিমল-নিখিলকে নিয়ে আমার জীবনের এই যে একটা অধ্যায় জমে উঠেছে এর ভিতরেও অনেকটা কথা ঢাকা পড়ছে। ঢাকা পড়ত না যদি আমার মধ্যে আইডিয়ার কোনো বালাই না থাকত। আমার আইডিয়া আমার জীবনকে নিয়ে আপনার মতলবে গড়ছে, কিন্তু সেই মতলবের বাইরেও অনেকখানি জীবন বাকি পড়ে থাকছে।'[৭০]

এই বাকি পড়ে থাকা জীবনটি বৃহত্তর বৃত্ত। সন্দীপ যার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াতে চায়, অথচ তা অনিবার্য বলেই অস্বীকার করতেও পারে না। উপন্যাসের আপাত শেষে দাঙ্গার পটভূমিকায় তাই যখন সে পালিয়ে যায়, তখন সেইসঙ্গে তার বৃহত্তর পৃথিবী থেকে নিজেকে টুকরো করে দেখার পরাজিত গ্লানিও ধরা পড়ে। 'রাজা' নাটকে বিরোধীপক্ষ হিসেবে কাঞ্চীরাজ তার একটি মতাদর্শ নিয়ে তৈরি হয়ে থাকে বলেই, সে রণাঙ্গণ থেকে পালায় না, যুদ্ধ করে। তাই সুদর্শনা,

সুরঙ্গমা, ঠাকুরদার মত সেও রাজার দ্বারা আশীর্বাদে ধন্য হয়। অন্যদিকে 'ঘরে বাইরে'-তে নানা বৃত্ত যেখানে একই বর্তমানে অবস্থানরত, সেখানে কমবেশি সাময়িকতার স্পর্শ সকলকেই ছুঁয়ে যায়। তাই প্রত্যেকের গতিময়তা ভিন্ন ভিন্ন দিক দিয়ে আবর্তিত হয়ে মুখশ্রীকে স্পষ্ট করে। কেউ সাময়িকতাকে অতিক্রম করে মুক্ত হয়, কেউ পালিয়ে গিয়ে পেতে চায় পরিত্রাণ। 'রাজা' নাটকের মতন 'ঘরে বাইরে' উপন্যাস তাই একইভাবে শেষ নয়, বরং তার কোনো এক বিন্দুতে মিলিত হতে হতে বিমলার অন্তর-বিশ্ব মন্থিত হয়ে সময়ের সত্য এবং সময়ের অসত্যকে দাঁড় করায়। আর ঠিক এখানেও কথা শেষ হয়ে যায় না। কেননা, রাজার আহ্বানের মতন কোনো প্রত্যক্ষ ইশারা তো এখানে নেই, তাই চলার সমাপ্তিও নেই। সময়ের ক্ষণটি ধরে ভাগ্যের প্রতীক্ষায় বেজে ওঠে বাইরের জগতের রাজবাড়ির দেউড়ির সময় নির্দেশক ঘন্টার ধ্বনি। সেই ধ্বনিকে ছুঁয়ে বড় বেশি কাছের-বাস্তব সচেতনতা নিয়ে নাড়া দেয়— আর তারপর পেছনের দিকে ঘুরে সেই বর্তমানকে দিয়ে এই বর্তমানকে বুঝে নিতে চায়। আর এই বুঝে নেবার সঙ্গে যুক্ত হয় তার মায়ের সতীত্ব রূপকল্প। এই সতীত্ব বোধ একটি অবলম্বনমাত্র। ফলে—

> "এই সতীত্বের মহিমার সূত্র ধরে সে পেছনের দিকে ফিরেছে— যে কাহিনী ও মানুষের সংস্পর্শে ঐ মহিমা থেকে তার স্খলন ঘটেছিল তার বিবরণে প্রবেশ করার মুখে বিমলার এই সতীত্ব-ব্যাকুলতা। মধ্যযুগসুলভ সতীত্ববোধে বিমলার এই মনস্তাত্ত্বিক প্রত্যাবর্তন তার 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে ধৃত জীবন ও চরিত্রের পরিণতির আশ্রয়রূপে গণ্য হতে পারে।"[৭১]

আর এখানে সাম্প্রতিককে ধরে থাকা, আর সাম্প্রতিককে ছাড়িয়ে আসা— ব্যবধানটি মুহূর্তে উবে যায়। সময়ের নানা মুখচ্ছবির সন্ধান এবং আবিষ্কার থাকে অবিরত— একভাবে, অন্যভাবেও।

উল্লেখপঞ্জি

১। পোস্ট মর্ডানের ভাবনা।। পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়।। অমৃতলোকঃ শারদ সংখ্যা ১৪০১।। পৃষ্ঠা - ৮৯

২। রবীন্দ্র রচনাবলী (সপ্তম খণ্ড)।। পৃষ্ঠা - ৪৯৬

৩। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর।। দে'জ।। পৃষ্ঠা - ১৭৪

৪। তদেব।। পৃষ্ঠা - ১৭৪

৫। The New Encyclopaedia Britannica in 30 Volumes. ।। 15th Edn. ।।পৃষ্ঠা - ৪১১

৬। এ আমির আবরণ।। শঙ্খ ঘোষ।। তৃতীয় সংস্করণ।। প্যাপিরাস।। পৃষ্ঠা - ৫৬-৫৭
গ্রন্থটিতে সমালোচক বলেন— 'অসতর্ক পাঠে, আমাদের মনে হতে পারে যে উপন্যাসটিতে শচীশকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে অগোচরে, অপূর্ণতার কোনো এক শূন্যতার মাঝখানে।...

জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে একদিন কাজ করত সে, তখন সে এই বস্তু পৃথিবীর বাইরে জানত না আর কিছুই, মানত না প্রত্যক্ষের চেয়ে বড়ো কোনো সত্তা। কিন্তু এবার আবার যে প্রত্যক্ষের মধ্যে কাজের মধ্যে ফিরে এল শচীশ, তার ভিতর দিয়েই সে ধরতে পারে বস্তু পৃথিবীর বাইরের কোনো অভিভব, গোটা জীবনের পরিচয়।... বিরাট এক প্রবাহের মাঝখানে রেখে দেখতে পেল তার জীবনযাপনকে, এইখানে শান্ত হয়ে এল তার উপলব্ধি; জীবন আর মৃত্যুর, প্রত্যক্ষ আর পরোক্ষের বিরোধকে মিলিয়ে নিতে পারল একটা জায়গায়।'

৭। Jerusalem Address।। The Art of the Novel।। Milan Kundera।। Rupa।। পৃষ্ঠা - ১৬০
৮। The Depreciated Legacy of Cervantes।। The Art of the Novel।। Milan Kundera।। Rupa।। পৃষ্ঠা - ১৮
৯। সতী।। স্বপন বসু।। দ্বিতীয় সংস্করণ।। পুস্তক বিপণি।। পৃষ্ঠা - ১৫৩
১০। Social Reform Movements in Nineteenth Century India।। Jamuna Nag।। First Pub. 1988।। RBSA Publishers।। পৃষ্ঠা - ১৫
১১। বাংলার নবচেতনার ইতিহাস।। স্বপন বসু।। পুস্তক বিপণি।। পৃষ্ঠা - ১২৫
১২। বিদ্যাসাগর।। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।। পৃষ্ঠা - ২৪৫ ('বাংলার নবচেতনার ইতিহাস' গ্রন্থ থেকে গৃহীত)।
১৩। উপন্যাসের সমাজতত্ত্ব।। পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়।। প্রথম প্রকাশ।। র‍্যাডিক্যাল।। পৃষ্ঠা - ৬৯-৭০
১৪। রবীন্দ্র রচনাবলী (সপ্তম খণ্ড)।। পৃষ্ঠা - ৪৩২
১৫। রবীন্দ্র রচনাবলী (দশম খণ্ড)।। পৃষ্ঠা - ৩০৮
১৬। রবীন্দ্র রচনাবলী (সপ্তম খণ্ড)।। পৃষ্ঠা - ৪৩১
১৭। তদেব।। পৃষ্ঠা - ৪৩৩-৪৩৪
১৮। তদেব।। পৃষ্ঠা - ৪৪৭
১৯। তদেব।। পৃষ্ঠা - ৪৫০
২০। তদেব।। পৃষ্ঠা - ৪৪৬
২১। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর।। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়।। দে'জ।। পৃষ্ঠা - ১৭৫
২২। রবীন্দ্র রচনাবলী (সপ্তম খণ্ড)।। পৃষ্ঠা - ৪৪৮
২৩। তদেব।। পৃষ্ঠা - ৪৫৪
২৪। তদেব।। পৃষ্ঠা - ৪৫৫
২৫। Imagination and Time।। Mary Warnock।। Blackwell।। First Pub.।। পৃষ্ঠা - ৮৮
২৬। রবীন্দ্র রচনাবলী (সপ্তম খণ্ড)।। পৃষ্ঠা - ৪৭৬
২৭। কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক।। শঙ্খ ঘোষ।। তৃতীয় সংস্করণ।। দে'জ।। পৃষ্ঠা - ১৬৬
২৮। রবীন্দ্র রচনাবলী (সপ্তম খণ্ড) পৃষ্ঠা - ৪৩১
২৯। রবীন্দ্র উপন্যাসের নির্মাণশিল্প।। গোপিকানাথ রায় চৌধুরী।। প্রথম প্রকাশ।। দে'জ।। পৃষ্ঠা - ৫৫
৩০। চিরনবীনতা।। শান্তিনিকেতন।। রবীন্দ্র রচনাবলী (চতুর্দশ খণ্ড)।। পৃষ্ঠা - ৫০২

৩১। এ আমির আবরণ।। শঙ্খ ঘোষ।। তৃতীয় সংস্করণ।। প্যাপিরাস।। পৃষ্ঠা - ৪১
৩২। Political Justice।। William Godwin.
৩৩। রবীন্দ্র রচনাবলী (সপ্তম খণ্ড)।। পৃষ্ঠা - ৪৪৯
৩৪। তদেব।। পৃষ্ঠা - ৪৫০
৩৫। Theory of Literature।। Wellek and Warren।। 1963।। পৃষ্ঠা - ২১৮
৩৬। বাস্তব।। সাহিত্যের পথে।। রবীন্দ্র রচনাবলী (ত্রয়োবিংশ খণ্ড)।। পৃষ্ঠা - ৩৬৩
৩৭। Literary Criticism: A Short History।। Fiction and Drama : Tlhe Gross Structure।। Oxford and IBA Pub. পৃষ্ঠা - ৬৮৫
৩৮। আত্মপরিচয়।। রবীন্দ্র রচনাবলী (সপ্তবিংশ খণ্ড)।। পৃষ্ঠা - ২৩৩
৩৯। রবীন্দ্র রচনাবলী (সপ্তম খণ্ড)।। পৃষ্ঠা - ৪৯৫
৪০। রবীন্দ্র উপন্যাসের নির্মাণশিল্প।। গোপিকানাথ রায় চৌধুরী।। প্রথম প্রকাশ।। দে'জ।। পৃষ্ঠা - ৩৯
৪১। The Art of Fiction (Pelham Edgar)।। পৃষ্ঠা - ১৮
৪২। উপন্যাসে জীবন ও শিল্প।। উজ্জ্বল কুমার মজুমদার।। সান্যাল অ্যাণ্ড কোম্পানী।। প্রথম প্রকাশ।। পৃষ্ঠা - ৪৪
৪৩। ঘরে বাইরেঃ রবীন্দ্রনাথের মিলন ও সম্প্রীতি ভাবনা।। সন্তোষ চক্রবর্তী।। 'পশ্চিমবঙ্গ'- সাম্প্রদায়িক বিরোধী রবীন্দ্র স্মরণ সংখ্যা, ১৪০৭।। পৃষ্ঠা - ৬৩
৪৪। The Development of the Indian National Congress 1892-1909।। Pansy Chaya Ghosh।। 2nd Revised & Enlarged Edition।। Firma K/m।। পৃষ্ঠা - ২৩৬
৪৫। উপন্যাসের সমাজতত্ত্ব।। পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়।। প্রথম প্রকাশ।। র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন।। পৃষ্ঠা - ৯০
৪৬। তদেব।। পৃষ্ঠা - ৯০
৪৭। The Development of the Indian National Congress 1892-1909।। Pansy Chaya Ghosh।। 2nd Revesed & Enlarged Edition।। Firma K/m।। পৃষ্ঠা - ১৩২
৪৮। হিন্দু মুসলমান।। কালান্তর।। রবীন্দ্র রচনাবলী (চতুর্বিংশ খণ্ড)।। পৃষ্ঠা - ৪৫০
৪৯। উপন্যাসের সমাজতত্ত্ব।। পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়।। প্রথম প্রকাশ।। র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন।। পৃষ্ঠা - ৯০-৯১
৫০। রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র।। নেপাল মজুমদার।। তৃতীয় সংস্করণ।। সারস্বত লাইব্রেরী।। পৃষ্ঠা ৪৬
৫১। রবীন্দ্র প্রসঙ্গ ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা ঃ ১৩ মার্চ ১৯২২-২১ মার্চ ১৯৩২।। চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত।। প্রথম সংস্করণ।। আনন্দ।। পৃষ্ঠা - ৬৭৮
৫২। মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্নে, বিংশ শতাব্দীর বাংলা উপন্যাস।। অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়।। প্রথম প্রকাশ।। দে'জ।। পৃষ্ঠা ৩১
৫৩। The Novel of Today।। Walter Allen।। ('মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্নে' গ্রন্থ থেকে উল্লেখিত।। পৃষ্ঠা- ২৯)
৫৪। রবীন্দ্র জীবনী (দ্বিতীয় খণ্ড)।। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়।। পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ।। বিশ্বভারতী।। পৃষ্ঠা - ২৮২

৫৫। তদেব।। পৃষ্ঠা - ২৮২
৫৬। রবীন্দ্র উপন্যাসঃ ইতিহাসের প্রেক্ষিতে।। ভূদেব চৌধুরী।। প্রথম প্রকাশ।। দে'জ।। পৃষ্ঠা - ৮৪
৫৭। উপন্যাস নিয়ে।। দেবেশ রায়।। প্রথম প্রকাশ।। দে'জ।। পৃষ্ঠা - ৫৫
৫৮। রবীন্দ্র উপন্যাসঃ ইতিহাসের প্রেক্ষিতে।। পৃষ্ঠা - ৮৪
৫৯। গ্রন্থ পরিচয়।। রবীন্দ্র রচনাবলী (অষ্টম খণ্ড)।। পৃষ্ঠা - ৫২৯
৬০। উপকার শুধু সাময়িকতা নিয়ে ধরা দেবে, সেটাই বড় নয়; উপকারকে আরো বড় স্তরে পৌঁছে দিয়ে দুঃখের কারণ এবং তার উচ্ছেদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করতে পারাটাই যোগ্য কাজ। এই কাজে সময়ের চোখ নিয়ে দেখার প্রয়োজন, প্রয়োজন সময়ের ভেতর দিয়ে জাতিকে শিক্ষিত করে তোলায়।
৬১। প্রেম ও নিয়ম।। প্রবন্ধ সংগ্রহ।। অম্লান দত্ত।। আনন্দ।। পৃষ্ঠা - ২৩৫
৬২। রবীন্দ্র রচনাবলী (অষ্টম খণ্ড)।। পৃষ্ঠা - ২১৪
৬৩। তদেব।। পৃষ্ঠা - ২৮৬-২৮৭
৬৪। (রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা।। ধ্রুব কুমার মুখোপাধ্যায়।। পুস্তক বিপণি।। পৃষ্ঠা - ২২-২৩) গ্রন্থে উল্লেখিত তালিকার সামান্য আশ্রয় নেওয়া হয়েছে।
৬৫। রবীন্দ্র রচনাবলী (অষ্টম খণ্ড)।। পৃষ্ঠা - ১৬৪
৬৬। তদেব।। পৃষ্ঠা - ২৫৪-২৫৫
৬৭। তদেব।। পৃষ্ঠা - ২৫৭
৬৮। এ আমির আবরণ।। তৃতীয় সংস্করণ।। প্যাপিরাস।। পৃষ্ঠা - ১৫৯
৬৯। রবীন্দ্র রচনাবলী (অষ্টম খণ্ড)।। পৃষ্ঠা - ২২১
৭০। তদেব।। পৃষ্ঠা - ২১২
৭১। বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড)।। ক্ষেত্রগুপ্ত।। গ্রন্থনিলয়।। পৃষ্ঠা - ৩৭২

পঞ্চম অধ্যায়

যোগাযোগ থেকে চার অধ্যায় ঃ অতীত ও অনাগতের মেলবন্ধন

উপন্যাসে যখন মুখশ্রীর সন্ধান চলে, তখন তাতে ব্যক্তিক-সামাজিক-রাজনৈতিক — যে চিত্রই ওঠে আসে, কেবল উপলক্ষ্য বলতে হয়। বরং একটি পরিপূর্ণ উপন্যাস স্পষ্ট করে নানা প্রেক্ষাপটে প্রধানতঃ দুটো অবস্থান। তার সাধারণ ও বিশেষ পরিসর। কিন্তু প্রক্রিয়াটি ঘটে যায় একটি সাধারণ স্তর থেকে শুরু করে বিশেষ স্তরে উপনীত বয়ানকে ছেঁকে নিতে নিতে নূতন আরেকটি সাধারণ (Universal) স্তরের মর্মস্বরকে তৈরি করে তোলায়। তার বাইরের পোশাক যা-ই থাক্, সমস্ত মেদ ঝরিয়ে পরিণামহীন অসংলগ্ন দেশকালের ভেতর থেকে সংযুক্তিতে আবিষ্কার। আর সেই আবিষ্কারকেই ব্যক্তির গভীর উৎস থেকে বেরিয়ে আসার শক্তিতে নূতন করে সাধারণের মধ্যে গঠন করতে থাকে মুখশ্রীর সন্ধান — বহুস্বর সঙ্গতিতে যা সত্য। কেননা আত্মবিরুদ্ধ সত্তার দিকেই এর উন্মুখতা।

'চতুরঙ্গ' কিংবা 'ঘরে বাইরে'তে এই সন্ধান পরিণত শিল্পকর্ম হয় এ কারণে — দু'টো উপন্যাসেই একটিতে শ্রীবিলাস, অন্যটিতে বিমলাকে নিয়ে তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার স্তরে অর্জিত হয় আত্মবোধ ও সম্পর্কবোধের যুগপৎ সঙ্কট। সেইসঙ্গে একটি অসম্পূর্ণতা থেকে সম্পূর্ণতার স্তরে নিজেকে ও সকলকে জানারও আকাঙ্ক্ষা। অবশ্য এই সামগ্রিক প্রক্রিয়াটি এদের পূর্ববর্তী 'গোরা' উপন্যাসের মত বড় বেশি ব্যাপক অর্থে ভাববার কারণ নেই। কেননা 'গোরা'র পর ঔপন্যাসিকের অনুসন্ধান-বৃত্তি সেই একটি মাধ্যমের পরিব্যাপ্ত পথে আর উত্তরণমুখী হতে চায় না। বরং মাধ্যম যে কত নানা মাত্রায় হতে পারে, তাতে থাকতে পারে কত অভিনব সীমাবদ্ধতার শিল্প— বিচিত্র প্যাটার্ণ অবলম্বনে তাকে বলতে চাওয়া হয়।

গোরা যেভাবে ব্যক্তি-আনন্দময়ীর মধ্য দিয়ে শেষে একটি বৃহত্তর উপলব্ধিতে পৌঁছায়, সেখানে তার ব্যক্তিগত ক্রমবিকাশের ধারায় বহু বর্ণময় চিত্র সংযুক্ত হলেও আনন্দময়ীকে আমরা প্রথম থেকেই বিস্তৃতির মধ্যে নিশ্চল ধ্রুবতারার মত দেখি। উপন্যাসের শুরুতে তিনি তাঁর প্রসারিত বিগ্রহ রূপ নিয়ে গোরার চোখে না হন, পাঠকের চোখে নিশ্চয়ই ধরা দিয়ে যেতে থাকেন। কাজেই তাঁকে স্পর্শ করে গোরার

অভিজ্ঞতার কেন্দ্রচ্যুতি ও কেন্দ্র সংহতিতে 'দেশ' এবং 'দেশ'কে ধারণ করে সময় আবিষ্কার করাই হয় পরিণাম সত্য। আর সুচরিতার সঙ্গে গোরার সম্পর্ক এত বড় মাপের যে, তাদের দ্বৈতজীবনের নিভৃত পরিসরটুকু গড়ে উঠবার কোনো অবকাশই পায় না।

ফলে আনন্দময়ী সম্পর্কে নূতন করে সমালোচককে ভাবায় — 'তিনি বড় বেশি প্রশান্ত, সুখ দুঃখ দ্বন্দ্বাতীত'[১], তেমনি গোরা-সুচরিতার দ্বৈতজীবন সম্পর্কেও একথা ওঠে — 'সেই পূর্ণতাভিলাষের গভীরে ব্যক্তির বাসনাকে সমাচ্ছন্ন করে সামগ্রিক ব্রত-সাফল্যের উদ্দীপনাই প্রায় একমাত্র হতে,[২]' চাইছে। তাছাড়াও নরনারী হৃদয়ের কোনো যৌন সমস্যার[৩] প্রশ্নও স্বাভাবিকভাবে তাতে অনুপস্থিত।

অতএব বিশেষ চোখে বিশেষের সন্ধানে যেখানে সময়-পরিসর ধরে 'চতুরঙ্গ' ও 'ঘরে বাইরে'তে ক্ষেত্র রচিত হয়, 'গোরা'র মত সর্বব্যাপকতা বোধে নানা স্তরে তাকে খোঁজা যায় না। হয়তো এ কারণেই 'ঘরে বাইরে' উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে একজন সাহিত্য গবেষক স্বীকার করে নেন—

"ঘরে বাইরে" মননশীল উপন্যাস, তবে 'গোরা'র মতো সর্বব্যাপক বোধের উপন্যাস নয়। .... বাঙালি মানসের স্বদেশ-সাধনার নানা স্তর, দেশাভিমান, জাত্যাভিমান — সবকিছুই 'গোরা'তে আছে। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের পটভূমি বিশাল নয়, এবং উদার বিশ্বমানবতা সম্পর্কেও লেখক কোনো কথা বলেননি।"[৪]

'গোরা'র পর দৃষ্টির এই পরিবর্তন স্বাভাবিক। তাই 'চতুরঙ্গ' ও 'ঘরে বাইরে'তে যা খুঁজতে চাওয়া হয়, অতঃপর, সময়ের বৈচিত্র্যের পথ ধরে জীবন পিপাসার আরেক মাত্রা সেখানে তৃপ্ত।

'চতুরঙ্গ' আলোচনায় মেলে, দামিনী খুব বিশাল পটভূমিকায় শচীশকে চায় না। শ্রীবিলাসকে নিয়ে তার দাম্পত্য জীবন ঘরের সংসার পরিধিতে শেষ পর্যন্ত ছাড়িয়ে গেলেও, তাকে নিশ্চিহ্ন করে নয়; বরং বারবারই তাতে ধ্বনিত হয়েছে সংসার পরিধিতেই ফিরে আসার বাসনা। অন্যদিকে নিখিলেশ যে বিমলাকে ঘর থেকে টেনে আনতে চায় বাইরে, সেখানে গৃহকেই বড় আসনে স্থাপন করতে বিমলা উদ্যোগী। আর এই স্থাপন করতে সন্দীপের মুখোমুখি তাকে হতে হয়, সেই সঙ্গে নিজের মধ্যে জমে থাকা আত্মদ্বন্দ্বকেও উপলব্ধি করে। যার পটভূমিকায় তার এবং সন্দীপের বিশাল রাজনৈতিক আবর্তে জন্ম নেয় সংসারের আভ্যন্তরীণ টানাপোড়েন। এর বৃহত্তর স্বদেশি আন্দোলনের কর্মকাণ্ড তাই কোনো ভাবেই বিমলা কিংবা সংসারকে ছাড়িয়ে বড় হতে পারে না। বিমলা যে সংসারটিকে আরো বড় পরিধিতে সম্পর্কযুক্ত করতে আত্মম্নোত্ত, সেখানে তার আত্মলিপি ধরেই

আত্মসমীক্ষায় পৌঁছানো। 'চতুরঙ্গে' তাই জগমোহনের মত উচ্চ মানবিক মূর্তি আর শচীশের পবিত্র মুক্তিতত্ত্ব সামগ্রিক পথ তৈরি করতে যেমন অপারগ, তেমনি ইতিহাস-সভ্যাতা-রাজনীতির বাহ্যিকতা নিয়ে আরো গভীর, আরো গোপন অন্তঃস্থলের উৎসার হয় না 'ঘরে বাইরে'। কথক স্বরের বাচনে এবং আত্মকথনের চরিত্র লিপি ধরে দুটো উপন্যাসের ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ এখানে পৌঁছে যান আলাদা আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যে। কিন্তু সেইসঙ্গে এর প্রবল সম্ভাবনার শিল্পশ্রী আবিষ্কার করেও এই পথ চলার সীমাবদ্ধতাও নজরে পড়ে। আধুনিক কালের একজন আলোচক যে স্বীকার করেন — 'এরকম বেশি বই লেখার সম্ভাবনা নেই,[৫]' তা সময়ের রূপকার বলেই রবীন্দ্রনাথ অনেক আগেই বুঝে নেন্।

আর ঠিক এখানেই নানা মুখশ্রী সন্ধানের পর্বকে নূতন করে সাজাবার প্রয়োজন অনুভূত হয় বলে প্রায় দীর্ঘ বারো বছরের অধিক সময়সীমা পেরিয়ে 'যোগাযোগ' উপন্যাস ধরে নূতন একটি অধ্যায়ের সূত্রপাত ঘটে। নূতন এই অনুসন্ধান চরিত্র-বিবৃতি ধরে নয়, লেখক কথিত পুরোনো বিবৃতির পদ্ধতিতে ('করুণা' থেকে 'গোরা') রবীন্দ্রনাথ খুঁজে নেন সময় এবং পরিসর সংসক্ত জীবনের আরেক ভিন্ন মাত্রা।

'যোগাযোগে'র পূর্বনাম 'তিন পুরুষ'। 'বিচিত্রা' পত্রিকায় দুটো সংখ্যাতে মোট চৌদ্দটি পরিচ্ছেদ প্রকাশিত হবার পর এর নাম বদল ঘটে। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ব্যক্তিগত কৈফিয়ৎ দেন।[৬] তবে আরো বাস্তব সত্যের উপাদান সঞ্চয় করে হয়তো প্রমাণ করা যায়, রবীন্দ্রনাথের তখন তিনপুরুষের সুবৃহৎ উপাখ্যান লেখার পর্যাপ্ত সময় ও অখণ্ড মনোযোগের অভাব।[৭] আর এ ব্যাপারে যথেষ্ট যুক্তি ও ভুরি পরিমাণ উদাহরণের দারস্থও হওয়া যায়। তবু মনে হয়, এগুলো যথেষ্ট নয়। বরং এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের কৈফিয়ৎকে কিছুটা অবলম্বন করে সময়ের পথ আবিষ্কার করা যেতে পারে।

যিনি নানা মুখশ্রীর সন্ধান করেন, তাঁকে খুব বড় পরিধি ছুঁয়ে কাজ শুরু করা চলে না। বরং একটি সংকীর্ণ অবস্থানকে নানা মুখশ্রীর লক্ষ্যে পৌঁছাতে বহু কৌনিকতা অবলম্বন করে। 'চতুরঙ্গ' কিংবা 'ঘরে বাইরে'তে যা যথেষ্ট সম্ভবপর হয় এ কারণে — বাচন সেখানে কথক এবং আত্মকথনের সূত্রে ওঠে আসে। ফলে ব্যক্তির সীমিত অভিজ্ঞতায় বক্তব্য গাঁথা পড়ে সময় ও পরিসরের পরিমিত উপায়ে। আবার যার পরিণাম হিসেবেও সুশৃঙ্খল জীবন জিজ্ঞাসাও রূপায়িত।

'যোগাযোগ' ঔপন্যাসিক বাচনে লিখিত, সেইসঙ্গে এর অবলম্বিত পরিসর তিনপুরুষের সুবিস্তৃত কাহিনী। ফলে আক্ষরিক অর্থে উপন্যাসটির কাল ক্রমানুসারী ও প্রলম্বিত বৈশিষ্ট্য নিয়ে সংহতি চ্যুত হবার প্রবল সম্ভাবনায় আক্রান্ত। যা হয়তো

রবীন্দ্রনাথকে ভাবায়। আর সেই ভাবনা থেকেই সংহতি রক্ষায় তিনি সংযত হন। তিন পুরুষের কাহিনীকেই তিনি টেনে নেন যোগাযোগের অনিবার্যতায়। যদিও শিল্পের তাগিদেই গল্প হয় বিশেষ এক কৌনিকতার আশ্রয়ী। কিন্তু তার সঙ্গে যোগ থাকে অতীত ও ভবিষ্যতের। তাই 'যোগাযোগ' উপন্যাস তিনপুরুষের মতন শুধু কালের বর্ণনার সরল এক অনুবর্তন নয়। যেমনটা—
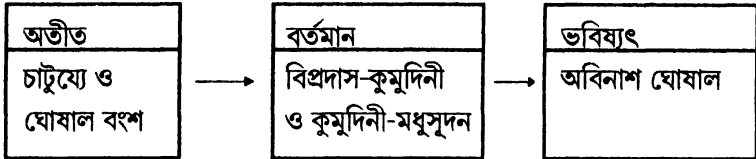
বরং তার কাঠামোগত গঠন বিবৃতি —
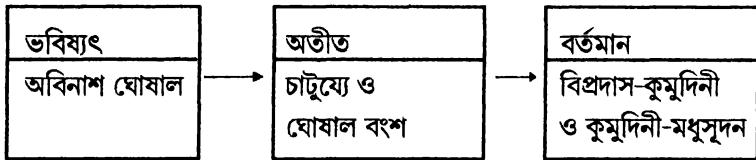
তবু মুখশ্রী-সন্ধান এই ক্রমানুসরণেও নয়। তার চেয়ে এভাবেই একে দেখা যায় —
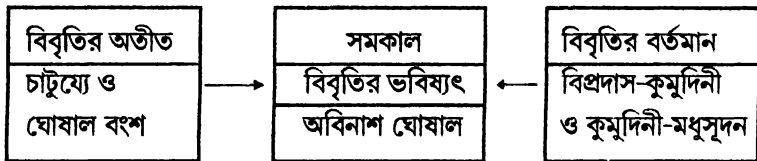
উপস্থাপন ভঙ্গিতে, অতএব, সমান্তরাল কাল খুব স্বাভাবিকভাবেই একমুখী চলনধর্মীতা অতিক্রম করে এগোয় বলে উপন্যাসটি মহাকাব্যের মত খুব বড় সময়সীমা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে না। যদিও রবীন্দ্র জীবনীকার উল্লেখ করেন, রবীন্দ্র উপন্যাসে একমাত্র 'গোরা' ছাড়া আর এত বড় গ্রন্থ 'যোগাযোগে'র মত লেখা নয়।[৮] তবু সময়ের বিন্যাসগত ঐতিহাসিক পরিকাঠামোয় 'গোরা'র সময়সীমা থেকে 'যোগাযোগ' দীর্ঘপ্রসারী। আবার অন্যদিকে 'গোরা' যতটুকু পরিব্যাপ্তিতে মহাকাব্যিক, 'যোগাযোগ' সেক্ষেত্রে খণ্ডিত নানা মুহূর্তের সংযোজক। ফলে 'গোরা' যেখানে মহৎ সমাপ্তিতে গিয়ে বড় তৃপ্তির চিহ্ন এঁকে দেয়, 'যোগাযোগ' অতৃপ্তি নিয়ে সম্পর্ক গঠনে প্রবাহিত হতে থাকে। সময়ের 'Micro' অভিব্যক্তিতে বর্তমানের

নানা আলো এসে কখনো বিপ্রদাস-কুমুদিনী ট্র্যাজেডিতে শেষ হয়। কখনো বর্তমান গিয়ে পৌঁছায় অবিনাশের অভিনন্দিত জন্মদিনে।

অতএব কাহিনী-বিবৃতিতে এক ধরনের শঙ্কিল (Spiral) গঠনে কুমু-মধুসূদনের 'তুলনামূলক বর্তমান' মূল বর্ণনায় আসার আগেই ভবিষ্যৎ চমকে ওঠে, তারপর দীর্ঘসময়কে ফ্ল্যাশব্যাকে নিয়ে প্রয়োজনীয় হয় অতীতবর্ণন। লক্ষণীয়, অতীতের পর্যায়টিতে পাত্রপাত্রীর উপস্থিতি যত বেশি, ক্রমশঃ তা পুঞ্জীভূত হতে হতে অবিনাশ ঘোষালের একক চরিত্রে এসে কেন্দ্রীয় স্তরকে তীক্ষ্ণ করে তোলে। অবশ্য এর সমস্ত অংশই যেহেতু নির্মাণস্তরের সেই কুমু-মধুসূদনের তুলনামূলক বর্তমান পুরুষটিকে ধরে, ফলে তাকে স্পর্শ করেই ভবিষ্যত-অতীত আসে, এবং যুক্ত হয়। তার ক্রিয়াশীলতার ধ্বনি ওঠে কুমু-মধুসূদন বৃত্তান্তে। কিন্তু ধ্বনিকে উপলব্ধি করতে দৃষ্টি ফেরাতে হয় অতীতের মুকুন্দলাল-আনন্দ ঘোষাল, তথা চাটুয্যে বনাম ঘোষাল বংশের বৃত্তে। আর তার সম্পর্ক গড়ে তুলতে দৃষ্টি ঘোরে ভবিষ্যতের অবিনাশ ঘোষালে। প্রতি মুহূর্তে এই যে যোগাযোগ — উপন্যাসের সময় কৌশলে বর্তমানের মৌলিকত্বে নিশ্চিত হতে দেয় না। প্রমাণ করে, আজকের যা সত্য— তা নঞর্থক কিংবা সদর্থক— যা-ই হোক, তার প্রতিটি বিন্দুতে জুড়ে আছে অতীত আর ভবিষ্যৎ-চিহ্ন। পূর্ণতাকে পেতে সংগ্রামের পালাবদলের ভেতর দিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছানো। কখনো কখনো এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে সময়ের ঐতিহাসিক নিয়তিও কাজ করে। সংগ্রাম দেখা দেয় 'পুরনো মৃতপ্রায় সমাজ বিধান — ফিউডাল তন্ত্রকে সম্পূর্ণ মুছে দিয়ে পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠার স্বার্থে।'[৯] আবার সেই পুঁজিবাদের মাধ্যমে বণিকতন্ত্রের কালটাই তো শেষ সীমানা নয়। মনে হতে পারে মধুসূদনই ক্রমশঃ এখানে জয়ী হয়ে ওঠে। আর তার কারণ, বর্তমান অর্থ-নিয়ন্ত্রিত সাম্রাজ্যের দাপট। গণতন্ত্রের দ্বারা তৃণমূল পর্যায়ে গিয়ে মানুষের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের মহৎ মর্যাদা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ দক্ষতায় সজীব করে তোলার ভবিষ্যৎ তো এখনও তুলনামূলক-বর্তমান থেকে দূরাগত। তাই ভবিষ্যতের ছবি বিশ্লেষিত কিংবা পরিষ্কৃত নয়। তবে নিশ্চয়ই সামন্ততন্ত্রের একদা প্রতিপত্তিকে হটিয়ে যেমন বণিকতন্ত্রের অবস্থান ঐতিহাসিক নিয়মে বর্তমান জুড়ে দেখা দেয়, কুমু-মধুসূদন তারই ক্রিয়াশীল পর্ব। তবু এ জায়গাতেই শেষ নয়। সামন্ত ও বণিকতন্ত্রের ভেতর থেকেও একদিন উত্তরিত হবে, মুখোমুখি হবে 'জীবনে'র, যা আরেক সময়ের ইতিহাস দেখে বলা সম্ভব— সেই যোগাযোগকে গড়ে তোলাই বড়। নানাভাবে উপন্যাসটি প্রসঙ্গে একথাগুলো মনে না রাখলে সমস্যা দেখা দেয়, যা শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত বহু প্রতিষ্ঠিত রবীন্দ্র গবেষকের মধ্যেও ঘটে। ফলে এ সম্পর্কে আপাত অসংলগ্নতা সূচক জিজ্ঞাসায়

তিনি অস্বস্তি অনুভব করেন।[১০] আর এই অস্বস্তি একদিকে বর্তমানের পরিচয়কে স্বাভাবিকভাবে যেমন বাঙ্ময় করে, তেমনি সেই তুলনামূলক বর্তমানকে সীমাবদ্ধ কিংবা পরিপূর্ণ ধরে বিচার করার বিড়ম্বনাও দেখা দেয়।

ফলে, এই ধরনের উপন্যাসকে নানা চোখে, নানা মুহূর্তে দেখার অবকাশ থাকে। আর তার পূর্ণনির্মিতির যোগ্যতার পেছনে সময়ের অনুলেপনও কাজ করে চলে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে স্ত্রী জাতির অধিকার ও স্ত্রী স্বাধীনতায় পুরুষের হস্তক্ষেপের সীমা বিচার নিয়ে তর্ক, যুক্তি ও বাক্‌বিতণ্ডাই দেখেন।[১১] অন্যদিকে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু স্ত্রী ও পুরুষের সমাধিকারের প্রশ্নটিকেই বড় করে না তুলে সেইসঙ্গে দুটো আলাদা পৃথক জীবন যাত্রার ব্যাপারকেও সমস্যারূপে দাঁড় করান।[১২] আর একেবারে গত শতকের নব্বইয়ের দশকে এসে পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন, উপন্যাসটি শুধু বিরোধের নয়, সংযোগের— নিজ অভিজ্ঞতার ছক থেকে বাইরে আসার।[১৩]

'যোগাযোগ' উপন্যাসটি যেখান থেকে শুরু, আর যেখানে তা শেষ— বিন্যাসগত প্যাটার্ণে ওই 'শেষে'র পর 'শুরু'র যাত্রা। অর্থাৎ যে ব্যাপারে 'ঘরে বাইরে'র বিবৃতিতে ঘটে চরিত্রের আত্মপ্রকাশে, তাকে এবার সরাসরি ঔপন্যাসিক বাচনেও সম্ভব করে তোলা হয়। ফলে তরঙ্গের পার্থক্যও লক্ষণীয়। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে পূর্ণ বৃত্তটি ধরা দেয় বিমলার মনোজগতের প্রতিক্রিয়ায়, অর্থাৎ একে একরকম মানস সমীক্ষাও বলা যায়। কিন্তু 'যোগাযোগ' কোনো চরিত্র ভাষণ নয় বলেই ব্যক্তি এবং ইতিহাস-কাল ধরে তা আদ্যন্ত বিন্যস্ত। এই বিন্যাস উপন্যাসের শিল্পমাধ্যম খুঁজে পায় বলেই সময় ও পরিসর নানা কৌনিকস্তর থেকে বিস্তৃতি লাভ করে। উপাখ্যানে একটি কাল আপাত মূল ধরে নিয়ে (কুমু-মধুসূদন পর্ব) আসে অতীতের ভূমি। যেখানে একদিকে মধুসূদনের পূর্বপুরুষ ঘোষাল বংশ, অন্যদিকে কুমু-বিপ্রদাসের পূর্বপুরুষ চাটুয্যে বংশ এবং তাদের পরস্পর-পরস্পরের সংঘর্ষের কাহিনী ওঠে আসে। সংঘর্ষ প্রধানতঃ শ্রেণীগত স্তরের, আর এই শ্রেণী সংঘাত তুলনামূলক গল্পকালে এসেও সংক্রমিত। এমনকি, অবিনাশ ঘোষালের প্রকৃত জন্মের মূল অবলম্বনকে অন্বেষণ করলেও কোথাও না কোথাও শ্রেণী সংঘাতের কারণটা লুকিয়ে থাকে। কুমুকে বিবাহ করার মূলে অন্ততঃ মধুসূদনের সেই উদ্দেশ্য তো কাজ করে। তবু এই শ্রেণী বৈরীতাই 'যোগাযোগ' উপন্যাসের সূক্ষ্ম সময়ানুভূতির একমাত্র পরিমাপক নয়। শ্রেণীর বৃত্তগত স্তরকে ভেঙে বিবৃত পটভূমিকায় তুলনামূলক-অতীতে চাটুয্যে বংশের ধারায় যেখানে মুকুন্দলাল ও নন্দরানীর প্রশ্ন জড়িত হয় এবং তাদের দ্বন্দ্ব ঘনিয়ে ওঠে, সেখানে তা স্পষ্টত

ব্যক্তির সংকটকেই পুঞ্জীভূত করে। সামন্ততান্ত্রিক যুগ পরিবেশে সামাজিক কুলপতি হয়েও মুকুন্দলালের জীবনে ঘরের এবং বাইরেব জগতের যে পুরুষানুক্রমিক নিয়মের সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলার প্রচেষ্টা এবং এই প্রচেষ্টায় যে ব্যক্তিরও গ্লানি থাকে— এ বোধকেই ধরিয়ে দেন নন্দরানী। যে জমিদারকে মানুষ ভয় করে, স্বাতন্ত্র্য নিয়ে যিনি আলাদা হয়ে থাকেন, নন্দরানীর প্রতি পত্নীপ্রেমের চৈতন্যে তার সত্তা-অপরতা বোধ জাগরিত হয়ে ওঠে। শুধুমাত্র শ্রেণী নয়, মানুষকে ব্যক্তিরূপে চেনার মধ্যেও যে সমকালের বহু রঙ পাল্টে যায়, সম্ভবতঃ নন্দরানীর অভিমানকে ধরে তা বুঝতে হয়। পুরুষের স্বেচ্ছাচারী বৃত্তির পাঠ শ্রেণীগত ভাবে এতকাল যে সময়ের ইতিহাস গড়ে, তার ভেতরে-ভেতরে আরেকটি সময়ের তীব্র প্রত্যাঘাত চলে। যার উপলব্ধি মুকুন্দলালের ব্যক্তিমানসে ঘটে নন্দরানীকে ঘিরে। অবশ্য এই সুপ্ত আকাঙ্ক্ষার বৃত্ত থেকে মুকুন্দলাল শেষ পর্যন্ত গল্পবিবৃতির অতীত স্তর বলেই মুক্ত হতে পারেন না। নূতন যুগের স্পন্দন তিনি শোনেন ঠিকই, কিন্তু নূতন যুগকে তিনি ধরতে পারেন না। অসমাপ্তির বিরাট প্রশ্ন চিহ্নের মাঝখানে অনুপস্থিত নন্দরানীকে ব্যক্তি-মুকুন্দলাল তাঁর শেষ উচ্চারণের আকাঙ্ক্ষায় তরঙ্গায়িত করেন— 'বড়ো বউ, ঘর যে অন্ধকার! এখনো আলো জ্বালবে না?'[১৪] দেখা যায়, চাটুয্যে বংশের আদিতে ব্যক্তিক স্তরে এই প্রশ্ন উচ্চারণের কোনো প্রয়োজন অনুভূত নয়। চাটুয্যেদের যে বংশ ধারা, তাতে মুকুন্দলাল সেই গল্প-বিবৃতির অতীতে সর্বশেষ স্তম্ভ। যেখানে বংশের পড়তি অবস্থার মাধ্যমে শক্তির বিকেন্দ্রীকরণে বহু ব্যক্তিস্বর ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এর আগে চাটুয্যে বংশে নন্দরানীর মত কোনো ব্যক্তির আবির্ভাব নিশ্চয়ই অসম্ভব না হলেও আধিপত্যের তাড়নায় তাদের কণ্ঠ রুদ্ধ বলে জমিদারকে তার শ্রেণীগত উত্তরাধিকারের প্রবৃত্তি লোক থেকে তারতম্য ঘটাতে তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। আর তারা নিজেরাও প্রবল সেই আধিপত্যের টানে আত্মব্যক্তিত্বকেও খুঁজে নিতে অপারগ হন। তাই বিবৃতির তুলনামূলক অতীতের গর্ভে দূরাগত আরেক অতীতকে এঁকে পাশাপাশি যেনো চিত্রিত করা হয় তার ক্রম পার্থক্য।

অন্যদিকে ঘোষাল বংশের যে অতীত পর্যায়ের শেষ সীমারেখাটি আনন্দ ঘোষালকে দিয়ে দেখনো হয়, সেখানে আগাগোড়া ব্যক্তির জাগরণ অবলুপ্ত। কি সুদুর অতীত, কি বর্তমান অতীত— ঘোষাল বংশের ক্রমান্বিত ধারায় কেবল মানুষ বদলের পরিবর্তনটুকু ছাড়া আর কিছু নেই ভাবতে অসম্ভব ঠেকে। আসলে ভেতরে ভেতরে তাদের উত্থানের প্রশ্নটি পাদপ্রদীপের আলো পায় না গোটা অতীত জুড়ে আধিপত্য সত্তায় চাটুয্যেদের দাপটে। সাম্রাজ্যের এই পরিসর ঘোষালদের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ভাবেই সংকুচিত। তাই তারা চণ্ডীমণ্ডপবিহারী সমাজের উৎপাতে কেবল

তাঁড়া খায়। কিন্তু এ ধরনের স্থবির কোনো অবস্থানই চিরাচরিত নয়। ঘোষাল বংশের উত্থানে অজ্ঞাতবাসের সময় প্রস্তুতি সাঙ্গ করে নবযুগের সংস্পর্শ লাগে। সামন্ততান্ত্রিক আধিপত্যকাল বিলীয়মান হয়ে প্রতাপের শক্তিতে জ্বলে ওঠে। কিন্তু সেইসঙ্গে আধিপত্যবাদই একদণ্ড ছেড়ে আরেক দণ্ডে বণিক বৃত্তিতে ঘোষাল বংশের সুযোগ্য উত্তরপুরুষ মধুসূদনকে আশ্রয় করে। তার ব্যক্তি প্রচেষ্টা এবং তীক্ষ্ণ ব্যবসায়িক বিচক্ষণতা তাকে সার্থকতার স্তরে নিয়ে যায় বটে, তবে বৃহত্তর অর্থে জীবন অন্বেষণ হয় না। বরং সেই একাধিপত্যের প্রবৃত্তিগত ক্ষমতার দ্বারা সে হয়ে ওঠে আরেকটি শ্রেণী জগতের প্রতিনিধি। উপাখ্যানের 'বর্তমান' তাই এ পর্বের সূত্রেই। অতএব যে ফিউডাল ব্যবস্থায় ব্যক্তির স্ফুরণ ঘটে, তা সম্প্রসারিত হয় বিপ্রদাস-কুমুর মধ্যে ঠিকই। কিন্তু যে-সামাজিক শক্তি এতকাল তাদের সহায়ক, তার হাতবদল ঘটে পুঁজিধর্মী মধুসূদন সম্প্রদায়ে। ফলে এবারকার ইতিহাসের আলো পড়ে ঘোষাল বংশে। গল্পের বর্তমান তাই কুমু-বিপ্রদাসের ব্যক্তি জগতের পরিচয় যতই বহন করুক, বার বার মধুসূদনের শ্রেণীসত্তা তাতে প্রতিবন্ধকতা করে— মূল্যকে পণ্য দরে যাচাই করতে থাকে।

এছাড়াও ব্যক্তিত্বের প্রকাশ সর্বত্র সম্প্রসারণের সূচক, একথা নিশ্চয়ই বলা যায় না। চাটুয্যে বংশের বিশেষ একটি স্তরে এসে (বর্তমান-অতীত) নন্দরাণী সম্প্রদায়গত আত্মপরিচয়হীনতা থেকে সময় বন্ধনকে যেখানে ভেঙে দিতে চান তাঁর ব্যক্তিত্বের স্পর্শে, সেক্ষেত্রে তাঁর অভিমান যতটুকু ভবিষ্যৎ গড়বার কাজে ব্যবহৃত হয়, তার চেয়ে অনেক বেশি তাঁকে ভাঙে। ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতা নিয়ে তিনি সন্তানের থেকে আরো অন্য কিছু বড় মনে করেন, যার প্রভাব প্রবলভাবে কুমুদিনীর উপর পড়ে এবং নঞর্থক রূপে দেখা দেয় বলে ঘটনা বিপুল সংকটেরও মুখোমুখি হয়। আর তার কারণ, কুমুদিনী নন্দরানীর মতন ব্যক্তিত্ব প্রকাশের বিচ্ছিন্নতার সূত্রে সমকাল থেকে আলাদা হতে পারে না। অথবা পারে না মৃত্যুর মাধ্যমে সমাপ্তি টেনে দিতে। যেহেতু বর্তমানটির সামাজিক অবস্থান আজ পূর্বপুরুষদের মতন চাটুয্যে কিংবা ঘোষাল বংশের মধ্যে সীমিত নেই। এ সমস্যাও আজ একমাত্র নয় তাদের উভয় সম্প্রদায়ের সংঘর্ষের ইতিবৃত্তকে ধরে। সমস্যার পরিসর এখন বৃহত্তর। সাময়িকতার আগ্রাসী শক্তিতে দুটো বংশের পুরনো পার্থক্য যেমন ভেতর থেকে জাগিয়ে রাখে, তেমনি প্রাক্-ঔপনিবেশিক ও ঔপনিবেশিক সময় পরিধি সুচিহ্নিত করে দেখায় মানুষের জীবনযাত্রায় পাল্টে যাওয়া লক্ষ্যকে। যেখানে শ্রেণী বলতে আর বংশ নির্দিষ্ট নয়, ব্যক্তির চৈতন্য জুড়ে। কেননা অর্থশক্তিতে চলা এই অর্থসর্বস্ব সামাজিক-জীবন মূল্যবোধকেই যে অবিরত পাল্টে দেয়। সমালোচককে তাই 'যোগাযোগ' উপন্যাস নিয়ে বলতে হয়—

"অর্থনৈতিক শ্রেণী বিন্যাস-শ্রেণীদ্বন্দ্বের পটভূমি জীবন্ত এবং তার জড় সূক্ষ্মভাবে মুখ্য তিন নরনারীর একান্ত ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের মধ্যেও প্রবেশ করেছে।"[১৫]

তার মানে ব্যক্তি এখানে যেভাবে প্রকাশ পেতে চায়, তার ভেতরে কাজ করে অর্থনৈতিক শ্রেণীবিন্যাসের স্বর। নূতন এই নিয়ন্ত্রক শক্তির ভয়াবহতার মুখোমুখি হতে নিশ্চয় নন্দরানীর ব্যক্তিপ্রকাশক প্রতিক্রিয়া একেবারেই ভ্রান্ত। ফলে তাঁর যুগের যে সমস্যার তিনি সম্মুখীন হন, এর চাইতেও আরো বড় সমস্যার সামনে দাঁড়িয়ে কুমুদিনী। বিবাহ বন্ধন আজ কুলগত আবেষ্টনে নেই। কুমুর তাই সম্পর্ক ঘটে তার বংশের বাইরে এসেই— 'মধুসূদনের সহিত কুমুদিনীর বিবাহ, যথার্থভাবে অসবর্ণ বিবাহ; কারণ, ইহারা দুই জাতের মানুষ— বিভিন্ন কালচারের স্তরে ইহারা লালিত।'[১৬]

অবশ্য এখানে কোনো সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায় থেকে আজ যে আলাদা নয়, আলাদা হতে পারে না— এটা এক সদর্থক দিক। কিন্তু সেইসঙ্গে অর্থ নির্ভরতার সূত্রে যে জীবন-অতিক্রান্ত, তাকেই একমাত্র বিবেচনা করায় থাকে বিপদ। ফলে মানুষ আজ বিচার্য অর্থের সম্পর্কে, অর্থ অর্জনের কৌশলগত সফলতায়। তারাশংকরের অনেক উপন্যাসের মত তাঁর 'গণদেবতা'র কাহিনীতেও ব্যক্তির থেকে শ্রেণী গোত্র যেখানে নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠে, সেখানে সময়ের তাগিদ অনুসারে শ্রেণীর চিহ্নিতকরণ ঘটে অর্থনির্ভর দৃষ্টিতে। অর্থ উপার্জনের ভিত্তিতেই ব্যক্তি এবং শ্রেণী নির্দিষ্ট। আর অর্থ উপার্জন বলতে এখন আর আভিজাত্যের সঙ্গীরূপে নয়, অর্থ উপার্জনের ক্ষমতাকে ছুঁয়ে যে কোনো বংশের ব্যক্তির উপরই নির্ভর করে তার প্রতিপত্তি। চণ্ডীমণ্ডপ তাই যে কালের প্রকাশ-মাধ্যম, তাতে অধিকার এবার কুক্ষিগত হয় হঠাৎ অর্থবান হয়ে ওঠা বাবুদের জোরে।

নূতন এই যুগসংকট এড়াতে না পেরে তাকে পাল্টানো যায় না— এই হতাশা নিয়েই তারাশংকর দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে ভাবতে হয় জীবনের পথ চলতে সংকট তো যে কোনো কালেরই পরিচিত বৈশিষ্ট্য। এই সংকটের ক্ষেত্র পাল্টেযাবার মধ্যেই একদিকে লুকিয়ে আছে সমাজ (সময় ও পরিসর), অন্যদিকে জীবন। একটিকে ছাড়া অন্যটি শুধু মূল্যহীন নয়, অসম্ভব। তাই কোনো একটি ইতিহাসে কালের খণ্ডত্ব শেষ কথা নয়, তারপরেও সমাজকে নিয়ে জীবনের সঞ্চার চলতেই থাকে। 'যোগাযোগে'র কুমুকে তাই বদ্ধ অতীত ও বর্তমান স্পর্শ করেও বলতে হয় —'সমস্ত গিয়েও তবু বাকি থাকে এই কথাটা বুঝতে পেরেছি।'[১৭]

অতএব নানা মুখশ্রীর সন্ধানে রবীন্দ্রনাথ কোনো একটি সাময়িকতার জন্য কোনো আরেকটি সাময়িকের মাঝখানে আক্ষেপ করেন না। সময়ের অনিবার্যতায় পর্বে পর্বে তার ঐতিহাসিক সূত্রে অনুকূল-প্রতিকূলকে স্বীকার করে নেন। আর

বর্তমানটি ছুঁয়ে প্রমাণ করেন, এদের সম্মিলন প্রক্রিয়াতেই ঘটছে নবযুগ। সময়কে কেবল এক উপন্যাসের আঙ্গিকগত ধারাতে নয়, ভাবের দিক দিয়ে বিস্তৃত প্যানোরামায় ছড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ ভাবতে পারেন বলেই 'যোগাযোগ' উপন্যাসে আভিজাত্যের পর্ব থেকে পুঁজিপতি বেনিয়ার ছবিও আঁকেন। আবার সেইসঙ্গে আভিজাত্যকে সহমর্মিতা দেখিয়ে সম্মানেও ভূষিত করেন এবং অর্থনির্ভর বণিকতন্ত্রকে জয়ের তিলক পরিয়ে আপাত যুগলক্ষণ রূপে গ্রহণ করেও নেন্। বাহ্যিকভাবে হয়তো মনে হয়, মধুসূদনের চাইতে মুকুন্দলাল-সম্প্রদায়ের প্রতি ঔপন্যাসিকের সহানুভূতি প্রবল। কিন্তু এই সহজ দৃষ্টিতে বিচারের প্রবণতা ছাড়িয়ে আরো গভীর ভাবে সময় দিয়ে বিশ্লেষণ প্রয়োজন। আর সেক্ষেত্রে শিল্পের লক্ষ্য আভিজাত্য কিংবা বণিকবৃত্তির বিশেষ কালটিকে ধরে নয়, বরং বোধটিকে জীবনের উন্নতির স্তরে বহু সময়ে ছড়িয়ে দেবার মধ্যে। কেননা, শুধু একটি বা দুটি বর্ণনায় এর দুর্বলতা বা সফলতাকে ফোটানো যায় না। সামন্ততন্ত্র কিংবা পুঁজিতন্ত্রের দুটো যুগে আধিপত্যের অত্যাচারে হেরফের থাকলেও চরিত্র সমান। তাই নারীঘটিত চরিত্রদোষ প্রসঙ্গ এনে দুটো যুগকেই মুকুন্দলালের বাঈজী সংস্পর্শ ও মধুসূদনের শ্যামা সংযুক্তিকে একই সাধারণ ভূমিতে দেখানে হয়। অর্থাৎ সে বিচারে অতীত ও বর্তমান এখানে সময়ের বাইরের পোশাক পরিবর্তন মাত্র। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অন্যভাবেও আরেকটি দিক ধরে দেখান, মানুষ যেখানে তার স্বাতন্ত্র্যের (Identity) শিক্ষা লাভ করে, সেখানে তাকে অর্জন করে নিতে হয় আভিজাত্যবোধ। অথচ সেইসঙ্গে বর্তমান অর্থনিয়ন্ত্রিত বাস্তব সমাজটিকেও অবহেলা করার উপায় নেই। কারণ স্বাতন্ত্র্যবোধ তো বিচ্ছিন্নতা জাগায় না। ফলে অর্থ নিয়ন্ত্রিত ব্যাপারটি দক্ষতায় পর্যবসিত হয়ে যে কোনো বংশ নির্বিশেষে মানুষকে পাদপ্রদীপের আলোকে নিয়ে আসে। দুটো সাময়িকতার একদিক থেকে আভিজাত্যের সম্মান ও তার সঙ্গে অন্যদিকে ভারসাম্য রেখে অর্থনীতির দিগন্ত খুলে গিয়ে যে নূতন কাল, তাতে গঠিত হয়ে ওঠার অপেক্ষায় আছে নূতন এক মানববিশ্ব। কেননা, মানুষের স্বস্তি এবং নিরাপত্তা তো শুধু আজ ব্যক্তি-প্রচেষ্টার উপর একমাত্র নির্ভর নয়, নির্ভর তার সম্মিলিত সমাজব্যবস্থার উপরও।[১৮] ফলে তার বিস্তার যত ঘটে, তত নূতন নূতন সমস্যা আরো তীব্র হয়। পরিবর্তনকে আরো বড় বলে চেনা যায়। তারপরেও আরো বৃহত্তর জগতে যেখানে অসংখ্য সাময়িকতার ভগ্নাংশ পূর্ণবৃত্ত রচনা করে, তখন দূর হয়ে যায় সাময়িক বিপন্নতা। পৃথিবী এখনও সেইযুগে প্রবেশ করেনি মানুষের হাত ধরে— তার সংগ্রাম চলছে। ফলে এই বর্তমানটাই বাস্তব অর্থে 'যোগাযোগ' উপন্যাসে কুমু-মধুসূদনের কৌনিক স্তরে একে অপরের ভিন্নতাতে

ধরা দেয়। আর আভাসে এই বর্তমানটির পেছনে দাঁড়িয়ে থাকে অবিনাশ ঘোষালের আরেক বর্তমান। সেই বর্তমানের বিস্তার উপাখ্যানে নেই, যেহেতু আজকের পৃথিবী এখনও আভিজাত্য ও অর্থনীতিবোধে সংযোগ সূত্র আবিষ্কার করে চলছে। তাই এই সংযোগসূত্রের পরিচয়কে দেখিয়ে দিতেই 'যোগাযোগ'-পরবর্তী 'শেষের কবিতা'র লাবণ্যের আবির্ভাব আবশ্যক হয়ে পড়ে। যেখানে তার চরিত্রের মৌলিকত্বে সে শুধু অমিতের নয়, সকলেরই সম্ভ্রম আদায় করে নেয় আভিজাত্যবোধ দিয়েই। অথচ সেইসঙ্গে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠার লক্ষ্যে আর্থিক নিরাপত্তাকেও মজবুত করে। কাজেই অর্থসম্পর্কিত বিষয়টি গুরুত্বহীন করে রবীন্দ্রনাথ জীবনপ্রতিষ্ঠায় সময়ের গাঢ় নিঃশ্বাসকে অস্বীকার করতে পারেন না। যে কারণে মধুসূদনের প্রতিনিধিত্ব করা যুগে কুমুকে লাবণ্যের মত ছড়িয়ে দেন না। বরং ঔপনিবেশিক নগর সভ্যতার স্থূল অর্থ সর্বস্বতার বাতাবরণেই কুমুকে শুধু নিঃসঙ্গ নয়, তাকে নিঃসঙ্গ মূর্তিতে সমালোচনাও করেন। কারণ কুমু যে আভিজাত্যবোধ নিয়ে ভুল ভাবে এগোয়, তাতে একদিকে যেমন থাকে মধ্যযুগীয় সংস্কার, তেমনি অন্যদিকে বিচ্ছিন্ন হবার প্রবণতা। যে বিচ্ছিন্নতার গোড়াপত্তন এবং দায়িত্ব কুমুর মাতা নন্দরানী অতীতের পৃষ্ঠা থেকেও এড়াতে পারেন না। কেননা কুমুর বিচ্ছিন্নতাবোধ পুঁজিতন্ত্রের যুগে সৃজিত নয়, দেশের বাড়ি থেকেই এর বীজ সে বহন করে চলে। তাই কখনো সে তার একাকীত্ব এড়াতে পারে না,— দেশের বাড়িতে, বিপ্রদাসের সান্নিধ্যে কিংবা মধুসূদনের সম্পর্কসূত্রে।

মধুসূদনকে ঠিক এর তুলনামূলক বিচারে প্রচুর বাস্তবজ্ঞানে পাওয়া যায়। ফলে পিতা আনন্দ ঘোষালের গতানুগতিক জীবনধারাকে অন্যখাতে প্রবাহিত করার ক্ষমতা সে রাখে। ঐতিহাসিক কালের অদৃষ্ট নামক সংস্কারের দাসত্বে সে নিজের শক্তিকে অপচয় না করে নির্ভুল হিসেব ও সামঞ্জস্যজ্ঞানের দৌলতে জীবনকে কৌশলগত ভাবে সংযুক্ত করে নেয় নিয়ন্ত্রণ দক্ষতায়। ফলে সাফল্যও আসতে থাকে। কিন্তু এই হিসেবজ্ঞান সর্বত্রই যে সমমাপে চলে, বাস্তবতার দর্পণে নিশ্চয়ই তা বলা যায় না। কাজেই হিসেবী মধুসূদনের উন্নাসিকতায় এবং পুরোনো চাটুয্যে— ঘোষাল বংশের শ্রেণীগত আক্রোশে যেখানে কুমুর সঙ্গে তার বিবাহ ঘটে, সেখানে অবমাননা করে সে দলগত অতীত স্মৃতির প্রতিশোধ তোলে ঠিকই, আবার একইসঙ্গে কুমুকে নিয়ে বিপন্ন বিস্ময়ও অনুভব করে। আর এই বিস্ময়ের মধ্যে যে দুর্বলতা ধরা দিতে থাকে, তারই রন্ধ্র পথ ধরে অলৌকিকের প্রতি বিশ্বাস জন্মে। তার চরিত্রগত নয়, ভাগ্যদেবতার প্রতি এই ক্রম নির্ভরশীলতাকে মাধ্যম করেই কুমুদিনীর অবস্থান প্রধান হয় ওঠে।

অথচ মধুসূদন ও কুমুদিনী— উপন্যাসে এই দুই বিপরীত মাত্রা একটি বিশিষ্ট স্থান-কালে সমবেত হয়ে তাদের তুলনামূলক সময় বৈশিষ্ট্যকেই আমাদের চোখে ধরিয়ে দেয়। যে বৈশিষ্ট্যে কুমুকে শুধু মুকুন্দলাল-জগতের মানুষ হিসেবেই নয়, তার অন্ধসংস্কার তাকে আরো গভীর অতীতেও টেনে নিতে থাকে। অন্যদিকে মধুসূদন বাস্তবতার দোহাই মেনে সাময়িকতার বর্তমানটিকেই গড়ে নেয়। অথচ তার এই অনুসন্ধানের মাঝখানে কুমুর ভিন্নমুখী চলনের সঙ্গে পদে পদে ঘটতে থাকে বিরোধ। এই বিরোধ অবস্থান পাশাপাশি কখনোই দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। কেননা, এর ফলে হয় তাতে কেন্দ্রচ্যুতি ঘটে, নয় আসে বিকৃতি। আর তা না হলে বর্তমানটি চূর্ণ হয়ে আরেকটি বর্তমানের সূত্রপাত ঘটায়। কুমুকে নিয়ে তাই মধুসূদনের চলার স্রোত কিছুটা ব্যাহত হয়ে আপাত কেন্দ্রচ্যুত হয়। অন্যদিকে কুমুকেও স্বীকার করে নিতে হয় তার অন্তঃসত্ত্বা হবার প্রবল বাস্তবতাকে। যে প্রবল বাস্তবতায় কুমুকে মধুসূদনের কাছে হার স্বীকার কিংবা কুমুর কাছে মধুসূদনের বাঁধা পড়াকেই লক্ষ্যস্থল করে না। বরং উভয়ের মধ্যে যে জায়গাটিতে অতীত এবং বর্তমান; প্রাচীনত্ব ও সাময়িকতাকে ঘিরে অচলায়তন গড়ে ওঠে, তাদের উভয়ের মিলনে নিশ্চিত হয় অ-বিনাশী মানব ভবিষ্যৎ। অবিনাশ ঘোষাল তারই সময় সম্প্রসারণ, সেই সম্প্রসারণ ধরেই যোগাযোগের সম্পূর্ণতা।

'যোগাযোগ' উপন্যাসের মধুসূদন চরিত্রের ব্যক্তিবৃত্ত নিশ্চয়ই গোরা কিংবা নিখিলেশের মত উদার উন্মুক্ত নয়। এমন কি তাকে কোনো ভাবেই স্থূলতার ঊর্দ্ধেও পরিমাপ করা সম্ভব নয়। অন্যদিকে কুমুকে যতই সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখা হোক; তার আত্মবৃত্ত গঠনে, স্থূলতা না হোক, স্থবিরতা এড়ানো যায় না। অন্ততঃ এই বৃত্ত গঠনের কারণেই তাকে আধুনিক করে তোলে না। তাই দাদা বিপ্রদাসের উদারশীল আধুনিক চিন্তনের পাশে বিবাহ সম্পর্কে কুমুর মন্তব্য বিরক্তির কারণও ঘটায়। আর দুটো অসম্পূর্ণতা ধরে উপন্যাসে দেখা দেয় অসমাপ্তি। কিন্তু কুমুকে নিয়ে ব্যবসার বাইরে মধুসূদনের বিস্মিত ভাবনা, কিংবা অন্তঃসত্ত্বা রূপে কুমুর নিজেকে আবিষ্কার করে নেবার মধ্যে দুটো পরস্পর বিরোধের মিলন রেখাও তৈরি হয়। হয়তো বর্তমানের দৃষ্টিতে কুমুর গর্ভসঞ্চারের নেপথ্যে 'legalized rape'[১৯] কথাটি সংযুক্ত হতে পারে। তবু মনে রাখা চাই, 'যোগাযোগে'র পাঠ শুধু মধুসূদনের বর্তমানই নয়, সেই বর্তমানের পর আরো অন্য আরেক বর্তমানের। সে বর্তমান ধরা পড়ে প্রতিবেদনের আদিতে— অবিনাশ ঘোষালের বত্রিশ বছরের দীর্ঘ অকথিত সময় সংস্পর্শে। সেই সংস্পর্শে মধুসূদনের রক্ত উত্তর পুরুষের একমাত্র প্রবহমান ধারা নয়, তাতে কুমুদিনীরও সংযোগ আছে। আর শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতের প্রজন্মের কাছে তাদের সম্পর্ক কিংবা সম্পর্কহীনতা— যা-ই হোক, প্রজন্ম নিজের মতন

আরেকটি নূতন সমাজ গড়ে। যেখানে মধুসূদনের পুঁজিতান্ত্রিক আধিপত্যের ইতিহাস কিংবা কুমুদিনীর নিঃসঙ্গতা তুচ্ছ। বরং যেখানে তাদের সংকীর্ণতা ও তুচ্ছতাকে ছাড়িয়ে বাস্তবতার দিকটি ধরে গঠন সম্ভব, উত্তর যুগের কাছে তা-ই গ্রহণযোগ্য। কেননা ভবিষ্যৎকে তো দাঁড়াতে হবে তার তৈরি হয়ে ওঠার শক্তিতে।

তবু যে বার বার 'যোগাযোগ' উপন্যাসকে অসমাপ্ত বলে ভুল ব্যাখা করা হয়, তার কারণ, কুমু-মধুসূদন পর্বটিকে চূড়ান্ত বলে ধরে নেওয়া। এছাড়াও বিভ্রান্তি আরো দু'একটি কারণেও দেখা দেয়। যার প্রথমটি হয় অবিনাশ ঘোষাল সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে না পারা এবং দ্বিতীয়টি উপন্যাসের শেষ অংশ অবধি বিপ্রদাসের ট্র্যাজেডি। কিন্তু অনুধাবন করলে বোঝা যায় প্রথমটির ক্ষেত্রে অবিনাশ ঘোষাল যেহেতু ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, ফলে ভবিষ্যৎটি সম্পর্কে আগাম পূর্ণাঙ্গ বিবৃতি প্রদান ঔপন্যাসিকের দায়িত্বে নেই। তাছাড়া বর্তমানের বিচ্ছিন্নতার ট্র্যাজেডিকে ভবিষ্যতের সঙ্গে লেখক সূত্রবদ্ধ করেন এবং শুধু তাই নয়, ভবিষ্যৎকে একেবারে আদিতে উচ্চারণ করে তার উৎস খুঁজতে যান। 'যোগাযোগ' উপন্যাস, অতএব, অবিনাশ ঘোষালের উপাখ্যান নয়, বরং তার হয়ে ওঠার উৎস। আর দ্বিতীয়টিতে, বিপ্রদাসের ট্র্যাজেডি সময়ের বাস্তবতারই দাবিদার। কারণ, যে বর্তমানটি ধরে বিপ্রদাস ও মধুসূদনের পাশাপাশি অবস্থান ঘটে, সেখানে কাজের উদ্যম মধুসূদনেই মেলে, পক্ষান্তরে বিপ্রদাস তার অতীত-আভিজাত্য মহিমাকে বহন করে মাত্র। অবশ্য বিপ্রদাসে মানবিক উদারতা সদ্‌গুণরূপে ক্রিয়াশীল। কিন্তু এই উদারতা ততক্ষণ পর্যন্ত সত্য নয়, যতক্ষণ না তা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংগঠিত। 'রাজর্ষি' উপন্যাসে গোবিন্দমাণিক্যের কর্মপ্রচেষ্টায় ত্রুটি কিছু থাকলেও তিনি তাঁর উদারশীল পথটি ধরে শেষ পর্যন্ত সংগ্রামের পথে এগোন। গোরার ক্ষেত্রে নানা ভ্রান্তিতেও সমস্ত জীবন জুড়ে কাজের ভেতরেই তার উদারশীল নির্মাণ প্রচেষ্টা চলে। আর নিখিলেশ নিজেকে আপাত গুপ্ত রেখেও কি স্বদেশিয়ানার প্রশ্নে, কি পারিবারিক বৃত্তে উদারতার দৃষ্টান্তরূপে গঠনপ্রয়াসী। 'যোগাযোগের'র বিপ্রদাসের মধ্যে কাজের ভেতর দিয়ে এক্ষেত্রে কোনো পথ তৈরি হয়ে ওঠে না, চলার শক্তিতে সময়কে প্রস্তুত করে তোলে না; ফলে, তার ট্র্যাজেডির জন্য সে-ই দায়ী। একমাত্র লেখকের সহানুভূতির চড়া রঙের উপর তার বেঁচে থাকা। অথচ অন্যদিকে মধুসূদন লেখকের সহানুভূতির অপেক্ষা না করে গঠন করে তোলার আপাত চারিত্রিক সামর্থ্যে সমকালটিকে শুষে নিতে পারে।

উপন্যাসে মধুসূদন পাঠকের শ্রদ্ধা আদায় করতে পারে না। তার অধিকারবোধ যে তৎসাময়িকের উপর প্রতিপত্তির জোরে চলে, সেখানে মানবিক স্বীকৃতির বদলে অর্থ উপার্জন প্রয়াসটাই বড়। নারীর মূল্য তার কাছে বস্তুর চাইতে বেশি নয়। তবু

বাস্তব জ্ঞানের দিক দিয়ে সে অনেক বেশি আধুনিক বলে বেঁচে থাকার অর্থকে অন্যভাবে পায় এবং সফলতাও অর্জন করে। অবশ্য এই সফলতা এলেও মধুসূদন নিশ্চয়ই সময়ের সার্থকতা অর্জন করে না। অন্যদিকে বিপ্রদাস-কুমুদিনীর মানবিক স্নিগ্ধতার পাশাপাশি তাদের নিশ্চেষ্টতাবোধ উভয়কেই খণ্ডিত করে। কুমুর একাকীত্বের জন্য মধুসূদন যতটুকু দায়ী, তার থেকেও বিবাহের পূর্ব হতেই তার চরিত্রের বিরোধ তাতে সময়ের সামঞ্জস্যের অভাবকেই ধরিয়ে দেয়। প্রগতি এবং বিবর্তনের ধর্ম যেখানে এগিয়ে চলা, কুমু সেখানে তার বিশ্বাসের ভিত্তি দাঁড় করায় পেছনমুখী সংস্কারকে ধরে। 'করুণা' উপন্যাসের করুণার সংস্কার এক্ষেত্রে খুব সীমা অতিক্রম করে না, অথচ করুণা ও কুমুর পটভূমি এক নয়। বিবাহের সময় কুমুর বয়সের উল্লেখ ছিল ঊনিশ বছর। তার মানে, পরিণত মনের সকল ক্ষেত্র এখানে প্রস্তুত। তাছাড়া যে আভিজাত্যবোধ তাকে আধুনিক সময় চেতনায় স্বাতন্ত্র্য দান করে, সেখানে ব্যক্তির অধিকারবোধ সম্পর্কেও সে সচেতন। মধুসূদনের পরিবারে সেই বোধ থেকে সে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে জেগে ওঠতে চায়। কিন্তু একদিকে প্রাচীন সংস্কার, আর অন্যদিকে আধুনিক চিন্তন তার চরিত্রকে কোনো একটি সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত করায় না। এক্ষেত্রে বিপ্রদাসও তার কর্মহীন স্বভাবধর্মে স্নেহের বোনটিকে তৈরি করে তুলতে পারে না। দাদাকে শ্রদ্ধা করলেও কুমু অন্তত তার বিশ্বাসের জগতকে বিপ্রদাসের সঙ্গে সম্মিলিত করে দেখে না।

আভিজাত্যবোধ বলতে যে উদারশীল ও সম্মানবোধ বোঝায় এবং সেই সঙ্গে বাস্তব-সম্পর্ক বন্ধনও সম্ভবপর হয়ে ওঠে এ ব্যাপারটি কুমুদিনী একটি যুগ আধারে অনুধাবন করতে পারে না। আভিজাত্যের বাস্তবতা নিয়েও মুকুন্দলাল তাই পারেন না সম্মানবোধের দ্বারা নিজের স্ত্রী নন্দরানীর ব্যক্তিত্বকে মান্যতা দিতে। স্ত্রীর প্রতি তাঁর অপরিসীম প্রেম থাকা সত্ত্বেও অন্যনারী সংসর্গ থেকে তিনি নিজেকে গুটিয়ে নেন না, আর নন্দরানীর প্রতিবাদও ওইখানে। অন্যদিকে দাদা বিপ্রদাসের মধ্যে যে সম্মানবোধ ও সততা, তার পাশাপাশি নিশ্চেষ্টতাবোধ সংক্রমিত হয় কুমুতে— যুগপৎ রূপে। এছাড়াও জগত পরিক্রমায় যে শিক্ষা সে অর্জন করে, সেখানে তার অনুভূতিতে ধরা দেয় বাবার দিক দিয়ে নারীর প্রতি সম্মানবোধের অবহেলা— যা অতীত থেকে বর্তমানে মধুসূদনের পরিবারেও খুব পরিবর্তিত নয়। আর নয় বলেই, নন্দরানীর মতন কুমুদিনীরও প্রতিবাদ। তবু সামাজিক এই অসম্মান সময় বদলে খুব পরিবর্তিত না হলেও একথা স্বীকার করতে হয় যে, নন্দরানী তাঁর সময়ে যে ভূমিতে দাঁড়িয়ে, কুমু নিশ্চয়ই সেই একই ভূমি দখল করে নেই। সময়ের কারণেই প্রতিবাদের মানে পাল্টাতে হয়। ফলে নন্দরানী যেখানে প্রতিবাদ অর্থে ভেতরে ভেতরে বিচ্ছিন্নতাকে অনিবার্য করেন, সেখানে নূতন কালের প্রতিবাদ আসে

সংযোগের আড়ালে। কারণ প্রতিবাদের মূল অনুসন্ধান হয় নূতন পূনর্বিন্যাসের আকাঙ্ক্ষা। আর সেই আকাঙ্ক্ষা রূপায়িত হতে পারে সংযুক্তিতে। নন্দরানীর কাছে প্রতিবাদের উপরিভাগটা প্রধান বলে তিনি সন্তানের দিকে না তাকিয়ে বিদায় নিতে পারেন। অন্যদিকে কুমুর ক্ষেত্রে সময়ের অবলেপনে এত সরলভাবে এর মীমাংসা হয় না। কারণ, তার প্রতিবাদ তো শুধু মধুসূদনকে ধরে নয়, প্রতিবাদ পিতা মুকুন্দলালের প্রতিও। ফলে, অতীত এবং বর্তমান জুড়ে এই যে ব্যাপ্তি— তাকে সে অস্বীকার করবে কি দিয়ে! আর তাছাড়া তাকে সংযুক্ত হতে হবে ভবিষ্যৎকে আরো বড় বিস্তৃতিতে নিয়ে যাবার জোরেই। নন্দরানীর সেই দায়িত্ব নেই, কুমুদিনীর দায়িত্ব এড়াবার উপায় নেই— সময় এভাবেই তৈরি করে তোলে, তৈরি হয়ে ওঠে। আর এই গঠনের মূলে কাজ করে চরিত্রের অন্তর জগত। যে কারণে কুমুদিনীতে অতীতের স্মৃতি পুরোনো মূল্যবোধ ও সংস্কারকে ধরে। অন্যদিকে একালের পরিণত নারী হিসেবে রচিসম্পন্ন স্বাতন্ত্র্যবোধকে অবচেতন ভাবে ধারণ করে চলতে থকে। আর তাদের মধ্যে সামঞ্জস্যবোধের অভাব থেকে সঞ্চারিত হয় সময়ের ব্যাধি— একাকীত্ব যার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া। এই একাকীত্ব সে কোনো খণ্ডপরিচয় দিয়ে মেটাতে পারে না। তাই শুধু মধুসূদন নয়, গ্রামের বাড়ি কিংবা বিপ্রদাসের সান্নিধ্যে কলকাতায় এসেও তার একাকীত্ব ঘোচে না। কিন্তু সেইসঙ্গে কুমু যখন বিপ্রদাসের কাছে মধুসূদন পরিবার থেকে মুক্ত হবার এবং সেইসঙ্গে তাদেরকেও মুক্ত করার কথা বলে,[২০] তখন তার গভীরে আরো অন্য কথা শুনে নিতে হয়। বুঝতে হয়, এই মুক্তি সময়ের খণ্ড সংকীর্ণ পরিধি থেকে মুক্তি। অতীতের স্মৃতি ধরে বর্তমানের সত্তা গঠনে সে বারবার নিজের বংশের ধারায় প্রবলভাবে মুক্ত হতে পারে না, হতে পারে অন্য বংশের ধারাস্রোতে মিলিত হয়ে— মধুসূদনের রূঢ় বাস্তবতার আঘাতে। তাই যে সুপ্ত মুক্তির আকাঙ্ক্ষা কুমু তার মনোজগতে দীর্ঘদিন বহন করে ফেরে, তার অভিব্যক্তির প্রয়োজন। আর এই প্রয়োজনটাই সে এতদিন অনুভব করতে শেখে না, বিপ্রদাসের সংস্পর্শেও নয়। মধুসূদনকে তাই আত্মীয়রূপে স্বীকৃতি জানাতে না পারলেও তার অন্তঃসত্ত্বা হয়ে ওঠার গভীরে নিবদ্ধ থাকে সময়ের প্রবাহ। যাকে কুমু মুখে বড় প্রতিবন্ধকরূপে মনে না করলেও এড়াতে পারে না, সংযোগকে স্বীকার করে নিতেই হয়।

উপন্যাসের শেষে কুমুর তাই ফিরে যাওয়া সন্তানপ্রীতিতে নয়, স্বামী ভক্তিতেও নয়; বর্তমানের রূঢ় বাস্তবতায় জেগে ওঠা। অস্তিত্বকে আরো নিশ্চিত ভবিষ্যতের আশ্রয়ে বর্দ্ধিত করে তোলা। যে বাস্তবতাকে চাইলেই দূর করা সম্ভব নয়। কেননা, গোটা পৃথিবী যে আজ এক মুক্ত বিপনন ক্ষেত্ররূপে তৈরি। মূল্যবিচার যেখানে অর্থের সঙ্গতিতে, আর মুনাফা অর্জন যার কৌশলগত ভাষ্য। অতএব এই বাস্তবতার

নাগপাশে মানবমন অর্থযন্ত্রের হাত থেকে কবে মুক্ত হবে, কে বলতে পারে ! বরং বলার জন্য চাই আরো দীর্ঘ, আরো প্রসারিত সময় সান্নিধ্যের স্পর্শ। কুমুদিনীকে তাই মধুসূদনের উত্তর পুরুষ ধারণ করতে হয়, সেই সঙ্গে ধারক শক্তিতে তাকে নবযুগের প্রতিনিধিরূপে গড়ে ওঠার সুযোগটাও করে নিতে হয়। মধুসূদনের অর্থসর্বস্ব বিশ্বাস ও বাস্তবতাকে ধরেই শুধু পরবর্তী প্রজন্ম ধরা দিতে পারে না, সেই সঙ্গে কুমুর রুচিশীল আভিজাত্য বোধের আধারটির যুগলমিলনের অপেক্ষাও রাখে। বিত্ত ভাবনার সঙ্গে আভিজাত্যময় বৈভব আজ বর্তমানের চোখে যতই যাথার্থ্যহীন মনে হোক, যতই কাল্পনিক ঠেকুক— নূতন যুগ গঠনে তার সম্পর্কবন্ধন ঘটাতেই হয়। অবিনাশ ঘোষালের বত্রিশ বছরের জীবনটি ছুঁয়ে তুলনামূলক নূতন যুগ চরিত্রের পরিচয় উপন্যাসে হয়তো নেই। কিন্তু একদিকে সামন্ততান্ত্রিক যুগের ব্যর্থতা, নিশ্চেষ্টতা এবং আভিজাত্যবোধ; সেইসঙ্গে ঔপনিবেশিক যুগ ও তার পরবর্তী স্তর ধরে বাস্তবতা ও ঔদ্ধত্য নিয়ে যে খণ্ড খণ্ড সময়ের চিত্ররূপ সংমিশ্রিত হয়— তাদের সমবায়িত রূপ নিশ্চয়ই প্রচলিত কথা বলে না, অন্য কথা বলে। সেই 'অন্য কথা' সদর্থক, কি নঞর্থক হবে নানা মুখশ্রীর সন্ধানে এখানে তার যুক্তি খোঁজা এবং যুক্তি প্রতিষ্ঠা হয় না — চলমানতাকে পরিবর্তনের ধারায় অব্যাহত রেখে বিবর্তন ও প্রগতির সূত্রে জীবনের স্পন্দনকে অনুভব করে নেয়। পরিবর্তন যেমন ঘটে কুমুর দশ বছরের অতীত থেকে বিবৃতির বর্তমানের উনিশ বছরের পূর্ণ তরুণীর বিবর্তনসূত্রী রূপ-পরিকল্পনায়, তেমনি অনুল্লেখিত হলেও আরো পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী অবিনাশ ঘোষালের বত্রিশ বছরের জন্মদিনটিতে এসে তার ভবিষ্যৎকালীন প্রায় বাহান্ন বছরের অধিক [২১] জীবন অতিক্রান্তিতে। সেইসঙ্গে তার ভেতরে ভেতরে যোগাযোগের সূত্রে ভবিষ্যৎকে তৈরি করে তোলার প্রগতি সূচক সাফল্যে।

তবু একথা ঠিক, 'যোগাযোগ' উপন্যাসকে কিছুটা বাইরের দিক থেকে দেখলে মনে হতেই পারে এর ঘটনা ও সমস্যা একটি সংকীর্ণ পরিসরে আবদ্ধ। হয়তো এরই জন্য সমালোচকরা সামগ্রিক রূপটিকে পেতে বর্তমান নিয়ে ঝুলে থাকেন, আংশিক উপাখ্যান বলে সিদ্ধান্ত নেন্। রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাতকুমারও রবীন্দ্রনাথের সংকট-আক্রান্ত ভাবনাকেই এখানে রূপায়িত করেন। [২২] আর এই রূপায়ণের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে নিশ্চয়ই অনেক প্রশ্ন জাগে। তবু একথা ঠিক, 'যোগাযোগে'র বিশাল এবং ভিন্ন মাপের সময় জগত থেকে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই মুক্তি খোঁজেন অন্য মুখশ্রীর সন্ধানে। যার পরিণামে 'শেষের কবিতা'র সূত্রপাত।

'শেষের কবিতা'কে নিশ্চয়ই 'যোগাযোগে'র ভবিষ্যৎ রূপে একমাত্র চিহ্নিত করা যায় না। তবে 'যোগাযোগের' অনেক সম্পর্ক বন্ধন 'শেষের কবিতা'য় ছায়া

ফেলে— কুমুর পর লাবণ্য যার প্রতিভাস। 'যোগাযোগে'র কুমু-মধুসূদনের বর্তমান ধরে গল্পের ভিত্তিটি দাঁড়ালেও, তার উদ্দেশ্য সেখানেই থেমে থাকে না। বলা যেতে পারে, একক স্বরে কোনো যুগই উপন্যাসে বর্তমান হয়ে ওঠে না, বরং রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলো বর্তমান নিয়ে এখানে একটি আরেকটি সংযুক্তিতে তার নির্মাণ প্রক্রিয়া দেখিয়ে যান। গল্পকে যদি যথার্থই দাঁড়াতে হয়, তবে এই নির্মাণলোক ধরেই এর বিন্যাস। ফলে মুকুন্দলাল-নন্দরানী সম্পূর্ণ নন্, বিপ্রদাস-কুমু-মধুসূদনও তাই; এমনকি, অবিনাশ ঘোষাল এবং তার পরিবৃত কালটিও স্পষ্ট নয়— শুধু তাদের একটি আরেকটির সংযোগে সময়ের স্বরান্তর প্রতিষ্ঠা ঘটতে থাকে, 'শেষের কবিতা'কে সেক্ষেত্রে বর্তমানের সঙ্গে খুব বেশি মাত্রায় মিলিয়ে নেওয়া সম্ভব। 'যোগাযোগে'র সময়-চলমানতার অস্থির (fickle) ভাবমূর্তি এখানে যেনো দাঁড়াবার অবসার পায়।

'শেষের কবিতা'য় সময়ের চলনধর্মীতা 'অমিত চরিত' নামক প্রথম পরিচ্ছেদ ধরে আভাসিত। ভূমিকাটির কাহিনীগত বিন্যাস স্বতন্ত্র হলেও এর চলমান প্রকৃতি অনেকটাই 'যোগাযোগে'র সঙ্গে মেলে। নায়ক অমিত তাই বর্তমান-সন্ধানী, কিন্তু কোনো বর্তমানেই নিশ্চিন্ত নয়। লক্ষ্য করলে তাই দেখা যায়, সে পরিবর্তনপ্রয়াসী। তবে এই প্রয়াসে কোনো গঠনধর্মীতা নেই। অমিত তার পরিচিত সমাজ থেকে যে একাকীত্ব অনুভব করে, সেই অনুভবের সঙ্গে গোরার আত্যন্তিক মিল নেই। অমিত তাই চলার পথটি গড়তে খেয়াল খুশি অবলম্বন করে। ফলে 'শেষের কবিতা' সমকালীন বিশেষ এক সমাজের ছবি হলেও রবীন্দ্রনাথ মূলত তা অমিত চরিত্রে এবং গৌণত উপাখ্যানবৃত্তে প্রস্তাবনা রূপে যুক্ত করেন। কলকাতার পরিসর এখানে সময়ের গভীরতর-বর্তমানকে ধারণ করতেই পারে না। ধাবমান-সংযুক্তির দ্রুততায় যে কাহিনী চিত্র 'যোগাযোগে' আঁকা, তার গুণগত ধারা 'শেষের কবিতা'র অমিত চরিত্রে মিশে গিয়ে উপস্থাপনার কাজটুকু সারে। তাই অমিত বৃত্তান্তে কলকাতার পারিসরিক বৃত্তে সময়ের চাল্ যত দ্রুত ও তীব্র, শিলং পাহাড়ে লাবণ্যের সান্নিধ্যে তাকে শমিত করে। কলকাতার ভেতর দিয়ে উৎসের দর্পণে গল্পের মৌলিক বিবরে প্রবেশ করে শিলং শহর এবং প্রাকৃতিক পরিবেশে এর কাহিনীর বর্তমান অনেক বেশি স্বচ্ছ হয়ে ওঠে।

জীবনীকার প্রভাতকুমার বলেন, 'শেষের কবিতা' রবীন্দ্রনাথের পক্ষে 'যোগাযোগে'র পর এক ধরনের রিলিফ বা মনের ভাব লঘু করবার প্রয়াস।[২৩] জীবনী পর্যালোচনায় এর একটি বাস্তবতা থাকলেও সৃষ্টির বিশ্লেষণে যেখানে সময়ের শিল্পরূপ ধরা দিয়ে যায়, সেখানে একটি যুগাধারে পরিসর পাল্টে প্রকৃতি-পরিবর্তনের প্রয়াস নজরে আসে। কলকাতার সামাজিক পরিসরে অমিতের বর্ণনা, আর শিলং-

এর প্রাকৃতিক বৃত্তে তার উপস্থাপনার যে পার্থক্য, তাতে সময়ের চলনধর্মিতার ভিন্নতাও নজরে পড়ে। এই ভিন্নতার প্রকৃতি ধরেই বিশ্লেষণ-দক্ষতা সত্যকে অন্বেষণ করায়।

বুদ্ধদেব বসু 'শেষের কবিতা'র নায়ক অমিত রায়কে এই বলে সমালোচনা করেন যে, সে প্রথম দিকে আমাদের মুগ্ধ করে, তারপর ক্রমেই প্রকট হয়ে ওঠে তার বাগ্মিতার ফাঁপা আওয়াজ।[২৪] যেখানে মুগ্ধতার পেছনে থাকে সময়-অবকাশের অভাবজনিত সুযোগ, অন্যদিকে সেই অবকাশটি সৃষ্টি করে তোলার ভেতর অমিতের প্রকৃতিকে বুঝে নেবার স্বরূপ। অমিত যে বড় বেশি বর্তমানকে অধিগ্রহণ করে রাখে, তাতে কোনো সম্পর্ক সন্ধানের প্রেরণায় মুখশ্রী আবিষ্কারের প্রয়াস আছে কিনা সন্দেহ দেখা দিলেও এমন দুর্দান্ত গতিতে কাহিনী এগিয়ে চলে যে দুর্বলতাকে উদ্ধার করাই অসম্ভব হয়ে পড়ে। অমিতের আদর্শ যত বড়, সামাজিক বৃত্তে তার পদচারণা তত বড় নয়। অতএব সে যখন তার দলের ভেতর থেকে আকাঙ্ক্ষাকে খুঁজে পায় না, তখনই ব্যতিক্রমিকের সুরসন্ধান করে। সেই সন্ধান কতটুকু বিশ্লেষণ উপযোগী, সন্দেহ জাগার আগেই সময়ের অপ্রতুলতায় সে পাঠকের মন হরণ করে। ফলে অমিতের অনর্গল কথার মালা গাঁথা সহানুভূতি আকর্ষণ করে নেয় এজন্য যে, তাকে বহু লোকের মাঝখানে নিঃসঙ্গ রূপে দেখা যায় বলেই। নিঃসঙ্গতার ভেতর থেকে চঞ্চল এক মন ক্রমশঃ বেরিয়ে আসতে চায় এই চমক দেওয়া কথার মধ্য দিয়েই। অন্ততঃ এভাবেই পাঠকের সহানুভূতি কেন্দ্রীভূত হতে থাকে।

কিন্তু পরিসর পাল্টে শিলং পাহাড়ে যখন গভীরভাবে ভাববার অবসর মেলে, তখন লাবণ্যের মত ব্যক্তিত্ব গঠনের চরিত্র-সংস্পর্শে আসা সম্ভব হয়। অমিতের মন হরণ করা বাচন যেখানে অন্তঃসারশূন্যতায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর ঠিক এখানেই অমিতকে চেনা যায় অন্যভাবে, চেনা যায়, তার আদর্শের বৃহত্তর ভাবনার সঙ্গে কর্মের উদ্যমের সীমাবদ্ধতায়। 'গোরা'র মহাকাব্যিক সমগ্রতা আছে বলেই বিশেষ এই সমস্যার উপর আলো পড়ে না, ঔদার্যে সব ভেসে যায়। গোরা চরিত্রের বৃহত্তর আদর্শবোধ তাই কাজের ভেতর দিয়েও সমান প্রবাহিত। ফলে নূতন নূতন ক্ষেত্র অধিগ্রহণ ও সর্বশেষে বিশ্ব অধিষ্ঠানকে ধারণ করে নিতে বাঁধা হয় না। অমিত সেক্ষেত্রে বহু দূরত্বের অবস্থানে দাঁড়িয়ে। তার একাকীত্ব থেকে বেরিয়ে আসা যেখানে প্রবলভাবে বৃহত্তর সময়ের কথা ঘোষণা করে, অথচ দ্রুততায় ছুঁয়ে যায়; সেখানে উপাখ্যান উপস্থাপনায় তাকে পৌঁছে দেয় বিচ্ছিন্নতায়। লাবণ্যই সেই বিচ্ছিন্ন বিগ্রহকে আরো নির্দিষ্ট করে চিনিয়ে দিতে পারে। হয়তো যোগাযোগে'র বিপ্রদাসের বর্তমান ট্র্যাজেডি অন্যভাবে অমিত রায়ে পর্যবসিত। যেহেতু অমিতের 'বর্তমান'

আভিজাত্যের যোগ্য মর্যাদা বহন করলেও বিচিত্র পরিসর-সন্ধানী নয়, মানুষ সন্ধানী নয়। ফলে শিলং পাহাড়ের ভিন্ন পরিসরে কলকাতা থেকে তার ছুটি কাটাতে আসা নির্দিষ্ট কোনো পরিকল্পনা নয়, কেবল পরিবর্তন বিলাসিতা। কিন্তু শিলঙে এসে সে বুঝতে পারে, এতদিন পরিবেশ তার পেছনে ছুটে গেছে, এবার তাকেই ছুটতে হবে পরিবেশ গঠনে। আর এই প্রথম বাধ্য-বাধকতা থেকে লাবণ্যের ব্যক্তিত্বের মুখোমুখি হয়ে সে অভূতপূর্ব জগতকে আবিষ্কার করে। শুরু হয় মুখশ্রী আবিষ্কারের অনুশীলন পর্ব। পুরোনো পরিচিত অমিতের মুখ বদলে যেতে থাকে পাঠকের চোখে, তার ব্যক্তিত্বকে দুর্বলতা বলে সিদ্ধান্ত নিতে বাঁধে না। অবশ্য অমিতের কথার যাদু এখানে নিশ্চয়ই সম্মোহন শক্তিকে একেবারে হারায় না। কিন্তু তার প্রগল্‌ভ আচরণে স্নেহের দৃষ্টিতেও প্রাচীন যোগমায়ার চোখে প্রশ্ন চিহ্নিত জিজ্ঞাসার সূত্রপাত ঘটায়। তাঁকে ভাবতে হয় লাবণ্যের সঙ্গে অমিতের বিবাহের ব্যাপারটি শেষ পর্যন্ত নাকি বাল্যবিবাহ হয়ে ওঠে।

'শেষের কবিতা'য় মূলতঃ নানা পরিবেশের একটি যৌগিক মিলন সম্ভব করে তোলেন রবীন্দ্রনাথ। যদিও সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় এই পটভূমি নির্মাণের প্রসঙ্গটিতে অন্যভাবে বিস্মিত হন এবং বলেন—

"আশ্চর্যের বিষয় সমস্ত ঘটনা ঘটেছে বাংলার বাইরে। এবং এমনি ছিন্নমূল এর নরনারীরা যে এদের প্রেমের জীবনের জন্যও দেশছাড়া পটভূমিই কল্পনা করে নিতে হয়।"[২৫]

কিন্তু এই মন্তব্যে ছিন্নমূল নরনারীদের উল্লেখকরণ সমর্থনযোগ্য হলেও তাদের দেশছাড়া কল্পনা আদৌ আশ্চর্যের নয়। কেননা, সময়ের আবেদনে সাড়া জাগিয়ে তোলার জন্য এর গভীর এক প্রয়োজন আছে। যার জন্য অনুভূতির মুখশ্রী সন্ধানে ভিন্ন ভিন্ন পরিসরের উপস্থাপনা জরুরী। উপন্যাস পাঠে দেখা যায়, অমিত আর লাবণ্য যেখানে একটি শূন্যকালে এসে দাঁড়ায়, অথচ তাকেই তারা নিরন্তর অজ্ঞতার সঙ্গে বহন করে চলে, তখন সে জগত থেকে দু'জনের বেরিয়ে আসার জন্য প্রয়োজন অনুপ্রেরণায় দীক্ষিত হয়ে ওঠার প্রস্তুতি। সেই প্রস্তুতি এবং আত্মযাচাইকরণের জন্য চাই এমন এক নির্জনতা, যেখানে একটি শূন্য উপবাসী মন গ্রহণের জন্য উন্মুখ হবে। পরস্পর নির্ভর করার যোগ্যতা অর্জন করবে। কলকাতার কোলাহলে তা অসম্ভব। তাই অমিত-লাবণ্য, অমিত-কেতকী ও লাবণ্য-শোভনের আখ্যান-বিবৃতি কলকাতার ঔপনিবেশিক হিসেবী পরিসর ছাড়িয়ে সংগঠিত। উপন্যাসের শেষেও কলকাতাকে ছুঁয়ে অমিতের কেতকী-বর্ণান্তকরণ সম্ভবপর হয় নৈনিতালের নির্জনতায়, লাবণ্যের সঙ্গে শোভনের বিবাহ বাসরের পরিবেশটিরও ভবিষ্যৎ চিত্র থাকে রামগড় পর্বতের শিখর।

অতএব বাহ্যিকভাবে প্রত্যক্ষস্বরূপ কলকাতাকে সামনে রেখে ভিন্ন ভিন্ন পরিসর ও পরিসর আবৃত সময়কে এখানে ধরে। আর তাতে সংগতিময় একটি মিলনজগতও তৈরি হয়ে ওঠে। প্রাণকেন্দ্র হিসেবে কলকাতাই যে আর শেষ কথা নয়,সময়ের নূতন দাবি নিয়ে অমিত ও লাবণ্যকে পরিচয়ের বন্ধনে নিয়ে আসতে গল্পের বৃহত্তর অংশ জুড়ে শিলঙে স্থানান্তর প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

অমিতের মানসলোকে যে সত্য ধরা দিয়ে যায়, সেখানে তার জীবনের বিচারদক্ষতা তাকে তার জগত থেকে অন্য মাপের মানুষ করে তোলে। এই সংকীর্ণ বৃত্ত অমিতের নয়। বরং এই বর্তমানকেই সে বার বার আরেক বর্তমানে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু চিরকালের সমকাল গঠনের যে মুখশ্রী সন্ধান, তাকে খুঁজতে হয় পরিচিত সাময়িকতায় ঘেরা সমাজপট থেকেই, সমাজপট থেকে বেরিয়ে নয়। সময়কে জীবনে প্রতিষ্ঠা দান করতে পরিচিত পৃথিবী থেকেই যাত্রা প্রয়োজন— তাকে একদিকে উদ্‌ঘাটন (discover), অন্যদিকে উদ্ভাবন (invention) করা চাই। ফলে তার প্রথম দিকের সংলাপগুলো একটু তলিয়ে বোঝা যায়, এর মধ্যে আছে মুক্তি। কিন্তু প্রেরণার অভাবে ভাবনার আকারে তা থেকে যায়। লাবণ্যই সেই পরিধি-অবগুণ্ঠন থেকে পরিধি-বিস্তৃতিতে টেনে নেয়। আবার শুধুমাত্র লাবণ্যকে দিয়েই তার বিন্যাস সম্ভবপর নয়, যদি সেই সঙ্গে পরিসর পাল্টে কলকাতার কোলাহল ছাড়িয়ে সময়ের অবকাশ না জোটে।

আমরা জানি, অনন্ত প্রবহমানতায় ভেসে চলেছি সকলেই। কিন্তু একদিকে খণ্ডের চমকে সেই প্রবহমানতা বুঝে উঠতে পারি না। অন্যদিকে যদি বা তাকে খুঁজতে চাই, সেখানে খণ্ডের পরিচিত চিত্রকেই পেরিয়ে যাই জোরের সঙ্গে। নয়তো নিস্পৃহ গতিতে। অমিতের ক্ষেত্রে এই দুটো সমস্যাই আসে। তাই তার প্রবহমানতা দিকশূন্য, তার কাজের দৃষ্টান্ত বিশেষ সীমানার দ্বারা আক্রান্ত। আবার সেইসঙ্গে তার পরিচিত বৃত্ত থেকে পালিয়ে আসা সাময়িকতাকেও এড়িয়ে চলতে চাওয়া। কিন্তু এড়াতে চাইলেই এড়ানো সম্ভব নয় বলে শিলং পরিবেশে লাবণ্য সংলগ্ন হয়েও কলকাতার কালচার তার পিছু নেয়। অনিবার্যভাবে উদয় ঘটে সিসি-লিসি-কেটি-নরেনদের। কেটির সঙ্গে অমিতের অতীত সম্পর্ক যে ইতিহাস রচনা করে, চাইলেই সে ইতিহাস মোছা যায় না। বরং এ ব্যাপারে অমিতকে একই বর্তমানে দাঁড়িয়ে দুটো ইভেন্টস্ - লাবণ্য ও কেটির কাছে জবাবদিহি করতে হয়। অমিত তার জীবনের পূর্বভাগে যেখানে জগতকে আলাদা করে দেখতে শেখে, অথচ সময়ের ইতিহাস যেখানে জীবন নামক সমগ্রের পরিচয় তুলে নেয়; সেখানে কোনো একটি ঘটনা, কোনো একটি মানুষের ছবি তো একমাত্র নয়। অমিতের গঠনের জন্য তাই বারবার নানা ইভেন্টস্-এর গুরুত্ব বেশি, যেহেতু— 'Images come

in various ways, and play various parts.'[২৬] যার কোনোটিতে লাবণ্য, কোনোটিতে কেটি — আর সব মিলিয়ে দীর্ঘসময়ের বিবৃতিতে শৈলশহর শিলঙের পটভূমি।

একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, উপন্যাসে নানা শ্রেণীবন্ধনের মাঝখানেও কোনো একটি চরিত্র তার পরিবেশকে নিয়ে কাহিনীর মূল অবলম্বন হয়ে ওঠে। 'শেষের কবিতা'র অমিত সে ভূমিকা পালন করে, অবশ্য অবচেতনভাবে। তাই স্ট্যাইল আর ফ্যাশানের সূক্ষ্ম বিভাজন মুখে সে স্বীকার করলেও জীবনকে পেতে প্রস্তুত নয়। তাতে চলতি মুহূর্তের প্রতিবিম্বই পড়ে, স্থায়ী আঁচড় কাটে না। এক্ষেত্রে তার পৈতৃক জন্মসূত্রে পাওয়া সামাজিক জীবন এবং তার ঘোরাটোপ জীবনের গভীর স্তরে যেমন প্রবেশ না করে বাইরের মুখোশরূপে মনোরঞ্জনকেই প্রাধান্য দেয়, সেখানে সেই মনোরঞ্জনকেই অমিত ব্যঙ্গ করলেও তার পক্ষে সম্ভব হয় না জীবনের গভীরে ডুব দেওয়া। লিলি গাঙ্গুলির সঙ্গে তার কল্পনাপ্রবণ বাক্য বিনিময় নানা সময়-সংলাপে ভরে উঠলেও শেষপর্যন্ত তা ফ্যান্টাসীই থেকে যায়।

অমিত চরিত্রের পূর্ববিভাগে তার এলোমেলো কথার খেলাগুলোর ভেতর জীবন সম্পর্কে নিরাসক্তি হয়তো ধরা পড়ে। কিন্তু এই নিরাসক্তি বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী'র অপু কিংবা 'ইছামতী'র ভবানী বাড়ুয্যের মত নিশ্চয়ই চরিত্রগত নয়। 'পথের পাঁচালী'তে এক-একটি মৃত্যু দৃশ্যের পথ পেরিয়ে অপুর ব্যক্তিজীবনে সঞ্চিত হয় বহু অভিজ্ঞতা। এই পথ চলার প্রবহমানতা পরিবেশকে এমনভাবে জড়িয়ে নেয় যে, চলতে চলতে খণ্ডকালগুলো এককভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে না। ইন্দির ঠাকুরানীর মৃত্যু, দুর্গার মৃত্যু, আতুড়ী বুড়ী ও বাবা হরিহরের মৃত্যু; তারপরেও 'অপরাজিত' -য় মা সর্বজয়া ও স্ত্রী অপর্ণার মৃত্যু— অপুর চোখে জীবনের চলমানতার দ্রুত ইতিহাস। এই ইতিহাসে সে চলমান সময়ের দর্শক এবং ধারক। 'ইছামতী'তেও উনিশ শতকের প্রেক্ষাপটের চাইতেও বড় 'সূচনা' ও 'সমাপ্তি'র নদীপ্রবাহে দ্রুত ধাবমান সময়চিত্র। ভবানীকে তাই চলমান ইতিহাসে যুক্ত হতে দেখি, জীবনের কোনো একটি ছকে পূর্ণতার আভাসে পাই না। অমিত ঠিক এরকম সময়-ইতিহাসের দর্শক নয়, তার নিরাসক্তি চলমান দ্রুততা বৃত্তিতেও নয়, বরং তার উপস্থাপনা সামাজিক সীমাবদ্ধতা থেকে। এই সীমাবদ্ধতা ছাড়িয়ে আরেকটি জীবনের সে অন্বেষণকারী সত্য, কিন্তু সে জীবনটি কি — তার সম্পর্কে একটা অনুমান জাগলেও অভিজ্ঞতা-শূন্যতায় বাস্তবতার ভেতর দিয়ে মুখশ্রী দর্শন ঘটে না।

লাবণ্যই তার এই পরিচিত সীমা ছাড়িয়ে নূতন এক অভিজ্ঞতা, নূতন এক সময়-অভিজ্ঞান। লাবণ্যের সঙ্গে অমিতের তাই সম্পর্ক গড়ে ওঠার মধ্যে এক একটি সময়ের মুহূর্ত বেশি গুরুত্ব পায়। আর সময়ের সঙ্গে যেহেতু ওতপ্রোত

জড়িত পরিসর, তাই শিলং শহরের প্রাকৃতিক পট হয় আধার। কলকাতা থেকে অমিত তার ছাত্রজীবনে অনেক দূরে ইংলন্ডের অক্সফোর্ডে হয়তো পড়তে যায় ঠিকই, কিন্তু পরিবেশের ভিন্নতা অনুভব করে না। শিলং হয়তো সে তুলনায় কলকাতা থেকে তত দূরবর্তী নয়, তবু এই দূরত্বই অমিত-জীবনকে অন্যলোকে নিয়ে যায়। কেবলমাত্র ভৌগোলিক দূরত্বে যার বিচার হয় না।

কিন্তু ইংলন্ডের পরিসরও উপন্যাসটির গুরুত্বপূর্ণ দিক। তার কারণ, এই পরিসরের মধ্যেই অমিত কেটির সঙ্গে প্রণয়ে আবদ্ধ হয়। যার সম্প্রসারিত বর্তমান শিলং-পটভূমিতেও ধাক্কা দিয়ে যায়। শিলঙে এসেই শিলং-ইংলণ্ড-কলকাতার ত্রিবেণী সঙ্গম ঘটে। কলকাতাই এর প্রেক্ষাপট এবং কলকাতাতেই তার পরিসমাপ্তি, অথচ কলকাতার গুরুত্ব কেবলমাত্র গল্পটির বাইরের সময়টিকে ধরেই। যেখানে অজস্র কোলাহলে অমিত জড়িয়ে পড়ে রবীন্দ্র বিরোধিতায়। কিংবা গল্পের শেষে যতিশঙ্করের কাছে লাবণ্য ও কেতকীর যে সম্পর্ক সে গড়ে নেয়, সেখানে হয়তো রবীন্দ্রদর্শন এসেও তত্ত্বের আলো ছুঁয়ে যায়। কিন্তু আগাগোড়া শিলং-শহরের প্রাকৃতিক পরিসরে বাইরের এই রবীন্দ্র বিরোধিতা এবং রবীন্দ্র তত্ত্বকে আলাদা করে গল্প থেকে চেনা যায় না, অথচ তা আছে— নেপথ্যে, শিল্পের সন্ধানী দৃষ্টিতে। 'শেষের কবিতা'র সমস্যা-সমাধান প্রভৃতির মোটা দাগের বিষয় 'কলকাতা', 'শিলং'- 'নৈনিতাল'- 'রামগড় পর্বত' শিল্পিত ভাষ্য। অথচ এই পরিসরগুলো 'শেষের কবিতা'য় বর্তমান হলেও তার উপস্থিতি প্রবহমান গতিতে নয়। যদিও ভিন্ন ভিন্ন পরিসর থেকে নানা ব্যক্তি এখানে সম্মিলিত হয়ে তাদের কাঙ্ক্ষিত সময়-সার্থকতা খুঁজে পায়। পাঠকরূপে আমরাও বুঝে নিতে পারি কলকাতা নামক বর্ণিত জগতটি প্রস্তাবনা ও উপসংহার বলেই সময়ের দ্রুততায় গল্পের সামঞ্জস্য রক্ষা মাত্র। মৌলিক উপাখ্যান শিলঙে, সময়ের স্বাভাবিক গতিধর্মে আত্মদর্শন; আত্মনির্মাণ, নৈনিতাল ও রামগড় পর্বতে— অমিত এবং লাবণ্য— দুজনের পক্ষেই।

'শেষের কবিতা'য় কলকাতা-শিলং প্রত্যক্ষ সামঞ্জস্য সূত্রে উপন্যাসে আসে। তাতে অবশ্য রচয়িতার সতর্ক বুদ্ধির দ্বারা সাজিয়ে তোলার পরিকল্পনা আছে। কিন্তু এই প্রয়োগ মূল্যবান হয়ে ওঠে হয়তো রবীন্দ্রনাথের নিজের অগোচরেই। কলকাতার অমিত রায়কে আমরা যেভাবে পাই, সেখানে তার বহু ব্যক্তি-সম্পর্ক ধরেই বোঝা যায়, তার পরিণতি সূত্রে এরা কেউই যুক্ত নয়। সে তুলনায় শিলঙে জনসংযোগ অমিতের সীমিত। তবু তাতে শুধু লাবণ্য নয়, মাসীমা যোগমায়ার ব্যক্তিত্বও যোগ্য ভূমিকাটি পালন করে চলে। অমিত ও লাবণ্য — এদের দুজনের জীবনেই ব্যক্তিত্বের বৈপরীত্যে যে মিলন সেতু গড়ে ওঠে, শিলং পরিসরের সময়-পটটি হয় তাদের সহায়ক। কিন্তু সেইসঙ্গে শিলং পরিসরকে ছাড়িয়েও আরো বড়

হয়ে ওঠে চরিত্রের অন্তরপ্রকৃতি। যেখানে তাদের একাগ্র নিবিষ্ট অভিজ্ঞতার অজানা সত্য অলক্ষ্যেও লেখকের অভিপ্রায়কে ছাড়িয়ে রচনায় গড়ে তোলে এক সর্বত-সামঞ্জস্য।[২৭] যে সামঞ্জস্য অমিত-লাবণ্যের আপাত বিভিন্নতা নিয়েও ভবিষ্যতে বহু শাখার সূচনা ঘটায়।

'যোগাযোগ' উপন্যাসে কুমু-মধুসূদনকে নিয়ে যে বর্তমান গড়া হয়, সময়ের ধীরতা তাতে পরিবেশকে ক্রমেই ভারী করে তোলে, অন্যদিকে 'শেষের কবিতা'য় শিলং পাহাড়ে সময়ের সেই ধীরতাই কত স্বচ্ছভাবে প্রবহমান হতে পারে। মুখশ্রী সন্ধানের এই দুটো কৌশলের মাত্রাটিও কিন্তু যুক্ত থাকে আসলে গোটা কাহিনীর পটভূমিকার উপর। 'যোগাযোগে'র গল্পপরিধি হতে 'শেষের কবিতা' অনেক বর্তমান-সংহত বলেই, ভাষা-চরিত্র-পরিবেশ সমস্তই এখানে বড় বেশি প্রত্যক্ষ সমকালীনতার স্পর্শকে পায়। সমালোচককেও তাই এই শিল্প বিভ্রমে জড়িয়ে গিয়ে বলতে হয়—

"বস্তুতঃ শেষের কবিতাই রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস যার গল্পকাল আর রচনাকাল— তথা কবি-ভাবনাধৃত কাল-চরিত্রে ব্যবধান অল্পই চোখে পড়ে"।[২৮]

'যোগাযোগ' হচ্ছে প্রতিটি কালের সংযুক্তি। গল্পের পরিসর হিসেবে কুমু-মধুসূদন পর্ব এখানে কেবল বিস্তার পায় মাত্র বর্তমানের তাগিদে। আর 'শেষের কবিতা' বড় বেশি একটি বর্তমানেরই কাহিনী। বর্তমানটিকে কেন্দ্রীয় স্তরে আবর্তন ঘটাতে ঘটাতে বিশেষ সম্প্রদায়ে, তাদের বিশেষ সমস্যার মধ্যে মেলে ধরেন ঔপন্যাসিক। 'শেষের কবিতা' তাই গদ্য জগত নিয়ে যতটা ব্যস্ত হয়, তার থেকে অনেক বেশি মীমাংসার পথ খুঁজে নিতে পারে কবিতা দিয়ে। কবিতাকে জীবনের এক অদৃশ্য সঙ্গী করে তোলার মধ্যেও থাকে অনুধাবন শক্তি। সেই শক্তি অমিত-লাবণ্যের আছে বলে তারা তাদের অনেক মুহূর্তকে চিহ্নিত করতে পারে কবিতাতে। কবিতা ধরেই শিলং পাহাড়ের সম্ভাবনাময় খণ্ডজগত তৈরি হয়— তার সূচনা ও সমাপ্তিতেও থাকে কবিতা। কিন্তু নিছক কবিতা বিস্তৃত ভাবের বিকাশকে ধরিয়ে দেয় না বলে সময়ের বহুস্বরিক আবেদন তাতে লভ্য নয়। 'শেষের কবিতা'য় অমিতের জীবনে কবিতা ভাবের অন্তর্লোক থেকে বাস্তবলোকে এসে মেশে। অন্যদিকে বাস্তবলোক থেকে অন্তর্লোকে যাত্রা করে লাবণ্যের কবিতা। কবিতা নয়, উপন্যাস বলেই দু'জনের দু'ধরনের সময় অতিক্রান্তির পূর্ণ জীবনচিত্র আভাসিত হয়। অমিতের পূর্বভাগ তাই ভাবলোকের দ্বারা বিচ্ছিন্ন বলেই নিবারণ চক্রবর্তীর মুখোশ পরে কবিতাতে কেবল ঔদ্ধত্যই দেখায়। আর বস্তুলোক নিয়ে লাবণ্য বড় বেশি আত্মবলয়ে সচেতন থাকে বলে ভাবলোকের অবলম্বনই পায় না। অমিতের জীবনে প্রয়োজন এই বস্তুলোকের খবর জানা, যেখানে তাকে মনে করিয়ে দেওয়া উচিত জীবন কোনো

ভারহীন সময়ের এক ব্যক্তি ভাবলোকের পুতুল ঘর নয়। কেতকীর কেটি হয়ে ওঠারও মূলে অমিতের দায় তাই এড়ানো অসম্ভব। অন্যদিকে লাবণ্যের কেবলমাত্র বস্তুলোকের নীতির প্রশ্নে হতে পারে না মানুষকে বিচার করার যোগ্যতা। শোভনের প্রেমকে সে মান্যতা দেবার অনুপ্রেরণা পায় বাইরের জগত পরিবেশের প্রতিচ্ছায়ায় নয়, অন্তর্লোকে; সময়ের ভারহীন মুক্তিতে— কবিতার হাত ধরে। একজন ভেতর থেকে বাইরে আসার, আরেকজন বাইরে থেকে ভেতরে যাবার এই বহুমুখীতা মুখশ্রীর নানা প্রতিবিম্বে ধরা দেয় - সময় যার অন্যতম সংযোগ সূত্র।

উপন্যাসটি সেদিক দিয়ে শুধু অমিতের নয়, লাবণ্যেরও সময়ের ভেতর দিয়ে নূতন আরেক সময় গঠনের হয়ে ওঠার কাহিনী। আমরা যে অর্থে বিচ্ছেদ এবং মিলনকে বুঝি, তার সংজ্ঞা নির্ধারিত হয় সময়ের খণ্ডমাত্রা ধরে। অথচ মাত্রাটিকে আরো বড় বিস্তৃতিতে নিয়ে যেতে পারলে বোঝা সম্ভব, আপাত বিচ্ছেদ-মিলনের সীমারেখাটি অমূলক। 'চতুরঙ্গে' তাই দামিনী-শ্রীবিলাসের দীর্ঘস্থায়ী দাম্পত্য জীবন সম্ভবপর হয় না, 'ঘরে বাইরে'তে বিমলা-নিখিলেশ পর্ব মিলনের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে চলে— মিলনে এসে পৌঁছায় না, আর 'যোগাযোগে' কুমু-মধুসূদনের দাম্পত্য জীবনের কোনো ছবিই শ্রদ্ধার সঙ্গে চোখে পড়ে না। আপাতধর্মী এই এতগুলো নঞর্থক চিহ্ন আমাদের সরল অনুভবকে পথভ্রষ্ট করে। অথচ কেবলমাত্র সময়কে এখানে বহুমুখীনতায় ছড়িয়ে অনুভবকে আরো গভীর, আরো প্রশস্ত করে তবে এর এক একটি উত্তর মেলে। 'শেষের কবিতা'র ক্ষেত্রেও তাই বলতে হয়— আর এভাবেই হয়তো নিজের কালটি পেরিয়ে রবীন্দ্রনাথ কেবলই ছুঁয়ে যান আমাদের কালকে।[২৯] অন্তত ছুঁয়ে যাবার জন আকাঙ্ক্ষাকে ধরে রাখেন সময়ের ভেতরকার অনাগত জীবনটিকে ছড়িয়ে।

ঔপন্যাসিক কখনোই তাঁর উপন্যাসে তত্ত্বগঠনে উৎসাহী কর্মী নন, যদিও এর সামগ্রিক বিন্যাসের পেছনে চিন্তাবিদ হিসেবে তিনি উপস্থিত থাকেন। চিন্তাবিদ বলেই তাঁর পক্ষে সম্ভব সময়ের সুনিয়ন্ত্রিত স্বভাব ধর্মে উপাখ্যান এবং উপাখ্যানের বাইরে শিল্পের বহুমুখী জীবনস্বচ্ছতাকে প্রকাশ করা, ভেসে যাওয়া নয়। 'শেষের কবিতা'র ক্ষেত্রেও হয়তো অনেক তত্ত্বের আভাস আমরা পাই। কিন্তু মনে রাখতে হয় এই তত্ত্বের উৎকট বহিঃপ্রকাশ বুদ্ধিবাদী জগতেই তো বেশি— আর 'শেষের কবিতা'য় জগত তো সেই বিশেষ শ্রেণীগত স্তরের। ফলে এর মুখশ্রীর সন্ধানে তত্ত্বের উপস্থাপনাই গোষ্ঠীর পরিচিতি। কলকাতার অমিত যে অনর্গল তর্ক করে, তাতে বার বার আসে তত্ত্বগঠন— ঔপন্যাসিকের নয়, চরিত্রের। আবার উপন্যাসের শেষে কেতকী ও লাবণ্যকে নিয়ে যে প্রেমের মিলনতত্ত্ব গড়ে তোলা, সেও সেই অমিতের চরিত্রগত পরিচয়। অমিত তো তার সামাজিক ও ব্যক্তিক মৌলিক পরিচয়

থেকে আলাদা হতে পারে না। দেখতে হয় সেই তত্ত্বকে সে জীবনের অভিজ্ঞতায় সময়ের প্রসাধনে প্রাণবান করে তুলতে পারে কিনা। অমিতের ভেতরে এই গঠন করে তোলার পরিচয় উপন্যাসের আদিতে নেই, শেষেও স্পষ্ট নয়। কারণ বিবাহোত্তর সময় চিত্রের আগেই গল্প শেষ। কিন্তু প্রাণবান প্রকাশ অবশ্য দেখতে পাই শিলঙের পরিবেশে, উপন্যাসের অন্তর্বর্তী কাহিনী প্রবাহে। অমিত এই পরিবেশ ধরেই জীবনকে সময়ের ভেতর দিয়ে দেখে, পরিবর্তিত হয় তত্ত্বভাবনা— একথাই বড়। নিজেকে এই তত্ত্বের আলোকে অমিত না জানলে তার বুদ্ধিবাদী মনের আইডেন্‌টিটিই তো বিনষ্ট হয়। যতিশংকরের সঙ্গে তাই তার সংলাপ নিজেকে শিলঙের সময়-অভিজ্ঞতা থেকে পুনর্বিন্যস্ত হয়ে ওঠার ভিন্নতর বাচন, ডিসকোর্স দিয়ে যা তৈরি। 'শেষের কবিতা'র উপন্যাসের পক্ষে এই তত্ত্ব প্রকাশের কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ তার শৈল্পিক পরিচয় শিলং শহরেই স্পষ্ট। তবু অমিতের জন্য এই তত্ত্ব দিয়ে উপলব্ধিটি জরুরী। কারণ মুখশ্রীর সন্ধান এই পর্বের মূল কথা। পরবর্তী 'দুই বোন' উপন্যাসেও যেখানে তত্ত্বের বাহ্যিক সূত্রপাত ঘটিয়ে জীবনকে সময়ের পটে আলাদাভাবে দেখানো হয়। তত্ত্বের ভেতর থেকে যেখানে মুখশ্রী সন্ধানকে প্রশস্ত করে, সেখানে আবার উপন্যাস সময়ের শিল্পরূপ নিয়ে জীবনের সাবলীল ঘটনায় যুক্ত হতে হতে ভিন্ন চরিত্রের সমাবেশ ঘটায়। মুখশ্রী সন্ধানী বলেই চিন্তাবিদের অন্তর্লোক থেকে সামঞ্জস্য আকাঙ্ক্ষায় তা তত্ত্বের ছবিও আঁকে, আবার জীবনের বিশ্বাস্য পটভূমিরও উপস্থাপনা ঘটায়।

অতএব উপন্যাসের আদিতে যেমন, উপন্যাসের শেষেও তেমনি সময়কে লেখক একের পর এক ঘটনা সংগঠিত হবার মাধ্যমে দ্রুতগতিতে কাহিনী নিঃশেষ করেন। কেতকীর সঙ্গে অমিতের, আর লাবণ্যের সঙ্গে শোভনের বিবাহ-আয়োজনটি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শুনিয়ে দায়বদ্ধতা হতে মুক্তি চান। তাই আলোচক যখন উপন্যাসটি প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন— 'গ্রন্থের শেষে প্রেম ও বিবাহ নিয়ে অমিতের তত্ত্বরচনার প্রয়াস সেই প্রেমের অন্তহীন স্বপ্নস্রোতকে ব্যাহত'[৩০] করে; তখন আমাদের সামান্য আপত্তি এই যুক্তিই দাঁড় করাতে পারে, তত্ত্ব থেকে জীবন সৃষ্টি হয় না সত্য, কিন্তু জীবনের মধ্যে তত্ত্বকে বসার আসন দিলে তার দিব্যদৃষ্টি খুলে যায়। ষোড়শ উপাঙ্গের শেষ অনুচ্ছেদে যে শূন্যের মধ্যে অমিতের অবস্থান, তার নির্দিষ্ট পরিণাম তো চাই; নাহলে লাবণ্য সংযুক্তির আলাদা মাত্রা তৈরি হয় না। আবার সময়ের ভিন্ন প্রেরণায় একটি গোটা মানুষের স্বভাবগত আগাগোড়া পরিবর্তনও অসম্ভব। ফলে তত্ত্বধর্মী অমিতকে উপন্যাসের শেষেও আমরা হারাই না, যদিও পুরাতন অমিতের চঞ্চল প্রকৃতির মানস জগতের অনেক পরিবর্তনও ঘটে যায় সময়-সংসর্গের স্বাভাবিক নিয়মে।

অমিতের এই পরিবর্তন যতিশংকরের সঙ্গে ডিসকোর্সেও ধরা পড়ে। তাই বিবাহের মানে মানুষের সঙ্গে মিশেই সে এবার আবিষ্কার করতে চায়। অথচ কথাটি সে তার তত্ত্ব-স্বভাবগত স্বরেই বলে। কিন্তু কত পার্থক্য এর উপলব্ধিতে! তাই উপন্যাসের প্রথম পর্বে এই অমিত এক জায়গায় কমল হীরের পাথরের চাইতে তার দীপ্তিকে যেখানে বড় করে দেখে শেকড়কে বাদ দিয়ে বৃক্ষের অলীক কল্পনা বৃত্তিকেই প্রাধান্য দেয়, অথচ এবার তার মানুষের পরিচয়কে ধরেই বিবাহের মানে বুঝতে হয়। তাছাড়াও সময়ের তত্ত্ব হয়তো একটি মহৎ উপন্যাস গঠনের সহায়ক নয়, কিন্তু এই তত্ত্ববোধই সময়কে নানামুখী ধারায় বিন্যস্ত করতে পারে বলে উপন্যাস জীবনেরও সর্বব্যাপ্ত মাধ্যম হয়ে ওঠে। সময়ের তদ্গত ধারণার সেই প্রত্নযুগীয় সারল্য নিয়ে কি আজ সম্ভব মুখশ্রীকে এই নানা উপায়ে অনুসন্ধান! ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ তাই তত্ত্ব উপস্থাপক নন্, চিন্তাবিদ। ফলে অমিতকে শেষপর্যন্ত তাত্ত্বিকরূপে রেখে দেবার মধ্যে তাঁর অনেকগুলো ইচ্ছারও প্রকাশ ঘটে। হয়তো এরই সূত্রে সমালোচক প্রমথনাথ বিশীর মন্তব্য চমৎকার ইঙ্গিত দিয়ে যায়—

"শেষের কবিতা প্রকাশের পরে অনেক বৎসর চলিয়া গিয়াছে; ইতিমধ্যে বইখানা বারংবার পড়িয়াছি, কিন্তু কোনো মতামত প্রকাশ করিতে সাহস হয় নাই। এমনই ইহার দীপ্তি যে, আসল বস্তুটি চোখে পড়িতে চায় নাই; এখনও যে দীপ্তি কিছু কমিয়াছে এমন নয়, কিন্তু চোখ অনেকটা অভ্যস্ত হইয়া আসিয়াছে; ফলে Privacy of glorious light'-এর তলে বস্তুটি ধীরে ধীরে চোখে পড়িতেছে — এইবার ভাবিবার সময় আসিয়াছে।"[৩১]

আসলে এ জায়গাটি বুঝে নিতে প্রত্যক্ষত অমিত উপন্যাসটিতে দুটো সাময়িকতা অতিক্রম করে— একটি তার কলকাতার পরিবেশে, অন্যটি শিলঙে। কলকাতার সাময়িক অবস্থান বহু চরিত্রের ভিড়ে দাঁড়িয়ে— অমিত যার কেন্দ্রবিন্দু; কিন্তু সেই সাময়িকতা প্রবহমান বাইরের যুগ পরিবেশটির আশ্রয়ে। ফলে তার ভিত্তিমূল গঠিত রবীন্দ্র সমকালের একটি বিশেষ স্তরে। রবীন্দ্রনাথকে সামনে রেখে রবীন্দ্রোত্তর যুগের কাছে তখন সবচেয়ে বড় বিপদ রবীন্দ্র-আবর্ত থেকে বেরিয়ে আসা। কবি বুদ্ধদেব তাঁর শ্রেণী পরিচয় নির্দিষ্ট করে তাই লিখেন— 'আমাদের পরম ভাগ্যে রবীন্দ্রনাথকে আমরা পেয়েছি, কিন্তু এই মহাকবিকে পাবার জন্য কিছু মূল্যও দিতে হয়েছে',[৩২] ফলে তারই সংশোধন করতে অনিবার্য প্রবল-রবীন্দ্র বিরোধিতা, যার একটি প্রচলিত প্রকাশ অমিত চরিত্র। সেই যুগ পরিবেশে অমিতের পক্ষেও সম্ভব নয় সাময়িকতার হুজুগকে কাটিয়ে ওঠা। তবে সে হল একটি দিক। অন্যদিকে অমিত যে সমকালটিতে রবীন্দ্র বিরোধিতায় যুক্ত, সেখানে মূলত সে রবীন্দ্র বিরোধীই নয়। তার একাকীত্বের শূন্যতাকে মেটাতে যেন এক হুজুগের প্রবাহে পরিসর ধর্মে

কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়া। এই কর্মযজ্ঞের সঙ্গে নিশ্চয়ই গোরার কালটির তুলনা চলে। কারণ গোরাও মানসিক শূন্যতা থেকেই কাজে ব্যাপৃত। অথচ গোরা যে অর্থে অবস্থান স্পষ্ট করে, অমিত তা নয়। তাকে সময়ের ভূমিকা পালন করতে সোচ্চারভাবে বিদ্রোহী সত্তাকে নিবারণ চক্রবর্তী নামে এক কাল্পনিক ব্যক্তির আধারে চালাতে হয়; আড়ালের এই নিরাপত্তা ও নির্ভরশীল প্রবৃত্তি ধরিয়ে দেয় তার দুর্বলতা। আর গোরা থেকে অমিত রায়ে পৌঁছাতে সময়ের যে আত্মদর্শন ঘটে, তাতে ঐতিহাসিক ভাবে বাঙালির পরিচয়কে স্পষ্ট করে তোলে সুনিপুণভাবে। কলকাতার সময় পরিসরের প্রকৃতি পরিবর্তন তাই সহজে অনুধাবন যোগ্য বলে অবস্থানটি অনেকটা এরকম দাঁড়ায়—
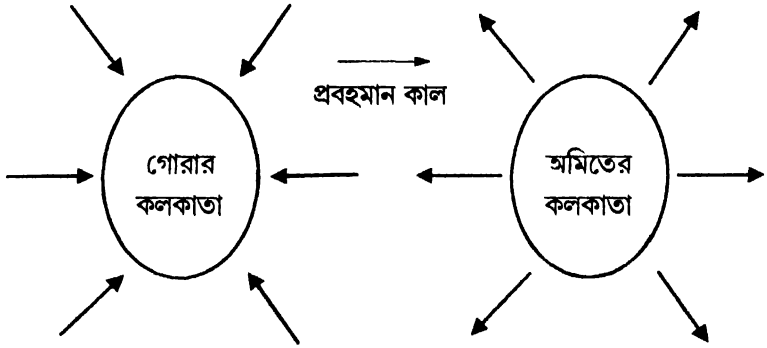
গোরার ক্ষেত্রে কলকাতাই হয়ে ওঠে সময় দিয়ে আত্মদর্শনের পীঠস্থান। আর অমিতকে কলকাতা-সংলগ্ন অবস্থান থেকে নানা মুখশ্রী সন্ধানে আত্মপরিত্রাণের তাগিদে বেরিয়ে আসতে হয় বারবার। ফলে, গোরা যে বৃহত্তর জিজ্ঞাসা নিয়ে দেখা দেয়, তাতে আদর্শবোধ বাঙালির সেই যুগের ছবি, যেখানে সে ডিরোজিও পন্থী, রামমোহনের দলভুক্ত— সমৃদ্ধ কলকাতার পরিসর যার কেন্দ্রস্থল। বাইরের জগতের নানা অন্যায়, নানা অপ্রাপ্তি ধরে এখানে অহরহ ব্যস্ততা। মনের নিভৃত অন্তরলোকের ভেতর আরেকটি জগত তৈরি করে তাতে বিলাসের সূক্ষ্ম উপলব্ধির সময় এখানে নেই। গোরা তাই নিজের জন্য একান্ত ব্যক্তিক বৃত্তে ভাবে না— তার অনুসন্ধানে নিজেকে আড়াল করার প্রতারণাও তাই নেই। অথচ অমিত যে কালের মুখপাত্র, বাঙালির প্রাধান্য তখন সংকুচিত। কি রাজনৈতিক নেতৃত্ব, কি ব্যবসা-বাণিজ্যে বাঙালি তখন সকল দিক দিয়ে সীমিত অবস্থানবর্তী। একদিকে তাই একটি গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে উজ্জ্বল বিস্তীর্ণ কর্মযজ্ঞের অতীত ইতিহাস, অন্যদিকে বিবর্ণ বর্তমান— বিদ্যাসাগর-বিবেকানন্দ ড্রয়িং রুম শোভিত আসবাব মাত্র। সংকীর্ণ অবস্থানে কর্ম

উপাদানের অপ্রতুলতা। ফলে কাজের চেয়ে সময় কাটানো বুদ্ধির বিন্যাসে তাদের ব্যস্ত হওয়াটা স্বাভাবিক। অমিতের তাই অফুরন্ত অবকাশ, অথচ সময়ের দাবিতে বিবর্তন ও প্রগতির সূত্রে মগজের কর্মপদ্ধতি জটিল থেকে জটিলতর রূপে সক্রিয়। অতএব কায়িক শ্রম থেকে বৌদ্ধিক চর্চায় অমিত যুক্ত হয় সহজে।আবার এই বৌদ্ধিক চর্চাও যখন প্রত্যক্ষ কোনো বৃহত্তর আদর্শের উপমা খুঁজে পায় না, তখন তা আত্মনাশের কারণ হয়ে বৌদ্ধিক বিলাসিতায় রূপান্তরিত হয়। অমিত এই যুগসংকটের বলি। যে কারণে তার আত্মানুসন্ধান আত্মদর্শনমুখী নয়, অস্থির। গোরার সোচ্চার এবং নিখিলেশের নীরব কর্মপ্রচেষ্টা সে গ্রহণ করতে না পেরে পথভ্রষ্ট। তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রমাণ করতে বসে কাজ করাটাই এক বর্বরোচিত সংস্কার। কলকাতার সমকালটি কোনোভাবেই গঠনের উপযোগী নয় বলে তাকে কেন্দ্রীয় করে তোলা অসম্ভব হয়ে পড়ে, তাই সেই পরিসর থেকে অমিতকে বেরিয়ে এসে শিলং, নৈনিতালের সন্ধান করতে হয় নিজের আত্মগঠনের আভ্যন্তরীণ সময় ধর্মে।

আর এখানেই ব্যক্তির দুটো আলাদা সামাজিক অবস্থানে নারী-পুরুষের আপাত পৃথক আইডেন্‌টিটিকে রবীন্দ্রনাথ সময় ভাবনার সঙ্গে যুক্ত করেন। ঊনবিংশ শতকে রামমোহন-বিদ্যাসাগরের বিপুল কর্মযজ্ঞে যেখানে অবহেলিত নারীকে ব্যক্তিলোকে টেনে আনার জন্য কর্মযোগী পুরুষশক্তির উদ্যম কাজ করে, বিংশ শতকের মধ্যবর্তী স্তরে সময় বিবর্তনে সেই শক্তি স্তিমিত। কেতকী তাই অমিতের কাছ থেকে বেঁচে থাকার আদর্শ আদায় করে নিতে পারে না। অথচ অতীতে কিছু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন পুরুষদের দ্বারা সামাজিক জীবনে নারীর যে শিক্ষা অর্জন ঘটে, উত্তরোত্তর ব্যক্তিজীবন গড়তে প্রগতির চিহ্ন ধরে তার বিকাশ জরুরী। লাবণ্য যাকে প্রমাণ করার জন্যই আবির্ভূত। ফলে পুরুষ থেকে এতদিনকার তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে থাকা নারী এবার যখন পুরুষের কর্মহীন নিশ্চেষ্টতাকে ভর্ৎসনা করে এগিয়ে আসে, তখন বিবর্তনের পাশাপাশি প্রগতি কোন পথে, বোঝা যায়। যোগমায়ার জীবনেও এই সত্যের রূপান্তর ধরা পড়ে তাঁর শ্বশুরের উদারশীল যুগ এবং স্বামীর কর্মহীন সংকীর্ণ যুগের পাশাপাশি অবস্থানভূমিতে। লাবণ্য পিতা অবনীশ দত্তের সহযোগিতায় শিক্ষার মৌলিক গুণ আত্মস্থ করেও পিতার বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসে। আর্থিক স্বনির্ভরশীলতায় নিজেকে করে তোলে স্বাধীন এবং তখনই তার পক্ষে সম্ভব হয় অমিতের অবদমিত সত্তাটিকে ঐতিহাসিক ভাবে ধরিয়ে দেবার কিংবা প্রতিষ্ঠা ঘটানোর। সময়প্রবাহে এই জগত ধরে এবার ভ্রান্ত ও অথর্ব পুরুষকে গঠন করে মানবলোকে নিয়ে আসার জন্য নারীর ভূমিকাই হয় বড়। অমিতের সংস্পর্শে লাবণ্যের জীবনে তাই যে পরিবর্তন, তার থেকেও আরো অনেক বৃহত্তর পালাবদল অমিতের

জীবনে। লাবণ্যের ক্ষেত্রে শোভনের প্রতি তার ভুল ব্যাখ্যার অতীত ইতিহাস একটি ব্যক্তিজীবনের কথা, কিন্তু কেটিকে কেতকী করে তুলতে অমিতের বর্ণান্তর করে তোলার ইতিবৃত্ত শুধু অমিতের নয়, এ যেন এক সামাজিক ব্যক্তির দ্বারা শ্রেণীর লুপ্ত ইতিহাসকে পুনরুদ্ধার করতে চাওয়া। লাবণ্যের তাই কবিতার মধ্য দিয়ে শেষ চিঠি একটি ব্যক্তির আত্মস্বীকৃতি অর্জন নয়, একটি জাতির মধ্য দিয়ে অন্য জাতিকে গঠনের লক্ষ্যে প্রবুদ্ধ করে তোলা। আর এই উদ্দীপ্তকরণে যুগের ক্রমইতিহাসের নানা ভিড়ে মানসলোককে মথিত করে তোলারও প্রয়োজন। লাবণ্যের 'শেষ চিঠি' নামক কবিতা তাই কালের যাত্রার ধ্বনিকে শুনিয়ে দেবার শিল্পময় তুলির টান। পরিণামে উপন্যাসে নারী পুরুষের আলাদা বিভেদবোধ দূর করে নানা মুখশ্রীর সন্ধানে মসৃণ পথটি গড়ে নেয়। ফলে গতির পথ ধরে সমাধান আসে কারো ব্যক্তিগত স্তরে, কারো ব্যষ্টিগত উপরিতলে। লাবণ্য মুক্তি পায় নীরস বিদ্যাচর্চার জগত থেকে, শোভন কাটিয়ে ওঠে সংকোচ, অবনীশ জ্ঞানের জগত ছাড়িয়ে বিধবার প্রেমে জেগে ওঠেন, কেটির এনামেল করা মুখের উপর অশ্রু গড়ায় এবং সর্বোপরি অমিত খুলে ফেলে এতদিনকার নিবারণ চক্রবর্তীর উদ্ধত মুখোশ।

সামাজিক জীবনে নারীর বিবর্তন ইতিহাসের ক্রমধারায় প্রবল ও বিচিত্র। যে কারণে 'শেষের কবিতা'র লাবণ্যে পৌঁছাতে এক এক করে অনেক পাপড়ি মেলে ধরার অবকাশ থেকে যায়। ফলে যে সময় থেকে নারী তার উত্তরকালটি সোচ্চারভাবে ধরতে আগ্রহী, তাতে বহু বর্ণময় চিত্র উপন্যাসে বার বার নানাদিক দিয়ে ধরা পড়াটা স্বাভাবিক। 'চোখের বালি'র বিধবা বিনোদিনী সংসারকে ছেড়ে যায় সংসারের প্রতি অপরিসীম মমত্বে, আবার 'চতুরঙ্গে'র দামিনী সংসারকে পেতে পুরুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার বাইরে আসতে গিয়েও প্রাথমিক বাঁধা কাটাতে পারে না শিবদাসের পরিবারে। 'ঘরে বাইরে'তে দীর্ঘদিনের অবদমিত মস্তিষ্ক বিমলার মধ্য দিয়ে সহজে সংকীর্ণতার পথ ধরে, পরে আসে অনুতাপ; আর এদের সামগ্রিক যৌগিক ফসল থেকেই সময়ের অভিজ্ঞতা অধিগ্রহণ করেও প্রবহমান সময়ে যুক্ত থেকে ওঠে আসে লাবণ্য। লাবণ্য তাই কোনো একটি কালের বিশিষ্ট প্রতিমা নয়, বহুকালের অভিজ্ঞতা-উত্তীর্ণ কেন্দ্রভূমি। আর এই ভূমিতে পৌঁছাতেও তাকে কোনো একটি Time duration ধরে বিদ্যাবাগীশ, অহংকারী, বলয়সর্বস্ব, লাবণ্য-খোলস থেকেও বেরিয়ে আসতে হয় বন্যার প্রবল তাড়নার মতই। সাহিত্যের জগতে সময়ের ইতিহাসও এ অর্থেই এগিয়ে চলে। অথচ এগিয়ে চলা বলতে জীবনের চাহিদা অনুযায়ী যে ক্রম-উন্নয়নের একটি প্রশ্ন জড়িত, একথা যদি ঔপন্যাসিক বলে না দেন, তবে আর কে বলবে। কেননা সময়ের নৈর্ব্যক্তিকলোকে এই গতির কথা তো

আছে, উন্নয়নের কথা নেই। 'শেষের কবিতা'র মধ্যে তাই মুখশ্রীর সন্ধান উন্নত যুগগঠনের পরিচায়ক, লক্ষ্য মানবায়ন। ব্যক্তিগত আবদ্ধলোক থেকে বেরিয়ে আসা। হয়তো প্রচলিত দৃষ্টিতে বেঁধে রাখা নিম্নবর্গ গণমানসের মধ্য দিয়ে মুক্ত দৃষ্টিতে বিশৃঙ্খল সমাজের পুনর্গঠন।

কিন্তু এই পুনর্গঠনের দায়িত্ববোধে যে একই বর্তমানের পটে নানান চরিত্রে সমতা রক্ষা করে ধরা দেবে সে নিশ্চয়তা জীবনপ্রবাহে নেই। 'শেষের কবিতা'র লাবণ্যের পাশে কেতকীকে তাই অসম্পূর্ণ বলে মনে হয়। উপন্যাসের ফ্ল্যাশব্যাক রীতিতে অত্যন্ত মসৃণভাবে যেখানে কেতকী তার কোটি হয়ে ওঠার অনাকাঙ্ক্ষিত বর্তমানের দায়ভাগকে নিয়ে অমিতকে অপরাধী রূপে নির্দিষ্ট করে, ঠিক একইভাবে অমিতের পরবর্তী সময়ধারায় তার সংলগ্ন হওয়াটিও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বে ভূষিত হয়ে ওঠে না। তার দিক থেকে যোগ্যতার কোনো অভাব না ঘটলেও অনেকটা তাকে নির্ভরশীল হতে হয়। অমিতকে অন্ধভাবে সে যে নির্ভর করে, তাতে তার ভবিষ্যৎ স্বাতন্ত্র্য চিহ্নের দ্বারা সংসার জীবনে প্রগতিমুখী হবে কিনা অনিশ্চিত। উপন্যাসের শেষে কেতকী আর অমিতের মিলনযাত্রার পথে অমিতের পক্ষ থেকেই বর্ণান্তর করার প্রশ্ন আসে। আর অত্যন্ত সহজে কেটি 'একে একে আপন উপরকার রঙিন পাপড়িগুলো খসাতে রাজি, চরমে ফল ধরবে আশা করে।' [৩৩] এক্ষেত্রে বিশ শতকের ক্রমান্বিত-কালের আধুনিক ও দূরদর্শী লাবণ্য যতটা যুগকে এগিয়ে নিয়ে আসে, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও কেতকী তার সমান্তরাল হয় না। আর তাতে বোঝা যায় সমবেত শক্তিতে যুগযাত্রা হলেও যুগপ্রগতির ধারক সকলেই নয়। কেননা একথা অস্বীকার করা যায় না 'সামাজিক বন্ধন ও সংস্কারকে স্বীকার করার প্রবণতা নারীর জীবনে যত তীব্র, কোন দেশের পুরুষের জীবনেই তত তীব্র নয়।' [৩৪]

ফলে লাবণ্যতে এসে সময়ের চলমানতার একটি উত্তুঙ্গ শিখরে উপনীত হতে গিয়েও নানা মুখশ্রীর সন্ধানে কেতকীর সূত্রে জীবন অন্যদিকে বাঁক নেয়। আর এই অনুসন্ধানের পথে বছর চারেক পর 'দুইবোন' নামে রবীন্দ্রনাথকে একটি উপন্যাস লিখতে হয় এবং তার ঠিক এক বছর বাদে সেই সম্বন্ধ গঠনে ওঠে আসে দ্বিতীয় আরেক সৃষ্টি 'মালঞ্চ'। নানা কারণে এই দুটো উপন্যাস সময়ের মুখশ্রী দর্শনকে আরো কেন্দ্রীয় স্তরে নিয়ে যেতে থাকে বলে সংকীর্ণতা ধর্ম এদের আপাত চরিত্র হয়ে ওঠে। যে কারণে 'দুইবোনে'র শুরুতেই লেখক একখানি তত্ত্ব জুড়ে দেন, তারপর গল্পটি বলেন। মনে রাখতে হয় 'শেষের কবিতা'র অমিত রায়কে দিয়ে সীমা অসীমের যে তত্ত্ব উপন্যাসটির সমাপ্তির স্তরে পৌঁছায়, তাতে সে তত্ত্বকল্পনা অমিতেরই চরিত্র লক্ষণ; অথচ 'দুইবোনে'র শুরুতে যে তত্ত্ব, তাকে লেখকের

উদ্দেশ্যই প্রকাশ পায়— শিল্পের পক্ষে যা গ্রহণযোগ্য নয়। তবু একবার ভেবে দেখলে বোঝা যায় নারীকে প্রিয়া ও মায়ের জাত বলে যে আলাদা দুই বিভাগ করা হয়, তা ঔপন্যাসিকের সিদ্ধান্ত নয়— কোনো কোনো পণ্ডিতের মুখে শোনা কথা। অবশ্য এই তত্ত্বসর্বস্বতাকে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসে সময়ের দর্পণে, চরিত্রের আবর্তনে জীবনচিত্র রূপে আঁকেন। শর্মিলা-ঊর্মিমালা-শশাঙ্ককে নিয়ে যে প্রধান বৃত্তটি রচিত হয়, পাশাপাশি নীরদকে আরেক বৃত্তে রেখে লেখক দেখান শুধু নারী নয়, পুরুষ চরিত্রেরও ভিন্নতা। আর নারীর মধ্যে প্রিয়া ও মায়ের প্রতিরূপটিকেই শুধু তত্ত্বের খাতিরে কি হুবহু অনুকরণ করেন রবীন্দ্রনাথ! জীবন নামক সামগ্রিক অস্তিত্ব কি সময় প্রবাহে সাড়া ফেলে না! পণ্ডিতের মানসিক সীমাবদ্ধতা দিয়ে কি আর এই উপন্যাস চলে! তাই তত্ত্ব যাই বলুক, শর্মিলার স্বভাব কেবল স্বামীর প্রতি সর্বত্র মাতৃ আবেগে ধাবিত হয় না, মায়ের স্বভাব ধরে পারে না স্বামীর প্রতি তার ভালোবাসাকে অন্তর থেকে অন্য নারীর সঙ্গে ভাগ করে নিতে। শশাঙ্ক বরং পুরুষ প্রবৃত্তির বহুমুখীনতায় সহজ সমাধানের পথে শর্মিলা ও ঊর্মিমালাকে একটি ঘরের আঙিনায় নিয়ে আসতে চায়— ব্যক্তিস্বার্থ পরিধির দ্বারা যা আবৃত।

শর্মিলা শুধু মায়ের প্রতিরূপ— এই গতানুগতির জীবনের ছককে নিয়েই শশাঙ্ক আসলে পরিশ্রান্ত। শর্মিলার পক্ষেও হয়তো এই বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব হয় না, যদি না অসুস্থতার মাধ্যমে তার কাজের সীমাটির বহির্বিভাগ সংকুচিত থাকে। ঊর্মিমালার উপস্থিতি যে কারণে আসে এবং শশাঙ্কের দিক দিয়ে সময়ের অন্য একটি জগত যেমন খুলে যায়, তেমনি ঈর্ষার আগুনে পুড়ে পুড়ে শর্মিলার জন্যও অপেক্ষা করে অন্য আরেক জগৎ। এখানে সে বুঝতে পারে তার মাতৃসুলভ উদারতা আর কার্যকর নয়, বরং দাম্পত্য জীবনে নিজের বোন হলেও তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশ ও প্রেমের অংশীদার হয়ে ওঠা স্বাভাবিকভাবে মেনে নেওয়াটা কঠিন। এক্ষেত্রে শশাঙ্ক ও শর্মিলার চরিত্রগত সুদূর ঐতিহাসিক সময় সংস্কার যথেষ্ট স্পষ্ট। পুরুষ যেহেতু চিরদিন ব্যক্তিজীবনে বহু নারীর সম্ভোগকে বিধিবিধান দিয়ে সমর্থন যোগায়[৩৫] অথচ নারীর দিক হতে দাবি আসে একনিষ্ঠা— এই বিপরীতধর্মীতায় যে সমস্যা ঘনীভূত, তার থেকে জীবনের ছবি নানা জটিলতায় ভরে ওঠে। শশাঙ্কের পক্ষে শর্মিলা-ঊর্মিমালাকে নিয়ে একই জীবনে ভাগাভাগি করে চলা যত সহজ, শর্মিলার পক্ষে তত মেনে নেওয়া কঠিন। আর তারই ফলরূপে যে যন্ত্রণা দেখা দেয়, যে সমস্যার উৎপত্তি ঘটায়, যে অমূলক সন্দেহেরও জন্ম দেয়, তার যোগ্য প্রমাণটি দেবার জন্য 'দুইবোনে'র সম্প্রসারণ রূপে 'মালঞ্চে'র নীরজার প্রসঙ্গটি আসে।

উপন্যাসের আঙ্গিকগত সময় বৈশিষ্ট্য রূপে ফ্ল্যাশব্যাক রীতির কথা আগে বলা হয়েছে। 'শেষের কবিতা'য় যার নানাভাবে উপস্থাপন ঘটলেও সবচেয়ে তা ভালোভাবে উত্তীর্ণ হয় কেটির মধ্যেই। কেননা লেখক-কথনে ফ্ল্যাশব্যাক রীতি অনেকটা প্রাচীন পদ্ধতি। যে পদ্ধতিতে 'শেষের কবিতা'য় তৃতীয় (পূর্ব ভূমিকা) ও চতুর্থ (লাবণ্য পুরাবৃত্ত) অধ্যায়ে যথাক্রমে যোগমায়া ও লাবণ্যের প্রথম জীবনের কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত। এই বিবৃতির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার উপায় নেই, কিন্তু এই পদ্ধতির উপস্থাপনা আরো বিশ্বস্ত হতে পারে পঞ্চদশ অধ্যায়ের শেষে কেটি আর অমিতকে ঘিরে। জীবনের চলতে থাকা সময় প্রবাহে বাইরের ঘটনাই তো উপন্যাসের পরিণাম সত্য নয়। তাই ফ্ল্যাশব্যাক রীতির সময়সূচক দৃষ্টিকোণ কাহিনীর বিন্যাস ঘটায় হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করেই।[৩৬] 'শেষের কবিতা'য় এই অন্তরজগতে ঢোকার অবকাশ তৈরি হয়ে ওঠার পরিস্থিতি আপাত অর্থে নেই। মনের চৈতন্যে বারবার যে বর্তমান মূল্যায়িত হয় অতীতের সঙ্গে মিলেমিশে— সেই সূক্ষ্মতা ফোটাতে বৃত্ত আরো বিশেষের পথে সংহত হয়। সংহত— যেহেতু, কাছে থেকে আরো বেশি নির্দিষ্ট করে চেনা যায়। 'দুইবোনে'র মধ্যে সেই পরিধি রচনা করে শর্মিলাকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায়, আর 'মালঞ্চে' নীরজার মধ্যে তা সংকীর্ণতার হালকা আবরণে যে জগত তৈরি করে নেয়, তাতে চৈতন্য প্রবাহের পথ ধরে বারবার আসে অতীত আর বর্তমানের সংমিশ্রণ। বস্তুত উপন্যাসটি দাঁড়িয়েই থাকে এই সংমিশ্রিত সময় জটিলতাকে ঘিরেই। 'দুইবোনে' যা করতে চান রবীন্দ্রনাথ, অথচ যার বিশ্বস্ত রূপায়ণ আরো কেন্দ্রীয় স্তরে উপনীত হবার অপেক্ষা রাখে, তা সম্পূর্ণ হয় 'মালঞ্চে' এসে।

সরলভাবে ঘটনাগত দিক দিয়ে 'দুইবোন' এবং 'মালঞ্চে' অনেক ঐক্য আছে, অনৈক্যও আছে। দুটো কাহিনীর বর্তমান প্রধান সমস্যা প্রেম। আর এ সমস্যা ঘনীভূত, ব্যাধিকে আশ্রয় করে। যদিও 'দুইবোনে' এ সমস্যার সমাধান জোর করে চাপানো, কিন্তু 'মালঞ্চে' খুলে রাখা হয় এর পথ।

প্রসঙ্গক্রমে একটা ব্যাপার লক্ষ্যণীয়, সময়ের মাপকাঠিতে মানুষের নিয়ন্ত্রিত অবস্থান এবং নিয়ন্ত্রণ- দক্ষতা উভয়েই দেখা দেয়। সেক্ষেত্রে 'রাজর্ষি' উপন্যাসে গোবিন্দমাণিক্যও দীর্ঘকাল ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে বলিপ্রথা চলে আসা অভ্যাসের অবস্থানকে অস্বীকার করতে পারেন না। কিন্তু এই প্রথা যে অমানবিক এবং অবিলম্বে তাকে বন্ধ করে দেবার আদেশ— এই অবস্থান বিন্দুর পরিবর্তন তাঁর জীবনে ঘটে নিয়ন্ত্রণ দক্ষতায়। গোরার জীবন সম্বন্ধেও সে কথা খাটে, ফলে তার সংকীর্ণ প্রাদেশিকগত সাম্প্রদায়িক বৃত্তের ঘেরাটোপ স্বীকার করে নিয়েও ভেতরে ভেতরে

সে এক সময় সেই সংকীর্ণতা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। তার প্রত্যক্ষ দক্ষতা শেষপর্যন্ত ঘটে যাবার পরই উপন্যাসটির বয়ান সম্পূর্ণ হয়। হয়তো সেভাবে শ্রীবিলাস তার পরিচালিত ও পরিচালক দুটো পথ তৈরি করে শেষেরটি দিয়ে বয়ান গড়তে পারে বলেই দামিনীর আকাঙ্ক্ষা সে অর্জন করে একটি বিস্তীর্ণ সময়পটে, জন্ম জন্মান্তরের ভারতীয় বিশ্বাসের উপর। অথচ বিশ্বায়ন প্রকৃতিতে ঠিক অনুরূপভাবে নিখিলেশও তার মূর্তিকে এই পথেই বিমলার চোখকে স্পষ্ট করতে পারে। সর্বক্ষেত্রে তাই দেখা যায় প্রেরণা, বা প্রতিবন্ধকতার উল্টো আঘাতে একটি বৃত্ত আরেকটি বৃত্তে পরিণত, পবিবর্তিত।

এক্ষেত্রে 'দুইবোন' ও 'মালঞ্চ' উপন্যাস মূলত জটিলতার স্তরে পৌঁছায় শারীরিক ব্যাধি আশ্রয় করে। 'দুইবোনে'র ক্ষেত্রে বৃত্তগত পরিবর্তন সর্বত্র বিশ্বাস্য পটভূমি তৈরি করে না। তাছাড়া শর্মিলার ক্ষেত্রে দৈবযোগে রোগমুক্তির পর শশাঙ্কের সঙ্গে পুনরায় তার সম্মিলন ঘটার মধ্যে যে শুভশেষ, তাতে সংকীর্ণতা থেকে সময় মুক্তির আকাঙ্ক্ষা একটি বড় চিহ্নায়ক হলেও তার তত্ত্বগত এবং জীবনের স্বভাবগত দিক এক ছাচে মেলানো যায় না, যা রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'মধ্যবর্তিনী' গল্পেই অনেক আগে প্রমাণ করেন। ফলে আমাদের বুঝতে হয়, ভাবনার জগতে প্রাকৃতিক কারণে নারীপুরুষের আলাদা পরিচিতি আছে। সেক্ষেত্রে 'দুইবোন' উপন্যাসে ভাবনার অবসান যতই নারীকেন্দ্রিক হোক, আসলে তা পুরুষ ভাবনার মধ্য দিয়েই সমাপ্তি টানে। সেক্ষেত্রে 'মালঞ্চ' একান্তই নারী ভাবনাজাত। আর সমস্ত মিলিয়ে জীবনের রূপান্তর।

বিষয়টিকে একটু বিস্তার ঘটালে দুটো উপন্যাসে চলমানতার ভিন্নতা নজরে পড়ে। 'দুইবোনে'র গতি তাই যে পরিমাণ বহির্ধর্মী, 'মালঞ্চ' সেই পরিমাণে অন্তরধর্মী। যদি নারী-পুরুষের কথা নাও ওঠে, তবু দুটো ব্যক্তির ভিন্নধর্মীতায় উপন্যাস দুটোর মুখশ্রীর সন্ধান চলে তাদের চারিত্রিক বিন্যাসে। ফলে যদি সেই সূক্ষ্ম বিচারের পথে যাওয়া হয়, তবে 'দুইবোনে'র সময় পরিচালক— শশাঙ্ক, 'মালঞ্চে'— নীরজা। 'দুইবোনে' শর্মিলা একান্তভাবে শশাঙ্ক-সংলগ্ন। শশাঙ্কের উপর তার কর্তৃত্ব আসলে বারে বারে নিজেকে সেখানে সমর্পণ করে রাখা—বিচার এবং বিবেচনা বাদ দিয়ে। কিন্তু অসুস্থতার একটি সাময়িক ধাক্কাকে কেন্দ্র করে যেখানে তার পরিবারে ছোটবোন উর্মিমালার আগমন ঘটে, সেখানে তার প্রতি শশাঙ্কের প্রীতি ও দুর্বলতা শর্মিলার চোখে একটি বৃত্তগত পরিবর্তনের ধারা। এর আগেও শর্মিলার ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত হয় না, তা নয়। শশাঙ্ককে চাকরী ছেড়ে দিতে ও কনট্রাকটের ব্যবসায়ে প্রাণিত করতে চাওয়া এবং করতে পারার মধ্যে তার ভূমিকা

গভীর। কিন্তু ব্যবসার জন্য শর্মিলার কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ নারীর কাছে পুরুষের সংস্কারগত অভিমান। আর সে অভিমানকে জয়ী করতেই শশাঙ্ক ব্যবসার কাজে সময়কে দ্রুত ব্যবহার করে। জীবন যে কাজ এবং ছুটিতে মিলে মিশে সময়ের নানা বিন্যাসে কখনো অধিকৃত, কখনো সম্প্রসারিত, কখনো অবকাশ-স্থৈর্য্যে বহমান হতে পারে,— তাকে ছাড়িয়ে বড় হয় আত্মমর্যাদা। সেই মর্যাদা তার বড় বলে উপন্যাসের শেষেও শুভ শেষটির পরিকল্পনাও থাকে তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে। তাই গোটা উপন্যাসে যে কয়েকটি চরিত্র সংযোজিত, তাদের নির্দিষ্ট বুনিয়াদ গড়ে ওঠে না। ঊর্মিমালাকে কোথাও যথেষ্ট গভীরতার স্তরে ভাবা যায় না, নীরদ তার আধিপত্যবাদী ভাবনায় শৃঙ্খলাহীন চলনে অভ্যস্ত, শর্মিলা ব্যক্তিত্বময়ী হয়েও শশাঙ্ক অনুগৃহীত। এক্ষেত্রে শশাঙ্ক প্রসঙ্গে সময়ের ভাবনায় দেখা দেয় পুরুষের বহু ব্যাপক সত্তা, যেখানে বারবার ঘরের সীমানা ছাড়িয়ে নির্মমভাবে ছিন্ন করে নারীর কোমল বাহুবন্ধন। কিন্তু এই পরিচয়ে তার সার্থকতা আসতে পারে না। কেননা, জীবনের পাঠ যেখানে প্রগতির সূত্রে সম্পূর্ণ হতে চায়, সেখানে গোরার বৃহত্তর বৃত্তকল্পনা সুচরিতাকে ছাড়িয়ে হয় না, শ্রীবিলাস তার বয়ান শেষ করতে পারে দামিনীর মান্যতায়, নিখিলেশের বিশ্বাসের জগত ও আবর্তন গড়ে ওঠে বিমলা-সংযুক্তিতে, আর অমিত একটি বিশেষ অস্বস্তিকর অবস্থান থেকে পরিত্রাণ পায় লাবণ্য-সান্নিধ্যে। অথচ এতগুলো উদাহরণের পর 'দুইবোন' উপন্যাসে সময়ের পালে এখানে ব্যক্তির সংযুক্তি কেবল সংলগ্ন অর্থে কি করে যুক্ত হয় ভাবতে গিয়ে বুঝতে হয়, আসলে শর্মিলার বয়ান এখানে শর্মিলারই নয়, শশাঙ্কের। সেদিক দিয়ে 'মালঞ্চ' নীরজারই ব্যক্তি ইতিহাস।

তবু উপন্যাসের দায়বদ্ধতা যেখানে ব্যাপক, সেখানে এর সংহতি এক আপাত সময় কৌশল মাত্র। মানুষকে আত্মজিজ্ঞাসার মুখোমুখি হতে নিবিড় সীমাচৈতন্যে মিলিয়ে নিতে নিতে এগিয়ে চলতে হয়। গড়ে ওঠে তার নির্মিতিকরণে পরিষ্কার ইতিহাস চেতনা, আর মর্মে থাকে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান। রবীন্দ্রনাথ সেই নির্মাণ আর মর্মকে দেশ-কালে বিস্তৃত করে জীবনের সঞ্চার ঘটান, আর সমালোচক এই প্রগতি ছুঁয়েই উল্লেখ করেন—

"নিজেকে অস্বীকার করে তাঁর এই উভমুখী আত্মবিস্তার যখন প্রকাশেরও সংহতি পায় কখনো, যখন স্পেণ্ডারের ভাষায় দেখা দেয় এক vision of the whole situation তখনই তাঁর মধ্যে নিশ্চিত এক আধুনিকতার মুখশ্রী দেখতে পাই আমরা।"[৩৭]

ফলে জীবনের সংযুক্ত বৃত্ত মর্মের সঙ্গে তুলে ধরতে 'দুইবোন' ও 'মালঞ্চে' ঔপন্যাসিক অবহেলা করতে পরেন না তাকে ধারণ করে থাকা ইতিহাসের ভাসমান

সময়পুঞ্জকে। 'দুইবোনে' শর্মিলার পিতা রাজারামবাবুকে ধরে অতীতের প্রেক্ষাপট থেকে কাহিনীর এক আলাদা সহায়ক ভূমিকার সীমারেখা তৈরি হয়। যেখানে উনিশ শতকের শিক্ষিত-মার্জিত যুক্তিবাদী-নাগরিক ব্যক্তির পরিচয় স্পষ্ট, আর এই ব্যক্তিকে ধরেই তার সামাজিক অবস্থান।

বর্তমানের একটি উপাখ্যান ধরে উনবিংশ শতকের উপস্থাপনা এক্ষেত্রে অযৌক্তিক নয়। শুধু শর্মিলার পিতার পরিচয় দিয়ে উপাখ্যান বৃদ্ধি নয়, বুঝতে হয় এই শতকের তাৎপর্য। ফলে মধ্যযুগ থেকে উনবিংশ শতক, আধুনিকতার স্তর উপনীত হয় নানাদিক ধরেই, যার অন্যতম সূত্র বহু সীমাবদ্ধতা থেকে প্রসারণশীল হওয়া। যদিও সামন্ততন্ত্রের দ্বারা আধিপত্য বিস্তার এই শতকেও বহমান। তবু জমিদার প্রথায় দেশের শাসনব্যবস্থা এবং আর্থিক ব্যবস্থাকে নানা ভাবে বিভাজন করে রাখলেও একটা ঐক্যের প্রভাব লক্ষিত হতে থাকে।[৩৮] সে ঐক্য কিভাবে ধরা দিতে থাকে, জমিদার হয়েও রাজারামের সুরুচির মধ্যে তার প্রকাশ ঘটে। তাই তিনি অনুভব করতে পারেন জমিদারী মেজাজ নিয়ে চিরাচরিত সময়-সংস্কারবশত কন্যার জামাতা-নির্বাচন অন্য কোনো ভূসম্পত্তি অধিকারীর উত্তরসূরী হিসেবে হতে পারে না, হতে পারে পাত্রেব ব্যক্তি ক্ষমতার গুণে। তাই তাঁর জামাতা শশাঙ্ক পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত অর্থের উত্তরাধিকারী নয়; শিবপুরে পাশ করা ইন্‌জিনিয়ার। আধুনিক মানসিকতায় এভাবে ব্যক্তির কর্মময় ভূমিকা এবং বিজ্ঞানের জগত যে বড় হয়ে ওঠে, একথা ভোলার উপায় নেই। অন্যদিকে তাই ছোট মেয়ে উর্মিমালাকে অবাধে ডাক্তারী শেখাতে ও পুত্র হেমন্তের স্মৃতিতে গঠিত হাসপাতালের রোগীর সেবায় তাকে নিয়োজিত করতে চাওয়ায় জমিদাররূপ রাজারামের প্রসারিত মাত্রার মানবিক ভূমিকা লক্ষ্যণীয়।

অবশ্য রাজারামকে যে অর্থে সেকাল এবং একালের দুটো পর্বে ছড়িয়ে রাখা হয়; তাতে স্পষ্ট নির্দিষ্টকরণ না থাকলেও[৩৯] আমাদের বুঝতে হয় প্রত্যেক আধুনিক মনন এবং প্রগতিশীল ব্যক্তির ক্ষেত্রেই থাকে যুগসন্ধিজাত সংগ্রাম। কারণ ইতিহাসে কালের সমান্তরাল প্রবাহে তিনিই প্রগতির উচ্চশীর্ষ স্পর্শ করেন, ব্যক্তির প্রচেষ্টায় ঘটে ব্যক্তির মুক্তি। ফলে এই শক্তির প্রকাশে বার বার নানা সংস্কারের ভিড় পথকে অবরুদ্ধ করে। অথচ পথকে উন্মুক্ত করে তোলাই হয় তার ধর্ম। রাজারাম বার বার তাঁর সংস্কারের বেড়ি ভেঙে ভেঙে এগোন সত্য, তবু নূতন যুগকে আহ্বান করতে গিয়ে কোথাও একটি স্থানে সংস্কারকে তিনি পূর্ণত কাটিয়ে ওঠেন না বলেই তাঁর ইংরেজ ডাক্তারের প্রতি অন্ধভক্তির কারণে প্রিয়তম পুত্রের মৃত্যু পর্যন্ত দেখতে হয়। তারপর যুক্তিবুদ্ধিতে চলা মানুষটির মধ্যে আবেগের ভেতর দিয়ে প্রমাণ ছাড়াই

নীরদ ভালবাসার পাত্র হয়ে ওঠে এবং স্বার্থপর বুদ্ধিসর্বস্ব ছেলেটিকে তিনি কনিষ্ঠা কন্যা উর্মিমালার জামাতা রূপেও কল্পনা করে নেন। আর এভাবেই হয়তো প্রমাণিত হয় সামন্ত্রতান্ত্রিক সমকালের সীমাবদ্ধতা।

তাই উপখ্যানে রাজারামের মৃত্যুর পর উর্মিমালার জীবন স্বাভাবিক চলন ধর্মীতা ছেড়ে নীরদের পরিকল্পিত উপাদান হয়ে ওঠে। যে আধুনিক বিজ্ঞানের সহায়তায় মুক্ত জীবনে মানুষকে পরিশীলিত প্রসারিত করে তোলার প্রবণতা থাকে, ভেতরে ভেতরে আদিম আধিপত্য মানসিকতাও প্রবেশের পথ গড়ে নেয়। নীরদ তাই আধিপত্যবাদী, অনুভূতিশূন্য এবং আত্মবলয়িত। উর্মিমালাকে সে গঠন করতে চায় বিজ্ঞানের মাপকাঠিতে, নিজের চোখে। অথচ মানুষকে গঠন করতে যে সহমর্মিতার প্রয়োজন, নীরদের জীবনে তা নেই। শশাঙ্কের দিক দিয়েও অনুভূতি কার্যকরী নয় স্ত্রী শর্মিলার কাছে অতি লালনে তার জীবন অবরুদ্ধ বলে। ফলে যে অর্থে উর্মিমালা ও শশাঙ্কের 'বর্তমান' নির্দিষ্ট হয়, তাতে মুখশ্রী দর্শন নেই। সেই মুখশ্রী দর্শন ঘটে পরস্পর পরস্পরের সান্নিধ্যে। উর্মিমালা তার স্বাভাবিক জীবনকে খুঁজে পায়, আর শশাঙ্ক কাজের মধ্য দিয়ে যে একটি মাত্র সময়ের সাধনা করে, তাতে পরিত্রাণের লক্ষ্য ভেদ করে জীবনের রঙ ঘনীভূত হয়ে ওঠে।

জীবনের ঐকতান ঘটাতে সময় ও পরিসরের ভূমিকা কতটুকু ইঙ্গিত করে যায়, সে কথা শিল্পজগত বার বার ঘোষণা করে। ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে মানুষের স্বাধীন বিচরণ ক্ষেত্র গড়ে তোলার দায়ভাগ ওই মানুষের হাতেই। অথচ এই স্বাধীনতাই বার বার অবহেলিত থাকে। তাই নীরদকে ধরে উর্মির চোখে বদ্ধ স্মৃতি তাকে যথার্থ পথ নির্দেশ করে না। অন্যদিকে শশাঙ্ক শর্মিলার কাছ থেকে আপাত ভাবে হয়তো সরে আসার জন্য কাজের পথটাকেই বড় করে ধরে, তবু এই কাজের পথেই সে দিশে হারায়, অভ্যাসের ঝোঁক এসে ভর করে। জীবনটা যে কাজ এবং ছুটির ভিন্নমাত্রিক সময় ধর্মে ভাগাভাগি করে উপভোগ—এই বোধ শশাঙ্কের হয় না। কিন্তু উর্মিমালার সান্নিধ্যে তার অন্তরজগত খুলে যায়, রচিত হয় অন্য এক সমকাল— তাতে যে অনুরাগ এতদিন প্রচলিত প্রথার আচ্ছাদনে ঢাকা, তাতে তার নবজাগ্রত পৌরুষের আচ্ছাদন সে ছিঁড়ে ফেলতে পারে।[৪০] উভয়ের জন্য উভয়ের ব্যাকুলতা নয়, পরিস্থিতি জাত বর্তমান সংকট থেকেই এই দুই ব্যক্তি দু'দিক ধরে পথ সন্ধান করে। তাই উর্মিমালার সঙ্গে শশাঙ্কের মেলবন্ধনও পূর্ণাঙ্গ গঠনমুখী হয় না। উর্মিমালা নীরদ-বন্ধনকে এড়াতে পারে না, আর শশাঙ্ক তার কর্মক্ষেত্রে বিপর্যয় ডেকে নিয়ে আসে। উপন্যাসের শেষে এই পর্বকে তাই ভেঙে দেন রবীন্দ্রনাথ। তার কারণ, সময়ের ছোট ছোট সম্প্রসারণ, প্রলম্বিতকরণ এবং

সংক্ষিপ্তকরণে যে চরিত্রের আত্ম-আবিষ্কার প্রয়াস লক্ষণীয়, ঔপন্যাসিক তার ছবি দেখাতে চান। কিন্তু সেই সঙ্গে সামগ্রিক এক ভূমিস্তর থেকে তাকে বিচার এবং বিশ্লেষণ গড়ে তোলারও তাঁর দায় থাকে। এদিক দিয়ে শর্মিলার জগতকে তো অস্বীকার করা যায় না। ফলে উপন্যাসের অন্তিমে শর্মিলার ব্যাধি মুক্তির মাধ্যমে সমাধানের পথ তিনি খুঁজে নেন্। তাই একদিকে ঊর্মিমালা আর অন্যদিকে শর্মিলাকে নিয়ে যে দ্বন্দ্ব ভাবনা মধ্যবিত্ত মানসিকতায়, একটি সীমায়িত পরিধিতে শশাঙ্কের মনে দাঁনা বাঁধে, তাতে সময়ের অবলেপনে উত্থানপতনের নানা পরিবর্তন ধরা দেয়। ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এই অবস্থান বিন্দু থেকে শশাঙ্ক জ্বালিয়ে নেয় মনের বাতি, আর এখানেই সে ভবিষ্যৎ সময়টিকে নির্দিষ্ট করতে অতীতের সম্পর্ক সূত্রে বলে—'যা ডুবিয়েছি আবার তাকে টেনে তুলবই এই রইল কথা, শুনে রাখো।'[৪১] আর ঊর্মিমালাকে নিয়ে যে স্মৃতিজগত উপন্যাসটিকে দ্বন্দ্বমুখর করে তুলতে পারতো তা নিজ থেকেই দূর অবস্থানে সময়ের কথা ঘোষণা করে জানায়— বর্তমানের ভাঙাচোরার ইতিহাস কালের হাত ধরেই নিজে থেকেই জোড়া লাগবে। তবু কালের হাতে এ রকম সহজ মীমাংসার প্রত্যয় কি বাস্তবে সম্ভব! উত্তরে 'দুইবোন' উপন্যাসে ঊর্মিমালার চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে শর্মিলা ও শশাঙ্কের মন জানবার উপায় নেই। হয়তো এই অতৃপ্তিবোধকে বাস্তবতার পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে 'মালঞ্চ' উপযুক্ত দিশারী হয়ে ওঠে।

বিশ শতকের একটি সূক্ষ্ম আধুনিক রীতি হল চেতনা প্রবাহের ব্যবহার। একে ব্যাখ্যা করে বলা হয়—

"A technique used by novelists to represent a character's thoughts and sense impressions without syntax or logical sequence....stream of conciousness becomes important as a technique with the rise of modernism in the 20th century".[৪২]

এই চেতনা প্রবাহের সফল রূপকার— জয়েস, রিচার্ডসন, উল্‌ফ প্রমুখ। কিন্তু কেন তাঁরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই রীতি গ্রহণে এগিয়ে এলেন, তার কারণ অনুসন্ধানে দেখা যায়, অবিচ্ছিন্ন সময় ধারার মধ্যে নিহিত থেকেও খণ্ড সময়ের স্থান বদলের ভূমিকা বার বার মানুষকে বর্তমান সচেতন করে তোলে। প্রবল শক্তিধর পরিস্থিতির প্রবাহে প্রতিকূলতা ধরেও মানুষ বাঁচতে চায়। তাই তার কাছে বর্তমান যতই সংকীর্ণ, যতই ব্যর্থ হোক, তাকে স্মৃতির চেতনা প্রবাহে উজ্জ্বল দিনগুলোতে নিয়ে যায়। মানুষ যে বহমান ইতিহাসের ক্রীড়নক হতে চায় না, তাকে আপন গতিতে চারদিক ধরে গড়তে চায় এই অবস্থানটি বুঝিয়ে দেবার জন্য শুধু ফ্ল্যাশব্যাক পদ্ধতির পুরাতন অনুবর্তন চলতে পারে না। চেতনা প্রবাহের ধারা এক্ষেত্রে তাই

সময় জগতে গুরুত্বপূর্ণ। বিশ শতকের জটিল বর্তমান ধরে তাই ফুলের বাগানের পবিত্র সত্যেও এসে প্রবেশ করে সন্দেহ—'মালঞ্চ' নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে এমনি করেই ভাবতে হয়। উপন্যাসটিতে কোনো চরিত্রকেই নঞর্থক ভাববার কারণ নেই, বরং অদৃশ্যভাবে কালের কূটিলতাই পরিচালিত করে এর উপাখ্যান। তবু ওই সময়ের চেতনা প্রবাহের সূত্রেই নীরজা অতীত স্মৃতি থেকে অনুসন্ধান করে ফেরে আত্ম মুখশ্রী।

'মালঞ্চ' উপন্যাসের 'বর্তমান' তাই থেমে যাওয়া একটি চিত্র। মানুষের ব্যক্তিচৈতন্য, আর বাইরের জগত— একে অপরের সম্পর্কহীনতায় অসহ্য হয়ে ওঠে। তাই নীরজা যে বৃত্তের মধ্যে সংকুচিত হতে হতে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়, সেখানে বাইরের সময় উন্নাসিক দৃষ্টিতে অসহযোগী হয়ে এগিয়ে চলে। উপন্যাসের সূচনায় এই নির্মম চিত্র বারবারই বলে দিতে থাকে ব্যক্তি কতটুকু একা। অথচ এই একাকীত্বের জন্য আদিত্য দায়ী নয়, দায়ী নয় সরলা। দায়ী এই ব্যাধি জর্জরিত প্রচলিত সমকাল। যে সমকাল শুধু নীরজাকেই একা এবং পঙ্গু করে তোলে না, আদিত্যকেও করে শূন্য। আর শূন্যতা থেকেই আদিত্য আবিষ্কার করে সরলার প্রতি তার অবদমিত ভালবাসা।

স্বভাবতই মানুষ জীবনের শম্বুক গতিতে অভ্যাসের দাসত্বে চলতে গিয়েও তার দুর্গে বার বার ফাটলের সৃষ্টি করে। তাই সমাজের ভাঙাগড়ার প্রবল রূপান্তরে সে সন্ধান করে বেড়ায় আত্মনির্ভরতা। সময় এই নির্ভরতাকে বাড়িয়ে তোলে, আর ক্রমশ ব্যক্তি তার অপরতার সান্নিধ্য থেকে খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে জীবনের বীজে এসে প্রবেশ করে, যেখানে সে রেখে যায় আগামী দিনের সম্প্রসারিত অবস্থান— ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। নীরজা ও আদিত্যের দশ বছরের সুখী দাম্পত্য জীবনে পরস্পর আদানপ্রদানের স্বচ্ছ রেখাটি কোনো বিমূর্ত রেখায় সংস্থাপিত নয়, ফুল গাছের পরিচর্যার পেছনে তাদের যৌথ আবেদনও কার্যকর। উত্তরোত্তর সেই গড়ে তোলা সৃষ্টিশীল সময়স্তর তাদের বন্ধনকে করে তোলে দৃঢ়-সংহত।

কিন্তু বারে বারেই দেখা গেছে মানুষ জীবনের সন্নিধানে যে ভাবে গড়তে চায় তার একান্ত ভুবন, সেখানে বাঁধা-বিপত্তির ধাক্কা এসেও ছিন্ন করে দিয়ে যায় সংযোগ। 'মালঞ্চে' নীরজার জন্য যদি আমাদের দুঃখ হয়, তবে সেই দুঃখের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীরূপে যুক্ত থাকে আদিত্য। নীরজার ভিতর থেকে আদিত্যকে আলাদা করার উপায় নেই। তাই মৃত সন্তানের মাতৃত্বে চিরব্যাধিতে কবলিত নীরজার পাশে আদিত্য ভুলে যায় না তার ভালবাসা, অবহেলার চোখ নিয়ে সংকীর্ণ করে তোলে না তাদের একটু একটু করে গড়ে তোলা দশটি বছরের দাম্পত্যের সমকাল-বিগ্রহ। অথচ এই যোগাযোগের সেতু যখন উভয়ের দিক দিয়ে ভেঙে পড়তে শুরু করে, তখনই

নীরজার দিক দিয়ে পরিসর ক্রমে হয়ে আসে ছোট, আর সেই সূত্রে সময়ের সংকীর্ণতাও ধরা দেয়। ঠিক এ জায়গায় আদিত্যের কাছে নীরজার 'বর্তমান' আত্ম আবিষ্কারে প্রতিকূল হয়ে ওঠে। তাদের স্বামী-স্ত্রীতে মিলে যে মালঞ্চ গড়ে তোলা, তারই স্রোত ব্যাহত হয় নীরজার সরলা-সন্দেহে। আর এর সংকীর্ণ অবস্থান থেকে মুক্তির জন্য আদিত্য যখন আশ্রয় খোঁজে, তখন দেখে তাদের দশ বছরের সময়-পরিসরের নেপথ্যে আরো বিপুল তেইশ বছরের ইতিহাস লুকিয়ে আছে সরলাকে নিয়ে। সম্পর্ক এখানে একজনের সঙ্গে আরেকজনের কি হচ্ছে বড় নয়, বড় এই সম্মিলিত হতে চাওয়া। হতে চাওয়া কোনো এক নির্মাণকে আশ্রয় করে। হয়তো আমাদের প্রচলিত সামাজিকতায় অসুস্থ স্ত্রীকে রেখে আদিত্যের সরলা-সান্নিধ্য অযৌক্তিক ঠেকে। তবু এই সংকীর্ণতা থেকে পরিত্রাণ পিপাসাকে নীতিতত্ত্ব দিয়ে অস্বীকার করার উপায় নেই। এখানে লক্ষ্য করতে হয়, ব্যক্তি নীরজার প্রতি আদিত্যের অবহেলা নেই, অবহেলা তার মিথ্যা সন্দেহে। যে সন্দেহ নীরজা বহন করে তার সীমিত হয়ে আসা বর্তমানটিকে ঘিরে। এই বর্তমান থেকে আদিত্য মুক্ত নয় বলে সেও হয়তো হয়ে পড়ে স্বার্থপর। অন্যদিকে নীরজার অকপট আত্মনিবেদন যে যুগে সমগ্রকে নিয়ে সম্পূর্ণ, প্রবাহ ধারায় সেই সমগ্রতা ভবিষ্যৎ শূন্য হয়ে খণ্ডকে নিয়ে তুষ্ট হতে বাধ্য। আর এখানেই বেঁচে থাকার তীব্র তাগিদ থেকেই নীরজার সংগ্রাম— এই সংগ্রামেরই প্রতিক্রিয়া হল সন্দেহ-সংশয়।

মনে রাখতে হয় এই অবস্থান 'চোখের বালি'র মহেন্দ্রের মত আত্মবলয়িত ব্যক্তিত্বের নয়। কারণ নীরজার চারিত্রিক পরিচয়ের সমকাল-অবস্থান পরিস্থিতিজাত, স্বভাবগত নয়। নীরজা তাই বার বার আত্মধিক্কারে সচেতন হয়ে ওঠে। অন্যদিকে মহেন্দ্রের অবস্থানটি সেই রকম, যখন ব্যক্তি জানে না জীবনকে নির্মাণ করবার শক্তি— অন্ধ তার চোখ, নিষ্ক্রিয় মস্তিষ্ক। আর নীরজা সেই জগতের, যে জীবনকে গড়তে গড়তে ক্রমান্বিত সময়ের অভিঘাতে অকস্মাৎ ছিন্ন হয়ে পড়ে। প্রবল অনুভূতি নিয়ে সে পাওয়া না-পাওয়ার দুটো ক্ষেত্রকে চিনে নেয়। যেখানে আজকের যুগ প্রকৃতিও তো অনেকটা তাই। ফলে জ্ঞান বিজ্ঞানের এতদূর অগ্রগতিতেও মানুষ মনের মতন সর্বমঙ্গলের একটি জগত গড়ে তুলতে পারে না। পুরোনো যুগকে হটিয়ে আমরা প্রতিদিনই নূতন সংযোগ গড়ে তুলি। অথচ তার বাহ্যিক বিস্তৃতি ছাড়িয়ে মানবিক প্রসারতার প্রয়োজন আন্তরিকভাবে অনুভব করি না। ফলে বার বার আজকের এই উন্নত পরিসেবার যুগেও ফিরে ফিরে মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ববোধ, প্রেমের বাণী শোনাতে হয় আলাদাভাবে। বোঝাতে হয়, এই উন্নত যুগের উন্নতি নির্ভরশীল মানুষের আত্মিক সংযুক্তিতে। অথচ আত্মবলয়ে সীমিত হয়ে পড়ার জন্য কোনো

পাঠশিক্ষার প্রয়োজন নেই, অহরহ আদিমতা থেকে তা আমাদের প্রলুব্ধ করতে থাকে। তাই বারবার আমরা প্রগতিবাদী, বারবার আমরা ব্যাধি জর্জরিত। একদিন পশ্চিমী ব্যক্তিবাদ, যুক্তিবাদ, উদার নৈতিক বলিষ্ঠতায় যে সামাজিক ভিত্তি বাংলাদেশে গড়ে ওঠে, কালে কালে তা সরল নিয়মে অপশাসন থেকে মুক্ত হয়ে আজকের এই একবিংশ শতকের গোড়ায় এসে তো স্বচ্ছ একটি রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে। কিন্তু পরিণামে ক্ষুদ্র রাজনৈতিক মত্ততা, ধর্মীয় মৌলবাদ, সন্ত্রাসবাদ আজ যে গোটা পৃথিবীতে কৌলীন্য নিয়ে বর্তমান, তার নানা অপদেবতার ছবি দেখা দিলেও এদের মধ্যে অন্তর্নিহিত হয়ে থাকে আধিপত্যবাদ। উপন্যাস জীবনটাকে এই ছোট্ট পরিধিতে চাই সীমিত করে দেখায় না, দেখাতে পারে না। ফলে নীরজা যখন সরলাকে ধরে আদিত্যকে সন্দেহ করে, তখন মানুষের এই পরিমিত বর্তমানের সীমানা নির্দিষ্ট হয় সত্য, কিন্তু সেই সঙ্গে সে যখন ঘোষণা করে 'সে আমি নয়, কোনো অপদেবতা'।[৪৩] আর তখন এই নিগড়-মুক্ত মানবিক উচ্চরণের আভাস ফুটে ওঠে। এতএব একদিকে সংকীর্ণতা এবং তার পূর্ব এবং উত্তর যুগের বিবৃতি, আর এ নিয়ে নানা যৌগিক অবতলে পরিবর্তনশীল সমাজের ছবি— রবীন্দ্রনাথ অনুপ্রাণিত সংস্কারক রূপে নয়, অভিমানী অথবা নীতির কর্তারূপেও নয়, ঔপন্যাসিক রূপে একান্ত শিল্পের টানে বলে যান। নানা মাত্রায় তার উচ্চারণ ধরা পড়ে বলে যেমন আদিত্য, তেমনি নীরজা দ্বিপাক্ষিক আবেদন নিয়ে ধরা দেয়। ফলে উভয়ের দিক দিয়েই চেতনা প্রবাহের সূত্রে সময় বদলের দিকটি বার বার ঘুরে ফিরে আসে। কি ছিলাম, কি পেলাম,— কি পেলাম, কি ছিলাম—সময়ের এই ধ্রুবপদ নিয়েই সম্পূর্ণ হতে পারে 'মালঞ্চ'। অতীতের সঙ্গে বর্তমান, আর বর্তমানের সঙ্গে অতীত যোগসূত্র রচনা করে করে নীরজার এক সফল প্রতিকৃতি তৈরি হয়, সময় দিয়েই যাকে ধরা যায় কেবল। লক্ষণীয় এই ছবি—[৪৪]

১)'.....আনন্দময় ক্লান্তিতে হত দিনের অবসান।'

২)'আজকালকার দুর্বল শরীরটা ওর অপরিচিত,.....।'

৩)'বাজল দুপুরের ঘণ্টা।'

৪) 'ছায়াহীন রৌদ্রে শূন্যতার পরে শূন্যতার অনুবৃত্তি।'

প্রথমটিতে অতীতের উজ্জ্বল স্মৃতি, প্রবলভাবে সমকাল ব্যাপ্তি; দ্বিতীয়টি অনিশ্চিত বর্তমান, ব্যাধিজর্জর সংকীর্ণ কর্মহীন জীবন যেখানে পরিচয়হীন; তৃতীয়টি বাইরের নিস্পৃহ কালের পদচারণা এবং চতুর্থটি সর্ব অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান থেকে সমকাল শূন্যতা। বাইরের জগত এভাবেই চরিত্রের অন্তর্জগতে নূতন মাত্রা নিয়ে প্রবেশ করে। যা সময়ের উপস্থাপন ছাড়া ফোটানো অসম্ভব। জীবনকে উপযুক্ত ভাবে যাচাই করার পদ্ধতি শুধু ক্রমান্বিত ধারাতেই তো একমাত্র হয় না, প্রয়োজনে

ক্রমান্বয়কেও ভেঙে দিয়েই উপন্যাস অন্য ভাষা চিত্র তৈরি করে। প্রকৃতপক্ষে লেখককে তা তৈরি করে নিতে হয়।

'মালঞ্চ' উপন্যাসের উপস্থাপনা তাই অতীত থেকে বর্তমান স্তরে নয়, বর্তমান থেকে অতীত স্তরে যাওয়া, তারপর অতীত থেকে বর্তমান স্তরে আসা। শুরুতে তাই নীরজার দশ বছরের সুখী দাম্পত্য জীবনের আলাপন নয়, বর্তমানের বদ্ধ-সংকীর্ণ অবস্থানলোক থেকে সে যাত্রা করে অতীতের উজ্জ্বললোকে। অতীত থেকে সে বাতি জ্বালিয়ে নেয় বার বার। আর এই প্রক্রিয়ায় বার বার সে যুক্ত হয়ে পড়ে অন্য চরিত্রের সঙ্গে সংলাপ বন্ধনে। তবু নীরজার অতীত এবং বর্তমানের ক্ষেত্রটুকু যে সামগ্রিক আবেদন নিয়ে আসে সেখানে ভবিষ্যৎ কেন্দ্রীয় বস্তু না হয়ে পারে না। নীরজা তাই উপন্যাসের একেবারে শেষে যখন ভবিষ্যৎ পরিসর ধরে বলে ওঠে— 'আমি নিশ্চয় জানি, আমার কথা বিশ্বাস করো। আমি থাকব, আমি এইখানেই থাকব, আমি তোমারই কাছে থাকব.....'[৪৫] তখন বুঝতে হয় এই আকাঙ্ক্ষা কতখানি জুড়ে আছে সময়ের ত্রি-অধিষ্ঠানে। শুধু অতীতের উজ্জ্বল দিনগুলো ছাড়া এই ভবিষ্যৎ-আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ হয় না, বর্তমানের দুঃস্বপ্নকে বাদ দিয়েও তীব্র হয় না তার ভাষা। বস্তুত মালঞ্চের পরিচিত পৃথিবী থেকে যে জীবন নির্যাস গ্রহণ করে নেয় নীরজা, ব্যাধির বদ্ধতা ধরেই সে সমকাল সচেতন হতে পারে। আদিত্যও সেই সমকালের স্পষ্টতা নীরজার ঈর্ষা ও গণ্ডীবদ্ধতা ধরে উপলব্ধি করে বলেই দশ বছরের জীবন ছাড়িয়ে সুপ্ত তেইশ বছরের জীবনকে চিনে নিতে পারে—মান্যতা দিতে পারে সরলার নীরব ব্যক্তিত্বকে।

উপন্যাসটি যদি নীরজাকেন্দ্রিক না হয়ে মালঞ্চের অভিমুখীন হয়, তবেই মান্যতা পেতে পারে আদিত্য আর সরলার সম্পর্ক। যে মালঞ্চকে কেন্দ্র করে অপরিসীম মমত্বে আদিত্য ও নীরজার সমকাল তৈরি হয়, সেখানে সেই জগতে শুধু নীরজা, শুধু আদিত্যই সব নয়; বাগানটিও একটি চরিত্র। আর যে বাগানটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে নেপথ্যলোকে অধিষ্ঠিত আরেক চরিত্র— সরলা। নীরজার অসুস্থ বর্তমানটি ধরে যেখানে মালঞ্চের অবস্থানই বিলুপ্ত হবার পথে, সেখানে সরলার আবির্ভাব গঠনকেই তো প্রবহমান রাখে। আর এই গঠনের পথ ধরেই আদিত্য তুলনা করে নিতে পারে কোথায় থেমে যাচ্ছে জীবন, কোথায় ছুটে চলেছে এর অব্যাহত ধারা। নীরজার অভিমানকে মান্যতা দিয়েও তাই আমাদের বুঝে নিতে হয় আদিত্য, সরলা এবং সর্বোপরি বিস্তৃত সময়পটকে— প্রগতির লক্ষ্যে যা এগিয়ে চলে।

আর এই জটিল অবস্থানকে সময়ের নানা মাত্রায় বিচারের অবকাশ সৃষ্টি করেও নরেনকে ধরে রবীন্দ্রনাথ নিয়ে আসেন বর্তমানের পরিচিতি। 'দুইবোনে'র ক্ষেত্রেও

যে পরিচয় সামন্তযুগের রাজারামবাবুকে ধরে ঘটে, এখানেও তেমনি স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে নরেনকে যুক্ত করে এর একটি রূপরেখা তৈরি হয়। বর্তমানকে এভাবে চিনিয়ে দেবার উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, বক্তব্যের আধারকে বাইরের জগতে যুক্ত রেখে অবস্থানকে স্পষ্ট করে তোলা। কারণ উপন্যাস তো প্রচলিত সামাজিক ভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো সৃষ্টি নয়। যদিও ইংরেজ আমলের পরাধীন ভারতের ছবি 'মালঞ্চ' নয়, 'মালঞ্চে'র উপস্থাপনা আন্দোলনকারীর কারাগার বরণের মধ্যে, বিশেষত সরলার এই কারাগারবরণ বিশেষ কোনো মাতৃভূমি উদ্ধারের সাধনায় নয়, সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। যে ব্যক্তিগত অবস্থান থেকে সে আদিত্য ও নীরজার জীবন থেকে শুধু নয় মালঞ্চের পরিসর থেকেও নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে। 'দুই বোনে' সামগ্রিক এই মানসিক জগতের মানবিকবোধ স্পষ্ট হতে পারে না যেখানে, 'মালঞ্চে' তার পূর্ণাঙ্গ ছবিকে ঔপন্যাসিক এঁকে দিয়ে যান— নানা মুখশ্রীর সন্ধানে। ভবিষ্যতের পক্ষে যা বহু ব্যক্তিলোকে বিভাজিত হতে হতে নীরজাতে এসে সংহতি লাভ করে, অধিষ্ঠিত হয় আত্ম নিরাপত্তার দাবিতে।

রবীন্দ্রনাথ যেভাবে উপন্যাসের স্বভাবধর্মে তার পটভূমি ও অন্তরজগতকে যুক্ত করেন তাতে একটির আধারে অপরটিকে গভীরতার দিকে ফুটিয়ে তুলতে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। যদিও একথা ঠিক 'কাহিনী পটভূমিকা থেকে বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব।'[৪৬] তবে পরিণামে একটি সফল উপন্যাস শেষ পর্যন্ত আবেদনের দিক দিয়ে যখন সার্বজনীন সত্যে গিয়ে পৌঁছায়, সময়ের দাবি মেনেই পটভূমিকার সময় স্তরকে তা ছিন্ন করে। যদি তা না নয়, তবে ত্রিপুরার ইতিহাসলোক থেকে গোবিন্দমাণিক্য-রঘুপতিকে কিভাবেই বা বর্তমানে আবিষ্কার করা যায়, গোরার চিরন্তন উপলব্ধি তো শুধু ঊনবিংশ শতকের নয় কিংবা 'ঘরে বাইরে'র আবেদন তো স্বদেশিয়ানার প্রশ্নে হতে পারে না; বরং উপন্যাসের বিচারে এগুলো প্রসঙ্গ সবচেয়ে গৌণ— লক্ষ্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়ক অবস্থান। সেই সূত্রে তাঁর শেষ উপন্যাস 'চার অধ্যায়' আপাতধর্মে বড় বেশি বিশেষ একটি অবস্থান ভূমিতে অন্তরঙ্গ ঠিকই, কিন্তু সেই নিবিড় সংযুক্তি তিনি কাটিয়ে ওঠেন। 'চার অধ্যায়' বাংলাদেশের অগ্নিযুগের বিপ্লব কাহিনীর, অথচ, বিপ্লব কাহিনী বর্ণনা লেখকের উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হলে সেই যুগের একটি সংকীর্ণ ছবি তিনি আঁকতেন না। কারণ, বিপ্লবীদের আত্মদানের যে পরিচয় ইতিহাসে মেলে, তাঁদের ত্যাগ যে শ্রদ্ধা জাগায়— একে অস্বীকার করার উপায় নেই। যেহেতু বিপ্লবীরা এ কর্মযজ্ঞে ব্রতী হন এই আদর্শে—

"Liberty is the life-breath of a nation, when the life is attacked,

when it is saught to supress all chance of breathing by violent pressure, any and every means of self-preservation becomes right and justifiable - just as it is lawful for a man who is being strangled to rid himself of the pressure on his throat by any means in his power."[৪৭]

কিন্তু 'চার অধ্যায়ে' বিপ্লববাদকে একটি সংকীর্ণ অর্থে নিয়ে আসে। এ থেকেই নানা অভিযোগের আঙুল উপন্যাসটি প্রসঙ্গে উঠলেও আমরা বুঝে নিতে পারি পটভূমিকার বিশেষ পরিচিতির আবেষ্টনে উপন্যাসটি দাঁড়িয়ে নেই। লেখক অবশ্য তাঁর কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে রাজনৈতিক টানাপোড়েনের আড়ালে এলা ও অতীনের প্রেম চিত্রের কথা গুরুত্ব দিয়ে বলেন, তবে সেইসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন—

"এই অধুনাতন কালের চিত্ত-আন্দোলন দূর অতীতে সরে গিয়ে যখন ইতিহাসের উত্তাপবিহীন আলোচ্য বিষয় মাত্রে পরিণত হবে তখন পাঠকের কল্পনা গল্পটিকে অনাসক্তভাবে গ্রহণ করতে বাধা পাবে না এই আশা করি। অর্থাৎ তখন এর সাহিত্যরূপ স্পষ্ট হতে পারবে।"[৪৮]

অর্থাৎ সমকালটি ছাড়িয়ে যখন ছবিটি অন্য একটি সমকালে এসে পৌঁছাবে, তখনই সম্ভব এর যোগ্য বিচার। এক্ষেত্রে গৌণতার মুখোশ খুলে ফেলার দায়িত্ব নিতে পারে একমাত্র সময়।

একথা দ্বিধাহীনভাবে বলা যায় উপন্যাসটিতে অতীন ও এলার প্রেম কাহিনী মূল উপজীব্য। কিন্তু ইন্দ্রনাথের ইঙ্গিতে তাদের জীবনে যে ট্র্যাজেডি নেমে আসে তার ভূমিকাও অনিবার্য। এক্ষেত্রে পটভূমিকার গুরুত্ব স্বীকার করে নিতে হয় এবং অনুধাবন করতে হয় তার সংকীর্ণ গণ্ডী। যদিও এই সংকীর্ণ গণ্ডীতে যে তিনটি প্রধান চরিত্র— ইন্দ্রনাথ-অতীন-এলা এসে মেলে, ব্যক্তিজীবনে গঠনের দিক দিয়ে প্রত্যেকের বিস্তৃত স্থান থাকে। ইন্দ্রনাথ বিজ্ঞানের সফল ছাত্র এবং কর্মী, অতীন অনুভূতিপ্রবণ, আর এলা সেই নারী— যে ঘরের ভেতর থেকে স্বদেশি যুগের মত্ততা নিয়ে 'ঘরে বাইরে'র বিমলার মত জীবনকে শুধু উদভ্রান্ত করে না, অবিচলিত প্রতিজ্ঞায় নিজেকে আত্মনিয়োগ করে কাজে। সময়ের প্রবহমান ধারার পাশাপাশি যে আত্মনির্মাণের স্বাবলম্বিতা জীবনকে তৈরি করে তোলে, তার সকল পরিচয়ই এখানে বহমান। তবু যথার্থ সংযোগের অভাবে সম্ভাবনার পথ অন্তরালেই থেকে যায়। লক্ষণীয়, দেশ গঠনের কাজে সে পরিসর-বিস্তৃতি গোরার জীবনভূমি হয়ে ওঠে, 'চার অধ্যায়ে' তিনিটি প্রধান চরিত্রের ক্ষেত্রে তা একটি সমাপতন মাত্র। বলা যেতে পারে, তিনটি চরিত্র যে বিপ্লবীদের কর্মপন্থা ধরে একটি কৌনিক স্তরে বিশেষ সাময়িকতায় ধরা দেয়, তাতে তাদের চিরকালের সমকাল গড়ার আদর্শটুকু নেই।

মূল কর্মভূমির বাঁধন তাই শিথিল। ইন্দ্রনাথ তাঁর দুর্দান্ত শক্তিকে গঠন মূলক কাজে লাগাতে পারতেন, কিন্তু অযোগ্য অধিনায়কের অধীনে তাঁর অধ্যাপনার কাজ ব্যাহত হয়। নিরন্তর শক্তির প্রবহমান ধারায় যে ল্যাবরেটরিতে হয়তো তিনি সৃষ্টি করে তুলতে পারতেন একটি নবযুগ, পরিস্থিতির চাপে তা অসম্ভব হয়ে ওঠে। ফলে শক্তি প্রয়োগের শুভ দিকটি পরিত্যাক্ত হয়ে ধ্বংশের অবস্থান বিন্দু ধরেই তার স্ফুরণ ঘটতে থাকে— বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়া দিয়ে যার সূত্রপাত। অর্থাৎ এই আন্দোলনের মূলে পরাধীনতার গ্লানি তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত। অপরিসীম ক্রোধ আর কঠোরতা নিয়ে তাঁর আবির্ভাব। ফলে আধিপত্যের তাড়নায় দেশের সঙ্গে দশের মঙ্গলের প্রসঙ্গটি হয়ে ওঠে গৌণ। এলা যে ইন্দ্রনাথের দলে যুক্ত হয়ে পড়ে সেখানেও একটি পরিত্রাণ পাবার ছবি প্রকট। বস্তুত বিবাহের মধ্য দিয়ে দুটো ব্যক্তির যে সংযোগ, তাতে এলা তার পিতামাতাকে ধরে শুধু বিচ্ছিন্নতাই দেখে। তাই বিবাহ তার কাছে পরাধীনতার ফাঁস রূপেই পরিচিত। অতএব সংস্কারগত ভাবে সময়ের অভিজ্ঞতা গায়ে মেখে সে সিদ্ধান্ত নেয় বিবাহ করবে না। অথচ পিতামাতার মৃত্যুর পর কাকা-কাকীর সংসারে বিবাহ নামক শক্ত বাঁধন থেকে উদ্ধার পাবার একমাত্র উপায় রূপেই এই কর্মযজ্ঞে তার বিকল্পহীন রূপে আসা। আর অতীন দলে আসে বিশেষ একটি বিপ্লবের আদর্শে নয়, স্পষ্টতই এলার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে। কাজেই পটভূমিকার সাময়িকতা এবং সাময়িক-উর্ধ্ব যৌথ আবেদন এনে ঔপন্যাসিক পরিণামে সাময়িকতাকেই দূর করেন। সেজন্য বিপ্লবীদের কাহিনী তিনি মসীবর্ণে আঁকেন বিশেষ একটি উদ্দেশ্য নিয়ে, যেখানে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের বাস্তবিক গুণাগুণ নিয়ে উপন্যাসের কোনো দায় নেই। ইন্দ্রনাথ, অতীন, এলা— এরা যেভাবে আন্দোলনকে মাধ্যম করে নানা মুখশ্রীর সন্ধানে বেরিয়ে যায়, তাতে যে যতটা যেমন করে একে গ্রহণ ও বর্জন করে, তাই নিয়েই পটভূমির ঐতিহাসিক ঘটনার প্রাসঙ্গিকতা।

যেহেতু উপন্যাস কোনো একটি মাত্র বিশিষ্ট কালের অবয়ব নয়, এর বহু বাচনিক সত্তা বারবার ছুঁতে চায় অসংখ্য যুগের পাঠক, আলোকিত করে নানা সভ্যতা দিয়ে গড়া বিস্তৃত পরিসর। সেক্ষেত্রে এমনটা হতেই পারে যে ঔপন্যাসিকের চিত্তে তাঁর সমকালের বস্তুধৃত ইতিহাস চেতনাকে প্রলুব্ধ করছে। প্রত্যক্ষভাবে রবীন্দ্রনাথ জীবনে দেখেন স্বদেশিয়ানা এবং বিপ্লবীদের কর্ম প্রচেষ্টায় শক্তির প্রকাশ। কিন্তু তার পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি অন্য মত পোষণ করেন। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে স্বদেশি বলতে যে গঠনমূলক প্রচেষ্টা, সে তো নিখিলেশের ভেতর নীরবে দেখিয়ে দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ মানবমুখী বলে তাঁর ভাবনা স্পষ্ট। বিশেষ সম্প্রদায়কে হত্যা করে বিশেষ আরেক সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার সরল পথ তিনি স্বীকার করতে পারেন না। সেজন্য

বিপ্লবীদের আত্মত্যাগের গৌরবোজ্জ্বল দিকগুলো তিনি শিল্পের তুলিতে ফোটান কম। কিন্তু তা প্রত্যক্ষ বাস্তবের গ্রহণ-বর্জনের ব্যক্তিগত অভিরুচির সমস্যা। কেননা, তাঁর অভিমত যেমনই হোক বিপ্লবীদের কাছে তাঁর রচনা—তাঁর গান ও কবিতা 'গীতা, 'আনন্দমঠ', বিবেকানন্দের বাণীর মতই প্রাণের রসদ জুগিয়েছে অফুরন্ত পরিমাণে।[৪৯]

এক্ষেত্রে 'চার অধ্যায়ে'র পটভূমিকা যে বিপ্লবীদের কর্মযজ্ঞের সঙ্গে জড়িত, তাকেই প্রধান করে, কিংবা অতীন ও এলার ব্যর্থ প্রেমকাহিনীর আলোকে ধরে উপন্যাসটি সাজান না রবীন্দ্রনাথ। যদি তাই হয় তবে বিশ শতকের অসংখ্য যুগকাহিনীর কোনো একটির দলিল রূপেই একে গণ্য করা যায়, পরিণামে ক্রমশ বিবর্তিত চিরকালের সমকালের পথে ফুরিয়ে আসে এর আবেদন। তাই সময়ের দূরবীক্ষণে তার শিল্প রহস্য আবিষ্কার করে নিতে হয় অন্যভাবে।

আমরা জানি প্রতাপের একাধিপত্য মানুষের এক বিশেষ প্রবণতা এবং সমস্যা। যুগে যুগে তার সাক্ষ্য বহন করে মানুষকে দুটো সার্বজনীন দলে ভাগ করে নেয়—শোষক এবং শোষিত। আন্তর্জাতিক স্তর থেকে ঘরের অন্দরমহল পর্যন্ত যার সোচ্চার ও নীরব প্রবাহধারা বহমান। এই একাধিপত্য কত বিপুল বিদ্রোহ রূপে দেখা দিতে পারে, তার প্রমাণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮) পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫)। ব্যবধানগত প্রায় কুড়ি বছরের অধিক সময় সীমায় এই মধ্যবর্তীকাল সময়ের সম্প্রসারণের ইতিহাস। তাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সীমা আরো বিস্তার পায়। সমালোচকও উল্লেখ করেন —

"এই যুদ্ধ প্রথম মহাযুদ্ধের মত একেবারে সুদূর ইউরোপেই সীমাবদ্ধ থাকে নি। এশিয়ার পূর্বাঞ্চলে এক বৃহৎ ভূখণ্ড জুড়ে এই যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে দাবাগ্নির মত।"[৫০]

অবশ্যই সময়ের বিবর্তন সূত্রে এই সীমা বিস্তার অনিবার্য। তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কুল পুরোহিত হিটলার আঞ্চলিক অবস্থান থেকে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েন নানা মাত্রায়। একটি মানুষের প্রতিকৃতিতে আমরা চিহ্নিত করতে পারি একাধিপত্যের শাসন। হিটলার তাই ফ্যাসিস্ট গোষ্ঠীর একটি ইতিহাসই নয়, মানুষের চলমান জীবনের যুগ যুগ বাহিত ক্ষমতার (power) অপব্যয়িত প্রতিনিধি। যার প্রত্যক্ষ প্রভাবে শুধু অনেকগুলো প্রত্যক্ষ দৈহিক মৃত্যুই আসেনা, সেই সঙ্গে ক্ষণস্থায়িত্ব, খণ্ডতা, আত্মমুখীনতাকে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ারূপে আন্তর্জাতিক স্তরে নিয়ে যায়—যার পরবর্তী লক্ষণরূপে নীতিহীনতা, অর্থ সর্বস্বতার সূত্রপাত। উপন্যাসে জীবনের এই সময় অগ্রসরণের পথ মৌলিকভাবে দেখার প্রয়োজন অনুভূত হয়। তাই বিশ্বসাহিত্যের নানা উপন্যাসের সঙ্গে তাল রেখে 'বাংলা উপন্যাসের পালাবদলে

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকাল, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তুলনায় অনেক বেশি গভীর চোরাস্রোতের জন্ম দেয়।'[৫১] অবশ্যই বিজ্ঞানের জয় যাত্রার পথে বীভৎস এই অবমানবায়ন সময়ের বিবর্তনসূত্রী, কিন্তু প্রগতির পরিপন্থী। আর ঠিক এখানেই সময়ের প্রবাহিত ধারা উপন্যাসের ভেতর দিয়ে আমাদের জিজ্ঞাসা তৈরি করে নেয়। ফলে 'চার অধ্যায়ে' প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব ইন্দ্রনাথ হিটলারের ফ্যাসিস্ট ভাবমূর্তির প্রতীক হয়ে ওঠেন। গঠনের দায়িত্ব পরিত্যাগ করে অবরুদ্ধ করে তোলেন নিজেকে, এবং নিজেকে ঘিরে থাকা জগত। তাই এলাকে তিনি ব্যক্তির চাইতে নারী বলেই চিহ্নিত করেন এবং তাকেই উদ্দেশ্য করে সংকীর্ণ উচ্চারণে বলেন—

"তোমার কাছ থেকে কাজ চাই নে, কাজের কথা সব জানাইও নে তোমাকে। কেমন করে তুমি নিজে বুঝবে তোমার হাতের রক্তচন্দনের ফোঁটা ছেলেদের মনে কী আগুন জ্বালিয়ে দেয়। সেটুকু বাদ দিয়ে কেবল শুখো মাইনেয় কাজ করাতে গেলে পুরো কাজ পাব না।"[৫২]

স্পষ্টতই তাতে দুটো ডিস্‌কোর্সে একদিকে প্রমাণ করে, ইন্দ্রনাথ এলাকে কাজে লাগাতে চাইছেন নারীর স্থূল যৌন শক্তির আকর্ষণকে ঘিরে; অন্যদিকে ধরা পড়ছে বিপ্লবাত্মক আন্দোলনের পেছনে গণ সচেতনতার অভাব। তা না হলে কাজ আদায়ের প্রশ্ন ওঠে কেনো। তাই গোটা পর্বটি ইন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জগত। আর এই জগতের দিকে তাকিয়ে এলা প্রশ্ন না করে পারে না— 'যতই দিন যাচ্ছে, আমাদের উদ্দেশ্যটা উদ্দেশ্য না হয়ে নেশা হয়ে উঠছে। ...... অমন সব ছেলেদের কোন্ অন্ধশক্তির কাছে বলি দেওয়া হচ্ছে!'[৫৩] ব্যক্তির গঠনমূলক শক্তিকে যেখানে স্থূলভাবে রাজনৈতিক অব্যর্থ কূটবুদ্ধিতে চালনা করার প্রয়াস, তারই রহস্য এলা যখন ব্যক্তি অভিজ্ঞতা থেকে আবিষ্কার করে নেয়, তখনই অতীনের ভালবাসার টানে সে উপলব্ধি করে মহাভারতের দ্রৌপদীকে। দ্রৌপদী স্বেচ্ছায় পঞ্চস্বামী বরণ করেন নি, বস্তুতঃ তার মতামতের চাইতে আগেই তা নির্দিষ্ট হয়ে যায় এবং অবশ্যই পঞ্চশক্তিকে এক গোত্রে রাখবার প্রয়োজনীয় ভূমিকাও তিনি গ্রহণ করেন কাহিনীর ইতিহাসের মুখ চেয়েই— আধুনিক বিচারে তা আজ কতটুকু মানবিক, কতটুকু প্রগতিধর্মী সে প্রশ্ন জাগে। তাই এলা যখন বলে অতীনের প্রেমবন্ধনে একটি জীবন গড়ে তোলা তার পক্ষে আজ অসম্ভব, যেহেতু দেশের কাজে সে বাক্‌দত্তা— তখন অপরিমিত দীর্ঘশ্বাস অলক্ষ্যে পড়ে যেতে দেখি আমরা। বুঝতে পারি, কত সুনিপুণভাবে বিজ্ঞানীর সফল পর্যবেক্ষণ গুণে নেপথ্য থেকে গড়ে উঠছে এমন এক জগত, যে জগতের প্রভু একজন মাত্র— তার উদ্দেশ্যের পথ ধরেই প্রতিটি কর্মপদ্ধতি পরিচালিত, আন্দোলিত, নীতি নির্ধারিত। রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে ইন্দ্রনাথকে যে একজন সবজান্তা

গোছের নাটকীয় চরিত্র করে তোলেন, তাতে ইঙ্গিতে থাকে ফ্যাস্‌িস্ট শক্তিতে আবৃত করে রাখা জগতের পরিচয়। জীবনে যে বিজ্ঞানের কর্মপদ্ধতিতে ইন্দ্রনাথ সার্থক হন না, এমন কি গবেষণার জন্য যেখানে তিনি একটি ল্যাবরেটরি পান না— সেই অসমাপ্ত উচ্চাশা থেকে তিনি স্বকল্পিত জগতে গড়ে তোলেন প্রবল প্রতিপত্তির পরিসর। সময় এই জগতে বারবার তাই তাঁর সহায়ক-প্রতিমা হয়ে ওঠে।

কিন্তু লক্ষণীয়, 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে এলাই মূল স্রোত। এক্ষেত্রে সময়ের চোখে উপন্যাসটির ভূমিকা অংশ বয়ানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তর। কেননা, যে একনায়কতন্ত্রের মধ্য দিয়ে আধিপত্য স্পৃহা মানুষের আদিম প্রবৃত্তি, তার সূত্রপাত এই পর্বেই। বলা যেতে পারে একদিকে ব্যক্তির আত্মবলয় ঘিরে বিচ্ছিন্নতা, অন্যদিবে ব্যক্তির আত্মমুক্তির পথ চেয়ে মুখশ্রী আবিষ্কার— উভয়ের ভেতরেই বিচিত্র পরিসর সেই সময়পট ধরে গড়ে ওঠে। 'বউঠাকুরানীর হাট' উপন্যাসে এই দুটো পরিসরের পাশাপাশি অবস্থান স্পষ্ট। তাই প্রতাপাদিত্য বারবার তার পরিসরের সীমা যেভাবে বাড়িয়ে যান, ঠিক ওইভাবেই বসন্ত রায় না এগিয়ে অন্যভাবে এগোন। বর্তমান সময়ের প্রখরতায় আপাতভাবে প্রতাপাদিত্য জয়ী হন সত্য, তবে বসন্তরায়ের ইমেজটুকু ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চিত থাকে — বিভা যার প্রসারিত প্রতিনিধি।

'চার অধ্যায়ে' বাংলা দেশের বিপ্লবীদের ঐতিহাসিক কালযজ্ঞের বিষয়টিকে গৌণ করে আসলে সেই পুরোনো আধিপত্য স্পৃহার সীমা বিস্তারের সার্বজনীন সুরটিকে তুলে ধরা হয়। আর এক্ষেত্রে উপন্যাসের ভূমিকাংশ হয় সবচেয়ে বড় প্রতিলিপি। লক্ষণীয়, এই প্রতিলিপি অথরিয়াল ডিসকোর্স দিয়ে বিবৃতির স্তরেই তৈরি। অর্থাৎ যে আধিপত্যবাদের প্রবৃত্তি থেকে আত্মকে ছেড়ে অপরকে দমন নীতির দ্বারা আবদ্ধ করার প্রয়াস, এলা তা মায়ের চরিত্রেই লক্ষ্য করে। এই স্বৈরাচারী শাসনের কারাগারে শুধু হিটলারের ব্যক্তি ছবি নয়, বিশ্বযুদ্ধের প্রবল ধ্বংসযজ্ঞ নয়— এর প্রকাশ নানা আদলে। ধ্বংস এখানে নিঃশব্দে— ব্যক্তি থেকে রাষ্ট্রীয় স্তরে। তাই কোনো আধিপত্যবাদী স্থপতির গড়ে ওঠার পেছনে পারিসরিক পরিস্থিতিকে দায়মুক্ত করা যায় না। 'রাজর্ষি' উপন্যাসে প্রথার ভেতর দিয়ে রঘুপতির যে ফ্যাসিস্ট ভাবমূর্তি উন্মুক্ত, তার জন্য অতীত থেকে সমকাল পর্যন্ত অপরতার দায়িত্ব কি কম! দেবীর কাছে বলি প্রথার কুৎসিত দিকটিকে তো সকলেই সমর্থন যুগিয়ে আসে, তবেই না সম্মিলিত প্রয়াসে রঘুপতির আবির্ভাব সম্ভব হয়। 'চার অধ্যায়ে'র ভূমিকাতে এলার পরিবারে মা মায়াময়ী অন্ধভাবে প্রভুত্ব চর্চা করে যান, আর পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা তাদের বর্তমান আশ্রয়টিকে মজবুত রাখার উদ্দেশ্যে

বাধাহীন করে তোলেন সেই স্বৈরাচারী শাসন। ব্যক্তিগত আপাত স্বার্থ সেখানে বড় বলেই সবাই খণ্ড খণ্ড পরিধি ছুঁয়েই সংকীর্ণ সীমাকে মেনে নেয়, পোষকতা করে। অথচ তার ফলে পরিবারে যে অচলায়তন গড়ে ওঠে, সেই সর্বনাশের ছবি কারো নজরে পড়ে না। এমনকি এলার শিক্ষিত পিতাও যেখানে অপরিসীম ধৈর্যে সমস্ত অন্যায় সহ্য করে যান, তখন তা স্পষ্টতই অপরাধরূপেও গণ্য হয়। একটি দেশ গঠনে মানুষের কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বার্থ, কোনো ক্ষেত্রে নিস্পৃহতা সমবেত ভাবে স্বৈরাচারী শাসনকে তৈরি করে তোলে, পরিশেষে তাকে স্বীকার করে নিতে নিতে অভ্যাস হয়ে পড়ে। সভ্যতার এই অপমৃত্যু ধরে প্রগতি যেখানে নিশ্চিহ্ন হবার মুখে এসে দাঁড়ায়, প্রতিবাদী ভূমিকায় তখন কোনো শক্তি এর রক্ষক হয়ে ওঠে। এই রক্ষকের ভূমিকায় রবীন্দ্র-উপন্যাসে গোবিন্দমাণিক্য, বিনোদিনী, শ্রীবিলাস, নিখিলেশকে আমরা পাই। মানুষ বলেই তাঁদের সীমিত সংস্কার থেকে আত্মদ্বন্দ্বে তাঁরা কখনো কখনো পড়ে যান সত্য, তবু শেষ পর্যন্ত সেই সংস্কারকে তাঁরা ছাড়িয়ে যান বলেই গতি-ধারা অব্যাহত থাকে। এলা তার পরিবার ভূমিতে প্রথম প্রতিবাদী চরিত্র। এক্ষেত্রে তার প্রতিবাদের লক্ষ্য হন তার মা। সমালোচক উল্লেখ করেন এই মায়ের দুটো রূপের কথা। একজন জন্মদাত্রী জননী— প্রভুত্বপরায়ণ, অন্যজন দেশমাতৃকা— ফ্যাসিবাদী বদ্ধতায় যার প্রকাশ।[৫৪] দুটো ক্ষেত্রেই বদ্ধতা, কিন্তু তার সীমা বিস্তৃত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যেভাবে স্বাভাবিক অর্থে সীমা বিস্তার করে নেয়, তাতে সময়ের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এর পরিসর। তাই ক্রমশঃ আগ্রাসী সীমানা বৃদ্ধি এর পরিচিত প্রবৃত্তি, আর এই পথে বিপুল সময়ের সীমা অধিকৃত হতে হতে ভয়ঙ্কর একরুদ্ধ, অন্ধ, স্থবির জগতকেই তো গড়ে তোলে। যা 'চার অধ্যায়ে'র গোড়া ধরে এর জীবন গঠনের সম্ভাবনার দিকটি উচ্চারিত। 'গোরা' উপন্যাসে পরেশবাবু যে প্রতিকূল অবস্থানে সামাজিক অন্তঃপুরের কথা বলেন, তার আবদ্ধ সময় পরিচয় এলাও আরেক সুরে তুলে ধরতে চায়, কাটাতে চায় সংকট। তাই মায়ের মধ্যে সে দেখে, আধিপত্যের ধর্ম একটাই— ক্ষমতার অধিগ্রহণ, আর পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা। মুসলমান অভ্যাগতকে বসার মাদুর পেতে দিলে সেই মাদুর সংস্কারের বশে ধর্মান্ধতা থেকে মায়াময়ী ফেলে দেন সহজে। অথচ এলা তাকে সুস্থ মনে কখনো মানতে পারে না। অন্যদিকে পিতৃব্যের বাড়িতে বিজাতীয় লৌকিকতায় যে আরেক অবরুদ্ধতা দেখা দেয়, যে আত্মপরিচয় লিপির বিচ্যুতি ঘটে, তাকেও স্বীকার করা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। আর ঠিক এখানেই বন্ধন থেকে মুক্তির অভিপ্রায়ে ইন্দ্রনাথের দলে তার পদার্পণ। সাময়িকতার আবদ্ধ এক বর্তমান থেকে প্রবহমান গতির নিয়মে এলা ভেসে আসে আরেক বৃহত্তর আবদ্ধলোকে। বলা যেতে পারে, এলার জীবনে

চারটি পর্বে এই ঐতিহাসিক গতিধারা অব্যাহত— মায়াময়ীর সংসার, পিতৃব্যের গৃহ, ইন্দ্রনাথের দল এবং অতীন সান্নিধ্য। চতুর্থ পর্বটিই প্রগতির চিহ্নায়ক, অথচ এই পর্বকেই প্রচলিত অন্য তিন ঐতিহাসিক ধারা বিনষ্ট করতে উদ্যত।

লক্ষণীয়, পরিবারতন্ত্রে যে ব্যক্তি বিদ্রোহ ঘোষণা করে সময়ের মুক্তি খোঁজে, তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বৃহত্তর সমাজ। গোরা, বিনোদিনী, নিখিলেশ, কুমুদিনী বারবার সেই ব্যক্তি বৃত্ত থেকে সামাজিক জীবনে যুক্ত হয় অনিবার্যরূপে। এলার ক্ষেত্রেও অবধারিত এই সত্য। তাই তার জীবনের প্রথম সূচনা বিদ্রোহ দিয়ে। আর ইন্দ্রনাথের দলে এসে তার পাঁচ বছরের ক্রমান্বিত সময়ের অভিজ্ঞতায় সে উপলব্ধি করে পরিবারতন্ত্রের আগ্রাসী প্রভাব থেকে মুক্ত হবার বিদ্রোহ পর্ব এখনোও শেষ নয়। কিন্তু এই বিদ্রোহের উপযুক্ত আশ্রয় তো চাই। ফলে পুনর্গঠনের লক্ষ্যে প্রেমই হতে পারে এর একমাত্র মাধ্যম— অতীন-সান্নিধ্যে যা সম্ভবপর। উপলব্ধিটি এলার পক্ষে নূতন, অথচ অতীন-সান্নিধ্যের চতুর্থ পর্বটি সবচেয়ে গুরুত্ব নিয়ে চরিত্রের উক্তি-প্রত্যুক্তিতে উপন্যাসে মুখ্য হয়ে ওঠে। আধিপত্যের বলয়িত নিঃসঙ্গতা যেখানে নবযুগ গড়তে অপারগ, সেখানে প্রেম-বন্ধন সন্ধান করে ফেরে সম্পর্ক। উপন্যাসের বৃহত্তর অংশ তাই সংলাপধর্মী, আর সেই সংলাপের সিংহভাগ অতীন ও এলার দ্বৈতালাপ, প্রেম যার অবলম্বন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে প্রেম ও আধিপত্যের কোনো অনুভূতি নেই, কোনো চরিত্র নেই। তাকে চরিত্র করে তোলার দায়িত্ব মানুষের— সদর্থক কিংবা নঞর্থক, যে কোনো উপায়ে। তাই একদিকে ইন্দ্রনাথের মত লোক নিঃশব্দে জগতকে আবদ্ধ করতে করতে পরিসর বাড়িয়ে চলেন নিজস্ব পরিকল্পনায় জ্ঞান অর্জনের সূত্রে, অন্যদিকে আশা-আকাঙ্ক্ষার জ্ঞানগর্ভ পারস্পরিক যৌগিক সম্পর্ক গঠনে অতীন ও এলাও এগিয়ে যায় ভবিষ্যৎ পৃথিবী গড়ার লক্ষ্যে। উপাখ্যানে অবশ্য এই দুটো ধারায় ইন্দ্রনাথ পর্বই জয়ী, তবু এর সীমানা ওইটুকু পর্যন্ত। নানা মুখশ্রী সন্ধানে যেখানে অব্যাহত ধারা বয়ে যায়, সেখানে পরিমিত মিলনে এলা ও অতীনই শেষ কথা হতে পারে। যেখানে সাময়িকতা তাদের ধ্বংস করে, অথচ সমকালীন অসংলগ্নতাথেকে বিবর্তন সূত্রে চলতে চলতে প্রগতির ইতিহাস ধরে রাখে এই ছবি। যেখানে ইব্‌সেনের চারটি লাইন উদ্ধার করে এলা ও অতীনের উর্দ্ধমুখী চলার ধ্বনিকে দূরের তীব্র হুইসেলের শব্দ তরঙ্গ থেকে বহু প্রসারিত করে। প্রেমের বর্তমান শেষ চুম্বন তাই চিরদিনের পথে অফুরান, জীবন এখানে পুনর্বিন্যস্ত হবার লক্ষ্যে অবিচলিত — উপাখ্যানে নয়, উপন্যাসে।

দার্শনিক হেগেল যে কথা উল্লেখ করেন —

"...... thought in its very nature is dialectical and that as

understanding, it must fall into contradiction .... the negative of itself."[৫৫]

এলার প্রতিনিধিত্বে বিরুদ্ধতার মধ্যে লড়াই চালিয়ে তারই যাত্রা অব্যাহত থাকে। মৃত্যু দিয়েও তাই প্রমাণ করে—

"স্বাধীন সত্তার, নিজ শক্তি ও বিকাশেই দেশ বাঁচে; দেশও ঐ সত্তার জন্য প্রতীক্ষা করে।"[৫৬]

কাজেই বলতে হয়, উৎপত্তির প্রথম মুহূর্ত থেকেই অবিচ্ছিন্নকাল মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক ঘটনা। উপন্যাসে ব্যক্তিত্ব আবিষ্কারের প্রথম পর্যায় এর ব্যক্তিগত দিক। অথচ আত্মোপলব্ধির নৈতিক প্রয়োজনীয়তা শুধু অন্তরজগত দিয়ে সম্ভব নয়। মনে রাখতে হয় এ শুধু একার কর্ম নয়, সমাজের সহযোগিতাও তাতে যুক্ত। কেননা, নিঃসঙ্গ আত্মোপলব্ধি শুধু স্বার্থপর নয়, অসম্ভবও বটে। তার মধ্যে যে কল্যাণধর্ম, অপরতার মিশ্রণই এর যৌগিক ফসল। পাশ্চাত্যের এক দার্শনিক উল্লেখ করেন —

"It is religion alone that can give the sense of worthwhileness to moral effort and bring us into touch with the ultimate sources from whence moral energy may be replenished and reinforced."[৫৭]

তাতে ধর্ম বলতে 'আমি' এবং 'আমার প্রয়োজন'-এর সংকীর্ণ অধ্যায় ছাড়িয়ে বৃহত্তর চেতনার সঙ্গে যুক্ত হবার কথা আসে। যে নূতন প্রয়োজনে মানুষ বসুধাকে কুটুম্ব মনে করতে সক্ষম।

অথচ উপন্যাস শুধু ওই জায়গা থেকে যাত্রা করে না। কেননা, নূতন ও পুরাতনকে মিলিয়ে সংস্কার ধরে রাখার এবং ভেঙে ফেলার দুই বা ততোধিক ইতিহাস মানুষের জীবনধারায় বহমান। উপন্যাসে তার বর্ণনা আসে যে তাগিদ থেকে, তাতে বিশেষ উদ্দেশ্যরূপে যদি মনে করা হয়, জগতে আদর্শ ও মূল্যের প্রতিষ্ঠা মানুষের মধ্য দিয়ে মানুষের জন্যই রূপায়ণ জরুরী, তবে সময় গঠনের প্রয়োজনকে অবশ্যম্ভাবী বলে মানতে হয়। কারণ, মানুষ সসীম জীব বলেই তার পক্ষে সময়ের ক্রম অবকাশ ছাড়া মানব আদর্শকে রূপায়িত করা, কিংবা সত্তার সঙ্গে অপরতার সম্মিলনও সম্ভব নয়। সৃষ্টির প্রয়োজনেই ঘটনার নিরন্তর প্রবাহ, পারম্পর্য ও ধারাবাহিক সুস্থতা আবশ্যক। আর উপন্যাস কোনো বিশেষ মুহূর্তের সীমাবদ্ধ শিল্পও নয়। তাই আজকের হতাশা, নিশ্চেষ্টতা, স্বজন হারাবার দুঃখ, সংশয়, ভণ্ড রাজনৈতিক সামাজিকতা, অর্থ রাক্ষসের উৎপাত বারবার খণ্ডিত করে শুভবোধ, খণ্ডিত করে বিচারশক্তি— উপন্যাস তার দলিল; অথচ দায়িত্ব এখানেই শেষ নয়। তাই বড় নিকট থেকে আজকের সামাজিক অবস্থান ধরে রবীন্দ্র

উপন্যাস যখন সংকীর্ণ পরিসর ছাড়িয়ে 'স্পিচ্' গঠন করে, যখন এর 'ম্যাসেজ' হয়ে ওঠে ক্ষমা ও ত্যাগের বড় আয়োজন— তখন বর্তমানের পরিচয় বন্ধনে অপরিচিত করে তোলে এই জগত। করুণা, বিভা, গোবিন্দমাণিক্য, শ্রীবিলাসকে তাই চিনে নেবার জন্য প্রতীক্ষা করতে হয়, সময় দিয়ে গঠন করতে হয় অবলোকন করতে পারার প্রসারিত শক্তি। বোঝা যায়, অস্তিত্বের জন্যই এই শক্তিকে ধারণ করতে পারা কতটা প্রয়োজন। আনন্দময়ীর মধ্যে গোরা এবং শ্রীবিলাসের মধ্যে দামিনী সেই শক্তিকে সময় ধর্ম দিয়েই দেখে, আদিত্যের মধ্যেও তাকে দেখবার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে নীরজা।

শুধু বর্তমানেই আমরা বেঁচে থাকার জন্য ব্যাকুল, অথচ বর্তমানের নিরাপত্তা নির্ভরশীল ভবিষ্যতে। তাই গোরা, নিখিলেশ, শ্রীবিলাস, লাবণ্য, দামিনী এদেরকে নিজের মতন করে আমাদের পরিসর ও সময় ধর্মে আবিষ্কার করে জীবনকে স্পর্শ করে যেতে পারি। প্রচলিত জড় সময়লোক থেকেও নিওপল্ড ব্লুম একটি নির্দিষ্ট সীমানা-বন্ধন হতে বেরিয়ে যায় যেভাবে, সেভাবে না হলেও, আরেক ভাবে গোরা তার জড় জগতকে অস্বীকার করতে পারে, বিমলা বলতে পারে রাত্রির সমুদ্র পার হবার জন্য হু হু করে সে উড়ছে। এক্ষেত্রে সময়ের বেড়ি, বেড়িমুক্তি এবং মুক্তি গঠনের অভিজ্ঞতা, ছবির পর ছবি সৃষ্টি করে গড়ে তুলে উপন্যাসের অন্তর্ভাষ্য। তাই মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির নানা সংকট নানা যুগে যেখানে-যেভাবে দেখা দেয়, সেখানে-সেভাবে আধুনিক সংস্কার দার্শনিক ও সমাজতাত্ত্বিক হেবারম্যাস সার্থকতা খোঁজেন না বদ্ধতা ও বিশ্বাসঘাতকতার ঐতিহ্যে, খোঁজেন উন্মুক্ত গণতন্ত্রের নাগরিক ভূমি থেকে— যেখানে সামাজিক মুক্তির সৌধ গড়ে ওঠে বারবার।[৫৮] সেই সূত্রে রবীন্দ্র উপন্যাসে জীবনের পরিচয়কে ধরে রাখতে অহং ও আধিপত্য-সর্বস্ব চিত্র বার বার ওঠে এলেও সেই পরিচয়লিপি অঙ্কনেই সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায় না। নরেন্দ্র, প্রতাপাদিত্য, রঘুপতি, সন্দীপ থেকে তাই বিকল্প পথ গড়ে ওঠে বিভা, গোবিন্দমাণিক্য, নিখিলেশ, লাবণ্যদের দ্বারা। রবীন্দ্রনাথও অন্যত্র স্বীকার করে নেন—

"জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে নানা পরিবর্তনের মধ্যে তারা গড়ে উঠেছে। সেই সমস্ত পরিবর্তন-পরম্পরার মধ্যে নিঃসন্দেহে একটা ঐক্যসূত্র আছে। সেইটিকে উদ্ধার করতে হলে রচনার কোন্ অংশ মুখ্য, কোন্ অংশ গৌণ, কোন্‌টা তৎসাময়িক, কোন্‌টা বিশেষ সময়ের সীমাকে অতিক্রম করে প্রবহমান, সেইটি বিচার করে দেখা চাই।"[৫৯]

হয়তো তাই কথাবস্তুর আপাত এই পরিসমাপ্তিতে এসে আভাস-আয়োজন-প্রতিমা নির্মাণ ও নানা মুখশ্রীর সন্ধানে বেরিয়ে আমাদের সংকল্প ও দায়বদ্ধতা

সমলোচকের একথা স্মরণ করে—

"যে সাহিত্যকর্ম প্রত্যেক যুগে নতুন চেহারা নিতে পারে, যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে যার আবেদন ফুরিয়ে যায় না, তারই স্থায়ী মূল্য আমরা স্বীকার করি।"[৬০]

স্মরণ করে—

"আধুনিক মননের আলোকে রবীন্দ্রনাথকে নতুন চোখে দেখা আজ প্রয়োজন।"[৬১]

প্রয়োজন, অন্য দেশ, অন্য কালের সঙ্গে বারবার এ কালটিকে মেলাবার গরজে, অতীত থেকে অনাগতের পথে— আমাদের জন্য .... আমার জন্য।

উল্লেখপঞ্জি

১। রবীন্দ্র উপন্যাস সমীক্ষা (প্রথম খণ্ড)।। সত্যব্রত দে।। দ্বিতীয় সংস্করণ।। জিজ্ঞাসা।। পৃষ্ঠা - ২৩৯

২। রবীন্দ্র উপন্যাস ঃ ইতিহাসের প্রেক্ষিতে।। ভূদেব চৌধুরী।। প্রথম প্রকাশ।। দে'জ।। পৃষ্ঠা - ৬৫-৬৬

৩। রবীন্দ্র জীবনী (দ্বিতীয় খণ্ড)।। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়।। পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ।। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ।। পৃষ্ঠা - ২৮৬

৪। রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে।। শুদ্ধসত্ত্ব বসু।। প্রথম প্রকাশ।। মণ্ডল।। পৃষ্ঠা - ১৮

৫। বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড)।। ক্ষেত্র গুপ্ত।। ১৯৯৪।। গ্রন্থনিলয়।। পৃষ্ঠা - ৩৭১

৬। গ্রন্থ পরিচয়।। রবীন্দ্র রচনাবলী (নবম খণ্ড)।। বিশ্বভারতী।। পৃষ্ঠা - ৫৪৫

৭। রবীন্দ্র উপন্যাসের পাঠান্তর।। সুচিত্রা পাল।। প্রথম প্রকাশ।। মডেল পাবলিশিং হাউস।। পৃষ্ঠা - ১৪৮

৮। রবীন্দ্র জীবনী (তৃতীয় খণ্ড)।। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়।। তৃতীয় সংস্করণ।। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ।। পৃষ্ঠা - ৩৭৩

৯। শ্রেণীচেতনা, বিভ্রান্তি, রবীন্দ্র উপন্যাস প্রসঙ্গ ঃ যোগাযোগ।। ক্ষেত্রগুপ্ত।। আধুনিক বাংলা সাহিত্য প্রতিভা ঃ স্বাতন্ত্র্যবিচার।। সম্পাদনা - ওয়াকিল আহমেদ।। প্রথম সংস্করণ।। এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ।। পৃষ্ঠা - ১০২

১০। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা।। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।। নবম পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ।। মডার্ণ।। পৃষ্ঠা - ১৭১

১১। তদেব।। পৃষ্ঠা - ১৭১-১৭২

১২। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর।। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়।। পরিবর্ধিত প্রথম সংস্করণ।। দে'জ।। পৃষ্ঠা - ১৮৭

১৩। উপন্যাসের সমাজতত্ত্ব।। পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়।। প্রথম প্রকাশ।। র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন।। পৃষ্ঠা - ১০৮

১৪। রবীন্দ্র রচনাবলী (নবম খণ্ড)।। বিশ্বভারতী।। পৃষ্ঠা - ১৯৬

১৫। শ্রেণীচেতনা, বিভ্রান্তি, রবীন্দ্র উপন্যাস প্রসঙ্গ ঃ যোগাযোগ।। ক্ষেত্রগুপ্ত।। আধুনিক বাংলা

সাহিত্য প্রতিভা ঃ স্বাতন্ত্র্যবিচার।। পৃষ্ঠা - ৯৫
১৬। রবীন্দ্র জীবনী (তৃতীয় খণ্ড)।। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়।। তৃতীয় সংস্করণ।। পৃষ্ঠা - ৩৭১
১৭। রবীন্দ্র রচনাবলী (নবম খণ্ড)।। বিশ্বভারতী।। পৃষ্ঠা - ৩৯২
১৮। সংস্কৃতি, সমাজ ও অর্থনীতি।। অমিয় কুমার বাগচী।। ১৯৯৫ বইমেলা।। অরুণা প্রকাশনী।। পৃষ্ঠা - xxviii
১৯। রবীন্দ্র জীবনী (তৃতীয় খণ্ড)।। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়।। তৃতীয় সংস্করণ।। পৃষ্ঠা - ৩৭২
২০। রবীন্দ্র রচনাবলী (নবম খণ্ড)।। বিশ্বভারতী।। পৃষ্ঠা - ৩৯১
২১। রবীন্দ্র উপন্যাস ঃ ইতিহাসের প্রেক্ষিতে।। ভূদেব চৌধুরী।। পৃষ্ঠা - ৯৫
২২। রবীন্দ্র জীবনী (তৃতীয় খণ্ড)।। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়।। পৃষ্ঠা - ৩৭৩
২৩। তদেব।। পৃষ্ঠা - ৩৭৩
২৪। রবীন্দ্রনাথ ও কথাসাহিত্য।। বুদ্ধদেব বসু।। তৃতীয় সংস্করণ।। নিউ এজ পাবলিশার্স।। পৃষ্ঠা - ৯৬
২৫। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর।। পৃষ্ঠা - ১৯১
২৬। An Outline of Philosophy।। Bertrand Russell 1993।। Routledge।। পৃষ্ঠা - ১৪৮
২৭। কালের মাত্রা ও রবীন্দ্র নাটক।। শঙ্খ ঘোষ।। তৃতীয় সংস্করণ।। দে'জ।। পৃষ্ঠা - ৪৮
২৮। রবীন্দ্র উপন্যাস ঃ ইতিহাসের প্রেক্ষিতে।। ভূদেব চৌধুরী।। পৃষ্ঠা - ১০১
২৯। ভিন্ন রুচির অধিকার।। শঙ্খ ঘোষ।। 'দেশ' ৪ মে ১৯৯৬ সংখ্যা।। পৃষ্ঠা - ৩৭
৩০। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য।। গোপিকানাথ রায় চৌধুরী।। প্রথম সংস্করণ। দে'জ।। পৃষ্ঠা - ৬৯
৩১। রবীন্দ্র সাহিত্য বিচিত্রা। প্রমথনাথ বিশী।। পরিবর্ধিত সংস্করণ।। ওরিয়েন্ট।। পৃষ্ঠা - ৩০৬
৩২। রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক।। সাহিত্যচর্চা।। বুদ্ধদেব বসু।। দে'জ।। দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ।। পৃষ্ঠা - ১১৯
৩৩। রবীন্দ্র রচনাবলী (দশম খণ্ড)।। বিশ্বভারতী।। পৃষ্ঠা - ৩৬৭
৩৪। রবীন্দ্র উপন্যাস সমীক্ষা (প্রথম খণ্ড)।। সত্যব্রত দে।। দ্বিতীয় সংস্করণ।। জিজ্ঞাসা।। পৃষ্ঠা - ৫৭
৩৫। রবীন্দ্র জীবনী (তৃতীয় খণ্ড)।। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়।। পৃষ্ঠা - ৫১৩
৩৬। উপন্যাসে জীবন ও শিল্প।। উজ্জ্বল কুমার মজুমদার।। প্রথম প্রকাশ ঃ দ্বিতীয় মুদ্রণ।। সান্যাল এণ্ড কোম্পানি।। পৃষ্ঠা - ৭৬
৩৭। নির্মাণ আর সৃষ্টি।। শঙ্খঘোষ।। দ্বিতীয় সংস্করণ।। প্যাপিরাস।। পৃষ্ঠা - ২০৬
৩৮। ঘরে বাইরের সাহিত্য চিন্তা।। শশিভূষণ দাশগুপ্ত।। সাহিত্য জগত।। পৃষ্ঠা - ২১
৩৯। রবীন্দ্র উপন্যাস ঃ ইতিহাসের প্রেক্ষিতে।। ভূদেব চৌধুরী।। পৃষ্ঠা - ১০৭
৪০। রবীন্দ্রনাথ ও কথাসাহিত্য।। বুদ্ধদেব বসু।। তৃতীয় সংস্করণ।। নিউ এজ পাবলিশার্স।। পৃষ্ঠা - ১১১
৪১। রবীন্দ্র রচনাবলী (একাদশ খণ্ড)।। বিশ্বভারতী।। পৃষ্ঠা - ৪৬৩

৪২। The Cambridge Guide to Literature in English।। Ed. Ian Ousby Forward by Margaret Atwood।। Cambridge University Press।। Revised Paper back edition.।। পৃষ্ঠা - ৯৫৬

৪৩। রবীন্দ্র রচনাবলী (দ্বাদশ খণ্ড)।। বিশ্বভারতী।। পৃষ্ঠা - ১৬৭

৪৪। তদেব।। পৃষ্ঠা - ১৫৪

৪৫। তদেব।। পৃষ্ঠা - ১৯৭

৪৬। ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ।। রণেন্দ্রনারায়ণ রায়।। প্রথম সংস্করণ।। দাশগুপ্ত এণ্ড কোম্পানি।। পৃষ্ঠা - ২০৮

৪৭। Works of Sri Aurobindo।। Birth Centenary Lib. Vol - 1।। পৃষ্ঠা - ৯৮

৪৮। গ্রন্থ পরিচয়।। রবীন্দ্র রচনাবলী (ত্রয়োদশ খণ্ড)।। বিশ্বভারতী।। পৃষ্ঠা - ৫৪৪

৪৯। রবীন্দ্র উপন্যাস ঃ ইতিহাসের প্রেক্ষিতে।। ভূদেব চৌধুরী।। পৃষ্ঠা - ১১২

৫০। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য।। গোপিকানাথ রায় চৌধুরী।। প্রথম সংস্করণ।। দে'জ।। পৃষ্ঠা - ২৯

৫১। বাংলা উপন্যাসের পালাবদল।। ভাস্বতী সমাদ্দার।। প্রথম প্রকাশ।। পুস্তক বিপণি।। পৃষ্ঠা - ৯

৫২। রবীন্দ্র রচনাবলী (ত্রয়োদশ খণ্ড)।। বিশ্বভারতী।। পৃষ্ঠা - ২৭৮

৫৩। তদেব।। পৃষ্ঠা - ২৭৪

৫৪। উপন্যাসের সমাজতত্ত্ব।। পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়।। প্রথম প্রকাশ।। র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন।। পৃষ্ঠা - ১৩১

৫৫। Wallace, The Logic of Hegel ('হেগেলীয় দর্শন' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।। অনিল রায়।। প্রথম প্রকাশ ।। জয়শ্রী প্রকাশন)।। পৃষ্ঠা - ৭৮

৫৬। উপন্যাসের সমাজতত্ত্ব।। পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়।। প্রথম প্রকাশ।। র‍্যাডক্যাল ইম্প্রেশন।। পৃষ্ঠা - ১৩৬

৫৭। The Philosophy of Religion।। D. Miall Edwards।। পৃষ্ঠা - ১৬৯

৫৮। আধুনিকতা, উত্তর আধুনিকতা ও একটি বিকল্পের অনুসন্ধান।। অমল চট্টোপাধ্যায়।। প্রথম পুনর্মুদ্রণ প্রকাশ।। ভারতী।। পৃষ্ঠা - ৪৭

৫৯। রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত।। কালান্তর।। রবীন্দ্র রচনাবলী (চতুর্বিংশ খণ্ড)।। বিশ্বভারতী।। পৃষ্ঠা - ৪৩৭

৬০। রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক মনন।। ভবতোষ চট্টোপাধ্যায়।। জানুয়ারি ১৯৯২।। প্যাপিরাস।। পৃষ্ঠা - ১৪

৬১। তদেব।। পৃষ্ঠা - ১৪

উপসংহার

একথা আজ স্পষ্ট, মানুষের সত্তাকে কোথাও একটি শিল্পলোকের আধার করতে চাইলে অবশ্যই তাতে সময়ের এক ব্যাপক ভূমিকা ধরা দিতে বাধ্য। সাহিত্য আলোচনায় তাই সামাজিক-প্রেক্ষিত স্থাপন স্বাভাবিকভাবে আসে। গবেষক ক্ষেত্র গুপ্তও এক জায়গায় উল্লেখ করেন—

"কোন লেখককে নিয়ে বই লিখতে গেলে প্রথম অধ্যায়ে দেশ কাল বিষয়ে প্রস্তাবনা থাকবেই,— না থাকলে আমরা অবাক হই।"[১]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসে প্রথম থেকে বিশেষ একটি মতকে প্রতিষ্ঠা ঘটাতে কখনো প্রস্তুত নন, তবে বিশেষ ছাপ দেওয়া মতবাদকে ভেঙে ভেঙে নূতন সামাজিক উদাহরণ যেখানে তিনি তৈরি করেন, তার অন্তরালে থাকে সময়াদর্শের কার্যকর শক্তি। কারণ, তাঁর উপন্যাস শুধু পরিবর্তমান ইতিহাসের ব্যাখ্যাই করে না, ইতিহাস-নির্দেশিত পথে সামাজিক ইতিহাসকেও বদলাতে চায়।

'করুণা' উপন্যাসে একদিকে নরেন্দ্রের পরিবৃত আবদ্ধলোক ধরে যেখানে করুণার ভাগ্যাকাশ নির্দিষ্ট, সেখানে পাশাপাশি রজনীর নিগড় মুক্তিতে স্পষ্ট হয় কথাবস্তু। কিন্তু তার থেকেও বড় কথা, স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠায় প্রচলিত সামাজিক বৃত্ত থেকে আরেক সামাজিকতায় ছুটে যায় কাত্যায়নী; সংকীর্ণ পরিধি থেকে বৃহত্তর লক্ষ্যে পৌঁছাবার শক্তিও শেষ পর্যন্ত অর্জন করে মহেন্দ্র— রজনীর প্রতি সীমাহীন মমত্বে যার প্রকাশ। আর সমস্ত মিলেই করুণার ব্যক্তিজগত নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের সন্ধানে অবলম্বন খুঁজে ফেরে— মৃত্যু নামক কোনো এক সম্ভাবনার বিনষ্টিতে নয়, সামাজিক স্তরে উত্তীর্ণ হবার মানসে। 'বউঠাকুরানীর হাট' উপন্যাসেও ইতিহাস কাল প্রতাপাদিত্যের শাসনকে যেখানে বহন করে, সেখানে উদয়াদিত্য-বসন্ত রায় নীরবে তাঁদের ব্যক্তি আহুতি দিতে বাধ্য হন সত্য, কিন্তু প্রেরণা তৈরি করে যান সময়কে পাল্টে নিতে পারার সামর্থ্য অর্জনে। যেখান থেকে স্পষ্ট রুচিবোধে দীক্ষিত হয়েই বিভা প্রচলিত সামাজিক সেই অশুভ শক্তি থেকে সময়ের কাছে আত্মবলিদান দিয়েও বর্তমান ও ইতিহাস থেকে আমাদের ভবিষ্যৎ স্তরে সংযোগ সূত্রটি ধরে রাখে।

এই সংযোগরেখাই হাসির মাধ্যমে রাজা গোবিন্দমাণিক্যকে 'রাজর্ষি' উপন্যাসে সচেতন করে তোলে সময়ের একতারে বাঁধা সমাজ জীবনের চলমানতা ছাড়িয়ে প্রগতির শীর্ষে। বহু যুগ ধরে সর্বংসহ মূকত্বের অবগুণ্ঠন সরিয়ে গোবিন্দমাণিক্যের কাছে এসে পৌঁছায় সময়ের মুক্ত হয়ে পড়া পথের নিশানা। কিন্তু কোনো সামাজিক জীবনে রণ হুংকারে বিরাট একটি পরিবর্তন তড়িৎগতিতে সম্ভব নয়। রঘুপতির প্রভুত্ব চর্চা যে সমাজ বহু সময়ের অভ্যাসের দাসত্বে মেনে নেয়, তার সংস্কারমুক্তি ঘটানো শুধু একজনের পক্ষে পরিমিত সময়প্রবাহ ধরে সম্ভব নয়। গোবিন্দমাণিক্য তাই প্রচলিত সামাজিক জীবনে সকলের বিরাগ ভাজন হন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত 'অপরতার সহায়তা' নিয়ে দীর্ঘ সময়ের অভিজ্ঞতাতে উপার্জন করে তিনি লক্ষ্যে পৌঁছান। অবশ্যই এই পূর্ণতার পেছনে থেকে যায় জয়সিংহের আত্ম-আহুতির অবদান। কেননা, রঘুপতির আগাগোড়া পাল্টেযাওয়া চরিত্র-বিবৃতির সঙ্গে জড়িত এই ঘটনার আবেদনই প্রধান সূত্র।

সামাজিক জীবনে ইতিহাসের নিস্তরঙ্গ গতিতে জীবনের উত্তাপকে যুক্ত করতে পারা শুধু একটি খণ্ড সময় পরিধি ধরে সম্ভবপর নয়। তার কারণ প্রগতির সঙ্গে মানুষের মনন এবং মুক্ত দৃষ্টি যেখানে জড়িত, সেখানে দীর্ঘদিন একে আবরণের আড়াল করে এই বিশ্বাসকেই বড় করে তোলা হয় যে, ব্যক্তিসুখই পরমার্থ। একদিকে দীর্ঘ একসময় ধারার সংস্কার, আর অন্যদিকে দৈহিক প্রবৃত্তি— যুগপৎ জীবনের লক্ষ্যকে অন্ধতা, আধিপত্য, স্বার্থসর্বস্ব অভীপ্সারূপে দেখে। ফলে এতদিনকার স্তূপীকৃত ভ্রান্ত বিশ্বাসকে ভেঙে দিতেও চাই সময়ের আরো বড় প্রস্তুতি। ঊনবিংশ শতকে বাংলাদেশে রামমোহন, বিদ্যাসাগর কিংবা ব্রাহ্ম সমাজের আন্দোলন সময় মুক্তির ডাক নিয়ে এলেও সামগ্রিক স্তরে ধ্বনি তোলে না। নারী সমাজের মধ্যে সামাজিক আধিপত্য থেকে উত্তীর্ণ হবার চিত্ররূপে বোঝানো যায় না শুধু একজন স্বর্ণকুমারী দেবী, একজন কুমুদিনী বসু, কিংবা একজন কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের উদাহরণকে দাঁড় করিয়ে। তাতে পর্যবেক্ষণ চালাতে হয় গোটা সমাজে একটি প্রতিধ্বনি তোলার, ধীরে ধীরে শৃঙ্খলমোচন হবার, প্রচলিত পারিবারিক ও সামাজিক বাঁধা ভেঙে ফেলার সময়পর্বের প্রতি।

'চোখের বালি'তে বিনোদিনী শিক্ষিত ও রুচিপূর্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়ে তাই সংস্কারান্ধ অপরতার সঙ্গে যেমন দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়, তেমনি আবার আত্মজগত ধরেও প্রাথমিক এক ঈর্ষার সাময়িক পরিধিতেও পা রাখে। অবশ্য নানা স্তরীয় ভিন্ন মুহূর্ত বিনোদিনী পেরিয়ে যায় বটে, তবে নিরন্তর সম্পূর্ণতা-গঠনের জন্যও উদ্যত থাকে। পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদে বিহারী বাস্তবে চুম্বনোদ্যত বিনোদিনীকে প্রত্যাখ্যান

করে। অথচ উপন্যাসে সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদে স্মৃতিলোকে সেই বিহারীই বিনোদিনীকে অস্বীকার করতে পারে না। বিনোদিনীর মাধ্যমে প্রেমের উৎস এখানে সময়ের প্রবাহিত এবং গঠনধর্মী প্রচেষ্টাকে আত্মস্থ করে, আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। বুঝতে হয়, এভাবেই বিনোদিনীর একার জগতটিকে ধীর ধীরে বহু জগতের সম্মিলনে লেখক সম্পূর্ণ করে তোলেন, বিনোদিনীকে দিয়েও বহুর জগত যোগ্য হয়ে ওঠে। তাই শুধু বিনোদিনী নয়, বিনোদিনীকে ছাড়িয়েও মহেন্দ্র-পত্নী আশার মত আপাত নিষ্প্রভ চরিত্রেও বিয়াল্লিশ সংখ্যক পরিচ্ছেদে ফুটে ওঠে হিন্দু নারীর প্রচলিত সংস্কার ও শিক্ষাকে প্রয়োজনে সেও বিসর্জন দিচ্ছে, পুরাতন কালের একনিষ্ঠার সাধ্বীত্বকে কায়োমনোবাক্যে মেনে নিতে পারছে না।

'নৌকাডুবি'তে বিশিষ্ট কোনো চরিত্রের একক অবস্থান নেই। স্পষ্টতই 'চোখের বালি'-র পারিবারিক সমস্যা অনেকগুলো পরিবারে বিভক্ত হয়ে সীমানার বিস্তার ঘটায়, সামাজিক অবয়বকে আকার দান করে। আর এই পরিসরলোকে কোনো এক অদৃশ্য জগত হতে সময়ের প্রথাগত অনুবর্তনকে সরিয়ে প্রবহমান পথ ধরে আসে নৌকাডুবির দুর্ঘটনা, নাটকীয় উলোট পালোটের জীবনধারার আদল থেকে শেষপর্যন্ত তৈরি হয় নলিনাক্ষ-কমলার মিলনসেতু। প্রত্যক্ষ ভাবভূমিকে ছাড়িয়ে দৃষ্টির প্রখরতায় নির্মিত হয়— শুধু আত্ম নয়, শুধু সমগ্র নয়,— দুইয়ের মিলনে সম্পূর্ণতার দিক।

ফলে 'গোরা'তে এসেও গোরা চরিত্রের মতন প্রগতিবাদী ব্যক্তিত্বকে প্রত্যক্ষ সময়ের স্রোতে অবগাহন করেও শিক্ষা নিতে হয় অপ্রত্যক্ষের। বুঝতে হয় প্রগতির আসল চিহ্নটি কোথায়। স্বদেশপ্রেমেই জীবনের সার্থকতা, আর তাতে ব্যক্তি স্বভাবের বিসর্জন— গোরার এই হয় প্রাথমিক বিশ্বাসের ভূমি; অথচ তাকে অনেক ঠেকে মানতে হয়, ব্যক্তি স্বভাবের বিসর্জন নয়, প্রতিষ্ঠাতেই জীবনের সার্থকতা। মানুষের মন উজ্জীবিত হয় আধিপত্যের শাসন মেনে নয়, হুজুগের দৌরাত্ম্যে নয়— দুঃসাহসের উপর ভর করে অপরতার সহায়তায় জীবনের কঙ্কর খচিত পথে নেমে এসে। গোরা তাই পনের সংখ্যক পরিচ্ছেদে একদিন যেভাবে ষোলআনা ব্যক্তিপ্রেমকে প্রত্যাখ্যান জানায়, উনসত্তর সংখ্যক পরিচ্ছেদে কারাগার অন্তে ভোরবেলাকার বিশেষ একটি পরিসরে সে বার বার সুচরিতার কথা না ভেবে পারে না। এই ভাবতে পারা, আর না-পারা দিয়ে সময়ের স্বর উপন্যাসে নানা তরঙ্গে নানা কৌনিকতায় পদে পদে খণ্ডিত থেকে পূর্ণতার অভিমুখে পথ পরিক্রমা করে.— প্রচলিত সময়ের কৌশলকেই একমাত্ররূপে সাজাবার আয়োজন করে না। তাই নূতনভাবে সময়কে জীবনের পৃষ্ঠায় খুঁজে নেবার জন্য যে প্রবণতা ধরা

পড়ে, তার চরিত্র-বিবৃতি দেখাতে গিয়ে আলোচককে উল্লেখ করতে হয়—

"Discontinuty of time, and a complex and elusive progression based on the inter-weaving of recurrent motifs, replaced the simple, chronological development of plot, which, in its traditional sense, disappears almost entirely." [২]

যার পরিচয় 'গোরা'র পর 'চতুরঙ্গ' ও 'ঘরে বাইরে'তে এসে আরো প্রবলভাবে রবীন্দ্রনাথ উচ্চকিত করেন। শুধু বিবৃতিতে নয়, প্রয়োজনে চরিত্রের প্রবল ভূমিকাকেও তিনি গৌণ করে দেখাতে পারেন, সময়ের বদ্ধতাকে উন্মুক্ত করে দেবার তাগিদে।

'চতুরঙ্গে' জগমোহন চরিত্র প্রচলিত সামাজিক জীবনে ব্যতিক্রম, অথচ রুচিবান— হয়তো একটি আরেকটির পরিপূরক সূত্রে। কিন্তু, উভয়ের এই সার্থকতা শ্রীবিলাস নামক উত্তরযুগের কাছে। বাস্তব জীবন থেকে উনবিংশ শতকে বিদ্যাসাগরের চারিত্রিক দৃঢ়তা ও সততা লেখক যেভাবে উপলব্ধি করেন, বিংশ শতকে পরাধীন ভারতের প্রথাগত অসহযোগ আন্দোলনের প্রেক্ষাভূমিতে তাঁকেই তিনি যুক্ত করেন। নীতিগত ভাবেই হয়তো গান্ধীজীর বিরোধিতা করে রবীন্দ্রনাথ দেশের বৃহত্তর জনতার কাছে সমালোচিত হন,[৩] কিন্তু সেইসঙ্গে সেখানেও তিনি খুঁজে ফেরেন বিদ্যাসাগরের ইমেজ, খুঁজে বেড়ান তাঁর বিদ্রোহী সত্তা— যা আবেগের বশে চলে না, অথচ মানবমহিমায় যার হৃদয় ভরপুর। তিনি গঠন করেন, অথচ প্রচলিত সাময়িকতার সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে নিঃশেষ হয়ে যান। জগমোহনকেও যুগের এই তপ্ত নিঃশ্বাস ধারণ করতে হয়, বহন করতে হয় মহৎশূন্যতা। যে শূন্যতা স্বয়ং বিদ্যাসাগরকেও স্বীকার করে নিতে হয়, ইতিহাস যার সাক্ষী। তবু এর সীমারেখাটি ওই পর্যন্ত। সময়ের নির্দিষ্ট বৃত্তটি ভেঙে উত্তরসূরীদের মধ্যে বার বার তাঁদের জাগরণ ঘটে, নবজন্ম হয়। জগমোহন তাই তাঁর উপযুক্ত সম্মান পেয়ে যান শ্রীবিলাসের মাধ্যমে। তাঁর শিষ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে শচীশের মতন প্রবল আকর্ষণীয় চরিত্র যেখানে গঠনকে নিশ্চিত করে তোলে না, সেখানে তাঁর অবর্তমানে তাঁর শুভ পরিণামটিকে কাজে লাগাতে পারে কেউ কেউ— শ্রীবিলাস তাঁদেরই একজন। প্রকৃতপক্ষে, রবীন্দ্রনাথ তাই বিদ্যাসাগর, রামমোহন কিংবা স্বাধীনতা আন্দোলনে গান্ধীজীর অবস্থানকে অন্যভাবে দেখান; তাঁদেরকে শুধু ব্যক্তিত্বের আলোকে আলোকিত করেই নয়— সময়ের কাছে বৃহত্তর অপরতার স্তরে পৌঁছে দিয়ে। 'চতুরঙ্গে' শচীশ তাই যত আলো বিকিরণ করে, তাতে আকর্ষণ অমোঘ হলেও প্রায়োগিক দিক থেকে মানবিককাল শূন্যই থেকে যায়। উত্তরযুগের সমালোচককে তাই স্বীকার করতে হয়—

"শচীশ আমাদের কাছে শেষ পর্যন্ত প্রহেলিকা। পূর্ণতা-অন্বেষী শচীশ তার

জীবনের শেষ ছকে যে পর্যায়ে উপনীত, সেখানে সে তার সাধনা সর্বোত্তীর্ণ অবস্থায় পৌঁছেছে, তখন সে আত্মশরণ, তাই সে কেবল আমাদের নয়, দামিনী ও শ্রীবিলাসেরও আয়ত্তের বাইরে।"[৪]

এখানে তাই কালের যোগ্য বন্ধনমুক্তি কোথায় ঘটছে, কোথায় ঘটছে না — স্পষ্ট সীমানা ভাগ করে উপন্যাসের পথকে তুলে ধরে। স্বভাবতই, শচীশের সংসার বিচ্যুতিতে নয়, শ্রীবিলাসের সংসার সংলগ্নতায় জগমোহন তাঁর অসমাপ্তির সীমারেখাটি মুছে ফেলে পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠতে পারেন। আর ক্রম এই নির্মাণলোকে নিখিলেশ এবং সন্দীপের মধ্যবর্তী হয়ে বিমলার দ্বারা নির্দিষ্ট হয় 'ঘরে বাইরে' নামক আরেক সামাজিক উপাখ্যানের অবয়ব।

যেহেতু বিবর্তনের শেষ নেই এবং সভ্যতা এখনও অস্তিত্ব নিয়ে বর্তমান। তাই জীবনে ক্রমান্বিত কালের সঙ্গে বার বার জড়িয়ে থাকে মানুষ হয়ে ওঠার প্রগতিসূচক অভীপ্সা। অথচ এই জীবনধারার পথেই আছে কত নানা বিপরীতার্থক স্বর। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে তিনটি চরিত্রের সূত্রে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় জীবন প্রবাহিত, আবার এই প্রবাহধারার সামগ্রিক আবেদন নিয়ে আরেকটি অদৃশ্য সময়-স্পন্দন বেজে ওঠে। এই স্পন্দনকেই মুক্তরূপে অবিচ্ছিন্নতায় তুলে ধরার মানসে নিখিলেশ পঞ্চুর মধ্য দিয়ে পারিবারিক সীমাকে অতিক্রম করে ছুটে যেতে পারে দেশকাল থেকে অন্য দেশকালে— বৃহত্তরে স্বার্থে। অন্যদিকে বৃহত্তর স্বার্থের পথ থেকে আপনা আপনি গুটিয়ে যেতে পারে সন্দীপ তার ক্ষুদ্র আত্মপরায়ণতার সুউচ্চ প্রাচীরে, নিঃশব্দে; আর বিমলা সমগ্র রেখাটি স্মৃতির পটে সাজিয়ে অপেক্ষা করে বসে থাকে বিবর্তনের পথে, প্রগতির লক্ষ্যে।

উপন্যাসে তাই বিবর্তনকে দেখায় সহজরূপে, কিন্তু প্রগতির স্তরেই আসে নানা বিতর্ক। সযত্নে যে বিতর্ক সন্দীপ ও নিখিলেশের দেশ সাধনায় ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্যে ধরা পড়ে। 'যোগাযোগে' এসেও এই ভিন্নতা আরো প্রবল আকার ধারণ করে বলে কুমুদিনীকে মান্যতা দিয়েও মধুসূদনকে তুচ্ছ করা যায় না। ফলে পূর্ণবিবৃতির লক্ষ্যে তাদের দ্বৈতরূপ থেকে তৃতীয় সম্ভাবনাকে তুলে নিয়ে আসতে হয়। বুঝতে হয় অযুত সমস্যা আর দ্বন্দ্ব সংঘাত নিয়েই জীবন, ন্যায়-অন্যায়ের উৎস বিচার করতে পারা আজ আর তত সহজ নয়।

'শেষের কবিতা'য় একটি জীবনের ছক থেকে বাঁধাবাঁধি সংস্কারকে দূরে ফেলে বেরিয়ে আসার পথটি খুলে যাবার কথা প্রথম থেকেই উচ্চারিত। যার সম্ভাবনাটি বাস্তবায়িত হয় অমিত আর লাবণ্যের আলাদা দুই কেন্দ্রভূমি থেকে ওঠে এসে মিলন সংঘাতে। একই লক্ষ্যে 'দুই বোন' এবং 'মালঞ্চে'ও আকীর্ণ পথকে খুলে

রাখা এবং খুলতে চাওয়া— পর্যায়ক্রমিক দুটো উপন্যাস ধরে আসে। মনোজগতে তৈরি হয়ে ওঠে অপরতা দিয়ে গঠিত সত্তার চিরন্তনতা। 'মালঞ্চে'র নীরজা যে লক্ষ্যে ভবিষ্যৎ লোকে খণ্ড বর্তমানকে ছাড়িয়ে মানস সৌধ গড়ে তোলে। বেঁচে থাকার আবেদনকে জাতীয় স্তরে নিয়ে যেতে পারে বলেই ভাবা যায়। সেইসঙ্গে 'চার অধ্যায়ে' সেই মুক্তির লক্ষ্যভূমিকে এলার মধ্য দিয়েও প্রচলিত বর্তমানের শাসনকে উপেক্ষা করে উত্তরণের অপেক্ষাই হয়ে ওঠে বড়।

কিন্তু কোনো এই অপেক্ষার জন্য প্রবল তাড়না! তার কারণ, ধূমমলিন বাস্তব জীবনের প্রাণধারনের গ্লানি বহন করে মানুষ যেখানে পরিচিত, সেখানে আপেক্ষিক সত্য থাকলেও পূর্ণ সত্যে তা বিভাসিত নয়। উপন্যাস সেক্ষেত্রে যদি হয় এমন এক গদ্যকাহিনী, যেখানে অভিজ্ঞতার অধিকতর অনুপুঙ্খতা ও চরিত্রের বৈচিত্র্য নিয়ে সময় ও স্থানের বিস্তৃততর আধার হয়ে ওঠে এবং অন্বিষ্ট হয় বাস্তব মানুষ,[৫] তবে ব্যাপ্তির বিশালতায় নিজেকে সমর্পণ না করে উপায় থাকে না। আমাদের চারদিককার বর্তমান ছোট ছোট ঘটনার পুঞ্জ ধরে জীবনধারাকে যেখানে অব্যাহত রাখে, অথচ সেই বর্তমান থেকে চিরকালটিকে দেখতে পাওয়া সম্ভব হয় না, তখনই সময়ের পথ ধরে অপেক্ষার আবেদন কার্যকরী হয়ে ওঠে। সমালোচক বুদ্ধদেব বসু যে কথাটি সচেতন ভঙ্গীতে বলে নিতে গিয়ে তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন—

"চিরন্তনতা স্থানুতার নামান্তর নয়, সাহিত্যে তাকেই চিরন্তন বলে যার মধ্যে অব্যক্ত ইঙ্গিতের পরিমণ্ডল সমস্ত ভবিষ্যৎকে আপন গর্ভে ধারণ করে, যুগে যুগে অজাতের জন্মে, অব্যক্তের ব্যঞ্জনায় যার অপূর্ব রূপান্তর কখনোই শেষ হয় না।"[৬]

রবীন্দ্রনাথ তাই কোনো উপন্যাসেই বর্তমান অবরুদ্ধতায় থেমে থাকার কথাটি একবারও বলতে পারেন না। তাঁর পাত্রপাত্রীরা অবিরত লড়াই করে অন্তহীন অন্বেষণ আর ক্লান্তিহীন অভিযাত্রার পথ ধরে— একটি সময় থেকে আরো একটি বড় সময়ের পথে— সময়ের সহযোগিতায়। তাই যুগ পাল্টায়, তবু রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসলোকে ততোধিক সমকালিনতা নিয়ে বিরাজ করেন। সৃষ্টির পথ ধরে চিনে নেওয়া সম্ভব হয় বহু দূরত্বে অবস্থানরত প্রজন্মের সঙ্গেও গভীর এবং নিবিড় বন্ধনে তিনি কতটা যুক্ত! তাঁর উপন্যাসের চিরন্তনতা এভাবেই হয়তো প্রথার বাস্তবকালকে জয় করে নিতে, মূল্যকে পুনর্মূল্যায়ণের পথে আবেদন তৈরি করতে এবং কালের সামঞ্জস্য রক্ষা করে-করে এগিয়ে ধরতে বদ্ধপরিকর। কেননা, উপন্যাসই হচ্ছে সেই আয়না, যে আয়নায় আমাদের দ্রুত ধাবমান কাল তার দ্রুত পরিবর্তনশীল মুখের বিভিন্ন ছবিকে প্রতিফলিত করে। তাকে ক্যামেরাও বলা যায়, যে ক্যামেরা আমাদের বিভিন্ন মুখচ্ছবি স্ন্যাপ্‌শটের মত করে ধরে রাখে। আবার আয়না বা

ক্যামেরা কারুরই সাধ্য নেই জীবনকে তুলে ধরার। শিল্পের সেই ক্ষমতা আছে। উপন্যাস অনেক সময় তাই বাস্তবের থেকেও সত্যকে বেশি জ্যান্ত করে তুলতে পারে। রবীন্দ্রনাথ সেই সার্থকতাকেই তাঁর উপন্যাসে কাজে লাগাতে পারেন— কাজে লাগাতে পারেন দ্রুত ধাবমান সময়ের অন্তরালে বিভিন্ন মুখচ্ছবির জীবন্ত বিন্যাসকে তুলে ধরার আকাঙ্ক্ষায়।

উল্লেখপঞ্জি

১। রবীন্দ্রনাথ, ছোটগল্পের সমাজতত্ত্ব।। ক্ষেত্র গুপ্ত।। দ্বিতীয় সংস্করণ।। পুস্তক বিপণি।। পৃষ্ঠা - ২

২। A History of English Literature।। Edward Albert।। London 1963।। পৃষ্ঠা - ৫২২-৫২৩

৩। রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাসাগর।। অরুণ কুমার বসু।। পশ্চিমবঙ্গ, রবীন্দ্রসংখ্যা।। ১৪০৫ বাংলা।। পৃষ্ঠা - ৪৭

৪। কালের প্রতিমা।। অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়।। সংশোধিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ।। দে'জ।। পৃষ্ঠা - ৭

৫। বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাস।। রবীন পাল।। প্রবন্ধ সঞ্চয়ন।। সম্পাদনা ঃ সত্যবতী গিরি ও সমরেশ মজুমদার।। প্রথম প্রকাশ।। রত্নাবলী।। পৃষ্ঠা - ৪১৪

৬। মাইকেল।। সাহিত্যচর্চা।। বুদ্ধদেব বসু।। দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ।। দে'জ।। পৃষ্ঠা - ২৮

গ্রন্থপঞ্জি

।। বাংলা ।।

১. আচার্য্য, দেবেশ কুমার ঃ প্রবন্ধ বিচিত্রা।। প্রথম প্রকাশ।। বামা পুস্তকালয়।।

২. আহ্‌মদ, ওয়াকিল (সম্পাদিত) ঃ আধুনিক বাংলা সাহিত্য প্রতিভা— স্বাতন্ত্র্য বিচার।। প্রথম সংস্করণ।। এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ।।

৩. কবিরাজ, নরহরি (সম্পাদিত) ঃ উনিশ শতকের বাঙলার জাগরণ- তর্ক ও বিতর্ক।। প্রথম প্রকাশ।। কে পি বাগচী।

৪. গঙ্গোপাধ্যায়, পার্থজিৎ (সম্পাদিত) ঃ বিভূতিভূষণ—বিচার বিশ্লেষণ।। জানুয়ারি ১৯৯২।। পাণ্ডুলিপি।

৫. গুপ্ত, ক্ষেত্র ঃ বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড)।। ১৯৯৪- প্রকাশ।। গ্রন্থনিলয়।

৬. গুপ্ত, ক্ষেত্র ঃ রবীন্দ্রনাথ-ছোটগল্পের সমাজতত্ত্ব। দ্বিতীয় সংস্করণ।। পুস্তক বিপণি।

৭. গুপ্ত, রবীন্দ্র ঃ উপন্যাসে বাস্তবতা-রবীন্দ্রনাথ।। প্রথম প্রকাশ।। চিরায়ত প্রকাশন।

৮. ঘোষ, তরুণ ঃ রবীন্দ্রনাথের চোখের বালি উপন্যাসের শিল্পরূপ।। প্রথম সংস্করণ।। রত্নাবলী।

৯. ঘোষ, শঙ্খ ঃ এ আমির আবরণ।। তৃতীয় সংস্করণ।। প্যাপিরাস।

১০. ঘোষ, শঙ্খ ঃ ঐতিহ্যের বিস্তার।। তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ।। প্যাপিরাস।

১১. ঘোষ, শঙ্খ ঃ কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক।। তৃতীয় সংস্করণ।। দে'জ।

১২. ঘোষ, শঙ্খ ঃ নির্মাণ আর সৃষ্টি।। দ্বিতীয় সংস্করণ।। প্যাপিরাস।

১৩. ঘোষ, শঙ্খ (সম্পাদিত) ঃ এইসময় ও জীবনানন্দ।। প্রথম সংস্করণ।। সাহিত্য অকাদেমি।

১৪. চক্রবর্তী, অজিত কুমার ঃ রবীন্দ্রনাথ ও কাব্য পরিক্রমা।। তৃতীয় মুদ্রণ,।। মিত্র ও ঘোষ।

১৫. চক্রবর্তী, বসুধা ঃ মানবতাবাদ।। দ্বিতীয় সংস্করণ।। দীপায়ণ।

১৬. চট্টোপাধ্যায়, অমল ঃ আধুনিকতা, উত্তর আধুনিকতা ও একটি বিকল্পের অনুসন্ধান।। প্রথম প্রকাশ।। ভারতী বুক স্টল।

১৭. চট্টোপাধ্যায়, ভবতোষ ঃ বিবেকানন্দ-সময় ও ইতিহাস চেতনা।। প্রথম প্রকাশ।। প্যাপিরাস।

১৮. চট্টোপাধ্যায়, ভবতোষ : রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক মনন।। জানুয়ারি ১৯৯২।। প্যাপিরাস।

১৯. চৌধুরী, ভূদেব : রবীন্দ্র উপন্যাস-ইতিহাসের প্রেক্ষিতে।। প্রথম প্রকাশ।। দে'জ।

২০. দত্ত, অম্লান : প্রবন্ধ সংগ্রহ।। প্রথম সংস্করণ।। আনন্দ।

২১. দাশ, অমরেশ : রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস— নবমূল্যায়ন।। প্রথম প্রকাশ।। মণ্ডল বুক হাউস।

২২. দাশগুপ্ত, শশিভূষণ : ঘরে বাইরের সাহিত্য চিন্তা।। সাহিত্য জগৎ।

২৩. দাশগুপ্ত, শশিভূষণ : ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য।। প্রথম প্রকাশ (ষষ্ঠ মুদ্রণ)।। সাহিত্য সংসদ।

২৪. দাশগুপ্ত, শশিভূষণ : শিল্পলিপি।। প্রথম সংস্করণ (তৃতীয় মুদ্রণ)।। এ. মুখার্জি এণ্ড কোং।

২৫. দাস, রবীন্দ্রনাথ : ধর্ম ও দর্শন।। প্রথম সংস্করণ।। নিউ এজ।।

২৬. দে, বিশ্বনাথ (সম্পাদনা) : রবীন্দ্রস্মৃতি।। প্রথম প্রকাশ।। ক্যালকাটা বুক হাউস।।

২৭. দে, সত্যব্রত : রবীন্দ্র উপন্যাস সমীক্ষা (প্রথম খণ্ড)।। দ্বিতীয় সংস্করণ।। জিজ্ঞাসা।

২৮. পাল, নিমাইচন্দ্র : রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে।। প্রথম প্রকাশ।। রত্নাবলী।।

২৯. পাল, প্রশান্ত কুমার : রবিজীবনী (দ্বিতীয় খণ্ড)।। প্রথম সংস্করণ।। আনন্দ।।

৩০. পাল, সুচিত্রা : রবীন্দ্র উপন্যাসের পাঠান্তর।। প্রথম প্রকাশ।। মডেল পাবলিশিং।

৩১. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত কুমার : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (সপ্তম খণ্ড)।। প্রথম সংস্করণ।। মডার্ণ।

৩২. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত কুমার : বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত।। সংশোধিত সপ্তম সংস্করণ।। মডার্ণ।

৩৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন (সম্পাদিত) : রবীন্দ্র প্রসঙ্গ/আনন্দবাজার পত্রিকা ১৩ মার্চ, ১৯২২ থেকে ২১ মার্চ, ১৯৩২।। প্রথম সংস্করণ।। আনন্দ।

৩৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়ন্ত : উপন্যাসে সমাজদৃষ্টি-বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ।। ১৯৯০ প্রকাশ।। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।

৩৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম : অন্তর্বয়ন-কথাসাহিত্য।। প্রথম প্রকাশ।। একুশে।

৩৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম : উপন্যাসের সমাজতত্ত্ব।। প্রথম প্রকাশ।। র‍্যাডিক্যাল ইম্‌প্রেশন।

৩৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম : পোস্টমডার্ণ ভাবনা ও অন্যান্য।। প্রথম প্রকাশ।। র‍্যাডিক্যাল ইম্‌প্রেশন।

৩৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, রণজিৎ : উনিশ শতকে নারীমুক্তি আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য।। প্রথম প্রকাশ।। পুস্তক বিপণি।।

৩৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার : বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা।। নবম পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ।। মডার্ণ।

৪০. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার : রবীন্দ্র সৃষ্টি সমীক্ষা (দ্বিতীয় খণ্ড)।। নূতন সংস্করণ।। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি।

৪১. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ : বাংলা উপন্যাসের কালান্তর ।। পরিবর্ধিত প্রথম সংস্করণ।। দে'জ।

৪২. বসু, অরুণ কুমার : বাংলা কাব্যসংগীত ও রবীন্দ্রসংগীত । দে'জ পাবলিশিং।

৪৩. বসু, বুদ্ধদেব : রবীন্দ্রনাথ ও কথাসাহিত্য।। তৃতীয় সংস্করণ।। নিউ এজ পাবলিশার্স।

৪৪. বসু, বুদ্ধদেব : সাহিত্যচর্চা।। দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ।। দে'জ।

৪৫. বসু, মধুসূদন : রবীন্দ্র সাহিত্যে পল্লী ও শহর।। অন্নপূর্ণা।।

৪৬. বসু, শুদ্ধসত্ত্ব : রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে।। প্রথম প্রকাশ।। মণ্ডল বুক হাউস।

৪৭. বসু, স্বপন : বাংলার নবচেতনার ইতিহাস।। তৃতীয় সংস্করণ।। পুস্তব বিপণি।

৪৮. বসু, স্বপন : সতী।। দ্বিতীয় সংস্করণ।। পুস্তক বিপণি।।

৪৯. বাগচী, অমিয় কুমার : সংস্কৃতি, সমাজ ও অর্থনীতি।। ১৯৯৫ বইমেলা প্রকাশ।। অনুষ্টুপ।

৫০. বিশী, প্রমথনাথ : রবীন্দ্র সাহিত্য বিচিত্রা।। পরিবর্ধিত সংস্করণ।। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি।

৫১. ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন : নানা রবীন্দ্রনাথ।। প্রথম সংস্করণ।। আনন্দ।

৫২. ভট্টাচার্য, তপোধীর : উপন্যাসের সময়।। প্রথম প্রকাশ।। এবং মুশায়েরা।

৫৩. ভট্টাচার্য, তপোধীর : বাখতিন-তত্ত্ব ও প্রয়োগ।। প্রথম প্রকাশ।। পুস্তক বিপণি।

৫৪. ভট্টাচার্য, মালিনী : নির্মাণের সামাজিকতা ও আধুনিক বাংলা উপন্যাস।। প্রথম সংস্করণ।। দে'জ।

৫৫. মজুমদার, অর্চনা : রবীন্দ্র উপন্যাস পরিক্রমা।। প্রথম প্রকাশ।। ওরিয়েন্ট।

৫৬. মজুমদার, উজ্জ্বল কুমার : উপন্যাসে জীবন ও শিল্প।। প্রথম প্রকাশ।। সান্যাল এণ্ড কোম্পানি।

৫৭. মজুমদার, উজ্জ্বল কুমার : এ মণিহার।। প্রথম প্রকাশ।। শৈব্যা।

৫৮. মজুমদার, উজ্জ্বল কুমার (সম্পাদিত) : রাতের তারা দিনের রবি।। প্রথম সংস্করণ।। আনন্দ পাবলিশার্স।

৫৯. মজুমদার, নেপাল : রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র।। তৃতীয় সংস্করণ।। সারস্বত লাইব্রেরী।

৬০. মুখোপাধ্যায়, অরুণ কুমার : কালের প্রতিমা - বাংলা উপন্যাসের ষাট বছর - ১৯২৩-১৯৮২।। সংশোধিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ।। দে'জ।

৬১. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার : মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্নে, বিংশ শতাব্দীর বাংলা উপন্যাস।। প্রথম প্রকাশ।। দে'জ।

৬২. মুখোপাধ্যায়, ধ্রুবকুমার : রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা।। দ্বিতীয় পরিবর্ধিত পরিমার্জিত সংস্করণ।। পুস্তক বিপণি।

৬৩. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার : রবীন্দ্রজীবনী (দ্বিতীয় খণ্ড), পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ।। বিশ্বভারতী।

৬৪. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার : রবীন্দ্রজীবনী (তৃতীয় খণ্ড)।। তৃতীয় সংস্করণ।। বিশ্বভারতী।

৬৫. মুখোপাধ্যায়, সন্তোষ (সম্পাদিত) : নিঃশব্দের শিখা শঙ্খ ঘোষ ।। প্রথম প্রকাশ ।। অনুষ্টুপ।

৬৬. রায়, অনিল : হেগেলীয় দর্শন।। প্রথম প্রকাশ ।। জয়শ্রী।

৬৭. রায়, দেবেশ : উপন্যাস নিয়ে।। প্রথম প্রকাশ।। দে'জ।

৬৮. রায়, নীহাররঞ্জন : রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা।। পঞ্চম সংস্করণ।। নিউ এজ পাবলিশার্স।

৬৯. রায়, রণেন্দ্রনারায়ণ : ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ।। প্রথম সংস্করণ।। দাশগুপ্ত এণ্ড কোম্পানি।

৭০. রায় চৌধুরী, গোপিকানাথ : দুই বিশ্বযুদ্ধেব মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য।। প্রথম সংস্করণ।। দে'জ।

৭১. রায় চৌধুরী, গোপিকানাথ : বাংলা কথাসাহিত্য প্রকবণ ও প্রবণতা।। প্রথম প্রকাশ।। পুস্তক বিপণি।

৭২. রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ : রবীন্দ্র উপন্যাসের নির্মাণশিল্প।। প্রথম প্রকাশ।। দে'জ।

৭৩. শাস্ত্রী, শিবনাথ : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ।। তৃতীয় সংস্করণ।। নিউ এজ পাবলিশার্স।

৭৪. সান্যাল, ভবানীগোপাল : রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য তত্ত্ব।। দ্বিতীয় সংস্করণ।। মডার্ণ।

৭৫. সিকদার, অশ্রুকুমার : আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস।। প্রথম প্রকাশ।। অরুণা প্রকাশনী।

৭৬. সেন, সুকুমার : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (চতুর্থ খণ্ড)।। প্রথম সংস্করণ।। আনন্দ।

৭৭. সেনগুপ্ত, শ্যামল : নায়কের বিবর্তন - বাংলা উপন্যাসে।। সাহিত্য বিহার সংস্করণ।। ওরিয়েন্টাল।

৭৮. সেনগুপ্ত, সুবোধচন্দ্র : সাহিত্য পাঠের ভূমিকা।। দ্বিতীয় সংস্করণ।। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়।

৭৯. হাসান, বদরুল : উনিশ শতক - নবজাগরণ ও বাংলা উপন্যাস।। প্রথম প্রকাশ।। জগতমাতা।

।। ইংরাজি ।।

1. Bhattacharjee, Bhabani : Tagore as a Novelist. ।। Centenary Volume.
2. Dutt, Hur Chunder : An Address on Native Female Education ।। Calcutta- 1856.
3. Edward, Albert : A History of English Literature ।। London 1963.
4. Edwards, D. Miall : The Philosophy of Religion.
5. Ford, Boris (Ed.) : The New Pelican Guide to English Literature (Vol-7) ।। Revised and expanded edition ।। Penguin Books.
6. Forkes, Mayer : Social structure, Studies presented to A. R. Radcliffe-Brown ।। 1963 ।। New York, Russell & Russell Inc.
7. Fox, Ralph : The Novel and the People
8. Ghosh, Pansy Chaya : The Development of the Indian National Congress 1892-1909 ।। 2nd Revised & Enlarged Edition ।। Firma klm Private Limited.
9. Ghosh, D. N. : Essays on Literary Types and Theories ।। Fourth Edition ।। Modern.
10. Hurlock, Elizabeth B. : Personality Development ।। TMH Edition ।। TATA Mc GRAW. HILL.
11. Ian, Ousby (Ed.) : The Cambridge Guide to Literature in English ।। Revised paper back edition ।। Cambridge University press.
12. Iyengar, K. R. Srinivasa : Rabindranath Tagore A Critical Introduction ।। 1965 ।। Sterling.
13. Iyengar, K. R. Srinivasa : The Adventure of Criticism ।। 1985 Published ।। Sterling.
14. Kripalani, Krishna : Tagore A Life ।। Third edition ।। National Book Trust, India.
15. Kundera, Milan : The Art of the Novel ।। First Rupa paper back edition ।। Rupa and Co.
16. Latham, Jaequeline E.M. Ed. : Critics on Virginia Woolf ।। Reprint 1994 ।। Universal Book Stall.
17. Nag, Jamuna : Social Reform Movements in Nineteenth Century India ।। First Published, 1988 ।। RBSA Publishers.
18. Radhakrishnan. S. : Towards A New World ।। First Pub. ।। Orient.

19. Russell, Bertrand : An outline of Philosophy ।। 1993 ।। Routledge.

20. Ryle, Gilbert : The Concept of Mind ।। 1990 ।। Penguin Books.

21. Warnock, Mary : Imagination and Time ।। First Published ।। Blackwell.

22. West, Alick : Crisis and Criticism and Literary Essays ।। Lawrence and Wishart, London.